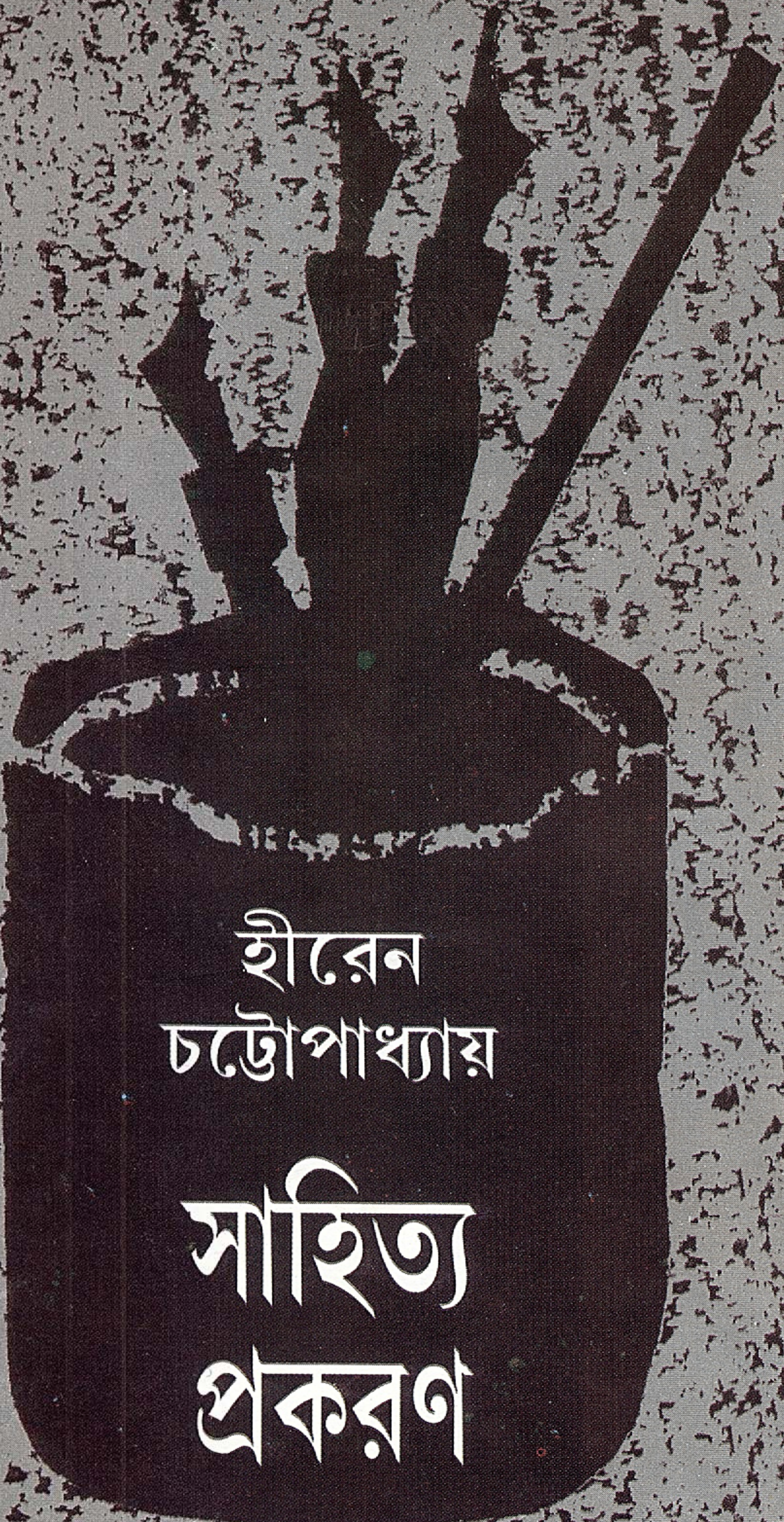


হীরেন
চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকরণ

সাহিত্য-প্রকরণ

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

SAHITYA-PRAKARAN, An Elementary Book of Literary Forms and Literary Movement, By Dr. Hiren Chattapadhyay, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, September 2012, ₹ 150.00.

প্রথম প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২
দ্বিতীয় সংস্করণ : দোল পূর্ণিমা, ১৪০৪
তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : পৌষ সংক্রান্তি, ১৪০৬
চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ১৪১৩
পূনর্মুদ্রণ : রথযাত্রা, ১৪১৬
পূনর্মুদ্রণ : শিক্ষক দিবস, ১৪১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

অক্ষর বিন্যাস
সুমুদ্রণ
৩০/১বি কলেজ রো
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 81-89827-10-3

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায়কে

শ্রদ্ধাসহ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ হয়েছিল ১৪০৬ বঙ্গাব্দে, তারপরও এর দুটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পুনর্মুদ্রণ থেকেই অস্বস্তি অনুভব করতে থাকি এই কারণে যে, যে-ব্যাপক সংযোজন ও পরিবর্তন তৃতীয় সংস্করণে করেছিলাম, তাও যেন এখন যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। সেই কারণে বইটি আদ্যোপান্ত দেখতে গিয়ে আরো কিছু সংযোজন অপরিহার্য মনে হচ্ছিল। এই দিকগুলি সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদানরত আমারই প্রিয় ছাত্রছাত্রী বা ছাত্রপ্রতিম অধ্যাপক। এঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতাতেই এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান, সুতরাং তাঁদের মতামত কখনোই উপেক্ষণীয় নয়। সেই কারণেও কিছু প্রসঙ্গ সংযোজিত করতে হয়েছে। সেগুলি লেখার পর দেখা গেল গ্রন্থের আয়তনও লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে, আলোচনাও বিশদতর হয়েছে। অর্থাৎ সব অর্থেই এটি যে একটি ভিন্ন সংস্করণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আমার এই গ্রন্থটিকে নিয়মিত পৌঁছে দিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে, তাঁদের প্রতি আমার ভালোবাসার ঋণ অমেয়। নিয়ত তাঁদের শুভকামনা করে সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে চলেছি।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হবে। এই গ্রন্থ পাঠ করে অযাচিত ভাবেই, কেবল গ্রন্থের মান সম্বন্ধে তৃপ্তিলাভ করে, প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত আমাকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর নিতান্ত অপরিচিত, ছাত্রপ্রতিম অধ্যাপকের প্রতি, তাঁর এই আচরণ আমাকে অভিভূত করেছিল। এই সুযোগে তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

এত চেষ্টা করেও গ্রন্থটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়নি। প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনার কথা বলে আসছি, গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করা, এবারেও তা করা গেল না। বিস্তর পরিবর্ধন সত্ত্বেও এখনও কিছু প্রসঙ্গ অনালোচিত বলে মনে হচ্ছে। তত্ত্বগ্রন্থের পূর্ণতা সাধন বোধহয় কোনদিনই সম্ভব নয়।

সুধী মানুষ ও নিষ্ঠ অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করেছেন, সে আমার সৌভাগ্য, কিন্তু মূলত যাদের জন্য এই বই তারা উপকৃত হলে এবং একে ভালোবাসতে পারলেই আমার উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক মনে করবো। ইতি—

ব্যাঙ্ক পার্ক, ব্যারাকপুর
পৌষ, ১৪১৩

ইতি—

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কেতাবী সাহিত্যপাঠ শুরু করবার আগে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ এবং প্রধান সাহিত্যিক আন্দোলন বা মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত থাকা প্রয়োজন। একে বলা যেতে পারে সাহিত্যপাঠের উপক্রমণিকা, যেটি নিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে কেবল প্রত্যাশিত নয়, আবশ্যিক।

ইংরেজিতে এই ধরনের উপক্রমণিকা আছে, বাংলাতেও আছে। বস্তুতপক্ষে ইংরেজি ভাষায় ঔপন্যাসিক-সমালোচক W. H. Hudson-এর An Introduction to the Study of Literature গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রাথমিক গ্রন্থগুলির আদর্শ বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত শ্রীশচন্দ্র দাশ বিরচিত 'সাহিত্য-সন্দর্শন', যেটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজি ভাষায় তো বটেই, বাংলাতেও শ্রীশচন্দ্র দাশের গ্রন্থের পর এই ধরনের গ্রন্থ আরো কিছু লেখা হয়েছে এবং তা লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের কৃতী সমালোচকেরাই। এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থটি সেই ধারার এক তুচ্ছ সংযোজন মাত্র।

এই স্বীকারোক্তিকে বিনয় হিসাবে গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রমথ চৌধুরী বর্তমান যুগকে 'ছোটগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন' রচনার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। যুগলক্ষণে এত ভালো সনাক্তিকরণ খুব বেশি হয়নি বলেই মনে হয়। এই যুগেও করবার মতো বড়ো কাজ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতেই উৎসাহ ও পরমায়ুর সার অংশ ব্যয়িত হয়ে যায়, বড়ো কাজ অস্পৃষ্টই থেকে যায়। এই গ্রন্থটিও সেই রকমই একটি অনিবার্য অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত।

সাধারণ পাঠক এবং সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সহজে সাহিত্য সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারেন, বিস্তর আয়াস স্বীকার না করেও মোটামুটি ভাবে সাহিত্যপাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থ রচিত। সুতরাং গবেষণাধর্মী কোনও বিশ্লেষণ, কোনও নতুন তথ্য, এমনকি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাও এই গ্রন্থে হয়তো পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সাহিত্যের প্রকরণ সম্বন্ধে বা সাহিত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে মৌলিক সংযোজনের কোনো দাবি আমার নেই, এবং সেই সঙ্গে একথা স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাগ্রসরদের জন্য এ গ্রন্থ নয়—যাঁরা সাহিত্য-অধ্যয়নের প্রথম পাঠ নিতে চলেছেন, এ গ্রন্থ তাঁদের কাছেই উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি অবশ্যই দুটি খণ্ডে বিভক্ত থাকা উচিত ছিল, প্রথম খণ্ডে থাকতে পারতো সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রকরণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাহার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্যিক মতবাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরকম কোনো খণ্ডবিভাগ করা যায় নি। প্রথম সাতটি অধ্যায়ে আছে সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয়, এ পরিচয় সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের; গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে আছে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক আন্দোলনের পরিচয়

এবং তা থেকে উদ্ভূত কিছু পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা। প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যিক আন্দোলনের পূর্বেই থাকে সমজাতীয় এক দার্শনিক আন্দোলন। পরিসরের স্বল্পতার কথা ভেবেই দার্শনিক জগতের সেই আন্দোলনের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি, উল্লেখ করেছি মাত্র। অবশ্য সাহিত্যিক আন্দোলনগুলিও বিশদ করার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

একেই প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ, তার ওপর তা বিশদ করতে না পারা জনিত কুণ্ঠা, কাজেই এর স্বীকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকাই স্বাভাবিক। সাগ্রহে রসিকজনের, এবং অবশ্যই বিদগ্ধজনের, মতামতের অপেক্ষায় থাকবো।

অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তবু এর জন্য বিস্তর সময় নিয়েছি, ধৈর্যের প্রায় শেষ স্তরে পৌঁছবার পরই পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাগুলি প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি; এবং তাও যে শেষ পর্যন্ত পেরেছি তার জন্য তরুণ প্রকাশক শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর তাগাদা এবং অশেষ ধৈর্যশীল মনোভাবই দায়ী। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে সে লজ্জা পাবে, আমার শুভেচ্ছাই তাকে জানালাম।

নাম ধরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গেলে এই গ্রন্থপ্রকাশে আরো বিলম্ব হয়ে যেত, কারণ আমি কৃতজ্ঞ নই কার কাছে, তাই আমাকে ভাবতে হত। আমার পণ্ডিত সহকর্মীরা, কাছের বন্ধুবান্ধব, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাশীল ছাত্রছাত্রীরা, যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাদের সুপণ্ডিত লেখকবৃন্দ—সকলের কাছেই আমার ঋণ স্বীকার করছি। বিশেষ করে নাম করতে হবে ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদেবদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন সময়ে তার সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি।

আমি মূলত সাহায্য গ্রহণ করেছি দুটি ইংরেজি গ্রন্থ ও দুটি বাংলা গ্রন্থের। এগুলি হল W. H. Hudson-এর *An Introduction to the Study of Literature*, M. H. Abrams-র *A Glossary of Literary Terms*, শ্রীশচন্দ্র দাশের 'সাহিত্য-সন্দর্শন' এবং শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদারের 'সাহিত্যের রূপ-রীতি'। এ ছাড়াও, প্রাসঙ্গিক সাহায্য আছে বহু গ্রন্থের। আমি মুক্তকণ্ঠে এই সব সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এতো রকমের সাহায্যের পর বলবার কথা একটাই থাকে, শংসিত হবার মতো কোনো গুণ এ গ্রন্থের থাকলে তার কৃতিত্ব অনেকের, নিন্দিত হবার সুযোগ করে দিয়ে থাকলে সে ত্রুটি সম্পূর্ণ আমার। শংসা ও নিন্দা যাই হোক, তা জানাবার কষ্ট স্বীকার করলে বাধিত হবো।

শেষ কথা, যাদের জন্য এই বই, তাদের ভালো লাগলে নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করবো।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।
পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

ইতি—

এই লেখকের কয়েকটি গ্রন্থ

- বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি
- বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত
- এসেছে রবির কর
- বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা (সম্পাদনা)
- সাহিত্য প্রবন্ধ : প্রবন্ধ সাহিত্য (সম্পাদনা)
- উপন্যাসে আধুনিকতা : চোখের বালি
- বিচিত্র বিষয় ও রীতি : রজনী
- দীর্ণ ব্যক্তিত্বের দিনলিপি : পঞ্চভূত
- নাটকে আধুনিকতা : কৃষ্ণকুমারী নাটক
- সাহিত্য-বীক্ষণ
- বিসর্জন : নবনিরীক্ষা
- আরণ্যক : বিভূতিভূষণ এবং অন্যান্য
- ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ
- তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেরও (সম্পাদনা)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যপাঠের ভূমিকা

ক. শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্যালোচনা কী ধরনের তত্ত্ব, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি ও মতভেদ—শিল্পের মাধ্যমভিত্তিক প্রকারভেদ। খ. সাহিত্যসৃষ্টির কারণ—দৈবী আশীর্বাদ বা প্রেরণা—অনুকরণবাদ—বিস্ময়বোধ—রাবীন্দ্রিক ধারণা—সাহিত্যসৃষ্টিতে চিন্তার ভূমিকা—অবাস্তব জগতের চিন্তা, ব্যবহারিক চিন্তা, মানবিক চিন্তা—একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি—মানুষ হিসাবে মানুষের অভিজ্ঞতা—মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ—প্রকৃতিজগৎ সম্বন্ধে চিন্তা—শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাবনা—চিন্তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীর সাহিত্য : আত্মমগ্ন বা মন্ময়, বস্তুধর্মী বা তন্ময় এবং তথ্যমূলক। গ. সাহিত্যের উপাদান : হৃদয়গত—বুদ্ধিগত—কল্পনা—প্রয়োগকৌশল—মুখ্য উপাদান মানবজীবন।

ক. শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্যালোচনার স্বরূপ এবং প্রকারভেদ

সাহিত্য কাকে বলে, এই প্রশ্ন করলে আমাদের অধিকাংশের মনের অবস্থা ঠিক যেরকম হয় সেটা বোঝা যাবে সেণ্ট অগাস্টিনের একটি রমণীয় উত্তর থেকে—"জিজ্ঞাসা যদি না করো তো আমি জানি, করলে আমি কিছু জানি না।"

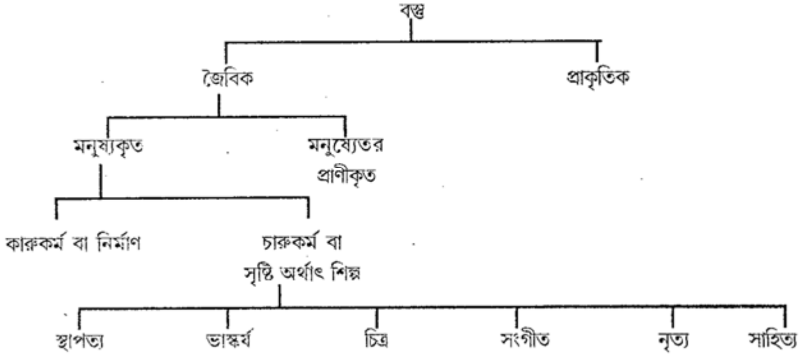
সেণ্ট অগাস্টিন অবশ্য সাহিত্য প্রসঙ্গে এই উত্তর দেন নি, কিন্তু 'কবিতা কী?' এই প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন প্রায় এই রকম একটি মন্তব্যই করেছিলেন — "Why, sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is."

"কী নয় সেটা বলা সহজ, কী তা জানানোর চেয়ে"—এ কথা কেবল কবিতা সম্বন্ধে সত্য নয়, সমগ্র সাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য। আবার শুধু সাহিত্যের কথাই বলি কেন, সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা প্রযোজ্য। শিল্প কাকে বলে, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সে বোধ আমাদের অনেকেরই আছে। রামকিঙ্করের একটি গতিময় ভাস্কর্য যখন দেখি, চোখে পড়ে পুরাণের পাতা থেকে উঠে-আসা রবি বর্মার ছবি, একটি অসাধারণ নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হই—আমরা বুঝে যাই কাকে বলে শিল্প; যিনি সে নাটক লিখেছেন তিনিও শিল্পী, যিনি অভিনয়ে তাকে সজীব করলেন তিনিও। শুধু কি এই, উদয়শঙ্করের মতো নৃত্যশিল্পী, আলি আকবর খাঁ সাহেবের মতো যন্ত্রশিল্পী, সরোজিনী নাইডুর মতো বাগ্মী—এঁরা সবাই তো শিল্পী। কাজেই এই ব্যাপক শিল্পাঞ্চলকে সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলার মতো দুঃসাধ্য কর্ম কেমন করে সম্ভব! কাজেই কেউ প্রশ্ন করলে সেণ্ট অগাস্টিনের মতো এ কথা তো বলতেই হবে, যদি জিজ্ঞাসা না করো তো জানি, করলে নয়।

শিল্পের এই ব্যাপকত্বের জন্য যেমন এক কথায় তার পরিচয় দেওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত ও শিল্পরসিক মানুষদের মতভেদও ব্যাপারটিকে প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে নিয়ে যায়। যেমন, সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হত যে আনন্দ দান করাই শিল্পের উদ্দেশ্য, তাই শিল্পতত্ত্বকে সৌন্দর্যতত্ত্ব হিসাবেই গ্রহণ করা হত। এ বিষয়ে প্রথম সমস্যা দেখা গেল যখন মনে এ প্রশ্ন এল, একে সঠিকভাবে কী বলা হবে—সৌন্দর্যবিজ্ঞান না সৌন্দর্যদর্শন! এই প্রশ্নের মীমাংসা হলেই যে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, এ কথা মনে করার কারণ নেই—

সৌন্দর্যের আকরই হোক বা আনন্দের প্রকাশই হোক, অথবা অভিজ্ঞতার ফসলও যদি বলি—শিল্প যে মানুষের নির্মিত বা মানুষের চেষ্টায় কৃত কোনো বস্তু, এ সম্বন্ধে ভুল নেই। সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এই কথাটা একটু স্পষ্ট করে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে বস্তু দুরকম—প্রাকৃতিক ও জৈবিক অর্থাৎ জীবের দ্বারা কৃত। এবার এই জীবের তৈরি করা বস্তুকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—এক ভাগে থাকবে মানুষের তৈরি বস্তু, অন্যভাগে মনুষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তু (যেমন ধরা যাক পাখির বাসা, উইপোকার ঢিবি, মৌচাক প্রভৃতি)। মনুষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তু অনেক সময়ই দেখে আমরা মুগ্ধ হই, অবশ্য আকাশে মেঘের খেলা কিংবা ফুলের বিচিত্র বর্ণের শোভাও আমাদের মুগ্ধ করে—কিন্তু তাদের তো আর আমরা শিল্পকর্ম হিসাবে অভিহিত করতে পারবো না। তাহলে শিল্প হল মানুষেরই করা কোনো বস্তু, এ ভাবে বললে আমরা নেতিবাচক পথে অন্যান্য অনেক বস্তুর সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তুর সঙ্গে তার একটা পার্থক্য রচনা করতে পারব। এবার দেখা যাক মানুষের করা সব জিনিসই শিল্প কিনা! নিশ্চয়ই তা নয়! মানুষ যন্ত্রপাতি বানায়, রুটি গড়ে, বাড়ি তৈরি করে—এ সব তো আর শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। তার কারণ হল, মানুষ এগুলো প্রয়োজনের তাগিদেই করে, এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত মুগ্ধতা, উপভোগ্যতা বা প্রয়োজনের বাইরে অন্য কিছু নেই! তাই এখানেও আমরা মানুষের তৈরি করা জিনিসকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—ব্যবহার্য জিনিস এবং উপভোগ্য জিনিস, আর একটু সাধুভাষা ব্যবহার করে এদের বলতে পারি যথাক্রমে কারুকর্ম এবং চারুকর্ম। রবীন্দ্রনাথ এদের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে একটাকে বলেছেন নির্মাণ, অন্যটাকে সৃষ্টি। প্রধানত সাহিত্য প্রসঙ্গে বললেও, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই রকম—"সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইঁটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী।" *(সাহিত্যের উদ্দেশ্য/সাহিত্য)*

যে ভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি তাতে বলতে পারি, চারুকর্ম অর্থাৎ মানুষের করা সৃষ্টিধর্মী বস্তুই শিল্প। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর শিল্পতত্ত্ববিষয়ক একটি সমালোচনা-গ্রন্থে এই ব্যাপারটি বোঝাতে একটি রেখাচিত্র ব্যবহার করেছেন। তা অবলম্বন করে আমরা এই ভাবে এযাবৎকৃত আলোচনাকে সজ্জিত করতে পারি—



সৌন্দর্যবাদীদের মধ্যেই এ৲ বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সেখানে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই। এরপরও আমরা এমন কিছু শিল্পতাত্ত্বিকের সন্ধান পাবো যাঁরা সৌন্দর্যকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করেন না, তাঁদের মতে শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ। এই মতে বিশ্বাস করেন না এমন শিল্প-রসিকও আছেন। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন শিল্প আসলে রসতত্ত্ব, মনের ভাবকে রসে পরিণত করাই শিল্পের কাজ। অনেকের মতে শিল্প হচ্ছে প্রকাশতত্ত্ব—প্রকাশের আবেগই তার উৎস এবং সমর্থ প্রকাশই তার পরাকাষ্ঠা। আবার এমন মতও আছে যে কল্পনা, প্রতিভা, সৌন্দর্য, এসব কোনো ব্যাপারই নয়—শিল্প জন্ম নেয় অভিজ্ঞতা থেকে। তাই শিল্পবিচারে এঁদের বলা যায় অভিজ্ঞতাবাদী বা বীক্ষণবাদী। এসব কথা যাঁরা বলেছেন, এসব চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন ভাবধারা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রসজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি। যেমন, বীক্ষণবাদীরা বলেন শিল্পতত্ত্বের প্রচলিত ইংরেজি নাম Aesthetics, যে শব্দটির মূলে আছে গ্রীক 'aisthesis' (যার অর্থ sense-perception বা ইন্দ্রিয় সংবেদন) সুতরাং বীক্ষণতত্ত্বই শিল্পতত্ত্বের মূল কথা।

এখন কথা হচ্ছে, যখন পণ্ডিতদের মধ্যেই এত মতান্তর তখন আমরা, অত্যন্ত সাধারণ পাঠকেরা, কী করবো! আমাদের এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের সেই বিখ্যাত কবিতা 'পূর্ণিমা'-র কথা :

"পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনা তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহাকে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায়; শেলী, গেটে, কোল্‌রীজ
কার কোন্ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,
... ...
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিত পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।"

তবে মুশকিল হচ্ছে, মহৎ সাহিত্যপাঠের আসরে প্রবেশ করতে হলে সামান্য কিছু ধারণা তো রাখতেই হয়! কাজেই পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা বরং শিল্প-সাহিত্যের সেই প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করবারই চেষ্টা করি।

শিল্প কাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যখন একটু অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে, তখন বরং নেতিমূলক পথে এগোন যাক খানিকটা, অর্থাৎ শিল্প কাকে বলা যায় না সেই দিকে চোখ রেখেই অগ্রসর হই।

খ. সাহিত্যসৃষ্টির কারণ: বিভিন্ন মতবাদ

কাকে বলে সাহিত্য! এ প্রশ্ন জেগেছিল একেবারে আদিকবি বাল্মীকির মনে। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত প্রথম শ্লোক 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদির সঙ্গেই কবির যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে প্রশ্ন জেগেছিল, এ আমি কী উচ্চারণ করলাম—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।' সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ বহু চিন্তিত প্রয়াস উপস্থিত করেছেন—ধ্বনিবাদী, রসবাদী, রীতিবাদী তাত্ত্বিকেরা অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিন্তা প্রতীচ্যেও আমরা লক্ষ করি অনেক আগে থেকেই। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান আলোচনার জন্য অ্যারিস্টটল এবং তার 'পোয়েটিক্স্' এখনও অমর হয়ে আছে, এখনও সাহিত্যালোচনার জটিল তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় তাঁর। কিন্তু প্রতীচ্যে এই জাতীয় আলোচনার সূত্রপাত অ্যারিস্টটলের গুরু, আর-এক মহান দার্শনিক প্লেটো-র হাতে, অথবা বলতে পারি আরও আগে 'ফ্রগ্স্' গ্রন্থে—যার রচয়িতা প্রায় চব্বিশশো বছর আগেকার কমেডি নাটক রচয়িতা অ্যারিস্টাফিনিস।

এর পর দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যতাত্ত্বিকরা নিয়োজিত রয়েছেন সাহিত্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ বিচারের কাজে। সাহিত্য রচনার উৎসাহ কেন মানুষের মনে জাগে, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' কেন, সকলে কিছু লেখার চেষ্টা করলে 'বাক্য' হয়েই থাকে অথচ বিশেষ কারো কারো লেখা 'কাব্য' হয়ে ওঠে কী কারণে, কাব্য রচয়িতাদের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতা বর্ষিত হয় কিনা—এই ধরনের অনেক প্রশ্নই তাত্ত্বিকদের আলোড়িত করেছে। দার্শনিক সক্রেটিস এবং প্লেটো কবিদের সম্বন্ধে যে ঐশী প্রেরণার উল্লেখ করেছিলেন, তার পর থেকেই নানাভাবে এই প্রেরণার ব্যাপারটা একটা তাত্ত্বিক চেহারা লাভ করেছে। আবার ওই একই সঙ্গে দার্শনিক অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদী চিন্তার ফলে অনুকরণবাদের উদ্ভব ঘটেছে, যার বলে সাহিত্যপ্রতিভা এই রকম কোনও দৈব প্রতিভানিরপেক্ষ এক শক্তি বলে পরিগণিত হয়েছে।

মানুষের মনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আসে কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন সে শক্তি তাকে দান করেন, প্লেটোর এ কথা সত্যি ধরে নিলে যে কী সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা প্লেটোরই লেখা থেকে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, হোমারের মতো কবি যখন দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হয়ে যান তখনই লিখতে পারেন এবং সেই দিব্যোন্মাদনা ও ঐশী শক্তির প্রকাশ না ঘটলে কারো পক্ষে সে লেখার সঠিক রসগ্রহণও সম্ভব নয়। এই কথায় বিস্মিত হয়ে আয়োন বলেছেন—"That is good, Socrates; and yet I doubt whether you will ever have eloquence enough to persuade me that I praise Homer only when I am mad and prossessed; and if you could hear me speak of him I am sure you would never think this to be the case."

সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্য কারণ হিসাবে যদি দৈবী আশিস্ বা প্রেরণা সঞ্চারের ব্যাপার থাকে, তবু তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা সেটাই আমাদের চিন্তা করতে হবে, কারণ যে শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা করাই সম্ভব নয়, তাকে বিশ্লেষণের ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমাদের ধারণার সীমার মধ্যে যা আছে, তার বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের পক্ষে সম্ভব।

শিল্পের এই যে বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশ করা হল তা প্রধানত শিল্পমাধ্যমের পার্থক্যের কারণেই ঘটে। মাধ্যম যখন পাথর তখন তা ভাস্কর্য, যখন রং ও তুলি তখন তা হয়ে যায় চিত্র, যখন কণ্ঠস্বর তখন তাকে বলতে পারি সংগীত, যখন তা দেহভঙ্গিমা বা অঙ্গবিক্ষেপ তখন তাকে বলি নৃত্য, সেই মাধ্যম যখন কাগজ-কলম বা ভাষা, তখন সৃষ্টি হয় সাহিত্যের। এ বিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। স্থাপত্যকে অনেকে মনে করতে পারেন নির্মাণধর্মী, কণ্ঠস্বরের সাধনায় সংগীত শুধু নয়—বাগ্মীতাও শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে বলে মনে করতে পারেন কেউ, আবার অভিনয়কে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে তাকে বাচন ও অঙ্গবিক্ষেপের যৌথ ক্রিয়া ভাবতে পারেন কেউ। যেহেতু শিল্প আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, সেই জটিল বিতর্কে প্রবেশের কোনো বাসনা আমাদের নেই।

সাধারণভাবে চারুশিল্পকে কারুশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ তো দিয়েছেনই, নন্দলাল বসুও দিয়েছেন, বলেছেন—"চারুশিল্প আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সঙ্কুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমের পথ করে দেয়।"

অর্থাগমের প্রসঙ্গটা এসেছে কৌতুকের ছলে, কিন্তু মূল বক্তব্য এই যে কারুশিল্প প্রয়োজনের শিল্প, চারুশিল্প অপ্রয়োজনের ব্যাপার এবং তাকে বলা যায়, আনন্দিত সৃষ্টি। দার্শনিক সান্তায়ানাও বলেছেন সেই একই কথা—"Art is objectified pleasure." আবার আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে বিভাগটির উল্লেখ করেছি, ঠিক সেইভাবেই চারুশিল্পকে দেখতে আগ্রহী—অর্থাৎ আনন্দ, সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে, এমন মত আজকের দিনেও দেখতে পাওয়া যায়। চারুশিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকরণ বোঝাতে গিয়ে লিও টলস্টয় লিখেছেন—"To evoke in oneself a feeling one has experienced, and having evoked it in oneself then by means of movement, hues, colours, sounds or forms expressed in words so to transmit that feeling that others experience the same feeling– this is the activity of Art."

সেইভাবে চারুশিল্পের যে বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে, এর মধ্যে আবার বড় বা ছোট শিল্প বলে কোনো ভেদাভেদ থাকতে পারে কি! এ বিষয়ে দার্শনিক হেগেলের মত হচ্ছে, যে-চারুশিল্পে বস্তুর প্রাধান্য যত কম, তাই তত বড়ো শিল্প। এদিক থেকে বিচার করলে সবচেয়ে মোটা দাগের শিল্প আমরা বলতে পারি স্থাপত্যকে, কারণ তা কেবল ভারি নয়, অনেকটাই প্রয়োজনভিত্তিক। ভারির কথা ভাবলে তার পরেই এসে যায় ভাস্কর্য, যদিও প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। মহত্তর শিল্পের সন্ধান করতে গেলে এরপর আমাদের মনে পড়বে চিত্রকলাকে, তারপর সংগীত এবং সবশেষে সাহিত্যকে। অর্থাৎ এভাবে বিচার করলে সাহিত্যই মহত্তর চারুশিল্প, বস্তুপ্রাধান্য এখানেই সবচেয়ে কম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ও সাহিত্য, সুতরাং অন্যান্য চারুশিল্পের প্রসঙ্গে এখানেই ইতি টেনে আমরা এবার সাহিত্য বিষয়েই উৎসাহিত হতে পারি।

চেয়েছে। চোখে দেখা পৃথিবী যেমন তাকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি চোখে দেখা যায় না এমন জগতের কথাও সে কল্পনা করেছে—কল্পনার এই প্রসারও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ এই বাস্তব জগতের মতো অন্য জগতের কল্পনা করেছে আকাশলোকে, ভেবেছে পাতালেও এই রকম আর একটা পৃথিবী আছে—ফলে এক ভুবনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে ত্রিভুবনের কল্পনা। সে ভাবতে চেষ্টা করেছে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমানের কথা। এই অতিলৌকিক শক্তির চিন্তাতেই তার মনে এসেছে স্বর্গলোকের দেবতাদের কথা, সেই সঙ্গে সে ভেবে ফেলেছে পাতালে অসুর-শক্তির পরাক্রমের কথা।

অবশ্য এসব চিন্তা মানুষের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা। তাই তার সাহিত্যেরও একেবারে আদিকালে এই সব চিন্তার প্রকাশ আমরা দেখি। মানুষের চিন্তাশক্তি যত পরিণত হয়েছে ততই, এই বহির্জগতের চেয়ে মানুষ এবং মানুষের বিচিত্র মনোজগৎ, তার উৎসাহের কেন্দ্রে চলে এসেছে। নিজে ছাড়া অন্যান্য যেসব মানুষ রয়েছে—তার পরিবারে, তার গোষ্ঠীতে, অন্যান্য গোষ্ঠীতে, তাদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে তার। তারপরে এসেছে মানুষের নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা—উদরপূর্তির চিন্তা নয়, বাসস্থানের চিন্তা নয়, এরচেয়ে অনেক বেশি স্বার্থবিযুক্ত চিন্তা, অনেক বেশি মানবিক চিন্তা। মানুষ হিসাবে আমাদের করণীয় কী, মানব-জীবনের সার্থকতা কী—মানুষের প্রকৃত জীবনযাপন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, এই সব চিন্তা। এই সঙ্গে অর্থাৎ জীবনের সার্থকতার প্রশ্নের সঙ্গেই মানুষের মাথায় এসেছে মৃত্যুচিন্তা, মানুষের পরিণামের চিন্তা। মৃত্যুচিন্তার সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক আরো অনেক কিছু—নিয়তি বা অদৃষ্ট চিন্তা, পাপ-পুণ্যের চিন্তা, কর্মফল, জন্মান্তর ইত্যাদির চিন্তা। আসলে মানুষের আশা-আকঙক্ষা, অনুরাগ-বীতরাগ, স্বপ্ন ও ভালোবাসা—এক কথায় তার সংরক্ত অনুভূতির জগৎ এতোই প্রবল যে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের সব কিছুর আকস্মিক ছেদ, এক চরম পরিসমাপ্তি—এ কথা মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। সেইজন্যই মানুষের এই ধরনের চিন্তা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথ-পরিক্রমা। এর মধ্যে কতটুকু সত্য কতটুকু অসত্য সে আমাদের বিচার্য নয়, সম্ভবত তা আমাদের সাধ্যের মধ্যেও নয়। কিন্তু চিন্তার জগৎ যেহেতু আমাদের সাহিত্যেরই জগৎ, তার একটা পরিসীমা আছে, একথাও আমাদের জেনে রাখা উচিত।

চিন্তার আর একটি মাত্রাগত বৈচিত্র্যও আছে, সেটি নির্দেশ করেছেন সমালোচক হাডসন। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা পাই চিন্তার বিষয়। অথবা চিন্তার প্রতিফলনই যেহেতু সাহিত্য, এমন কথাও বলা যায়। আমরা এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে পেয়ে যাই সাহিত্যের বিষয় সম্বন্ধে কিছু স্থূল বিভাজন-রেখা। সেগুলি এইরকম—

(ক) একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বিবরণ, বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই। তার এই চিন্তার দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তি, সমাজ বা সামাজিক কোনো সত্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় কী না আমাদের জানার দরকার নেই। তার দ্বারা সে ব্যক্তি হিসাবে নিজেকেই স্পষ্ট করে তোলে। একদিকে যেমন আমরা পাই তার বাহিক্য আচরণ ও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, অন্যদিকে তার অন্তর্জগতের উদ্ভাস। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, আমরা সেই মানুষটিকে বা একক ব্যক্তিত্বকে চিনে নিতে পারি।

(খ) মানুষ হিসাবে মানুষের অভিজ্ঞতা। এখানে সমস্যা ঠিক একক মানুষের নয় এবং সমস্যার প্রকৃতিও প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত নয়। সেটা নয় বলেই সমস্যার প্রকৃতি

সেই ভাবে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে, মানুষ নিজে যা অনুভব করে সেই অনুভূতি প্রকাশের জন্য তার একটা ব্যাকুলতা আছে। এর দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ তার অনুভূতির ক্ষেত্র অনেক বড়ো—পশুর মতো খাদ্য-অনুসন্ধান এবং বংশবিস্তারের মধ্যেই তার চিন্তা ও পরিশ্রম সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত সে বস্তুজগৎকে ঠিক যেমনটি দেখে ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করে না—বাস্তব অস্তিত্বকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সে একটু অন্যরকম ভাবে তৈরি করে নেয় হৃদয়ের মধ্যে। এই দুটি কারণেই নিজের অনুভূতিকে সে প্রকাশ করতে চায়।

অবশ্য এর পেছনে রূপনির্মাণের একটা আগ্রহও আছে। মানুষ শিল্পসৃষ্টি করতে পারে, নিজের সৃষ্টি দেখেই হয়তো মানুষ তা শিখেছে এবং তারপর থেকেই হয়তো সে নিজের সৃষ্টির প্রেমে পড়ে গেছে। সে গুহার গায়ে আঁচড় কেটে দেখেছে, তার শিকার-দৃশ্যের কিছুটা আনুরূপ্য ফুটে উঠেছে সেখানে। পাহাড়ের টুকরো ঘষে দেখেছে তার চেহারায় আকৃতি ফুটে উঠেছে কোনো কিছুর। সাহিত্যের ব্যাপারটা এসেছে নিশ্চয়ই অনেক পরে, কিন্তু রূপনির্মিতির প্রতি ঔৎসুক্যও যে সাহিত্য রচনার একটি প্রধান কারণ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছে বোধহয় মানুষের বিস্ময়বোধ। এই জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে মানুষ ছিল অত্যন্ত উৎসুক। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার প্রতিটি জিনিসই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। একদিকে পর্বত, সমুদ্র, আকাশের মতো বিশাল সৌন্দর্য, অন্যদিকে অগ্নি, বজ্রবিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝার মতো প্রবল শক্তি আমাদের ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। কিন্তু কেবল বিশাল জিনিস নয়, মানুষ যখন একটি বর্ণোজ্জ্বল প্রজাপতি দেখেছে সে বিস্মিত হয়েছে, ফুলের শোভা তাকে মুগ্ধ করেছে, পাখির কূজন তার ভালো লেগেছে। এই বিস্ময়ের কারণেই মানুষের মুগ্ধতা, মুগ্ধতার জন্যই ভালোবাসা, আবার ভালোবাসার সূত্রেই পৃথিবীর ওপর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই বিস্ময়বোধকে তাই বোধহয় বলতে চেয়েছেন 'হৃদয়ের জারক রস'। মনুষ্যেতর প্রাণীর হৃদয়ে এই বিস্ময়বোধ নেই বলেই তার জগৎ অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু মানুষের পৃথিবী অনেক বড়ো—সে যেমন তার কাছের জিনিসকে জানতে চায়, তেমনি জানতে চায় দূরের জিনিসকে; যেমন সে জানতে চায় অপরকে, তেমনি জানতে চায় নিজেকে।

আর এই যে জানা, এ শুধু চোখ দিয়ে জানা নয়, কান দিয়ে শোনা নয়—এর সঙ্গে যুক্ত আছে হৃদয়। ইন্দ্রিয়ের জগৎকে পরিবর্তিত করছে অনুভূতি—অনুভূতির সাহায্যে দৃশ্যমান জগৎকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা নতুন জগতে পরিণত করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে লিখেছেন—"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"

'হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস' আছে বলেই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও জানার আনন্দ এতো প্রবল। মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে, প্রথমে সেই পৃথিবীকে সে ভালো করে জানতে চেয়েছে তার বাঁচার চেষ্টাতেই, তার অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে। এরপর জেগেছে তার বিস্ময়—বৃহৎ শক্তি সম্বন্ধে, ক্ষুদ্র সৌন্দর্য সম্পর্কে, দৃশ্যমান সব কিছু সম্পর্কে। মানুষের মনে এই যে সৌন্দর্যের জগৎ জেগে উঠেছে, সেই হৃদয়ের জগৎকেই সে প্রকাশ করতে

গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

এখানে আমরা সাহিত্যের এক স্থূল শ্রেণীবিভাগ পাই, এবং বুঝতে পারি, প্রকৃতি অনুযায়ীই বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের রূপনির্মিতি স্পষ্ট হয়। নাটককে সাধারণভাবে দৃশ্যকাব্য বলা হয়, তার দৃশ্যত্ব নামক ধর্মটির ওপরই প্রাচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা বেশি জোর দিয়েছেন। সাধারণ রূপের বিচারেও তাকে আমরা বলে থাকি 'উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধ', কারণ নাটকের উপজীব্য কেবল সংলাপ এবং নাট্যনির্দেশিত ক্রিয়া। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আরো গভীরভাবে বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন, মানুষের কোনো কোনো হৃদয়ভাবেরই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে, কথা এবং ক্রিয়াদ্বারা তা প্রকাশ করা সম্ভব, এবং নাট্যকার সেই ধরনের ভাবই নাটকের জন্য গ্রহণ করেন। যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, যা কথার দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নয়, তা যদি বিষয় হিসাবে নাট্যকার গ্রহণ করেন তাহলে কী অনর্থ ঘটে তাও বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে। যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, তা গীতিকবি কেমন করে প্রকাশ করেন, সে অন্য প্রসঙ্গ এবং তা সবিস্তারে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। মহাকাব্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে মাত্র তিনটি প্রকরণ আশ্রয় করে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের উৎসমূল দেখিয়েছেন, হাডসনের অবলম্বন সেরকম তিনটি মাত্র প্রকরণ নয়, কিন্তু বিভাগের ক্ষেত্রে তিনি অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেন নি। চিন্তার যেসব বৈচিত্র্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বিচার করলে সাহিত্যের প্রধান শ্রেণী হতে পারে তিন ধরনের—

(ক) আত্মমগ্ন বা মন্ময় সাহিত্য : এখানে যিনি সৃষ্টি করছেন, তাঁর হৃদয়ের উন্মোচনই বড় কথা, অর্থাৎ তিনি তাঁর হৃদয়ের কথাই বলুন অথবা বাইরের কোনো মানুষ, বস্তু বা প্রকৃতির কথাই বলুন—এগুলি উপলক্ষ করে তাঁর নিজের চিন্তার যে প্রতিফলন এবং তার দ্বারা স্রষ্টা-হৃদয়ের যে অন্তরঙ্গ উদ্ভাস, সেটিই সৃষ্টিকর্মে বড় হয়ে ওঠে। কবিতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গীতিকবিতা এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং সেই একই কারণে ধর্মমূলক খণ্ডকবিতা, শোকগাথা এমনকি আধ্যাত্মিক চিন্তার কবিতাও মন্ময় সাহিত্যের মধ্যেই পড়তে পারে। কবিতা ছাড়া এক ধরনের প্রবন্ধকেও আমরা আত্মমগ্ন বলতে পারি, যাদের আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। রম্যরচনায় প্রায়ই বাইরের একটি বিষয় প্রাধান্য পায়, কিন্তু যেখানে বাইরের বিষয় উপলক্ষমাত্রে পরিণত হয়, লেখকের অন্তর্জগৎই আলোকিত হয় বেশি—সেখানে রম্যরচনাও নিঃসন্দেহে মন্ময় সাহিত্যেরই দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে বলা যেতে পারে একটি বিশেষ ধরনের সমালোচনার কথা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Impressionistic Criticism, বাংলায় বলতে পারি প্রতীতিমুখ্য সমালোচনা। লেখকের মনের বিশেষ ধারণা বা প্রতীতিই নিয়ন্ত্রণ করে এই ধরনের সমালোচনাকে, তথ্য ও যুক্তি নয়। সুতরাং এই জাতীয় সমালোচনাকেও আমরা আত্মমগ্ন রচনাই বলবো।

(খ) বস্তুধর্মী বা তন্ময় সাহিত্য : এই ধরনের সাহিত্যে স্রষ্টার হৃদয়ের উন্মোচন আমাদের কাছে মুখ্য আকর্ষণ নয়, বহির্জগৎ এবং অন্যান্য মানুষ সম্বন্ধে তাঁর বোধ ও অভিজ্ঞতা কীভাবে

নৈর্ব্যক্তিক এবং সামান্য। একটা জীবনের সার্থকতা কী, মরণোত্তর কোনও অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কী না, পাপ-পুণ্য বলে সত্যিই কিছু আছে কী না—এই ধরনের বোধ আমাদের কোন্ দিকে পরিচালিত করছে, ঈশ্বর যদি থাকেন মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঠিক কী, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কী, এই ধরনের প্রচুর জিজ্ঞাসা। এগুলি সবই মানবিক জিজ্ঞাসা, কিন্তু এ প্রশ্ন সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মানুষের, কোনো ব্যক্তিগত মানুষের নয়।

(গ) মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চিন্তা, এক কথায় তার সামাজিক চিন্তা। সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি একক ব্যক্তির কী ধরনের মনোভাব হওয়া উচিত, অথবা সমাজকে তার কী দেবার আছে বা সমাজের জন্য তার কিছু করণীয় আছে কী না। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য—ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা তা ব্যাহত করে অথবা ব্যক্তিজীবনকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে, এই ধরনের চিন্তাভাবনা।

(ঘ) বাইরের প্রকৃতির জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা। একে এক অর্থে নিসর্গচিন্তা বলা যায়, সৌন্দর্যচিন্তাও বলা যায়, কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে। আসলে প্রকৃতি ও মানুষ—এই নিয়ে পার্থিব জগৎ, সুতরাং একে অন্যের পরিপূরক কী না, আমাদের অনুভূতি ও জীবন নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির কোনো ভূমিকা আছে কী না, এইরকম নানা প্রশ্ন আমাদের আন্দোলিত করতে পারে। বস্তুত ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগে এই প্রশ্ন বিচলিত করেছিল আর্য ঋষিদের। প্রকৃতির বিশাল শক্তি দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাঁরা পবন, বরুণ, ঊষা, আকাশ প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে বন্দনা করেছেন।

(ঙ) শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে মানুষের ভাবনা। শিল্পে মানুষ বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা ভাবতে পারে, নানা প্রকরণে তার সৃষ্টিক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে, অথবা মানুষ শিল্প ও সাহিত্যে তার যে সাফল্য এবং সৃষ্টিক্ষমতার বিকাশ, তাকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

মানুষের যে চিন্তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়, তার এই বিভিন্ন মাত্রাগত বৈচিত্র্য বিচার করলেই সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের একটা রূপরেখা আমরা পেতে পারি। যেমন হাডসনের নির্দেশিত চিন্তার এই পাঁচটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখলে সাহিত্যের পাঁচটি স্থূল প্রকারভেদও আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে নির্দেশ করতে পারি যথাক্রমে এইভাবে—আত্মগত বা মন্ময় সাহিত্য, সাধারণভাবে মানুষের জীবননির্ভর সাহিত্য, সামাজিক সত্যমূলক সাহিত্য, নিসর্গচেতনামূলক সাহিত্য এবং সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত রচনা।

অবশ্য ঠিক এইভাবে সাহিত্য-প্রকরণের বিভাগ করা চলে না, কারণ এই বিভাগ একান্তভাবেই বিষয়নির্ভর। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের কথা যখন আমরা ভাবি তখন কেবল বিষয়ের কথা ভাবি না, তার আঙ্গিকের কথাও ভাবি। তাছাড়া প্রকরণের বিভাগ ও উপবিভাগের সূক্ষ্মতায় যে প্রচুর বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হতে হয়, এতো সাধারণ বিভাগে তার কাছাকাছি পৌঁছনোও সম্ভব নয়। সুতরাং এই আলোচনা স্মরণ রেখেই আমরা অন্যভাবে সাহিত্যের শ্রেণীবিচারের কথা ভাবতে পারি।

মানুষের চিন্তার একেবারে উৎসমূলে গিয়ে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেইটুকু

অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ জাগায়, সেই আবেগই তাঁর রচনার প্রাথমিক উৎস। একে বলা যায় সৃষ্টির আবেগ। কাজেই, শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা যেখানে না হয় সেখানে হৃদয়গত উপাদান থাকবেই।

সাহিত্যের দ্বিতীয় উপাদান বুদ্ধিগত। সাহিত্যরচনার আবেগ অনুভব করলেই তা রচনা করা যায় না, তাকে কাজে পরিণত করতে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সাহিত্যে এই বুদ্ধিগত উপাদানের দুটি কাজ আছে—প্রথমত বিষয়-নির্বাচন, দ্বিতীয়ত রূপ-নির্বাচন। মনে অনেক কারণেই আবেগ জন্ম নেয়, প্রাত্যহিক জীবনে পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে। কিন্তু এই আবেগের মধ্যে কোনগুলি সাহিত্যে প্রকাশের যোগ্য, কোনগুলি তা নয়—এই ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হয় বুদ্ধিকেই। একেই বলা যায় বিষয়-নির্বাচন। এরপর থাকে রূপ-নির্বাচন। যে বিষয়টি সাহিত্যে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হল, তাকে কোন্ রূপে অর্থাৎ সাহিত্যের কোন্ প্রকরণে প্রকাশ করলে তা সবচেয়ে উপযুক্ত, কার্যকর এবং সমর্থ সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে, মানুষের বুদ্ধিই সে কথা বলে দেয়। এই সিদ্ধান্তও মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের বিষয় কাব্যনাট্যের বিষয় হতে পারতো কী না, 'ক্যামেলিয়া' বা 'বাঁশি' কবিতা নিয়ে ছোটগল্প লেখা সম্ভব ছিল কী না, এসব প্রশ্ন চিন্তাশীল ও সতর্ক পাঠকের মনে নিশ্চয়ই উদিত হতে পারে—কৌতুকের ছলে হলেও। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য, অল্প হলেও, ভাবতে হয়েছে।

সাহিত্যের তৃতীয় উপাদানকে আমরা বলতে পারি কল্পনা বা Imagination। যে ঘটনা মানুষ চোখের সামনে দেখে বা যে-মানুষ তার চিত্তকে আলোড়িত করে, সেই মানুষের সবটুকু তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। একটি ঘটনার নেপথ্যে কী ঘটনা ছিল, অথবা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র আসলে কোথায়—কিংবা মানুষের যেটুকু দেখা যায় তার অন্তরালে না-দেখা মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে—স্রষ্টাকে তা কল্পনায় পূর্ণ করে নিতে হয়। যাঁর কল্পনাশক্তি যত বলিষ্ঠ এবং সুস্থ, এ কাজে তিনি ততই সফল। Imagination ছাড়াও Fancy বা খেয়ালি কল্পনা বলে এক ধরনের তরল অনুমান-শক্তি আছে—যার মধ্যে গভীরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা নেই। ফলে খেয়ালি-কল্পনার আশ্রয় নিলে রচনা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

সাহিত্যের চতুর্থ উপাদান, প্রয়োগকৌশল। মনে সৃষ্টির আবেগ এলো, তাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী বলে রায় দিল বুদ্ধিবৃত্তি, তার মধ্যে যত অসম্পূর্ণতা ছিল, কল্পনাশক্তি তাকে ভরাট করেও নিল। এবার প্রশ্ন, মনের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা যত কার্যকর ছিল, যত সুন্দর ছিল, প্রকাশের পরও কি তা ঠিক সেই রকমই আছে!

সাহিত্যের আন্তরিক উপলব্ধি এবং তার প্রকাশক্ষমতা—উভয়ের গুরুত্ব একইরকম কী না এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে এরকম ধারণা পোষণ করেন যে সাহিত্যের আবেগ ও তার প্রকাশ স্বতন্ত্রভাবে মনে আসে না, একই সঙ্গে উদিত হয়। অর্থাৎ মনে যখন কোনো চিন্তা আসে তখন তা ভাষার সাজ পরেই আসে। চিন্তা ও তার প্রকাশভঙ্গি যে স্বতন্ত্র এবং প্রকাশভঙ্গির আলোচনা যে পৃথকভাবে হতে পারে, এই ব্যাপারটিই স্বীকার করেননি সজ্ঞাবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক বেনেদিত্তো ক্রোচে। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বলেছেন প্রকাশই

প্রকাশিত হয়েছে, তাই আমাদের উৎসাহিত করে। কবিতার মধ্যে দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা আখ্যানকাব্য বা গাথাকাব্য এই বিভাগে পড়তে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহাকাব্য মন্ময় ও তন্ময় ধারার মিশ্র রূপ, কিন্তু প্রকরণের বিচারে মহাকাব্যকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নাটক অবশ্যই এই শ্রেণীতে পড়বে কারণ নাট্যকার সর্বদাই নিজেকে অনুপস্থিত রাখতে চান নাটকে, এবং তন্ময়তাই এই সাহিত্য-প্রকরণের প্রধান ধর্ম। উপন্যাস, অর্থাৎ নভেল ও রোমান্স—এই দু ধরনের রচনাই বস্তুধর্মী সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে, যদিও উপন্যাসে লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং জীবন সম্বন্ধে বোধ অত্যন্ত মূল্যবান। তদ্‌সত্ত্বেও বাস্তব জীবনবীক্ষা এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন বলে তাকে তন্ময় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করে উপায় নেই। একই কারণে ইতিহাস এবং মহৎ জীবনীকাব্যও এই দ্বিতীয় বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ধরে নিতে হবে।

(গ) তথ্যমূলক সাহিত্য : কেবল তথ্য দান করাই যে সাহিত্যের কাজ, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'জ্ঞানের বিষয়' এবং ইংরেজিতে সাধারণভাবে যা পরিচিত literature of knowledge নামে, তাকেও আমরা এই তৃতীয় বিভাগের মধ্যে ফেলতে পারি। গুরু প্রবন্ধ, তথ্যমূলক সমালোচনা এমনকি ভ্রমণকাহিনীকেও আমরা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারি। তবে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে সাহিত্যের এই বিভাগটির গুরুত্ব খুব বেশি নয়, অন্তত সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে গুরু প্রবন্ধের মধ্যে যেখানে কোন লেখকসত্তার বা কোন সৃষ্টির অন্তরঙ্গ রহস্য-উন্মোচন আছে, কিংবা ভ্রমণকাহিনী যেখানে তার তথ্যের ভার একান্ত লঘু করে দিয়ে আদ্যন্ত সাহিত্যরসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, সেখানে তাকে আমরা নিছক তথ্যমূলক সাহিত্যও বলতে পারি না—লেখক নিজেই সেখানে নিবিড় ভাবে ধরা দেন। উদাহরণ হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' বা সৈয়দ মুজতবা আলির 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

গ. সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান

সাহিত্যের যে-কোনও প্রকরণেরই প্রধান উপাদান মোট চারটি, যার প্রথমটি অভিহিত হতে পারে হৃদয়গত উপাদান নামে। এই উপাদান হৃদয়-সংবেদন জাগায়। সৃষ্টির ইচ্ছা প্রাথমিকভাবে হৃদয়েই জাগে, তার কারণ যাই হোক না কেন। যাঁরা প্রতিভাবাদী তাঁরা মনে করেন, কেবল প্রতিভাবানদের—অর্থাৎ ঈশ্বর যাঁকে কবিপ্রতিভা দান করেছেন, কেবল তাঁরাই হৃদয়ের এই উপাদান লাভ করেন। ফলে 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' যাঁরা প্রেরণাবাদী তাঁদের ধারণা, উপযুক্ত প্রেরণা এলে সকলেই এই সংবেদন লাভ করতে পারেন। আবার অ্যারিস্টটল-এর মতো মনীষীর ধারণা, এই উপাদান সকলেরই মনে আছে—প্রতিভা বা প্রেরণার কোনো ভূমিকা এক্ষেত্রে নেই। সমালোচকদের অভিমত যাই হোক, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছাটা হৃদয়ের এই উপাদানের ওপরই নির্ভরশীল, সাহিত্যসৃষ্টিও তার ব্যতিক্রম নয়। কোনো মানুষ, কোনো দৃশ্য, কোনো ঘটনা বা কোনো

দ্বিতীয় অধ্যায় || সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয়

ক. সাহিত্য-প্রকরণ বলতে কী বোঝায়—কবিতা ও পদ্য—কবিতার প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—গীতিকবিতা—বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। খ. নাটকের সাধারণ পরিচয়—নাটকের প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—পূর্ণাঙ্গ নাটক—নাটকের রসগত বিভাগ : ট্র্যাজেডি ও কমেডি এবং তাদের বাংলা নামকরণ—ট্র্যাজেডির মূল সংবেদন, উদাহরণ—নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ—নাটকের বিষয়গত বিভাগ। গ. উপন্যাসের প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—নভেল ও রোমান্স—প্রতি-উপন্যাস—উপন্যাসের প্রকৃতিগত উপবিভাগ—উপন্যাসের বিষয়গত উপবিভাগ। ঘ. ছোটগল্প—ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষণ।

ক. কাকে বলে সাহিত্য-প্রকরণ

সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কথাটা জেনে রাখা দরকার সেটা হল, সাহিত্যের এই প্রকারভেদ কেবল আঙ্গিক ভেদ বা form-এর পার্থক্য নয়, অনেক সময় তার বিষয়েরও পার্থক্য। সাহিত্যের বিষয় অনুযায়ীই তার প্রকরণ নির্বাচন করেন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ। এই সঙ্গেই সত্য, যে-প্রকরণ বা প্রকরণের অন্তর্গত রূপকৃতি নির্বাচন করা হয়েছে তার চাহিদা অনুযায়ীও বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যে ঘটনার দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব আছে—অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে জীবনের যে রূপ কথা বা ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ হতে পারে, নাটক নামক সাহিত্য-প্রকরণের জন্য সেই ঘটনাই বেছে নেওয়া হয়, কেবল সংলাপের মাধ্যমে কিছু লিখলে—অর্থাৎ সেই আঙ্গিক মেনে নিলেই তা নাটক হয়ে ওঠে না। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য, কবিতার উপযোগী বিষয় হলে তবেই তা নিয়ে কবিতা রচনা করা সম্ভব, নাটকের উপযোগী বিষয় নিয়ে মহৎ কবিতা লেখা যায় না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য, সাহিত্য-প্রকরণ বলতে আমরা বিষয় ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেরই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ বুঝি, তারা কেবল আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে না।

যে-কোনও সাহিত্যেই সবচেয়ে আগে যে সাহিত্য-প্রকরণ দেখা দিয়েছে তার নাম কবিতা, বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন, অন্তত এখনও পর্যন্ত আমরা যা জানি, চর্যাপদ। এগুলি ধর্মবিষয়ক এক ধরনের গীতিকবিতা বা খণ্ড কবিতা। অবশ্য কবিতা বলতে আমরা আধুনিক অর্থে যে সাহিত্য-প্রকরণকে বুঝে থাকি, ঠিক সেই অর্থে তাদের কবিতা বলা যাবে কী না সন্দেহ, হয়তো গীতিকবিতাও বলা যাবে না। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ্যে লেখা যাবতীয় রচনাকেই কবিতা হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

কবিতা বলতে সঠিক ভাবে কী বোঝায়, পদ্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য কিছু আছে কী না, এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা কবিতা নামক সাহিত্যশ্রেণীর পরিচয় দান কালে আলোচনা করতে পারবো। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে, পদ্য এবং গদ্য সাহিত্যপ্রকাশের দুটি মাধ্যম বা medium-মাত্র, কবিতা সাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণী। সাহিত্যের যে-কোনো শ্রেণী এই দুটি মাধ্যমের যে-কোনো এক মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আধুনিক যুগের আগে গদ্যমাধ্যমের বিশেষ ব্যবহার ছিল না বলে দেবদেবী-বিষয়ক দীর্ঘ আখ্যানও লেখা হতো পদ্যে, আবার

সাহিত্য—সাহিত্যের অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি প্রকাশের সামর্থ্যের মধ্যে তিনি প্রকাশ ক্ষমতাকেই অনেক বেশি মূল্য দেন।

এই দুটি চরম মতবাদের কোন্‌টি সত্য তা জানার কোনো প্রয়োজন আপাতত আমাদের নেই, আমরা শুধু সহজ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে, সাহিত্যের আবেগ যেখানে জাগে—প্রকাশের চিন্তা ঠিক সেখানে জাগে না। হৃদয়ের আলোড়ন জাগে অনেকেরই, কিন্তু সেই অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করলে সেই অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশিত হবে, অথবা নিজে যে ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করেছেন, পাঠকের চিত্তেও সেই সমজাতীয় অনুভূতি কেমন করে জাগাতে পারবেন,—এই ভাবনাটা কিছুটা স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রকাশক্ষমতা ও প্রয়োগকৌশল, ইংরেজিতে বলা যায় Composition and style, যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান, একথা অস্বীকার করা মুশকিল।

তবে এ সবই গৌণ ব্যাপার—সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত উপাদান মাত্র, সাহিত্যের মুখ্য উপাদান অবশ্যই মানবজীবন—বিভিন্ন প্রকরণের সাহিত্যে মানুষের জীবনই বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত ও ব্যাখ্যাত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন তা জীবনের সমালোচনা, আমরা মনে করি সাহিত্যস্রষ্টা জীবনের ব্যাখ্যাতা—জীবনকে যিনি যেমন ভাবে দেখেছেন তিনি সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময় স্রষ্টার জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে কোনো সাহিত্যকে মহৎ সাহিত্যের স্বীকৃতি না দেবার প্রশ্ন উঠেছে। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলেই তাকে মহৎ সাহিত্য বলা যায় না। ব্যক্তিগত জীবন অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লব্ধ জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধিই সাহিত্যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রতিফলিত হয়। ব্যাখ্যাতা অনুসারে তার প্রকৃতি পালটে যায়, আবার সাহিত্যের প্রকরণভেদেও তার বৈচিত্র্য বেড়ে যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যের সম্ভাব্য সব রকমের প্রকরণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

সনেট, মোটামুটি ভাবে যে আঙ্গিক অনুসরণ করে বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করা হয়েছে।

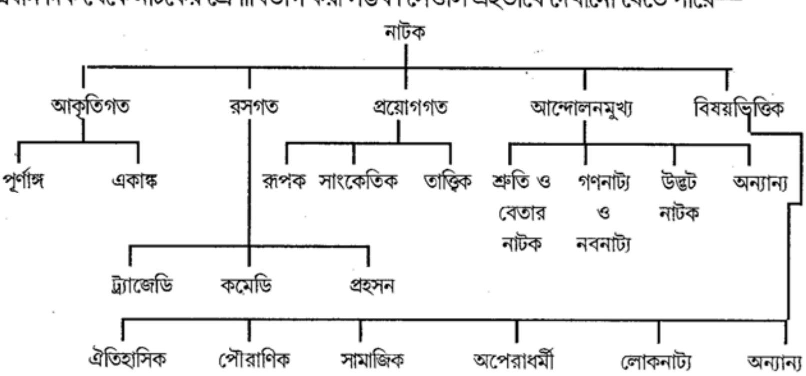
বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলতে আমরা বুঝিয়েছি, যেখানে বক্তার আত্মগত উচ্ছ্বাস বা নিজের হৃদয়-উন্মোচনের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া হয় কবিতা রচনার জন্য। এর মধ্যে প্রধান অবশ্যই আখ্যানকাব্য বা গাথা—যার মধ্যে আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলির মতো ভক্তি-গাথা আছে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের জীবনীকাব্য আছে, 'ময়মনসিংহ' গীতিকার মতো লৌকিক গাথা আছে, আবার ঊনবিংশ শতকের স্বদেশ গাথাও যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই শ্রেণীতে অন্য যেসব উপবিভাগ থাকতে পারে বা অন্য যেসব কাব্য এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, পৃথক ভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. নাটকের সাধারণ পরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক বিভাগে সাহিত্যের প্রথমভাগ ছিল দুটি—কবিতা এবং নাটক। নাটক নামক সাহিত্য-প্রকরণ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রাচীন না হলেও যাত্রা এবং পালাগান হিসাবে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। অবশ্য এখন যে নাটকের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজি theatre-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে।

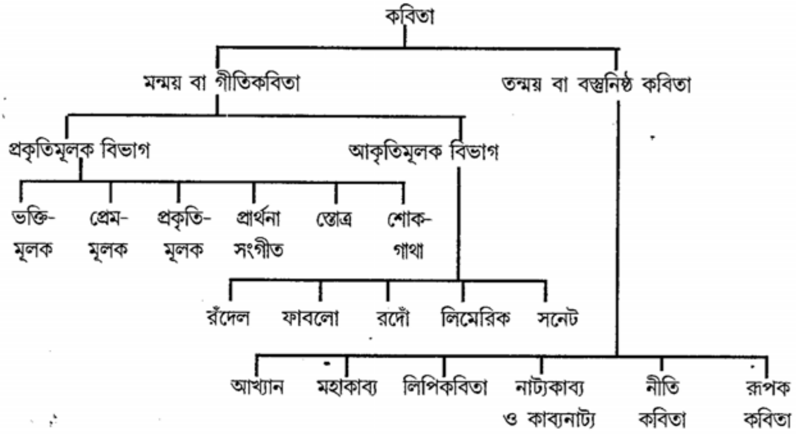
সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে নাটক এক সুপ্রাচীন সাহিত্য-শ্রেণী। সংস্কৃতে একে বলা য়েছে দৃশ্যকাব্য এবং পঞ্চম বেদ। প্রাচীন কালেই ভরতমুনি এর লক্ষণ নির্ণয় করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স্'-এ সাহিত্যের যে আলোচনা করেছেন তাতে নাটকের আলোচনাই বেশি এবং গ্রীক সাহিত্যের উজ্জ্বল নাটকগুলি তিনি তাঁর সমালোচনার জন্য পেয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যেও নাট্যকলা একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার উইলিয়ম শেক্স্পীয়র সর্বকালের সেরা নাট্যকার হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকেন।

প্রকরণ হিসাবে নাটকের অনেকগুলি বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে। স্থূলভাবে বলতে গেলে, পাঁচটি প্রধান দিক থেকে নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব। সেগুলি এইভাবে দেখানো যেতে পারে—



গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মতো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বিষয়ও পদ্যেই লিখতে হয়েছে। অবশ্য যদি কেবল আধুনিক অর্থে যাকে কবিতা বলে, সেই অর্থেই এই প্রকরণটিকে গ্রহণ করি তাহলে সুদীর্ঘ প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক পদ্যকেই কবিতা নামের অযোগ্য বলতে হয়। সুতরাং প্রকরণের আলোচনাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পদ্য মাধ্যমে লেখা যাবতীয় রচনাকেই আমরা স্থূল অর্থে কবিতা হিসাবে স্বীকার করে নেব। তবে গদ্য মাধ্যমেও যে কবিতা লেখা সম্ভব সে কথাও স্বীকার করবো এবং তার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি জানাবো।

পদ্যমাধ্যমে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা হিসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য কবিতা নামক প্রকরণটির ব্যাপ্তি এতো বেড়ে যায় যে তার বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনাই শক্ত হয়ে পড়ে। একেবারে প্রাথমিক বিভাগ করার জন্য আমরা তার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়কেই আশ্রয় করতে পারি। কবিতার আকৃতি বা আয়তনগত বিভাগ করতে হলে বলতে হবে কবিতার প্রধান বিভাগ দুটি—খণ্ড কবিতা এবং দীর্ঘ কবিতা। আর কবিতার প্রকৃতিগত বিভাগ করলে বলা উচিত কবিতার একেবারে প্রাথমিক বিভাগ দুটি হল, মন্ময় কবিতা বা Subjective poetry এবং তন্ময় কবিতা বা Objective poetry। সাহিত্যের প্রকরণ নির্দিষ্ট হয় তার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ের বিচারে, তবু বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত নিশ্চয়ই প্রকৃতির। সুতরাং কবিতার মোটামুটি বিভাগের রেখাচিত্র হতে পারে এইরকম—



এখন যদিও গীতিকবিতা বলতে বিশেষ এক ধরনের খণ্ড কবিতাই বোঝায় কিন্তু একসময় গীতের উদ্দেশ্যে রচিত বিশেষ শ্রেণীর আত্মমগ্ন কবিতাই ছিল লিরিক বা গীতিকবিতা। সেই অর্থে গীতিকবিতাকে গ্রহণ করলে আমরা এর প্রকৃতি অনুযায়ী অনেকগুলি বিভাগ পাই। সেগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, রেখাচিত্রে তার প্রধান বিভাগগুলির নামই কেবল উল্লেখ করা হল।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধতার জন্যই আমরা কয়েক ধরনের গীতিকবিতাকে চিনি। গীতিকবিতার আকৃতিগত বিভাগের মধ্যে সেগুলিকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত আঙ্গিক অবশ্যই

আমাদের চেয়ে কিছুটা হীন—অবশ্য চরিত্রের গুণাবলীর দিক থেকে নয়, চরিত্রের কোনও একটা বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি থেকে, যা অন্যের চোখে তাদের হাস্যকর করে তোলে। তবে সেসব বিচার আপাতত তোলা থাক।

নাটকের উপস্থাপন বা প্রয়োগের দিক থেকে চিন্তা করলে তার খুব স্পষ্ট তিনটি বিভাগ আমরা দেখতে পাই—রূপক, সাঙ্কেতিক এবং তত্ত্বনাটক। এই বিভাগগুলি বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনে উদ্ভূত বিভাগ হিসাবেও গ্রহণ করা চলে, তবে আন্দোলনের ফলে নাট্যধারার যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ধরনের পরিবর্তনই থাকে এবং সেসব পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রয়োগগত যে তিনটি বিভাগের কথা বলা হল এরা সাধারণভাবে নাট্যকারের মানসিকতাই প্রতিফলিত করে। অনেকে মনে করেন নাটক মানেই একটি বিশেষ সমস্যা এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার পর্যালোচনা। বিশ্রুত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এই মতের পরিপোষক ছিলেন, তিনি মনে করতেন নাটক মানেই 'discussion, discussion and discussion only'। এ থেকে মনে হতে পারে, একটি বিশেষ তত্ত্ব না থাকলে নাটক নির্জীব হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে, মহৎ নাটক মানেই সাঙ্কেতিক নাটক—এই ধারণাও পোষণ করেন কিছু সমালোচক। তাঁদের মতে, সঙ্কেতবাদী সংলাপই শ্রেষ্ঠ সংলাপ এবং সাহিত্যের অন্যসব বিভাগের মতোই বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়াই নাট্যসংলাপের উৎকর্ষের চরম সার্থকতা। প্রায় এই একই রকম ভাবে রূপক নাটকের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন, এমন সমালোচকও নিতান্ত দুর্লভ নন। আমরা মুখ্যত এই তিনটি বিভাগ এবং নাট্য আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত প্রধান কয়েকটি নাট্যধারার আলোচনা করব যথাস্থানে। সেই সঙ্গে প্রয়োগগত আর-একটি বিভাগও আলোচ্য—শ্রুতি নাটক এবং বেতার নাটক।

বিভিন্ন আন্দোলনও বিভিন্ন ধরনের নাটকের জন্ম দিয়েছে। সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রত্যেক অভিঘাতই নাটকের ওপর এসে পড়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক, কারণ নাটক একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকরণ। সেই হিসেবে সাঙ্কেতিকতার আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত নাটক অবশ্যই আন্দোলনজাত, অথবা বাস্তববাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত নাটকও সেই ভাবেই বিচার্য! তবে আমরা মূলত নাট্য-আন্দোলনগুলির আলোচনা করতে চাই বলে গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলনের উল্লেখ করছি।

নাটকের আর একটি প্রথাগত বিভাগও আছে, সেটি বিষয়ভিত্তিক। অর্থাৎ নাটকের বিষয় যে উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়, নাটকটিকে সেই জাতীয় নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, নাটকের বিষয় যদি হয় সমাজসমস্যামূলক, তাকে আখ্যা দেওয়া হয় সামাজিক নাটক। নাটকের বিষয়বস্তু যদি আমরা সংগ্রহ করি ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে, তাহলে তাদের বলা হবে যথাক্রমে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক। তেমনি লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী ও লোকগাথা অবলম্বন করে রচিত নাটককে বলা হয় লোকনাট্য। অবশ্য শুধুমাত্র এই উৎসের কথা স্মরণ রাখলেই হয় না, এইরকম বিষয়ভিত্তিক নাটকেরও প্রকৃতিগত কিছু লক্ষণ থাকে এবং সেই লক্ষণ না পাওয়া গেলে কেবল বিষয়ের প্রকৃতি দেখেই তাদের ওই জাতীয় নাটক বলতে অনেকে রাজি হবেন না।

এই রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে বাংলা নাটকের আকৃতিগত বিভাগ আছে দুটি—পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক। পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে আমরা নাটকের প্রথাগত পাঁচটি অঙ্কবিভাগ বুঝে থাকি, অবশ্য প্রতিটি অঙ্কে সম বা অসম সংখ্যার দৃশ্য থাকতে পারে এবং দৃশ্য সংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। নাট্য-আন্দোলন এবং নাট্য-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরে অবশ্য পাঁচ অঙ্কের কমেও পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা হয়েছে—নবনাট্য আন্দোলনের প্রতিভূস্বরূপ 'নবান্ন' নাটকটিই এই প্রথাগত পঞ্চাঙ্ক বিভাগ মানে নি। একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব আরো অনেক পরে। এই নাটকের অঙ্ক তো একটি বটেই, প্রায় প্রথাগত ভাবে একটি দৃশ্যেই নাটকটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

নাটকের রসগত বিচারে প্রধান ভাগ দুটি—ট্র্যাজেডি এবং কমেডি, যদিও এর সঙ্গে প্রহসন বা farce-এর লক্ষণও অ্যারিস্টটল আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজেডির স্বরূপ এবং অন্যান্য লক্ষণ নির্ধারণেই অ্যারিস্টটল সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন এবং আমরা সেই আলোচনার ঐশ্বর্যে এখনও বৈভবশালী হয়ে আছি। ট্র্যাজেডি এবং শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি নিয়ে যতো গ্রন্থ ইংরেজি সাহিত্যে লেখা হয়েছে তাদের সংখ্যাও আমাদের রীতিমতো রোমাঞ্চিত করতে পারে। তুলনায় কমেডির আলোচনা কিছু কম হলেও তাকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত নাটকের আলোচনা বলতেই—অন্তত তার শ্রেণীবিচারে ট্র্যাজেডি ও কমেডির আলোচনাই সবচেয়ে আগে মনে আসে।

ট্র্যাজেডি এবং কমেডি পূর্ণতই রসগত বিভাগ, এবং সেই রসগত প্রকৃতি স্মরণ রেখেই ট্র্যাজেডির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক—যদিও কমেডির সুনির্দিষ্ট কোন বাংলা নামান্তর এখনও চোখে পড়ে না। সাধারণ ভাবে তাকে বলা যায় মিলনান্ত নাটক, ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর রসগত পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখে। পোয়েটিক্‌সের প্রথম সার্থক বঙ্গানুবাদে একে বলা হয়েছিল 'হাস্যোদ্দীপক' কিন্তু 'প্রহসন' নামটিও মোটামুটিভাবে প্রচলিত। নাটকের অন্তে বিষাদ অথবা মিলনের আনন্দ—এই দুইয়ের মধ্যে কী আছে, প্রধানত তার ওপরই নির্ভর করে ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য। কিন্তু এ পার্থক্য নিতান্তই স্থূল। সাহিত্যের অনেক বিয়োগব্যথার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ, যেমনটি ঘটেছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারীচরিত্র ভ্রমরের ক্ষেত্রে—অনুতপ্ত স্বামীকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে শয্যাপার্শ্বে দেখে অকৃত্রিম আনন্দেই সে মৃত্যুবরণ করেছে। তুলনায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীর জীবনবৃত্তান্তকে মিলনান্তক বলতেই হবে, স্বামী নগেন্দ্রনাথকে সে ফিরে পেয়েছে রাহুগ্রাস কেটে যাবার পর। তবু তার পরবর্তী দাম্পত্য জীবন কতটা সুখের হবে বলা কিন্তু সহজ নয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের প্রলম্বিত পর্ব কল্পনা করে কোনো উপন্যাস রচনা করেননি, তবে আমরা যারা অনুভূতিনির্ভর সাহিত্যপাঠে আগ্রহী তারা বুঝতে পারি নগেন্দ্রনাথের মিলন এবং তার জন্য একটি নিরপরাধ কিশোরীর করুণ আত্মহনন দুজনের কেউ ভুলতে পারবে না—তাদের সুখী দাম্পত্যজীবনের মাঝে মধ্যবর্তিনী এই কুন্দনন্দিনীর স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হতে দেবে না।

অ্যারিস্টটল অবশ্য ঠিক সেভাবে বিচার করেননি, করেছেন একটু ভিন্ন দিক থেকে। তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখতে চাই সেইসব চরিত্রকে যাঁরা আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা মহৎ ও উচ্চস্তরের মানুষ। কমেডিতে আমরা দেখতে চাই সেই সব ধরনের মানুষকে যাঁরা

ওয়র্ল্ড' বা ফ্রেড হয়েলের 'দা ফিফ্‌থ্ প্ল্যানেট'। বিজ্ঞানের ভূমি না থেকে কেবল বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল ও অনুষঙ্গ থাকলে তাকে বলতে পারি ফ্যান্টাসি, যেমন সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কুবিষয়ক বেশ কিছু কাহিনী। এছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য ও জীবন-সমালোচনা নিয়ে খেয়ালি কল্পনামূলক কিছু উপন্যাসও আমরা দেখেছি—তাদের এই তৃতীয় বিভাগেই আমাদের স্থান দিতে হবে।

নভেলের কয়েকটি উপবিভাগ আছে এবং সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে প্রাথমিক ভাবে তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রকৃতিগত ও বিষয়গত বিভাগ। প্রকৃতিগত বিচারে নভেলকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়—কাহিনীমুখ্য উপন্যাস এবং চরিত্রমুখ্য উপন্যাস। উপন্যাসের উদ্ভবের সময় প্রায় সব দেশেই প্রাধান্য থাকে কাহিনীমুখ্য উপন্যাসের, কাহিনীর আকর্ষণেই পাঠক তা পড়তে আগ্রহী হন। পাঠক প্রাপ্তমনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র এবং তাদের আচরণের গভীর মনস্তত্ত্ব পাঠককে উৎসাহিত করে। ফলে কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রসৃষ্টিই তখন প্রাধান্য পায়। ইংরেজি সাহিত্যে 'প্লটের মৃত্যু' নামক যে-রকম সাহিত্যিক আন্দোলন উত্থিত হয়েছিল, আমাদের দেশে তা দেখা যায়নি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকেই যে কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রের প্রাধান্য সূচিত হল, এ কথা মনে প্রায় দ্বিধা না রেখেই বলা যায়।

উপন্যাসের বিষয়গত বিভাগ গড়ে উঠেছে তার অবলম্বিত বিষয়ের প্রকৃতি দিয়ে, তাই এর সঙ্গেও যে উপন্যাসের প্রকৃতির যোগ নেই, এমন কথা কখনোই বলা যাবে না। আসলে বিষয় এবং তার উপস্থাপনরীতি এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে উভয়কে পরস্পরের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলা সম্ভব নয়—এই ধরনের বিভাগ আসলে আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য করা। উপন্যাসের ক্ষেত্র ও সমস্যা যখন সামাজিক তখন আমরা বলি সামাজিক, যখন তা রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক তখন তাদের আমরা সেই শ্রেণীতেই বিন্যস্ত করি। এদের প্রকৃতিগত অনেক বৈশিষ্ট্যও অবশ্য বিশেষভাবে স্মরণ রাখবার মতো। বিস্তারিত আলোচনার সময় আমাদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ঘ. ছোটগল্পের কথা

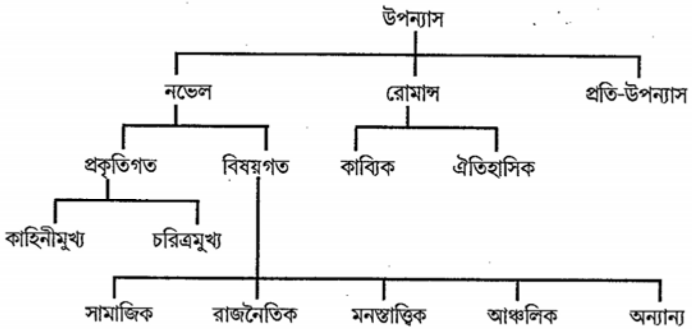
ছোটগল্পকে বলা হয়েছে 'উনবিংশ শতকের বিস্ময়'। অথচ সাহিত্যসংসারের এই কনিষ্ঠতম সদস্যই এখন সবচেয়ে প্রাণবান্। জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ এই সাহিত্য-প্রকরণ বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বলা যায়। গতিশীল ও কর্মচঞ্চল জীবনে দীর্ঘ রচনা পাঠ এবং ধ্রুপদী রীতির সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ অনেক কমে এসেছে। ছোটগল্প তার সংহত আয়তনে আমাদের 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' এনে দেয়—জীবনের বহুবিচিত্র নাটক, সমগ্র জীবনবৃত্তের উপন্যাস এবং ধ্রুপদী নাটক যেন বলিষ্ঠ দু-একটি রেখায় সজীব করে তুলে ধরে আমাদের সামনে। ফলে যুগোপযোগী এই সাহিত্য-প্রকরণ আমাদের সবচেয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের মতো বর্ষীয়ান প্রজাতিরই কোনো সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ যখন এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি তখন ছোটগল্পের মতো নবীন আগন্তুক তার শিল্পরূপ নির্দিষ্ট করে

গ. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

উপন্যাস সাহিত্য-সংসারের আধুনিক সদস্য। মানুষ সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ ও শ্রদ্ধা এবং আমাদের যথার্থ বাস্তবতার বোধ না জাগা পর্যন্ত উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে এবং উপন্যাসের সার্থক পথিকৃৎ হিসাবে এখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন।

উপন্যাসের বিভাগ-বিভাজন কীভাবে করা হয়, এই রেখাচিত্র থেকে তার মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে—



বাস্তবতাই উপন্যাসের, এবং বাংলা উপন্যাসের, প্রথম শর্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লেখক যখন তাঁর চোখে দেখা বাস্তব, অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা ও চরিত্র নির্ভর করে উপন্যাস রচনা করেন তখন আমরা তাকে বলি নভেল। খুব সাধারণভাবে উপন্যাস বলতেই বোঝায় নভেল। এর পাশাপাশি আছে উপন্যাসের আর একটি ধারা, প্রায় নভেলের জন্মলগ্ন থেকেই, তার নাম রোমান্স। রোমান্সের লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার ওপর নির্ভর করেন না, তাঁর কাহিনী নির্মাণের উৎস হয় তাঁর কল্পনা অথবা ইতিহাসের ঘটে যাওয়া কোনো অধ্যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই কথা যে, কল্পনাই হোক বা ইতিহাসের কোনো ঘটনাই উপজীব্য হোক, তাতে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হলে তাকে আমরা রোমান্স বলতে পারবো না, কারণ রোমান্স উপন্যাসেরই একটি বিভাগ। নভেলে লেখক যখন নির্বাচন করেন প্রকৃতই ঘটেছে এমন কোনো (possible) ঘটনা, রোমান্সে তখন লেখক জোর দেন বর্ণিতব্য ঘটনার সম্ভাব্যতার (Probability) ওপর, অর্থাৎ তা ঘটা সম্ভব কিনা, তার ওপর। অবশ্য রচনা-প্রক্রিয়াতেও নভেল ও রোমান্সের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। রোমান্সের উপকরণ যখন কল্পনা থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন আমরা তাকে বলি কাব্যিক রোমান্স, যখন সেই উপাদান সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে, তখন তাকে আমরা আখ্যা দিই ঐতিহাসিক রোমান্স।

উপন্যাসের আর একটি বিভাগ করা সম্ভব, যাকে বলা হয় প্রতি-উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসে আমরা ভবিষ্যৎ মানুষের একটি চিত্র দেখাতে চাই, অথবা উপন্যাসের আধারে কোনো এক অনাগত ও অনিবার্য পরিস্থিতিকে দেখাতে চাই। এই ধরনের কাহিনী-পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের ভূমি থাকলে তাকে আমরা বলি কল্পবিজ্ঞান, যেমন অল্‌ডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ

নিতে পারবে, এটা আশা করা যায় না। তাছাড়া জীবনের বিচিত্র দিক তা লিপিবদ্ধ করে বলেই তার বহিরঙ্গ রূপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, নামেই বোঝা যায়, একে আগে ছোট হতে হবে এবং তারপর গল্প—কিন্তু এভাবে তাকে কখনোই বিচার করা যায় না। কারণ ছোটগল্প শব্দটি সমগ্রতই একটি সাহিত্য-প্রকরণকে বোঝায়, ছোট যে গল্প—এইভাবে কর্মধারয় সমাস হিসাবে শব্দটি গঠিত হয়নি। বস্তুত ছোটগল্প চলমান জীবনের সংহত রূপ বলেই তাকে ছোট হতে হয়, কিন্তু তা কতটা ছোট হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, থাকতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-ও ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত, আধুনিক কালে বনফুলের অতিক্ষুদ্র ছোটগল্পগুলিও সার্থক ছোটগল্প হিসাবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে, সুতরাং গল্পের আয়তন এই সাহিত্যশ্রেণীর স্বভাববৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে ছোটগল্প নবাগত হলেও এ নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে এর পরিমাণ খুব বেশি না হলেও, একেবারে হয়নি এমন বলা যাবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' এ বিষয়ে এখনও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন সমালোচকগণ করেছেন অনেকভাবেই, আপাতত সেই বিস্তারে যাবার দরকার নেই। ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের একমুখিনতা বা singleness of purpose-কে প্রায় সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং সেই একমুখিনতার প্রকৃতি অনুসারে ছোটগল্পের প্রধান ভাগ তিনটি—ঘটনামুখ্য ছোটগল্প (story of incident), চরিত্রমুখ্য ছোটগল্প (story of character) এবং প্রতীতিমুখ্য ছোটগল্প (story of impression)। অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণভাবে প্রতীতি বা impression-ই ছোটগল্পের মূল কথা। ছোটগল্প পাঠ করে যে প্রতীতি মনে জাগে তার ওপরই নির্ভর করে ছোটগল্পটির শিল্পসাফল্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ময় কবিতা

ক. কবিতা ও অকবিতার প্রভেদ—কবিতার কিছু বিখ্যাত সংজ্ঞা ও তার বিচার—কবিতায় কল্পনার ভূমিকা—কবিতায় অনুভূতি ও প্রকাশ-কৌশলের তুলনামূলক গুরুত্ব—কবিতা ও সৌন্দর্যবোধ—সৌন্দর্য বস্তুগত অথবা আত্মগত—কবিতার কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা। খ. কবিতা ও পদ্য—গদ্য ও পদ্য মাধ্যম—কবিতার সঙ্গে ছন্দের অপরিহার্য কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা—এ বিষয়ে কিছু পরস্পরবিরোধী মত—কবিতা ও ছন্দস্পন্দ। গ. গীতিকবিতার পরিচয়—গীতিকবিতার সংজ্ঞা সন্ধান—গীতিকবিতার প্রধান কিছু লক্ষণ। ঘ. গীতিকবিতার উৎস—প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সাহিত্য—সংস্কৃত অপভ্রংশে গীতিকবিতার সন্ধান—আধুনিক কালের আগে খাঁটি গীতিকবিতা রচনা সম্ভব ছিল কিনা—লোকসাহিত্যে গীতিকবিতা। ঙ. আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার সাধারণ পার্থক্য—বৈষ্ণবপদাবলীর আত্মমগ্নতা গীতিকবিতার অনুরূপ কিনা—সাম্প্রতিক গীতিকবিতা—একটি প্রাচীন ও একটি আধুনিক গীতিকবিতার তুলনা। চ. ভক্তিমূলক কবিতা—এদের আদৌ কবিতা বলা যায় কিনা। ছ. প্রেমমূলক কবিতা। জ. প্রকৃতিমূলক কবিতার বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন প্রকৃতিমূলক কবিতা—আধুনিক কালে এর সূচনা। ঝ. প্রার্থনাসংগীতের সঠিক লক্ষণ—ভারতীয় প্রার্থনাসংগীত—পাশ্চাত্য প্রার্থনাসংগীত। ঞ. ওড বা স্তুতিকবিতার উৎস—ওডের সংজ্ঞা—ওডের অঙ্গবিভাগ, প্রাচীন ও আধুনিক মত—বাংলায় স্তুতি কবিতা—একটি স্তুতি কবিতা। ট. এলিজির বৈশিষ্ট্য—এলিজির উদ্ভব—প্রাচীন গ্রীক কবিতায় এলিজি—ইংরেজি এলিজি—বাংলা শোককবিতা। ঠ. সনেটের সাধারণ আলোচনা—সনেটের উদ্ভব—পেত্রার্কীয় সনেটের অঙ্গবিভাগ—ইংরেজি সনেটের অঙ্গবিভাগ—সনেটের ভাবগত বৈশিষ্ট্য—সনেটের পাঁচটি বিশিষ্ট লক্ষণ—পাশ্চাত্য বিশিষ্ট সনেট-রচয়িতা—বাংলায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ড. মধুসূদন দত্তের একটি সনেটের বিশ্লেষণ। ঢ. কবিতার আঙ্গিকমুখ্য বিভাগ—ট্রায়োলেট—লিমেরিক—লিপি-কবিতা—বাংলা কবিতা—বাংলা লিপি-কবিতা। ণ. কবিতার উপকরণ।

ক. কবিতা কাকে বলে?

কবিতা কাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কবিতা কাকে বলেনা সে কথা বলা অনেক সহজ। আদি গ্রীক মহাকবি হোমার কবিতা লেখার জন্য মিউজ-এর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, প্লেটো বলেছেন, এক 'স্বর্গীয় উন্মাদনা' এলেই কবিতা রচনা করা সম্ভব, আবার আমাদের আদিকবি বাল্মীকি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে বলে উঠেছেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।' অর্থাৎ আমার মুখ থেকে এই যে অপূর্ব বস্তু প্রকাশিত হল, সেটি কী!

তার মানে, আজ পর্যন্ত কবিতা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে না পারলেও মানুষ কবিতাসৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার উত্তর সন্ধান করছে। কবিতার আত্মা কী, তার সৃষ্টিরহস্য কী, এ সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল, পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যেও এ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতা এবং অকবিতা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সংশয় ছিলনা, এই দুই জিনিসের পার্থক্য তাঁরা বুঝতে পারতেন। সংস্কৃত আলংকারিকগণ কবিতা ও চিত্রকাব্যের (অর্থাৎ মেকি কবিতার) তফাৎ করতে পারতেন এবং সুখের কথা, সে বোধ আমাদের আছে, এখনও। যেমন আমরা জানি, একে বলে কবিতা :

'ভিজেছে চোখের পাতা বৃষ্টি কিংবা কুয়াশায় হিমে
এখন পড়ে না মনে, শুধু ঝাপসা দেখি গোরস্থালি
কোনদিন বনজ্যোৎস্না জ্বলেছিল বুকে,
কোনদিন উদাসী হাওয়ায়
অন্যমনে বেজেছে নূপুর।
সমস্ত দুপুর জুড়ে একা ছিল চিলেকোটা,
আজ সেই চঞ্চল কিশোরী
খুলেছে ডাকের সাজ, অন্ধকারে দিগন্ত ছুঁয়েছে।'

[*কিশোরী*/আনন্দ বাগচী]

আধুনিক কালের কবি আনন্দ বাগচীর তুলনায় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিখ্যাতি কিছু কম ছিল না, তবু তাঁর তপ্সে মাছ বিষয়ক এই কবিতাটিকে 'কবিতা' বলে মেনে নিতে বোধহয় আমাদের অনেকেই এখন রাজি হবেন না। এর অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

"কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর ন্যায়॥ ...
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥ ...
প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আঁস বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা॥ ...
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভরে খেতে যেন পাই একদিন॥'

ঠিক একই ভাবে আমরা বুঝতে পারি ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি খাঁটি কবিতাকেও, যদি সেটি সত্যিই কবিতা হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে কবিতা হিসাবে মোটামুটিভাবে চলে গেলেও অ-কবিতাকে সহজে আমাদের মন কবিতা হিসাবে স্বীকার করতে চায় না। দুটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা বোঝা আরো সহজ হবে।

বড় কবি লিখলেই যে সব সময় তা কবিতা হয়ে ওঠে না, তা বুঝবার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি রোম্যান্টিক যুগের অবিসংবাদিত কবি শেলির এই কটি ছত্র—

"Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around,
Nor that content, surpassing wealth,
The sage in meditation found,
And walk'd with inward glory crown'd–
Nor fame, nor power, nor love, nor leisure;"

গদ্যগন্ধী এই ছত্রটির পাশে স্মরণ করা যাক অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, মধ্যযুগীয় কবি অ্যান্ড্রু মারভেলকে—

"But at my back I alwaies hear
Times winged charriot hurrying near :
and younder all before us lye
Desarts of vast Eternity."

সময়ের উড়ন্ত রথের কল্পনা এক মুহূর্তে আমাদের কবিতাটির জাত চিনিয়ে দেয়।

কাকে বলে কবিতা তা জানার জন্য কবিতার বিখ্যাত সংজ্ঞাগুলির দিকে একবার চোখ বোলানো যাক। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তাকে প্রায় কবিতার সংজ্ঞা হিসাবেই অভিহিত করা যায়, তিনি বলেছেন—"বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।" বোঝা যায়, একেবারে অস্পষ্ট ভাববাদী সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ দেননি। এ কথা বলেছেন বটে যে, হৃদয়ে অনুভূতি দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তার চিত্রধর্মী ও সংগীতধর্মী প্রকাশই সাহিত্য—তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তার মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হয়।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কিন্তু একেবারে ভাববাদী ব্যাখ্যাই দিয়েছেন এবং সেই সংজ্ঞা থেকে কবিতার প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা খুব সফল না হতেও পারে। তিনি বলেছেন, "কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্ছিত মানবের ভাববিধুর গদ-গদ ভাবই কবিতা।"

ইংরেজিতে যেসব বিখ্যাত সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা পরিচিত তারা মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোনো কোনো সংজ্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে কবিতার অপরূপ বাণীভঙ্গির ওপর, কোনো সংজ্ঞা জোর দিয়েছে আবেগ ও অনুভূতির ওপর এবং তৃতীয় ধরনের সংজ্ঞায় অনুভূতি, প্রকাশভঙ্গি এমনকি কবিতার উৎস ও কর্তব্য সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রথম ধরনের সংজ্ঞার কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে কোলরিজের সেই বিখ্যাত উক্তি—"Prose is words in their best order, Poetry is the best words in the best order."

সমালোচক ওয়াট্স্ ডান্টন এই বাণীভঙ্গির ওপর জোর দিলেও অনুভূতির উল্লেখ করেছেন—"Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the mind in emotional and rhythmic language."

প্রকাশসৌন্দর্য ছাড়াও কবিতার যে কিছু কাজ আছে, ম্যাথু আর্নল্ড তা বলেছেন, তবে তিনি এও বলেছেন—"Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach."

কবি-গল্পকার এড্‌গার অ্যালান পো-র অভিমতও সেইরকম—"It is the rhythmic creation of beauty."

অনুভূতির এবং কল্পনার ওপর যাঁরা জোর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবি শেলির কথা আগে মনে পড়বে। কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেলি বলেছেন, "... in a general sense (it) may be defined as the expression of the imagination."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত সংজ্ঞাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Poetry is the spontanious overflow of powerful feelings."

মেকলের ব্যাখ্যাটি আরও বিশদ, কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "By poetry we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by mean of words what the painter does by means of colours."

অবশ্য শুধু কল্পনা নয়, কবিতার কাজ যে সত্যের বাণীও প্রচার করা এবং জীবনের সমালোচনা ও ব্যাখ্যাও যে কবিতার কাজ—এসব কথাও বলেছেন মনস্বী সমালোচকগণ। জনসন কবিতাকে বলেছেন, '... the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason."

ম্যাথু আর্নল্ডকে এই প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, "Poetry is at bottom criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty."

সমস্যা এই যে, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমরা কবিতার স্বরূপে উপনীত হতে পারি না, বরং কবি-সমালোচকদের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও আমাদের সংশয় ও বিভ্রান্তি ক্রমেই বেড়ে যায়। এটুকু আমরা বুঝতে পারি, বাহ্যজগৎ এবং মানুষকে বাদ দিয়ে কবিতার জগৎ নয়, তবে কবিদের রচনায় কল্পনার একটি বড় ভূমিকা আছে। কল্পনা বলতে অবশ্যই আমরা অলীক কল্পনা বুঝি না, বুঝি সেই creative imagination যাকে ইংরেজ সমালোচকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছেন। কবিতা সৃষ্টির পক্ষে এই ধরনের কল্পনা একেবারে অনিবার্য, কারণ—

"The light that never was on sea or land
The consecration and the Poet's dream"

প্রতিফলিত করার জন্য সৃজনী কল্পনার সাহায্য দরকার হবেই। 'স্মর-গরল' কাব্যে মোহিতলাল মজুমদার একেই বলেছেন—

"শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চঞ্চল তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে ..."

কবি কোলরিজ একেই বলতে চেয়েছেন Esemplastic Imagination এবং এটি এমনই এক কাব্যপ্রতিভা যা 'tends to objectize itself and to know itself in the object'।

আসলে, কবিতার প্রধান প্রকাশসৌন্দর্য যে চিত্রকল্প এবং উপমা, তার অনেকটাই নির্ভর করে কল্পনার সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর। এ কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি যখন মনে করি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসারের পদ—

"তঁহি অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল-নিচোল॥"

অথবা, কোলরিজ যখন লেখেন—

"silent icicles
Quietly shining to the quiet moon."

কিংবা যখন রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সেই পংক্তিগুলি আমাদের মনে পড়ে—

"ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী—
এলায়ে?
ওগো, নবঘন-নীলবাস খানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?

তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে?"

সংস্কৃত আলংকারিকগণ এই কবিকল্পনার ব্যাপারটিকে অবহেলা করেছেন এবং কল্পনা বা Imagination-এর কথা কখনও বলেননি, এরকম অভিযোগ করেছেন ড. সুশীলকুমার দে তাঁর Sanskrit Poetics গ্রন্থে। ঠিক 'কল্পনা' শব্দটির প্রয়োগ না থাকলেও 'কবি-কৌশল', 'কবি-ব্যাপার' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত আলংকারিকগণ ব্যবহার করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ধ্বনিবাদী আলংকারিক অভিনবগুপ্ত যে 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'-র কথা বলেছেন, তাকে আমরা কল্পনারই নামান্তর বলতে পারি। সুতরাং কবিতার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় কবির গভীর অনুভূতি ও সৃজনশীল কল্পনা, যার একটি ঋদ্ধ প্রকাশ ঘটলেই আমরা তাকে গ্রহণ করি কবিতা হিসাবে।

এই প্রসঙ্গেই কবিতার প্রকাশভঙ্গির সামর্থ্যের প্রশ্ন ওঠে। কেবল অনুভূতির ঐশ্বর্য থাকলেই তাকে আমরা মহৎ কবিতা হিসেবে গ্রহণ করি না। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

এই রকম চরমপন্থী মত অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র প্রকাশ করেননি, একজন রোম্যান্টিক কবির কাছে তা আমরা প্রত্যাশাও করতে পারি না, তবে এ কথা আমরা বুঝতে পারি যে মনোভাব মনের মধ্যে থাকলে তা পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়—ভাব যখন রূপ পরিগ্রহ করে তখনই তা কবিতা হয়ে ওঠে। ক্রোচের মতো সজ্ঞাবাদী নন্দনতাত্ত্বিকও প্রকাশভঙ্গির মূল্য অস্বীকার করতে পারেননি, তবে তিনি বলেছেন প্রকাশের জন্য কবিকে কোনও অতিরিক্ত চিন্তা করতে হয় না—মনে ভাব যখন আসে তখন রূপ পরিগ্রহ করেই আসে।

কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা দরকার। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের অন্যতম প্রকরণ হিসাবে, এবং সম্ভবত গভীরতম অনুভূতিসঞ্জাত বলে, কবিতার প্রধান আবেদন আমাদের হৃদয়ে এবং সৌন্দর্যবোধের কাছে। বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক আন্দোলনের পথিকৃৎ গুস্তাভ ফ্লবেয়র কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই এরকম মত প্রকাশ করেন যে তার জন্ম হৃদয়ে, মস্তিষ্ক তাকে উষ্ণতা দান করতে পারে মাত্র। সুতরাং কবিতা যে হৃদয়নির্ভর, এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার—বিশেষ করে বিশিষ্ট কবি টি. এস্. এলিয়টের কাব্য-আন্দোলনের পর, কারণ তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতাতেও প্রবলভাবেই পড়েছে।

সেই একই কারণে কবিতার আবেদন যে আমাদের সৌন্দর্যবোধের কাছে, এ কথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সৌন্দর্যকে আমরা এখানে প্রথাগতভাবে গ্রহণ করবো না। আমরা জানি, সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা চিরকাল স্থির হয়ে নেই এবং ব্যক্তির মানসিকতা অনুসারেও সৌন্দর্যধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রযুগের কবিতার সৌন্দর্যচর্চা সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকদের যদি কোনও অসন্তোষ থাকে তবে তা এই কারণে যে, সে সৌন্দর্য ছিল অনেকটাই বস্তুগত। সংস্কৃত আলংকারিগণ যেমন

বলেছেন কিছু বিষয় স্বভাবতই কাব্যিক বিষয় হবার যোগ্য, যেন সেই যোগ্যতাতেই কবিরা তাদের গ্রহণ করেছেন নির্বিচারে। সৌন্দর্য ধারণায়-এর একটি বিপরীত দিকও আছে, যাকে বলা যায় আত্মগত সৌন্দর্যবোধ, এবং যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথেই আছে—"গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',/সুন্দর হল সে।"

আসলে, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বস্তুগতও নয়, আত্মগতও নয়—একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সৌন্দর্যের সিদ্ধি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের দরকার হয়। বস্তুগত সৌন্দর্য অনেক সময়ই নির্ভর করে তার সামঞ্জস্যের ওপর—এ কথা জড়বস্তু সম্বন্ধে যেমন সত্য, মানবচরিত্র সম্বন্ধেও তাই। আবার আত্মগত ভাবে দেখতে গেলে, মানুষ যাকে সত্য বলে অনুভব করে তার মধ্যেই সে সৌন্দর্য খুঁজে পায় এবং সৌন্দর্যকে সে সত্য বলে বলে মনে করে বলেই তার কাছে তা এতো সুন্দর। কীট্‌সের কথাটি এ প্রসঙ্গে একেবারে প্রবাদ হয়ে আছে—'Truth is beauty, beauty truth.' এর সঙ্গে মঙ্গলদৃষ্টি বা অধ্যাত্মদৃষ্টি যোগ দিলে কেমন করে সৌন্দর্যবোধের মাত্রা বেড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যবোধ', প্রবন্ধে তা বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন। আবার ব্যক্তিভেদে, তার মানসিক গঠন অনুসারেও যে সৌন্দর্যবোধ পৃথক হতে পারে সে কথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝি। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টি কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ কথা স্বীকার করতে সম্ভবত আমাদের কোনো আপত্তি হবে না। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সুন্দর-অসুন্দর বিচার করলে যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভাঁড়ুদত্ত মুরারি শীলকেও সুন্দর বলা যায় না এবং তা সত্ত্বেও যে তারা আমাদের আকর্ষণ করে—এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করেছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তারা সত্য বলেই সুন্দর। কাজেই সুন্দর-অসুন্দরের সে রকম বিচার অর্থহীন। কোনো বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র আমাদের আকর্ষণ করে বলেই তার সত্যতা আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাকে অভ্রান্তভাবে সত্য বলে জানি, তাই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে সুন্দর এবং যা আকর্ষণীয় তাকেই আমরা নান্দনিক রূপ দিতে চেষ্টা করি, অন্যের মনেও তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে মনে করে।

কবিতা-বিষয়ক আর একটি প্রশ্ন তার উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে। আনন্দ দেওয়া এবং আনন্দ পাওয়া ছাড়া কবিতার অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিনা, এই প্রশ্নে তাত্ত্বিকদের মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। একদল সাহিত্যতাত্ত্বিকদের বলা হয় উদ্দেশ্যবাদী, তাঁরা Art with a purpose-এর নীতিতে বিশ্বাস করেন। অন্য দলকে বলা হয় কলা-কৈবল্যবাদী, তাঁরা Art for art's sake-এই নীতিতে বিশ্বাসী। প্রথম দল মনে করেন কবিতার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, দ্বিতীয় দলের মতে কবিতাই কবিতার উদ্দেশ্য—কবিতার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

কবিতার যে প্রকৃতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকৃত কবি কোনো কবিতা রচনা করেন না—সৌন্দর্যসৃষ্টি বা মনের আনন্দপ্রকাশই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই কারণেই কীট্‌স্ বলেন, "We hate poetry that has a palpable design upon us ... Poetry should be great and unobtrusive." অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের কথাও আমরা ভুলতে পারি না, কবিতা যাঁর কাছে জীবনের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এমন কথাও বলেছেন যে কাব্য নীতি এবং অন্যান্য শিক্ষা দিয়ে থাকে, যদিও তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন--"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি জ্ঞান নহে। ... কবিরা

জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"

সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যের চতুর্বিধ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তাঁদের মতে কাব্যপাঠ করলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই সব কিছুই লাভ হয়ে থাকে।

এই সমস্যার গভীরে না গিয়েও আমরা প্রকৃত সত্য অনুভব করতে পারি। কবিতা রচনার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জীবন-সমালোচনা বা নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়, কিন্তু কবিতা তো জীবন ও জগৎ-বহির্ভূত কোনো অলীক বস্তুও নয়। কাজেই জীবনের অনুভূত সত্য, অভিজ্ঞতার নির্যাস সেখানে থাকবেই। তাই জীবনের সমালোচনা না হোক, জীবনের একটা ব্যাখ্যা আমরা সেখানে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। নীতি প্রচার করা হয়েছে অথবা হয়নি, কবিতার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ক্ষেত্রে এটি কোনো বিচার্য বিষয়ই নয়। কোনো কবির জীবনে সুনীতির প্রভাব থাকলে তাঁর কবিতায় নীতির স্পর্শ আমরা পেতে পারি, কোনো কবির ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারও ঘটতে পারে। কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই কবিতা এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আবার কবিতা জীবন-বহির্ভূত এক খামখেয়ালি সৃষ্টি নয় বলেই তাতে জীবনের স্বাদ আমরা লাভ করি।

কবিতা প্রসঙ্গে আর একটি প্রসঙ্গ বেশ বিতর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য কী না। প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে আলোচ্য বলেই তা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করাই সংগত।

খ. কবিতা ও পদ্য

কবিতা কেবল পদ্যেই লিখিত হতে পারে কিনা, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য কিনা, বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতা লেখা সম্ভব অথবা নয়—এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে রাখা এবং স্মরণে রাখা ভাল যে কবিতা এবং পদ্য এক জিনিস নয়, তাদের পার্থক্যটা এতো স্পষ্ট যে দুটিকে অভিন্ন মনে করার কোনো কারণই নেই।

কবিতার যেটুকু বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি শুধু সেইটুকু জেনেও বলা যায়, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মতো কবিতা একটি সাহিত্য-প্রকরণ। তার কোনো বিশেষ রূপ আছে কি নেই সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, কবিতা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তার প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য দরকার—সেগুলি থাকলেই তাকে আমরা কবিতা বলে মেনে নেবো। পক্ষান্তরে পদ্যকে বলতে পারি সাহিত্যের একটা মাধ্যম—গদ্য যেমন তার আর-একটা মাধ্যম, ঠিক তেমনি। বাংলায় যেমন পদ্য এবং কবিতা দুটি আলাদা শব্দ শুধু নয়, ব্যাপারটাও আলাদা—ইংরেজিতেও তাই। গদ্য এবং পদ্য মাধ্যমকে ইংরেজিতে বলে যথাক্রমে prose এবং verse, কবিতা বলতে আমরা বুঝি poetry। একই কথা আমরা গদ্যে বলতে পারি, পদ্য মাধ্যমেও বলতে পরি; পদ্য মাধ্যমে বললেই তা কবিতা হবার গৌরব অর্জন করে না। 'দেখি, পারলে কাল তোমার বাড়ি যাবো'—গদ্য মাধ্যমের এই সংবাদ পদ্য করে আমরা জ্ঞাপন করতে পারি এইভাবে—'সময় যদি করতে পারি/কালকে যাবো তোমার বাড়ি।' কিন্তু এর সঙ্গে কবিতার

কোনো সম্পর্ক নেই, কবিতাকে কবিতা হতে হলে নির্দিষ্ট কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমন্বিত হতে হবে—তার মাধ্যম কী, সে প্রশ্ন পরে। আমরা যখন এই কবিতা পড়ি—

> "হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি নেই সোনার অধিক
> উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
> আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়
> আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি?"
>
> [*এক অসুখে দুজন অন্ধ*/শক্তি চট্টোপাধ্যায়]

তখন মাধ্যমটি গদ্য অথবা পদ্য, সে বিচারের চেয়ে কবিতাটি কেমন করে কবিতা হয়ে উঠলো সেদিকেই আমাদের মন আরো বেশি থাকে না কি!

তা সত্ত্বেও কবিতা ও পদ্য প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে অনেকের কাছেই। কারণটা এমন হতে পারে, যে, দীর্ঘ দিন পদ্যই ছিল, আমাদের সাহিত্য-মাধ্যম এবং তার ফলে রাধা-কৃষ্ণের লীলা থেকে শুরু করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের মতো দুরূহ গ্রন্থও লেখা হয়েছে পদ্য মাধ্যমেই। দীর্ঘ পদ্যগ্রন্থ রচনার জন্য তাঁদের কবির সম্মানও আমরা দান করেছি। এ ব্যাপার শুধু বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে তা নয়, ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচকদেরও আমরা পদ্য এবং গদ্য কথাদুটি প্রায় রূপকার্থে প্রয়োগ করতে দেখি। কবিতার বিষয় ও পরিবেষণভঙ্গী সাদামাটা বা তথ্যবহুল হয়ে গেলে তাঁকে তাঁরা 'Prosaical' আখ্যা দেন। তুলনায় গদ্যরচনায় কাব্যিক অনুভূতি পেলে তাকে বলেন 'poetical' বা ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনায় তাঁরা খুঁজে পান 'the other harmony of prose'। এই সমস্যার সমাধান করা দরকার শুধু এই কারণে নয় যে গদ্যমাধ্যমে কবিতা রচনার প্রবণতা এখন ক্রমবিস্তার লাভ করছে, কবিতার সত্যিই কোনো নির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে কিনা সে কথা জানার জন্যও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া জরুরি।

কবিতাকে কবিতা হলেই চলবে, ছন্দ বা পদ্যের সঙ্গে তার যে বিশেষ সম্বন্ধ নেই, এ কথা একেবারে প্রথম দিকে বলেছিলেন ষোড়শ শতকের কবি সার ফিলিপ সিডনি। তাঁর মতে, পদ্যছন্দ কবিতার অলংকারমাত্র—"... being but an ornament and no cause to poetry; sith there hath beene many most excellent poets, that have never versified, and now swarme many versifieres that need never answere to the name of poets." ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থের মতো কবি তাঁর 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্'-এর ভূমিকায় খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন—"There neither is, nor can be any essential difference between the language of prose and metrical compostion."

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন, "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।" ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ এবং রবীন্দ্রনাথ এ সব কথা বললেও ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি পদ্যমাধ্যমেই রচনা করেছেন তা আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবো। গদ্য ও পদ্যের 'ভাসুর-ভাদ্রবউ' সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ মানেন না, এমন কথাও তিনি বলেছেন এবং 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'কাব্যের অধিকার' অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, এও তাঁর দাবী। তা সত্ত্বেও

যখন পরবর্তী কাব্যপ্রয়াসে পদ্যছন্দকে তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং 'আফ্রিকা'-জাতীয় বেশ কিছু কবিতায় বার বার আঙ্গিক পরিবর্তন করেন, তখন বোঝা যায় একটা কোনও অস্বস্তি তাঁকে বিচলিত করছে। আমরা এখন অন্তত বুঝি, মিল বা পর্বের মাত্রাসমকত্ব ত্যাগ করলেও ছন্দ-স্পন্দ বা Rhythm রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে পারেন না, ইচ্ছে করলেও না।

অতঃপর যাঁরা মনে করেন কবিতার সঙ্গে ছন্দের একটা অনিবার্য সম্পর্ক আছে, তাঁদের কথা শোনা যাক। হেগেলের মতো পণ্ডিত দার্শনিক একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "metre is the first and only condition demanded of poetry."

অথচ আমরা আগেই বলেছি কবিতা এক সাহিত্য-প্রকরণ এবং পদ্য ও গদ্য সাহিত্য-মাধ্যমমাত্র, সুতরাং কবিতার সঙ্গে পদ্যকে এক করে দেখার ব্যাপারটা একই সঙ্গে কেন ঠিক, আবার কেন ঠিক নয়—সেটি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন প্রাবন্ধিক লী হান্ট। দীর্ঘ হলেও তাঁর উদ্ধৃতিটি এক্ষেত্রে সমস্যাটিকে বোঝার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি—"It has been contended by some that poetry need not be written in verse at all; that prose is as good a medium, provided poetry be conveyed through it; and that to think otherwise is to confound letter with spirit, or form with essence. But the opinion is a prosaical mistake. Fitness or unfitness for song, or metrical excitement, make all the difference between a poetical and prosaical subject; and the reason why verse is necessary to the form of poetry is that the perfection of the poetical spirit demands it– that the circle of its enthusiasm, beauty, and power, is incomplete without it."

এই কারণেই, সাহিত্যপ্রকৃতির সঙ্গে প্রায় সাহিত্যের আঙ্গিক মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে জানিয়েও, লী হান্ট বলেছেন কবিতার শিল্পরূপেই পদ্য অপরিহার্য, নইলে তার ভাব, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কথাটাই শেলি বলেছেন অন্যভাবে, মানে কথাটা যতো ভালো ভাবে বলা সম্ভব ঠিক ততোটাই ভালো করে—"The distinction between poets and prose writers is a vulgar error."

কোলরিজ অবশ্য একথা বলেছেন, অথবা বলতে বাধ্য হয়েছেন—"poetry of the highest kind may exist without metre' কিন্তু তাঁর মনের কথাটি বোঝা যায়, যখন তিনি বলেন—"There **may** be, is and **ought to be** essential difference between the language of prose and metrical composition." (মোটা অক্ষর দিয়েছি আমি)।

কবি ও সমালোচকদের এই ধরনের পরস্পরবিরোধী উক্তি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে বাংলায় ছন্দোবদ্ধ কবিতাই যখন ব্যতিক্রম হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে গেলে বলতে হবে, কবিতা এবং পদ্য যে সমার্থক নয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা এ কথা অবশ্যই মনে রাখবো যে কবিতা একটি সাহিত্য-প্রকরণ, পদ্য এক রকমের সাহিত্যমাধ্যম। কবিতা যে পদ্যে লিখতেই হবে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, পক্ষান্তরে পদ্যে লিখলেই তা কবিতা হবে না, কবিতা হবার শর্ত আছে অন্যত্র। এতো কথা বলেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, কবিতার বিষয় গভীর ও মর্মচারী অনুভূতি বলেই সেই অনির্বচনীয় প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের একটু বেশি সাবধান থাকতে হয়। আমাদের

অনুভূতি গোপনচারী, একান্ত ও মৌলিক, কিন্তু যে ভাষায় তা প্রকাশিত হয় তা সর্বসাধারণের বহুব্যবহৃত ভাষা—নিত্যকার প্রয়োজনে সে ভাষা বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। সেই কারণেই কবিতার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য (যদিও তিনি একে সাধারণভাবে সাহিত্যের ভাষা বলেছেন)—"অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। ... ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।"

যাকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার সংগীতধর্ম বলেছেন, তাকেই প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে এক ধরনের ছন্দ-স্পন্দ বা Rhythm, এবং কবিরা প্রায় সকলেই এই সংগীতধর্ম বজায় রেখেই থাকেন। কবিতার পংক্তি যে সাজানো হয় অসমভাবে, ক্রিয়াপদ যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় স্বস্থানের অনেকটা আগে—এ থেকেই বোঝা যায় ছন্দ পরিহার করে গদ্যমাধ্যমে কবিতা লিখতে চাইলেও আমরা ছন্দ-স্পন্দকে পরিহার করতে পারি না। যেখানে সচেতনভাবে আমরা সেটাও পরিহার করি—যদিও এটাকে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া বা ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরতে হবে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা একটি বিশেষ লয় বা গতি এবং কার্যত একটি বিশেষ ধরনের শব্দ-স্পন্দকে বজায় রেখে থাকি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গদ্যে কবিতা রচনা করবার জন্য এবং অসাধারণ গদ্য লিখবার জন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিধাহীন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর একটি কবিতা উদ্ধার করি—

'আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম—

আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকানো উঠোনে
সারি সারি
　　　　লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।'

এ কবিতা একেবারেই গদ্যে লেখা, যদিও সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনো কোনো কবিতায় আরো কঠোর গদ্য ব্যবহার করেন, তবু বলবো পদ্যের কোনো লক্ষণই এর মধ্যে নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বিস্তৃত করবার জন্য সচেতনভাবে গদ্য কবিতার প্রবর্তন করেন তখনও কিন্তু কবিতার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচিত সেই গদ্যের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত গদ্যের কিছু পার্থক্য বোঝা যেত, অন্তত একটা পার্থক্য তো ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, বাংলা গদ্যে বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সনাতন পদ্ধতির বদলে। ক্রিয়াপদকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসা, যথা—

'তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
　　আঁক কষবার খাতা।

ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে। (*শেষ চিঠি*/পুনশ্চ)

একটু চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গদ্যছন্দের কবিতার ছন্দ-বিভাগও করা একেবারে অসম্ভব নয়, যেমন—

'আমরা কেবল | বানিয়ে তুলি |
আপন ব্যথার | রঙে রসে |
ধূলির থেকে | পালিয়ে যাবার | সৃষ্টিছাড়া | ঠাঁই
বেড়া দিয়ে | আগলে রাখি।
ভালোবাসার | জন্যে দূরের | বাসা
সেই আমাদের | গান।' (*গানের বাসা*/পুনশ্চ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত কবিতায় কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন ছন্দ নেই, পদ্যের আমেজও নেই, আছে সহজ সরল নিপাট গদ্য। বরং ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নিখুঁত গদ্যের আমেজ, যেমন—

"অবশ্যকর্তব্য নীড় | (মড়া-কাটা-ঘর, —স্থানাভাবে?)
নখাগ্রে নক্ষত্র পল্লী; | ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে | ঋষি মনে হ'তো হাবেভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ | উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী।"

আসলে ছন্দোস্পন্দ বর্জন করে গদ্যমাধ্যমকে যখন আমরা কবিতা রচনায় ব্যবহার করি, তখন তার অতি-নির্বাচিত শব্দের ধ্বনিসজ্জা তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত এক গতি সঞ্চার করে দেয় এবং এই গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট কবিতার সর্বত্র একই রকম থাকে। অবশ্য এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি, আমরা এবার অগ্রসর হবো পরবর্তী প্রসঙ্গে।

গ. গীতিকবিতা

গীতিকবিতা কথাটি এসেছে ইংরেজি Lyric poetry থেকে। Lyric শব্দটির মূলে আছে লায়ার নামক একটি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, এই যন্ত্রসহযোগে যে গান গাওয়া হতো তাকেই বলা হতো লিরিক বা গীতিকবিতা। এই ভাবে গ্রহণ করলে ইউরোপের বিভিন্ন আখ্যানকাব্য, এমনকি ইলিয়াড ও ওডিসিকেও গীতিকবিতা বলতে হবে, কারণ সেগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানই করা হতো একদিন। এইভাবে দেখতে গেলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাকেই গীতিকবিতা বলতে হয়, কারণ এ সবই গান করা হতো। বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী ছিল মূলত গান, সেগুলি এখনও সংগীত হিসাবেই পরিবেষণ করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-মূলক কাব্য ইত্যাদি সবই তো সুর করে পাঠ করা হতো। সুতরাং সাংগীতিক অনুষঙ্গ থেকে তাদেরও বাদ দেওয়া শক্ত।

অথচ গীতিকবিতা বলতে আমরা এখন যে ধরনের কবিতা বুঝি তার সঙ্গে সংগীতের

বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপার কেমন করে ঘটেছে তা বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে। বিবিধ প্রবন্ধের 'গীতিকাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> "গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। ... দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনি সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।
>
> কাজেই কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপ গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূর রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।
>
> অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ গীত এবং গীতিকবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গীতরচয়িতার স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত, সুরারোপের পক্ষে উপযোগিতাই সংগীত রচনার প্রধান লক্ষ্য। ছন্দ গঠনের ব্যাপারে তিনি খানিকটা সুবিধাও লাভ করে থাকেন—সুরবাহিত বলে ছন্দের বিভিন্ন ত্রুটি গানে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু খাঁটি গীতিকবিতায় প্রকাশসৌন্দর্যও অত্যন্ত বেশি পরিমাণে দরকার হয়।

অবশ্য গীতিকবিতার আলোচনায় উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্যটি অত্যন্ত মূল্যবান, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের' পরিস্ফুটন গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে দিক থেকে দেখতে গেলে মন্ময় কবিতামাত্রই গীতিকবিতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্থূল দুটি বিভাগ করতে গিয়ে বলেছিলেন—"কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।" গীতিকবিতা একলা কবির কথা। কবির নিজের কথা বলেই অনুভূতির তীব্রতা এই কবিতার প্রাণ। তীব্র অথচ সংহত অনুভূতি প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি যে-কোনও বিষয় আশ্রয় করেই ব্যক্ত হতে পারে, সুতরাং গীতিকবিতার বিষয়ের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। তবে এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস কেবলই ব্যক্তিগত স্বার্থে সীমিত থাকলে তা কবিতার মর্যাদা লাভ করতে পারে না—তার আবেদন অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে।

সেই কারণেই গীতিকবিতার বিষয় ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধর্ম এক বিশেষ সম্প্রদায়ের, অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বও তাই। কাজেই তার দ্বারা ব্যক্তিগত অনুভূতি ঠিক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত থাকে না।

এবার গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করতে গেলে আমরা বলতে পারি, প্রথমত, তা কবির একান্ত ব্যক্তিগত কথা; তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে ধর্ম বা তত্ত্বদর্শনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, কবির ব্যক্তিগত অনভূতির তীব্রতার জন্যই এতে এমন এক নিবিড় আত্মময়তা থাকে যা অনুভূতিশীল চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করে। কবি ও পাঠকের এই রসসংযোগেই গীতিকবিতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

তৃতীয়ত, কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও গীতিকবিতার এক শাশ্বত

ও সর্বজনীন আবেদন থাকে—সম্ভবত এই কারণে যে, আন্তরিক অনুভূতির মধ্যে এমন এক নিত্যতা এবং আবেদন আছে যে অনুভূতিশীল সকল মানুষকেই তা আন্দোলিত করতে পারে।

চতুর্থত, আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে যখন গাঢ়ত্ব লাভ করে, ওয়র্ডস্ওয়র্থ যে অবস্থাকে বলেন 'Emotions recollected in Tranquility'—সেই অবস্থাতেই গীতিকবিতা লেখা হয়। সুতরাং এর প্রকাশ হয় সাবলীল, ব্যঞ্জনাময় ও সংহত—নিটোল মুক্তাসম্ভব এক-একটি শুক্তির মতো। আকারে সংক্ষিপ্ত অথচ অনুভূতিতে প্রগাঢ়—এটাই গীতিকবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

ঘ. গীতিকবিতার উৎস

খাঁটি গীতিকবিতার লক্ষণ যদি একেবারে সাহিত্যের চরম মূল্যে (absolute value) বিচার করি, তবে আধুনিক কালের আগে তার উদ্ভব স্বীকার করা সম্ভব হবে না, কারণ কবির বিশুদ্ধ অহং তখনই ধর্ম ও তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে যদি আমরা বিচার করি, অন্তত ধর্মীয় উপলক্ষকে ব্যক্তির অহং-আবরক বলে বিবেচনা না করি, তাহলে গীতিকবিতাকেই সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন শাখা হিসাবে আমরা স্বীকৃতি জানাতে পারবো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতিকবিতার বিচারে ধর্মীয় উপলক্ষকে আমরা ততটা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না দুটি কারণে, প্রথমত সেই সময়ে ধর্মকে আশ্রয় করাটা ছিল সাহিত্যের পক্ষে একটা অপরিহার্য ব্যাপার। 'The poet is not a mystic'—কথাটি সূক্ষ্ম ও দৃঢ়ভাবে মানতে গেলে ধরে নিতে হয় আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্য বলে কিছু ছিলই না; এবং সেটা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কবি যখন গীতিকবিতার মন্ময়তাকে সত্যিই আত্মস্থ করতে পারেন তখন তিনি যে-দেবদেবীর কথাই বলুন, তাঁর জবানীতে আসলে কিন্তু তিনি নিজের কথাই বলতে থাকেন। অন্যভাবে বলা যায় দেবদেবীর সঙ্গে আত্মস্থতায় তিনি এমন নিমগ্ন হয়ে যান যে এখানে তাঁদের ভিন্নতা প্রায় লুপ্ত হয়।

অবশ্য হাডসন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, সুপ্রাচীন সাহিত্যে যেসব রচনার সন্ধান বা উল্লেখ আমরা পাই তা ছিল প্রধানত গোষ্ঠীসাহিত্য, একক সাহিত্য নয়। একক সাহিত্য বা ব্যক্তিত্বের বোধ আমাদের এসেছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পর। আমরা মনে করি, প্রাচীন যুগে গীতিকবিতা বা মন্ময় কবিতা লেখা সম্ভব, এই ছাড়পত্র দিলে গোষ্ঠীসাহিত্যকেও গীতিকবিতার স্বীকৃতি দিতে হয়। আসলে মধ্যযুগীয় গোষ্ঠী কবিতা-তে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে যা পরিস্ফুট হয়েছে তা হল অনুভূতির গভীরতা এবং মানবিক উচ্চারণ। দেবদেবীর বন্দনাকে উপলক্ষ করেও যদি সেই মানবতার সুর আমরা শুনতে পাই এবং তা যদি উঠে আসে অনুভূতির গভীর স্তর থেকে, তাহলে তাকে গীতিকাব্য বলতে আমাদের বাধা থাকা উচিত নয়। এর স্বপক্ষে আরো বলবো, অনুভূতির সেই গহন উষ্ণতা থেকে উঠে আসা পংক্তিগুলি গোষ্ঠীসাহিত্যের উপলক্ষ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত না হয়ে পারে না। যেমন বেদ-রচয়িতা আর্য ঋষি যখন ঈশ্বরকে জানার অনুভূতি ব্যক্ত করেন, সে অনুভূতি ব্যক্তিগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইহুদী সংগীতে কবি যখন 'আমি' বা 'আমার' বলে উল্লেখ করে কবিতা রচনা করেন, তাতেও কবির ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ইহুদী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয় বেশি। সেই জন্যই ভারতবর্ষের 'সামগানে' মাঝে মাঝে যে

ব্যক্তিগত অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'এর 'বুক অব সাম্‌স্‌'-এ সেই ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিচয় অল্প—যদিও প্রকাশ-সৌন্দর্যে সেগুলি অসাধারণ।

গীতিকবিতার প্রাচীন উৎস সন্ধান করলে আমাদের গ্রীক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হতে হবে। অবশ্য আদি ভারতীয়-আর্য যুগের বৈদিক সাহিত্য কিংবা চীনের প্রাচীন কবিতার কথাও আমাদের মনে পড়বে। চীনের প্রাচীন কবি লি-পোর কবিতা রবীন্দ্রনাথের এত আধুনিক মনে হয়েছিল যে তিনি বেশ কিছু কবিতার অংশবিশেষ অনুবাদ করে আমাদের শুনিয়েছেন 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। একটি কবিতা এই রকম—

> "নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
> এতই আলস্য সে সাদা পালকের পাখা নড়াতে গা লাগছে না।
> টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
> পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
> আমার খালি মাথার 'পরে।"

প্রাচীন গ্রীক কবিতা যে-কোন প্রাচীন সাহিত্যের মতোই গেয় কবিতা। এক ধরনের গান ছিল সমবেতভাবে গাইবার, তাদের বলা হতো 'কোরিক' অর্থাৎ কোরাস গান; অন্য ধরনের গানকে বলা হতো 'মোনোডিক' বা একক সংগীত। এর মধ্যে 'কোরিক' আলাদা লেখা হতো না, লেখা হতো নাটকের মধ্যে। তবে এস্কাইলাস এবং সোফোক্লিসের মতো কবিও সমবেত-সংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে যে মোনোডিক গান শ্রেষ্ঠতর ছিল সে কথা অনেকেই স্বীকার করেন। প্রাচীন গ্রীক কবি সাফো, এলকেয়াস প্রভৃতি এই রকম একক সংগীতের বড় শিল্পী ছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাতে পারেন বোধ হয় কবি পিণ্ডার।

গ্রীক কবিতায় লিরিকের এই প্রস্তাবনা লাতিন সাহিত্যে নিয়ে এলেন বাতুল্ল, হোরেস প্রমুখ কবি। এদিকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বে অর্থাৎ অ্যাংলো-স্যাকশন পর্বেই যে গীতিকবিতার উদ্ভব দেখা গিয়েছিল সে কথা আমরা জানতে পেরেছি। সেই সময় যেমন 'বিউল্‌ফের' মতো মহাকাব্যিক রচনা ছিল, তেমনি ছিল 'এক্সাইটর বুক' যাতে মানবিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন সাতটি খণ্ডকবিতা ছিল। প্রত্যেকটি কবিতাতেই ব্যক্তিগত বিষাদের সুর ফুটেছে, অবশ্য তাতে কবিরা কেউই ভেঙে পড়েননি। যেমন 'ডিওর' কবিতার লেখক যা বলেছেন তার অনুবাদ--

> "গিয়াছে চলিয়া সে দুঃখ হায়,
> এ ব্যথাও যেন সেভাবে মিলায়।"

হাল ভেঙে দিশা হারানো এক নাবিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'দি সি-ফেয়ারার' কবিতায়, ঊনবিংশ শতকের কবি সুইনবার্ণের কবিতায় যেন সেই কণ্ঠস্বরই ভেসে আসে কালের সমুদ্র পেরিয়ে। মধ্যযুগেই ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং ফ্রান্সে লিরিক কবিতার সমুন্নতি দেখা যায়। কিছু পরে ইংরেজি সাহিত্যে লিরিক কবিতা আরো ঐশ্বর্যময় হয় সার ফিলিপ সিডনি, এডমণ্ড স্পেন্সার, স্যামুয়েল ডানিয়েল, জন ডান এবং যুগোত্তীর্ণ কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের হাতে।

অবশ্য ধর্মের উষ্ণতায় লালিত হলেও ভারতবর্ষের গীতিকবিতা একেবারে অনুল্লেখ্য ছিল না। বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস্‌ ভাষার সময় পেরিয়ে এসে লৌকিক সংস্কৃতের যুগে দেখি ধর্মীয়

সাহিত্যের প্রবণতাও কমে এসেছে; অন্তত লৌকিক সাহিত্যে বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন সাহিত্যের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রাজন্যবর্গ এবং রাজসভায় রচিত সাহিত্য কিছুটা মানবিক দেহসম্পর্কযুক্ত হতে বাধ্য। কালিদাসের দীর্ঘ কাব্যেও লিরিক ধর্মের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁর পত্রকাব্য 'মেঘদূতে'র দুটি পর্বেই। পরবর্তীকালে রচিত ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যদিও রাধাকৃষ্ণের ভাগবত উপাদান নিয়ে রচিত, তা সত্ত্বেও 'বিলাসকলা-কুতূহল' মানুষের পক্ষেও যে তা সমান রুচিকর, সে কথা কবি নিজেই বলেছেন।

গীতিকবিতা বলতে যদি সঠিকভাবে ওই বীণাজাতীয় যন্ত্রসংযোগে, বা আরো সাধারণভাবে, গান করবার জন্যই লেখা কবিতা বোঝায়, তবে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে তার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা যে অর্থে কবিতাকে গীতিকবিতা বা লিরিক হিসাবে ধরে নিয়েছি সেরকম কবিতা যে সংস্কৃতে অনেক লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ দুটি সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ—'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' (পরবর্তীকালে পরিবর্তিত নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ') এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতার সংখ্যা কিছু বেশি ছিল বটে এই দুটি সংকলনে—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-আশ্রিত কবিতা, তবে অন্য বিষয়ে লেখা লিরিকগন্ধী কবিতাও ছিল। যেমন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত একটি কবিতা—

"চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥"

মূলভাবের অনুবাদ হতে পারে এই রকম :

'খসে গেছে কাঠ, ধ্বসেছে দেয়াল,
জমে জড়ো হল এঘরের চাল,
আকীর্ণ শুধু জীর্ণ গৃহেতে
কেঁচো, আর কিছু ব্যাঙ।'

এই সঙ্গে একটু সম্পন্নতার, সুখের কবিতাও মনে করা যাক। কেদারভট্ট নামে এক কবি লিখেছেন—

"তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥"

সুন্দরী রমণীকে ভোজনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বঙ্গানুবাদের বোধ হয় প্রয়োজন নেই তা, থাকলে ভাবানুবাদ এরকম করা যায় :

"তরুণ সর্ষপশাক, নতুন চালের ভাত,
পিচ্ছিল দধি কিছু—শোন হে সুন্দরী,
সামান্য ব্যয়ে গ্রামে এসব ভোজন করি।'

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় উদ্ভবের মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাতেও কিছু খাঁটি গীতিকবিতার সন্ধান পাই। এই ভাষার প্রকীর্ণ কবিতার সংকলনও একটি আছে—'প্রাকৃত পৈঙ্গল', অবশ্য সরহের দোহাকাষেও কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা অধ্যাত্ম্য সাধনার রহস্যময় কবিতা। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' সংকলনের অনেক কবিতাই যে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ ও সাহিত্য গুণসম্পন্ন তাই নয়, তাদের একটু সীমিত অর্থে, সার্থক

গীতিকবিতাও বলা যায়। দু-একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বোঝা যাবে। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' এক কবি লিখেছেন বিরহের এই আশ্চর্য সুন্দর কটি পংক্তি—

"সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ॥"

অনুবাদ এই রকম :

'কান্ত এখন দূর প্রবাসে,
মন উচাটন, বর্ষা আসে।'

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

লক্ষ্য করবার মতো, কবি স্পষ্ট 'মন উচাটন' বলেননি, বলেছেন 'চেলু দুলাএ'—অর্থাৎ শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার মানে শাড়ির আঁচলের মতো মনও চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

এবার একটি গদ্যরসাত্মক কবিতা স্মরণ করা যাক। আধুনিক রসিক পাঠকের মুখে মুখে এটি প্রায় আধুনিক কালের কবিতাই হয়ে গিয়েছে—

"ওগ্গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।"

অর্থাৎ কিনা,

'ওগ্‌রানো ভাত কলার পাতে,
গাওয়া ঘি আর দুধের সাথে
মৌরলা মাছ, নালিতা শাক,
দিচ্ছে তো বউ, বর বসে খাক।'

বাংলা ভাষার উদ্ভবের একেবারে প্রথম পর্বে চর্যাপদের মধ্যে গীতিলক্ষণ থাকলেও গীতিকবিতার লক্ষণ তেমন ছিল না, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী এবং আরো পরে শাক্তপদাবলী দেব-দেবীকে অবলম্বন করেও সার্থক গীতিকবিতার আস্বাদ এনে দিয়েছে। আধুনিককালের গীতিকবিতা আমরা প্রথম পাই সম্ভবত বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখায়। অবশ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ড কবিতাতেও নিশ্চয়ই তার যোগ্য পূর্বাভাস ছিল এবং মধুসূদন দত্তের আক্ষেপমূলক চতুর্দশপদী কবিতায় গীতিকবিতার লক্ষণ আরো স্পষ্ট। আধুনিককালের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে গীতিকবিতার ভাণ্ডারকে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী,

কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মতো কবি এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি।

তবে সব কথার শেষে, অর্থাৎ গীতিকবিতার উৎস বিচার শেষ করেও এ কথা আমাদের বলতে হবে যে, শিষ্ট সাহিত্যের সমান্তর ধারায় বাংলা লোকসাহিত্যেও টুকরো কবিতা ও ছড়া প্রচলিত ছিল। আজ সেসবের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে গেছে—ছড়া ও ব্রত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরানো গ্রাম্যমহিলার মুখে, মেয়েলি ব্রতকথায়; আখ্যান কিছু বেঁচে আছে রূপকথায়, আর মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়। কিন্তু গীতিকবিতার উদ্ভবে এই সব লোক-সাহিত্যের মূল্যও নিতান্ত কম নয়।

ঙ. আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার তুলনা

প্রাচীন গীতিকবিতা বলতেই মনে পড়বে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, বৈষ্ণব পদাবলী। এই পদের উপজীব্য রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম—যখন রাধা কৃষ্ণের দর্শন বা স্পর্শসুখে আনন্দিতা তখন লেখা হয়েছে রূপোল্লাস, পূর্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি পর্যায়ের পদ; যখন কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাতর বা কুপিত তখন লেখা হয়েছে মান, মাথুর বা আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ। কিন্তু রাধা বা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, যে আর্তি বা আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে কবিদের লেখায় তাতে কবি যে নিরাসক্ত দর্শকমাত্র, এ কথা আমাদের কখনই মনে হয় না। আমাদের মনে হয় কবি নিজের জীবন দিয়ে এই আনন্দ ও বেদনা অনুভব না করলে, কেবল ধর্মীয় সংবেদন সৃষ্টির জন্য এমন পদ রচনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব-কবিতা'-য় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা এখন একবার মনে পড়বেই—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি ...
বিজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!"

এই অভিযোগ যে নিতান্ত অকল্পনীয় নয়, মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ স্মরণ করলেই তা বোঝা যায়:

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর 	মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- 	জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥"

বর্ষার সঙ্গে বিরহের যেন একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। রাধা আক্ষেপ করে বলছে, তার দুঃখের সীমা নেই, কারণ ভাদ্রমাসের এই ভরা বাদলেও কিনা তার গৃহ শূন্য। ঠিক কথা, সে যুগের অবহট্‌ঠ ভাষার কবিও বলেছেন, বর্ষা এলেই প্রবাসী কান্তের জন্য মন উচাটন করে ওঠে। এ যুগের কবিশ্রেষ্ঠও বলেন 'এমন দিনে তারে বলা যায় / এমন ঘনঘোর বরিষায়'। সেই বলবার মানুষটি ঘরে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের নায়িকারও মনে হয়—

"ঝরো ঝরো ঝরো ভাদরবাদর বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি।"

বিদ্যাপতির মনে হয়েছে আজকের যে দুর্যোগ, ঘনগর্জিত বিভীষিকা, তা যেন সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে—অবশ্যই এ পৃথিবী রাধার, যার একপ্রান্তে নিশ্চয়ই আছে কৃষ্ণ। তা জানে বলেই প্রবাসী কান্তের অদর্শনে মদনের নিষ্ঠুর শরাঘাতে তার হৃদয় বিক্ষত। হৃদয়ের সঠিক অবস্থা চিত্রিত করার জন্যই চার পাশে প্রমত্ত আনন্দের চিত্র কবি এঁকেছেন—ঘনঘন বজ্রপাতের শব্দের আনন্দে নেচে উঠেছে ময়ূর, ধারাপাতের আনন্দে গেয়ে উঠেছে দাদুরী, ডাকছে ডাহুকী। অথচ 'এহেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি/বাক্যহীন পুত্র শোকে'—আধুনিক কবির প্রায় এই পরিপ্রেক্ষিত রচনার তীব্রতায় বিদ্যাপতি বলেন, দুঃখে রাধার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরপর যে একটি অসাধারণ চিত্রকল্প আছে তা আধুনিককালের কবিরা ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিকতম কবি পর্যন্ত। বিদ্যাপতি দেখেছেন ঘোর যামিনীর তিমির অন্ধকারে, দুর্যোগের কালো মেঘের ওপর বিদ্যুতের পংক্তি অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। হতে পারে ঘন নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে চকিত আশার দীপ্তিকেই কবি উপমিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কী অব্যর্থ চিত্রকল্প! সেই ছবি মনে না থাকলে কি রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন আষাঢ়কে 'তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা'! আর একেবারে আজকের কবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ই কি পারেন প্রবীণ কবির দীপ্ত উঠে দাঁড়ানোকে এই অসাধারণ পংক্তি দিয়ে চিত্রিত করতে—

'অতর্কিতেই আকাশ হানলো
বিদ্যুৎময় আলোকচিত্র
নতুন একটা কবিতা পড়তে
উঠে দাঁড়ালেন অরুণ মিত্র।'

আসলে, মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ধর্মের উপলক্ষ পেরিয়ে রাধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তাই এ কবিতায় তাঁর অনুভূতি ও তার ব্যঞ্জনার মধ্যে রাধা কোনও ব্যবধান নয়, এক অলৌকিক সেতু। যে প্রকৃতিকে রাধা দেখেছে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে গিয়ে, কবির কাছে সেই কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতিই হয়ে গেছে কৃষ্ণ। আধুনিক কবির কাছে ধর্মের এই উপলক্ষ নেই, নেই তাঁর রাধার মতো কৃষ্ণরতির আকুলতা, তবু যখন আজকের কবি বলেন—

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে॥"

তখন একটি কৃষ্ণমূর্তি কি ঝলসে ওঠে না আমাদের মনের মধ্যে। এখানেই কবি বিদ্যাপতি একটি কবিতার উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে যান, সার্থক গীতিকবিতার স্বাদ সঞ্চারিত করতে পারেন তাঁর মাথুর পর্যায়ের ধর্মীয় কবিতায়।

এবার সময়ের বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে চলে আসি সাম্প্রতিক কালে স্বীকৃত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতায়। কবিতাটি এই রকম—

"নবীন কিশোর তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর ফুসফুস-ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
তোমার দুঃখ ক্রোধ শিহরণ
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা-কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলক
অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা-কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিলো, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।"

প্রমত্ত কৈশোর এবং নবীন যৌবনের সমস্ত মত্ততা—সব স্বাধীনতা, সব স্বপ্ন, সমস্ত ক্রোধ-দুঃখ-শিহরণ কবি দান করেছেন নবীন কিশোরকে। এক 'নওল কিশোরকে' সব কিছু দান করার পরও তাকে বুঝতে পারেনি বলে একদিন বিলাপ করেছে বিদ্যাপতির রাধা—'কৈছে গোঙায়াবি/হরি বিনে দিনরাতিয়া,' আর কালের অপর সীমায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আকুল হয়ে পড়েছেন আর এক নবীন কিশোরকে সব কিছু দেবেন বলে। নিঃস্বার্থ দান, চিরকালের মত—'একখানা নদী, দু-তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী' পর্যন্ত। রসিক পাঠক বোঝেন এই নবীন কিশোর কোনও বিশেষ কিশোর নয়, ইংরেজি কবিতায় যেমন আমরা পড়ি 'every man', 'every

child', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'চির-যুবা'—এরা তেমনি চির-কিশোর। এক কথায় বলতে গেলে 'নবীন কিশোর' একটা ধারণার মূর্ত রূপ, চির নবীনতার, চির কৈশোরের।

এবার পাশাপাশি কবিতাদুটি নিয়ে বিচার করলেই প্রাচীন গীতিকবিতা এবং আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য আমরা বুঝতে পারবো। দুটি কবিতার মধ্যে একটা বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদ 'এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর' এবং অন্যটি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নবীন কিশোর তোমাকে দিলাম ভুবন-ডাঙার মেঘলা আকাশ'। তবে তুলনামূলক বিচারের জন্য গীতিকবিতার যে চারটি লক্ষণের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম সেই লক্ষণগুলি পুনর্বার স্মরণ করবো, কারণ তার আলোকেই এই বিচার আমাদের করতে হবে। সেগুলি ছিল এই রকম—

এক॥ ব্যক্তিগত লক্ষণ :

সাধারণত কোনো তত্ত্ব বা দর্শন প্রকাশ না করে এই কবিতা কবির ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতিই প্রকাশ করবে।

দুই॥ আত্মময়তা :

ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতার জন্যই এমন এক আত্মময়তা ফুটে ওঠে যা সংবেদনশীল পাঠকের মনকে স্পর্শ করবেই।

তিন॥ শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন :

যতোই ব্যক্তিগত আকুতি হোক এবং তাতে আত্মময়তা যতোই তীব্র হোক, প্রকৃত গীতিকবিতার মধ্যে এক শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকবেই।

চার॥ ব্যঞ্জনাময় সংহতি :

গীতিকবিতার ভাষা ব্যঞ্জনাময় হবেই কিন্তু তার সংযমও হবে লক্ষণীয়। অনুভূতির এই সংহত প্রকাশ ভাবকে আরো গাঢ় করে তোলে।

এবার তুলনামূলক বিচারে অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে।

এক॥ বৈষ্ণব পদটি যতোই ব্যক্তিগত আবেগে মথিত বলে মনে হোক, আসলে এ আবেগ যে কবির নয়, রাধার, সে কথা কবি কোথাও গোপন করেন নি। বরং পদের শেষে ভণিতায় রাধার বিরহ-জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেন—'কৈছে গোঙায়বি/হরি বিনে দিন রাতিয়া॥' কাজেই এই আকুতি যে ব্যক্তিগত নয় সে কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আসলে কোনো ধর্মীয় কবিতাই কবির ব্যক্তিগত আকুলতা হতে পারে না, বৈষ্ণব পদাবলীও তা নয়। বৈষ্ণব কবিতা একটি ধর্মসম্প্রদায়ের কবিতা, একটি গোষ্ঠীর কবিতা। গোষ্ঠী ভাবনা থেকেই যে এই কবিতা লেখা হয় তাই শুধু নয়, এর পর্যায়গুলি পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট। যেমন এটি মাথুর পর্যায়ের পদ—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর রাধার যে আকুলতা, তাই এখানে প্রকাশিত। এই আকুলতা বিদ্যাপতি যেমন প্রকাশ করেছেন আরো অনেক কবিই তা করেছেন।

তবু এতো কথা বলার পরও মনে রাখতে হবে, বিদ্যাপতি কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবির মতো গোষ্ঠীময়তায় ভুগতেন না, ব্যক্তিগতভাবে রাধার অনুভূতি তিনি কখনো-সখনো প্রকাশ করেছেন। তাই বয়ঃসন্ধির পদে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যেমন আমরা দেখেছি তেমনি এই পদেও দেখি, প্রেমের সঙ্গে তিনি কামের কথাও বলেছেন—'কাম দারুণ/সঘনে খর শর হন্তিয়া॥'

তুলনামূলকভাবে নবীন কিশোরের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কবির বয়স বেড়ে গেছে, বেড়ে যায়—তাকে আটকানো যায় না। একদিন

অল্প বয়সে যে চূড়ান্ত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করেছেন, তুচ্ছ জেনেও যে আনন্দ পেয়েছেন আজ তা পাবার ক্ষমতা অনেক কমে আসছে, এই কবির দুঃখ। পুরনো এবং প্রিয় পোশাক শরীরে যে আজ আঁট হয়ে বসছে তা কবি টের পান। তাই গভীর বেদনাতেই সেই সোনালি কৈশোর ত্যাগ করার কথা বলেছেন, নবীন কিশোরকে তা দান করার কথা বলেছেন। সুতরাং এসব তো কবির ব্যক্তিগত কথা বটেই।

দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব কবিতায় রাধার অহং প্রকাশিত হয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই। কবির আত্মময়তা এখানে আশা করাই অন্যায়। অথচ একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে বর্ষার তুমুল বর্ষণের প্রেক্ষিতে রাধার বিরহ-আকুলতার যে চিত্র কবি বর্ণনা করেছেন, আত্মময় অনুভূতি না থাকলে তা করা যায় না। বৈষ্ণব কবির লেখায় রাধা যে আক্ষেপ করেছেন, আধুনিক কালের কবিগুরুর আক্ষেপও তার প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে যখন শুনি—

'উতল ধারা বাদল ঝরে
সকল বেলা একা ঘরে।'

সুতরাং রাধা এবং কবি একাত্ম না হলে এ অনুভূতি আসতেই পারেনা, এবং সেই কারণে এ কবিতায় পরোক্ষে যে আত্মময়তা ফুটে উঠেছে তাকে অস্বীকার করলে কবিতাটির ওপর অবিচার করা হবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় আত্মময়তাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। কবি না বললে আমরা জানতেই পারতাম না কবির সেই অভিমানী আত্মহননের কথা, 'অহংকারের দ্রুত পদপাতের' কথা যা একদিন সমস্ত শহরকে তোলপাড় করেছে। আমরা জানতেই পারতাম না কবির অধিকারে ছিল একশ খানা নদী, দু-তিনটে দেশ, এমনকি কবির নিজস্ব কয়েকটি নারী। এরকম একটি আত্মময় কবিতা একজন সমর্থ কবিও জীবনে বেশি লিখতে পারেন না, চেষ্টা করলেও না।

তৃতীয়ত, 'এ সখি হমারি' কবিতাটির আবেদন যে সর্বজনীন এ কথা বলে বোঝাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এমন একটি অনুভূতি-গাঢ় কবিতা কেবল বৈষ্ণব রসজ্ঞই বুঝতে পারবেন এমন দাবির কথা অসংগত। বৈষ্ণব নন, অথবা ধর্ম তাঁর কাছে সাহিত্যরসের আস্বাদনের কোন শর্তই নয়, এমন একটি আধুনিক পাঠকও এই পদের আস্বাদন সহজেই করতে পারেন। করতে পারেন যে, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এতদিন পরেও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে কবিতাটির তীব্র আকর্ষণ। কালের বিচারে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে এর আবেদন কালোত্তীর্ণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ।

এর আরো একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের মুখে এই পংক্তি বার বার ব্যবহার করেছেন। এর আবেদন যদি একটি গণ্ডিতে বা কালে আবদ্ধ থাকতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নায়ক এই উক্তি যে বার বার স্মরণ করতো না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আধুনিক কবিতাটি প্রসঙ্গে বলা যায় গীতকবিতায় যে শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকে তাও নিশ্চয়ই এই কবিতায় আছে। আমরা যেসব উত্তরকৈশোর পাঠক এই কবিতার দর্পণে নিজেদের মুখ দেখি, এ কবিতা তো তাদের সকলেরই। একদিন আমাদের সকলেরই অহংকারের পকেট অনেক ভারি ছিল। একটি নারী পাশে থাকলে, কবিতার জন্য দগ্ধ হতে পারলে, রাতের মাঠে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে প্রায় অকারণেই নিজেদের আমরা সম্রাট ভাবতে পারতাম।

তার দশগুণ বেশি পেয়েও আজ যখন এই প্রার্থিত পুলক অনুভব করতে পারি না, স্পষ্ট বুঝতে পারি সেই পুরনো পোশাক শরীরে আর মানাচ্ছে না, ছাড়তেই হবে এ পোশাক। এই সোনালি কৈশোরকে ফেলে আসার দুঃখ এতোই সর্বজনীন, যে কবিতাটি ব্যক্তিগত হয়েও সহানুভব পাঠে হয়ে ওঠে আমাদের সকলের।

চতুর্থত, সংহত প্রকাশভঙ্গির জন্যই বিদ্যাপতি খ্যাতিমান ছিলেন। তা ছাড়া বৈষ্ণব পদের অতি স্বল্প পরিসরে বক্তব্য বিশদ করা সম্ভবও ছিল না। অনুভূতির যে রসঘন প্রকাশ এখানে ঘটেছে তা এখনও আমাদের আদর্শ স্বরূপ। পক্ষান্তরে যে যন্ত্রণা এবং তীব্র অনুভূতি আধুনিক কবিতাটির মধ্যে নিহিত আছে তা অতি সংহত প্রকাশভঙ্গি খুঁজে নিতে পেরেছে বলেই তাকে একটি ছোট গীতিকবিতার সংযমী পরিসরের মধ্যে আমরা আবদ্ধ দেখেছি। উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটাতে চাইলে এই বিষয় নিয়ে কবি অনায়াসে একটা কৈশোর-সংহার কাব্য লিখে ফেলতে পারতেন।

চ. ভক্তিমূলক কবিতা

গীতিকবিতার আলোচনায় যদিও আমরা দেখেছি মধ্যযুগে ধর্মকে অবলম্বন করেও তা লেখা সম্ভব, তবু ভক্তিমূলক কবিতা নামে মন্ময় কবিতার একটি স্বতন্ত্র বিভাগের পক্ষপাতী সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ। তিনি এর নামকরণ করতে চেয়েছিলেন ভক্তিমূলক গীতিকবিতা। এই বিষয়ে তাঁর যা অভিমত তা হল—"শঙ্করাচার্যের স্তোত্রমালা, অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রামপ্রসাদের পদাবলী, গোবিন্দদাসের 'বন্দনাগীতি', Cardinal Newman-এর Lead Me Kindly Light, Browning-এর Saul, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কবিতানিচয়, রজনী সেনের (রজনীকান্ত সেন) 'নির্ভর' এই শ্রেণীর কবিতা।"

আমরা মনে করি ধর্মই যখন এদের উপজীব্য এবং ধর্মের মূল্যেই যখন রচনার মূল্য, তখন তাদের কবিতাই বলা যায় না। কিন্তু বিষয়কে তুচ্ছ করে যখন তা সত্যিই কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন আর ভক্তিমূলক সংজ্ঞায় অভিহিত না করাটাই সংগত। যেমন চর্যাপদের কোনো কোনো পদ কবিতা হয়ে উঠেছে, লালন ফকিরের গান ধর্মের পিঞ্জর ভেঙে উদার মানবলোকে প্রবেশ করেছে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুভূতির আলোয় এমন অসামান্য কবিতা হয়ে উঠেছে যে ধর্ম তার উপজীব্য কিনা ভাবারই অবকাশ থাকে না আমাদের। অন্যদিক থেকে বিচার করলে শঙ্করাচার্যের স্তোত্র এবং রবীন্দ্রনাথের গান, অথবা Newman এবং Browning-এর কবিতা একই বিভাগে বিন্যস্ত করাটা খুব বেশি যুক্তিসংগত বলে আমাদের মনে হয় না।

ছ. প্রেমমূলক কবিতা

গীতিকবিতার এই বিভাগটিও করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ। এই বিষয়ের পথিকৃৎ সমালোচক হিসাবে আমরা বিভাগটির উল্লেখ করলাম। তিনি লিখেছেন—"প্রেমমূলক গীতিকবিতায় প্রেমের আশা-নৈরাশ্য, বেদনা-মধুরতা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কবি আত্মগত

ভাব-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ দান করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Burns-এর My love is like a red, red rose, Donne-এর The Ecstasy, Browning-এর The Last Ride Together, One Word More, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে', দেবেন সেনের 'লাজ ভাঙান', গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি', এবং জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' উল্লেখযোগ্য।"

গীতিকবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে নতুন করে প্রেমমূলক কবিতার পৃথক বিভাজন স্বীকার করার কোনও অর্থ হয় বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ খাঁটি গীতিকবিতার পঞ্চাশ ভাগই তো প্রেমের কবিতা। তাছাড়াও একই বিভাগে গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমজ্জাসহ' এবং জীবনানন্দ দাশের 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' একই পর্যায়ভুক্ত মনে করে নেওয়াও শক্ত।

জ. প্রকৃতিমূলক কবিতা

প্রকৃতিমূলক কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরই অবদান। এর উত্তরাধিকার আমাদের ছিল না একথা বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতির উপাসনা-স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যেও অবশ্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রেক্ষাপট হিসাবে। নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থা পরিস্ফুট করবার জন্য প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করাই এর উদ্দেশ্য। আলংকারিক ভাষায় বলতে গেলে প্রকৃতিকে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে উদ্দীপন বিভাব হিসাবে, আলম্বন বিভাব হিসাবে নয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এই ব্যাপারটি দেখা যায়। প্রকৃতি সেখানে আসেনি এমন নয়, বরং মাঝে মাঝেই তাকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে ওই উদ্দীপন বিভাব হিসাবে, প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করার উৎসাহ কবিরা দেখাননি। যেমন ধরা যাক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ, সেখানে এরকম পংক্তি আছে—

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।"

এখনকার বাংলায় হতে পারে:

শবরীর বাসভূমি পর্বত উচ্চ,
গ্রীবায় গুঞ্জা-মালা, শিরে কেকা-পুচ্ছ।

সেখানে এমন পংক্তিও আছে—'নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী' (অর্থাৎ, নানা তরু মেলে শাখা গগন-স্পর্শী), কিন্তু প্রকৃতি সেখানে ধর্মতত্ত্বের রূপক। অনেক পরে অষ্টাদশ শতকের শাক্ত পদাবলীতেও আমরা ঠিক এই একই ভাবে রূপকার্থে প্রকৃতিকে পাই যখন কবি বলেন, "শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।"

আদি-মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রকৃতি-চিত্রণের অভাব নেই, একটি উদাহরণ—

"আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী।"

সহজ বাংলায় :

বর্ষা কাটবে গেলে আশ্বিন মাস,
মেঘ উড়ে যাবে, ফুটে উঠবে যে কাশ।

মধ্যযুগের ঐশ্বর্য বৈষ্ণবপদাবলী প্রকৃতিচিত্রণের ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায় এবং মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেও প্রকৃতির অনেক চিত্র আমরা পাই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উদ্দীপন বিভাবের ওপর আর তা উঠতে পারেনি। প্রকৃতির মহিমা পরিস্ফুট করবার জন্যই প্রকৃতিকে অবলম্বন করবার মতো ঘটনা ঘটেনি প্রাগাধুনিক সাহিত্যে, অবশ্য ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকতে পারে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

মধ্যযুগে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব মূল্যে গ্রহণ করার একটা অস্পষ্ট আভাস যদি থাকে, তবে তা আছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আদি কবি হিসাবে মেনে নিতে আপত্তি না থাকে তবে তাঁর কবিতায় এ আভাস আরো স্পষ্ট। তবে প্রকৃতিমূলক কবিতা বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত যে মধুসূদন দত্তের হাতে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-র অন্তর্গত 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালে তারা', 'নিশা', 'উদ্যানে পুষ্করিণী' প্রভৃতি কবিতা এর উদাহরণ। তবে প্রকৃতিকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানবের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

"হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন—
কেন হেন ওঠে মনে চিন্তার লহরী!"

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে প্রকৃতি প্রাণ পেয়েছে এবং বিবিধ বৈচিত্র্যে তা দীপ্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

ঝ. প্রার্থনাসংগীত

ইংরেজিতে যাকে বলে Hymn, বাংলায় তাকে আমরা প্রার্থনাসংগীত বা স্তবগাথা নাম দিতে পারি। মন্ময় কবিতার মধ্যে 'হিম্' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তার আলোচনা করা দরকার।

'হিম্' বলতে বোঝায় দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত স্তবগাথা, সাধারণ ভাবে গাওয়ার জন্যই যা লেখা হতো, তবে আবৃত্তির জন্য রচিত হলেও মানবিক অনুভূতি এই সব গানে একেবারে তাৎপর্যহীন নয়। পুরনো প্রার্থনাসংগীতে কবিরা ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাঁদের গানে মর্ত্যধামের পার্থিব জীবনও তুচ্ছ হয়ে যায়নি।

সবচেয়ে প্রাচীন খণ্ডকবিতা হিসাবেই স্তবগাথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালেই রচিত হয়েছে বৈদিক স্তবগাথা, অথচ আর্য ঋষিদের কবিকল্পনার ঐশ্বর্য আমাদের বিস্মিত করে। প্রকৃতিকে বন্দনা করবার জন্য তাঁরা যে স্তোত্র রচনা করেছেন তাতে

প্রকৃতিকে তাঁরা মূর্ত করে তুলেছেন এবং এই পদ্ধতির জন্যই তাদের প্রকাশ অনেক মানবিক হয়ে পড়েছে। সেই বেদগানের প্রার্থনাসংগীত থেকে আজকের শ্যামাসংগীতের প্রার্থনা 'ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে' পর্যন্ত আপাত-বিচ্ছিন্ন অথচ এক সুনিশ্চিত সাদৃশ্য সূত্র অবলম্বন করে এক অভিন্ন ধারার মতো প্রবাহিত হয়ে আসছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মিশেছে বহু বিভিন্ন ধারা—সুরদাসের ভজন, কবীরের ভজন, তুলসীদাস-মীরাবাই-এর ভজন, রামদাস-তুকারামের ভজন। অন্য দিকে বৈষ্ণব কবিদের প্রার্থনা, শাক্ত কবিদের আকুতি। সমস্ত ধারা মিলে একটি প্রধান আধ্যাত্মিক ধারাকেই এমন পরিপুষ্ট করেছে যে আমরা একথা আজ জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই বাউল গানে কোন্ বিশেষ ধর্মের মরমীয়া সাধনের কথা বলা হয়েছে, সুফী সাধনতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সাধনতত্ত্ব কিনা এবং ভাটিয়ালি গানে যে সুজন বন্ধুকে সম্বোধন করা হয় তিনি কোন্ ধর্মমতের দেবতা! নাকি তিনি একান্তই প্রাণের দোসর, রবীন্দ্রনাথের 'পান্থজনসখা' বা 'পরাণসখা বন্ধু'-র মতোই জীবনের নিয়ন্তা এক পরম বান্ধব।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে গ্রীক 'হিম্'-ই সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু তার বেশির ভাগ আজ বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত। যা আমরা স্মরণ রেখেছি তার মধ্যে পড়তে পারে বেশ কিছু স্টোয়িক স্তোত্র। ইহুদীদের প্রার্থনাসংগীতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের চেয়ে নিজেদের লাঞ্ছনা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসই বেশি দেখা যায়। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' বহু গানেই তার প্রমাণ আছে। গ্রীক এবং হিব্রু ভাষার প্রার্থনা সংগীতের অদ্ভুত এক সমন্বয় দেখা যায় ইংরেজি ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান 'হিমে'। বিভিন্ন গীর্জায় যেসব প্রার্থনা সংগীত গাওয়া হতো বা হয় তার স্বরলিপি-সমৃদ্ধ এক সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। প্রাচ্য সাহিত্যের ওমর খৈয়াম, হাফিজ প্রভৃতির মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনেক প্রার্থনাসংগীত লেখা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেও কুপার, হেবার, পামার-এর মতো ইংরেজ ও আমেরিকান কবি প্রার্থনাসংগীত লিখেছেন।

অবশ্য ঊনবিংশ শতকেই বা প্রান্তরেখা টানি কেন, ধর্মসংগীত হওয়া সত্ত্বেও স্তোত্র গাথার ধারা এখনও অব্যাহত বললেই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হবে। কারণ তা নাহলে ফ্রান্সিস টমসন বা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের গানগুলিকে আমরা আর কোন্ শ্রেণীতেই বা বিন্যস্ত করতে পারি।

ঞ. ওড বা স্তুতিকবিতা

গীতিকবিতার অন্যতম প্রাচীন শ্রেণী বলা যায় ওড (ode)-কে। স্বীকৃত পরিভাষার অভাবে একে স্তুতি কবিতা বলা যেতে পারে, তবে 'ওড' শব্দটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিসংগত হবে বোধহয়।

প্রাচীন গ্রীসে ওড ছিল প্রধানত এক ধরনের সম্মেলক গান বা কোরাস, তবে একক কণ্ঠের ওডও তখন একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। পুরনো ওডে পর পর তিনটি স্তবক থাকতো। সম্মেলক গায়কগণ প্রথমে মঞ্চের বাঁদিকে ঘুরে প্রথম স্তবক গাইতেন, একে বলা হতো স্ট্রোফি (Strophe); তারপর দ্বিতীয় স্তবকটি গাইতেন ডান দিকে ঘুরে, একে বলা হতো অ্যান্টিস্ট্রোফি

(Antistrophe); এরপর তৃতীয় স্তবকটি গাইতেন সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, একে বলা হতো ইপোড (Epode)। কবিতা দীর্ঘ হলে স্তবকের সংখ্যা বেড়ে যেতো, কিন্তু পুরনো ওডে তিনটি বিভাগ সর্বদাই মেনে চলা হতো। প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষায় যেসব কবি সার্থক ওড রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যাফো, অ্যানাক্রেওন, পিণ্ডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এইসব কবিদের রচিত ওডের বিষয় ছিল এতোই ভিন্ন যে গীতিকবিতার এই বিভাগটিকেই সমালোচক হাডসন খুব বিস্তৃত ও অস্পষ্ট মনে করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন যে এর ব্যাপ্তি ছিল "from the drinking songs of Anacreon to the love songs of Sappho, and from these again to the lofty 'Occasional' poems of Pindar."

তা সত্ত্বেও অবশ্য ওড-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। হাডসন এর দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন 'নিউ ইংলিশ ডিকশনারি' থেকে, প্রথম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি—"a rimed (rarely unrimed) lyric, often in the form of an address; generally dignified or exalted in subject, feeling and style."

নিউ ইংলিশ ডিকশনারির এই সংজ্ঞা অনুসারে তাহলে ওড প্রায়শই ছন্দোবদ্ধ এক ধরনের গীতিকবিতা যা কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত। বিষয়, অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গিতে একটা মহৎ কিছু বা উচ্ছ্বাস বর্তমান থাকে এরকম কবিতায়। হাডসন দ্বিতীয় সংজ্ঞা বেছেছেন English Odes গ্রন্থের ভূমিকায় Gosse যে মন্তব্য করেছেন সেখান থেকে। Gosse-ও বলেছেন প্রায় এই একই কথা, এই কবিতা হল "any strain of enthusiastic or exalted lyrical verse, directed to a fixed purpose, and dealing progressively with a dignified theme.

এগুলির সঙ্গে সমালোচকগণ যোগ করেছেন আরো দুটি বৈশিষ্ট্য—প্রথমত, চিন্তাধারার যুক্তিসংগত বিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত এর দৈর্ঘ্য, যা নাকি পঞ্চাশ থেকে দুশো পংক্তির মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ওড কবিতায় প্রচুর বিবর্তন হলেও ধারাটি এখনও সজীব। প্রাচীন গ্রীক রীতির তিনটি বিভাগ এখনও মানা হয়, তবে জনসন তাদের নতুন নামকরণ করেছেন যথাক্রমে turn, counter-turn এবং stand। প্রাচীন গ্রীক কবিদের মধ্যে ওড রচনায় সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন পিণ্ডার। তাঁর মতো কঠিন নিয়মনিষ্ঠা দেখাতে না পারলেও মোটামুটি পিণ্ডারীয় রীতিতেই রোমান কবি হোরেস ওড রচনা করেছেন। তাঁর ওডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'টু সিনেসাস', 'কান্ট্রিলাইফ' প্রভৃতি। ইংরেজি কবিতায় কবি মিলটনের সময় থেকেই এই জাতীয় কবিতা লেখা হয়ে আসছে। বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যে রচিত ওডের মারফতই আমরা এই ধরনের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, নতুবা বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই রকম স্তুতি কবিতা লেখার রেওয়াজ ছিল না। অতি সমৃদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যে যাঁরা মোটামুটি পিণ্ডারীয় রীতি মেনে কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরনো কবি বলতে নাম করতে হয় জন মিলটন এবং আব্রাহাম কলি-র। পরবর্তীকালে এই ধরনের ওড রচনা করেছেন গ্রে এবং কলিন্স। গ্রে-র 'ওড অন এ ডিসট্যান্ট প্রসপেক্ট অন ইটন কলেজ' ও কলিন্স-এর 'ওড টু ইভ্‌নিং' 'দি প্যাশন্‌স্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই ধারা অনুসরণ করে যাঁরা নিয়ম মেনে ওড রচনা করেছিলেন তাঁদের কিছু বিখ্যাত কবিতা—স্পেন্সরের 'এপিথালামিয়ন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড'; কীট্‌সের 'টু এ নাইটিঙ্গেল', 'অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন' প্রভৃতি। যাঁরা কঠিন নিয়ম না মেনে কিছু স্বাধীনতা

নিয়েছিলেন তাঁদের কিছু বিখ্যাত কবিতা ড্রাইডেনের 'আলেকজাণ্ডারস্ ফীস্ট'; ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থের 'ওড অন দি ইন্টিমেশন্‌স্ অব ইম্‌মরট্যালিটি'; টেনিসনের 'ওড অন দা ডেথ অব দি ডিউক অব ওয়েলিংটন' প্রভৃতি।

দেবদেবীর স্তুতি বাংলা কবিতায় মধ্যযুগে প্রচুরই লেখা হয়েছে, কিন্তু তাদের ঠিক ওড বলা যায় না, ওড আধুনিক কালের সৃষ্টি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশ্যধর্মী কবিতাকে কেউ কেউ ওড মনে করেন কিন্তু এগুলিকে উন্নত ভাবের রচনা কোনক্রমেই বলা চলে না। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কিছু ওডের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন 'কপোতাক্ষ নদ', 'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি', 'শ্যামা পক্ষী' প্রভৃতি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা খণ্ড কবিতাতে ওডধর্মী রচনা কিছু আছে, বিশেষত ইংরেজি কবিতার অনুবাদে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গ সুন্দরী' বা 'নিসর্গ সন্দর্শন' দীর্ঘ রচনা হলেও তাতে ওডের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওড লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছোট কবিতার মধ্যে তাঁর 'মহুয়া' কাব্যের 'নাম্নী' শীর্ষক কবিতাগুলিকে এই ধরনের উল্লেখযোগ্য কবিতা বলা যায়। দীর্ঘ কবিতার মধ্যে 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'ক্যামেলিয়া', 'পৃথিবী' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়। বাংলায় পরবর্তীকালের অন্যান্য ওডের মধ্যে উল্লেখ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নবপন্থা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধপূর্ণিমা', মোহিতলাল মজুমদারের 'পান্থ', জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নীলিমাকে', বিনয় মজুমদারের 'আমার ঈশ্বরীকে' প্রভৃতি।

● একটি স্তুতি কবিতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা' কবিতাটি সাধারণভাবে স্তুতি-কবিতা হিসাবেই গৃহীত হয়ে থাকে। এই কবিতায় স্তবকের সংখ্যা দশ। প্রতেকটি স্তবকেই বুদ্ধদেবের স্তুতিই কবির লক্ষ্য। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মানুষের তিনটি অনিবার্য দুঃখে বিচলিত হয়ে এর কারণ ও এর হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় সন্ধান করার জন্য তপস্যায় বসেছিলেন—তিনটি অনিবার্য দুঃখভোগ ছিল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। বোধিবৃক্ষের তলে নির্বাণলাভ করে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম অহিংসা ও কল্যাণের প্রতীক হিসাবে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বুদ্ধদেবকে তাই অহিংসা, ক্ষমা ও পৃথিবীর দুঃখবোধকারী মহাশক্তির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন কবি।

প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন, পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা এবং দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, এই সময় মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রের পুনর্জাগরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তবকেই কবির মনে পড়েছে একটি আহত মরাল নিয়ে ভাই দেবদত্তের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সংঘাতের কথা। তাকে প্রতীকী অর্থে ধরে কবি বলেছেন সেই নিরীহ মরালের স্রোতেই যেন আজকের সংসার ভাসছে। পৃথিবী তাই পুনরায় বোধিসত্ত্বেরই শরণ কামনা করছে—

'নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,

হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়।"

তৃতীয় স্তবকে কবি বলেছেন প্রায় প্রথম স্তবকের মতো কথাই—বহুদিন আগে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হলেও তাঁর অমর বাণী এখনও মূল্যবান হয়ে রয়েছে। হিংসা নাগিনীকে শেষ করার জন্যে এখনও তা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। সমস্ত পৃথিবী জোড় হাত করে এখনও যে সেই মহামানবের আশ্রয় প্রার্থনা করছে, এটাই চতুর্থ স্তবকের মূল কথা। পরবর্তী চারটি স্তবকে এই সময়ে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বা তাঁর বাণীর পুনর্জাগরণ কত প্রয়োজনীয় সে কথাই কবি বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। রাজ-সন্ন্যাসীর সেই বিমল হাসি আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হোক, অক্রোধ দিয়ে যেন আমরা ক্রোধকে জয় করতে পারি, এটাই তিনি চেয়েছেন। ভারতবর্ষ এখন সেই অবিস্মরণীয় মহামানবকে নতুন করে আবিষ্কার করতে যে প্রস্তুত, এটাই কবির কথা। শেষ দুই স্তবকে বিশুদ্ধ স্তুতি করেছেন কবি বুদ্ধদেবের। তাঁকে বলেছেন মুনিদের শিরোমণি, 'করুণা-সিন্ধু' এবং 'ভুবন-ইন্দু'। কবি কল্পনা করেছেন, আরো মানুষের প্রতি করুণায় তাঁর পদ্মনয়ন অশ্রুসিক্ত—

'বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়!'

স্তুতি-কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করেছি, সেই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এবার কবিতাটির বিচার করতে পারি। এর যে প্রথম সংজ্ঞাটি আমরা উল্লেখ করেছি সেটি স্মরণ রেখে বলি একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা, এবং অবশ্যই গীতিকবিতা। কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত তো বটেই, এবং যাঁকে উদ্দেশ্য করে রচিত, সমস্ত পৃথিবী তাঁকে চেনে। বিষয়, অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গিতে অবশ্যই মহৎ প্রেরণা আছে, উচ্ছ্বাস তো আছেই, কখনো তার মাত্রা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও আমাদের মনে হতে পারে। দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মহৎ উদ্দেশ্যের মহৎ উপস্থাপনা—সেটিও এই কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি এর আয়তন সংক্রান্ত। বলা হয়েছে এর আয়তন হবে পঞ্চাশ থেকে দুশো পংক্তির মধ্যে। 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা' কবিতাটির আয়তন চল্লিশ পংক্তির মতো—নিয়মিত চার পংক্তির স্তবক এবং এরকম স্তবক আছে মোট দশটি। কবিতার পক্ষে এই আয়তন একেবারে সঠিক হয়েছে বলেই আমরা মনে করি, কারণ বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর বোধিলাভের বৃত্তান্ত বা জাতক কাহিনীর প্রতি তিনি কোনো উৎসাহ দেখাননি—মহামানবের উপদেশ ও স্মৃতি স্মরণ করেছেন মাত্র এবং আজকের হিংসামগ্ন পৃথিবীতে তাঁর বাণী মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বিষয়টি আরো বেশি দীর্ঘায়ত হলে পুনরুক্তির সংখ্যা বাড়তো। তা না করে এটি ভাবগম্ভীর একটি আদর্শ স্তুতি কবিতায় পরিণত করেছেন।

ট. এলিজি বা শোকগীতি

এলিজি বা শোকগীতি বলতে আমরা এখন বন্ধু, আত্মীয় বা অতি নিকটজনের বিয়োগব্যথাকে উপলক্ষ করে কবির ব্যক্তিগত শোকভাবনার প্রকাশকে বুঝে থাকি, কিন্তু বহু প্রাচীন এই

গীতিকবিতার ধারা সম্বন্ধে 'প্রাইমার অব গ্রীক লিটারেচর' গ্রন্থে সমালোচক জেব বলেছেন, এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। যুদ্ধবিগ্রহ, পরাধীনতার যন্ত্রণা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আদর্শ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কবির ধারণা, মৃতের প্রতি শোকজ্ঞাপন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এলিজি লেখা হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত শোক এবং মৃতের উদ্দেশে রচিত কবিতাকে 'মোনোডি' নামে আখ্যাত করা উচিত বলে সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ মনে করেন। আবার সমালোচক হাডসন জানিয়েছেন, গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে একটি বিশেষ ছন্দরূপকেই 'এলিজি' বলা হতো। প্রথমে ছমাত্রা ও পরে পাঁচ মাত্রায় সজ্জিত এই ছন্দরূপের আদর্শ যে কবি লংফেলো-র একটি কবিতায় ধরা পড়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

অবশ্য উদ্ভবকালে এলিজির বিষয়বৈচিত্র্য কতো ছিল এবং কী সুনির্দিষ্ট ছন্দরূপ মেনে এই ধরনের কবিতা রচিত হতো তা জেনে আমাদের লাভ নেই। এলিজি শব্দটি এসেছে গ্রীক Elegie শব্দ থেকে, যার অর্থ বেদনার আকুলতা এবং বর্তমানে শোকপ্রকাশক কবিতা হিসাবেই আমরা তাকে জানি। সুতরাং প্রচলিত অর্থকেই এক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে। ইংরেজিতে শোকজ্ঞাপক ছোট এক ধরনের কবিতাকে বলে ডার্জ, তা সত্ত্বেও শোকের কবিতাকে সাধারণভাবে আমরা এলিজিই ধরে নিতে পারি।

বরং এলিজির কয়েকটি স্পষ্ট বিভাগের কথা আমাদের স্মরণে রাখা ভাল। এক ধরনের এলিজিকে বলা হয় Critical Elegy, এতে কবি-সাহিত্যিকদের স্মরণে তাঁর রচনাকর্মের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হয়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরনের এলিজির মধ্যে আর্নল্ডের 'হাইনেজ গ্রেভ', ওয়াটসনের 'ওয়র্ডসওয়র্থস গ্রেভ' উল্লেখযোগ্য। এলিজির অন্য এক বিশেষ বিভাগকে বলা হয় প্যাসটোরাল এলিজি বা রাখালিয়া শোকগীতি। এর বৈশিষ্ট্য হল, কবি তাঁর ব্যক্তিগত শোককে এক নিঃসঙ্গ রাখালের বেদনার সঙ্গে অভিন্ন করে তোলেন এবং রাখাল যখন তার শোকসন্তপ্ত চিত্তের পরিচয় ফুটিয়ে তোলে, তাতেই প্রকাশিত হয় কবির বেদনা। এই ধরনের এলিজির উদ্ভাবক গ্রীক কবি বিয়ন, তিনি 'ল্যামেন্ট ফর অ্যাডোনিস' কবিতায় এই রীতির প্রথম প্রয়োগ করেন। লক্ষ করবার মতো, কবি বিয়নের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য কবি মস্কাস্ লেখেন এই একই রীতিতে 'ল্যামেন্ট ফর বিয়ন'।

এলিজি কবিতার প্রাচীন গ্রীক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সিসনেরমাস্, অ্যানাক্রেয়ন ও একেসব্রোটাস। ল্যাটিন ভাষার কবিদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে কবি টিবিউলাস, ওভিড, ট্যাসো প্রভৃতির। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজি রচয়িতাদের মধ্যে আছেন মিলটন (লিসিডাস), স্পেন্সার (অ্যাস্ট্রোজেল), শেলি (অ্যাডোনেইস), ম্যাথু আর্নল্ড (রাগবি চ্যাপেল), হুইটিয়ার (ইন রিমেমব্রান্স অব জোসেফ স্টার্জ), ব্রাউনিং (লা সেইজিয়াজ) প্রভৃতি। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' দীর্ঘ এলিজির উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট এলিজির মোটেই অভাব নেই। তবে বেশির ভাগ বাংলা এলিজিই পড়তে পারে ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনামূলক এলিজির মধ্যে, যেমন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' ও 'এবে কোথায় চলিলে?' নবীনচন্দ্র সেনের 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' বা গোবিন্দ দাসের 'বঙ্কিমবিদায়' থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এলিজি 'পাথরের ফুল' বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। অবশ্য এ ছাড়া বাংলা কবিতায় এই জাতীয় এলিজি আরো অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে

দিলেও নজরুল ইসলামের 'গোকুল নাগ' ও 'রবিহারা', সজনীকান্ত দাসের 'মর্ত্য হইতে বিদায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাখালিয়া শোকগীতি বা প্যাস্টোরাল এলিজি বাংলায় বিশেষ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত শোক থেকে লেখা কবিতা অনেক আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বন্ধুবিয়োগ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্দেশে', রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তিনটি গুলি' প্রভৃতি। ব্যক্তিগত শোককে বা বন্ধুবিয়োগকে লঘু রীতিতে পরিবেষণের যে দুটি-একটি উদাহরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনফুলের লেখা 'পরিমল গোস্বামী'। এর প্রথম দুটি পংক্তি এইরকম—

"পরিমল, চলে গেলে! বেশ গেছো ভাই।—
এ জগতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নাই!"

ব্যক্তিগত শোক কিংবা বরেণ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সাধারণ শোকাবহ ঘটনা নিয়েও বাংলা এলিজি লেখা হয়েছে, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান'। তবে এলিজির চরম উৎকর্ষ আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' নামক দীর্ঘ কবিতায়। এই জাতীয় কবিতায় শোকের প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে যে আশার সুর শুনিয়েছেন মিলটন, যে কারণে তিনি বলতে পেরেছেন 'weep no more', কীট্সের উদ্দেশে কবিতা লিখতে গিয়ে শেলি যে কারণে বলতে পেরেছেন but the pure spirit shall flow/Back to the burning fountain whence it came," রবীন্দ্রনাথও সেই কারণেই এই ধরনের কবিতায় বলতে পারেন—

"বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে?"

এই বলিষ্ঠ আশাই কবিতাটিকে ভিন্নতর আস্বাদ দান করেছে।

● একটি শোকগীতির পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে ক্রিটিক্যাল এলিজি বা সমালোচনামূলক লোকগীতির সংখ্যাটি বেশি, তবে ব্যক্তিগত হয়েও সাধারণ শোকের কবিতাও কিছু বাংলা সাহিত্যে আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান'।

নূরজাহানের প্রতি ব্যক্তিগত শোক অনুভব করা কবির পক্ষে সম্ভব এবং অসম্ভব দুইই ছিল। অসম্ভব এই কারণে যে উভয়ের সময়ের দূরত্ব প্রচুর—নূরজাহান এক ঐতিহাসিক চরিত্র, তিনি বাস করছেন ইতিহাসের দূরত্বে, সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ছলে বলে কৌশলে নূরজাহানের স্বামী শের আফগানকে হত্যা করিয়ে তিনি নূরজাহানকে লাভ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নূরজাহানকে নিয়ে কবিতা লিখছেন না, লিখছেন তাঁর অবহেলিত কবর নিয়ে একদিন রূপের প্রখর দাপটে যিনি বাধ্য করেছিলেন জাহাঙ্গীরকে একটি জঘন্য অপরাধ

করে তাঁকে ছিনিয়ে নিতে, মৃত্যুর পর সেই নারী অবহেলিত কবরে তুচ্ছতায় ঢেকে আছেন। কবি বলেছেন বটে 'ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুববে না', কিন্তু আমরা জানি স্মৃতি তাঁর ডুবেই গেছে। সেই স্মৃতি কবি ব্যক্তিগত অনুভবে দীপ্ত করে তুলেছেন, সেই কারণেই বলতে পারি ব্যক্তিগত শোক অনুভব করা কবির পক্ষে সম্ভব, নতুবা এমন মরমী কবিতা কবি লিখতে পারতেন না।

কবিতার ত্রুটির কথাটা আগে বলে নেওয়া যাক। সংহত না হলে শোকের তীব্রতা আসেনা। 'কবর-ই-নূরজাহান্' কবিতার আয়তন ও ব্যপ্তি এত বেশি যে কবির বেদনার গভীরতা আমাদের হৃদয়পাত্রে ছড়িয়ে গিয়ে কিছুটা অগভীর হয়ে যায়। কবি নূরজাহানের গোটা জীবনেতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। মরুভূমির শুষ্ক বুকে তিনি যে জন্মেছিলেন মেহের-উন্নিসা হয়ে, কী করে রূপেগুণে তিনি অসাধারণ হয়ে উঠলেন, কেমন করে শের আফগানকে হত্যা করিয়ে আগ্রার রাজদরবারে তাঁকে নিয়ে এলেন সেলিম, কেমন করে নূরাজাহান প্রধানা মহিষীর সম্মান আদায় করে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করলেন এবং আমীর-ওমরাওদের ক্ষেপিয়ে ছিলেন—এত কথা কবিতায় কেউ আশা করেনা, কারণ কবিতা ইতিহাস নয়।

কবিতার মূল সৌন্দর্য, এবং কবিতাটিও যেখানে অসাধারণ, সেটা হল কবির এই অনুভব, একদিন যুবরাজ সেলিমের হৃদয়বরণ করা সৌন্দর্যের অধিকারিনী, ঐশ্বর্যের ছটায় সম্মোহিত করে কর্তৃত্ব আদায়কারী ব্যক্তিত্ব আজ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত; লাহোরের সহরতলির কাঁটাবনে অবহেলায় দিন কাটছে তার—

'জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বারি যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী!'

সমস্ত আগ্রা যিনি কাঁপিয়েছেন একদিন, আমীরদের মনে হৃদকম্প জাগিয়েছিলেন যে বহ্নিশিখা 'কাঁটার জঙ্গলে' সেই 'পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ' কবিকে শোকাহত করেছে। আমাদের মনে হয় কবরের ওপর লেখা একটি অসাধারণ কবিতাই সত্যেন্দ্রনাথের এই লোকগীতির উৎস। সেই কবিতাটি উর্দুভাষায় এইরকম :

'বর্ ম্যজারেমা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে
ন্যঃ পরে পরমালা সুজদ্ ন্যঃ স্যতায়ে বুল্‌বুলে।'

বিশ্বস্ত অনুবাদ কিনা বলা মুশকিল কিন্তু অসাধারণ সুন্দর অনুবাদ যে এই পংক্তিদুটির করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—

'গরীব-রোগে দীপ জ্বেলনা, ফুল দিওনা কেউ ভুলে—
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।'

শুধু এই কবিতা অবলম্বন করে নূরজাহানের স্মৃতি-সুরভিও একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য কবিতা যদি সত্যেন্দ্রনাথ লিখতেন, আমাদের মনে হয় নিটোল মুক্তোর মতো তা আমাদের হৃদয়ের যাদুঘরে রক্ষিত হত। সঠিক মাত্রাজ্ঞান সত্যেন্দ্রনাথের সম্ভবত ছিল না, নতুবা কবিতা শেষ হতে পারতেন এই দুটি পংক্তিতো—

'নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় জুবছ কানের সঙ্গেতে।'

তা সত্ত্বেও বলতে হবে 'কবর্-ই-নূরজাহান্' বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি স্মরণীয় লোকগীতি।

ঠ. সনেট

গীতিকবিতার যেসব শাখা একটি বিশেষ রূপকৃতি বা শিল্পরূপের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই রূপকৃতি হিসাবেই খ্যাতি লাভ করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে গীতিকবিতার আবেগকে চোদ্দ পংক্তির সীমিত আকারে এবং অন্যান্য কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হয়। সম্ভবত এই সব বন্ধনের জন্যই সিসিল ডে লুইস নামে এক কাব্য-সমালোচক মনে করেছেন, সনেট গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিগণ এই বন্ধনকে স্বীকার করেই সনেটের রূপকল্পে অসাধারণ কবিতা সৃষ্টি করেছেন। 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়' এই ধরনের কবিতা সম্পর্কে ওয়র্ডসওয়র্থের বক্তব্য :

> 't was pastime to be bound
> within the sonnet's scanty plot of ground."

বাংলা সনেটের শিল্পী প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

> "ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

সমালোচক হাডসন বলেছেন সনেটের এই বিভাগটি করা হয়েছে 'wholly on the basis of form' এবং তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ 'The theoretical system of the sonnet should, however, be carefully analysed and mastered by every student of poetic technique.' সুতরাং সেই তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি না জেনে আমাদের উপায় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা ভাল যে ভাবের গভীরতাই সনেটের প্রাণ, সেখানে ফাঁকি পড়লে আঙ্গিক তাকে ঋদ্ধ করতে পারবে না।

একটি বিশেষ রূপকৃতির কবিতা হিসাবে সনেটের উদ্ভব ইতালিতে, তবে উদ্ভবের স্বল্পকালের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় সনেটের প্রসার ও জনপ্রিয়তা ঘটে এবং সনেটের ইতিহাসে ইতালীয় সনেটের মতই গৌরবলাভ করে ইংরেজি সনেট। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কবিতার প্রচলন হয় বেশ কিছুটা পরে, 'চতুর্দশপদী কবিতা' নামে। পরে সনেট নামটিই বাংলায় গৃহীত হয়।

ইতালীয় ভাষায় 'সনেটো' শব্দের অর্থ মৃদুধ্বনি। আকারে সংহত এবং কবির আত্মকথন বলেই এই ধরনের নাম তার হতে পারে। রূপের দিক থেকে ইতালীয় সনেট বা ইতালীয় ভাষায় সনেটের পথিকৃৎ-কবি পেত্রার্কের নাম অনুসারে পরিচিত পেত্রার্কীয় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের কিছু পার্থক্য আছে। পেত্রার্কীয় সনেটকে ধ্রুপদী সনেটও বলা হয়। এই রীতির সনেটে মোট চোদ্দ পংক্তি থাকে এবং সেই চোদ্দ পংক্তি দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথম ভাগে থাকে আটটি পংক্তি, একে বলা হয় Octave বা অষ্টক। দ্বিতীয় ভাগে থাকে ছটি পংক্তি, একে বলা হয় Sestet বা ষট্‌ক। অষ্টকের সমান দুটি ভাগও কখনও কখনও দেখা যায়, চার পংক্তির এই দুটি ভাগকে বলে Quartrain বা চতুষ্ক। সেইভাবে ষট্‌কেরও সমান দুটি ভাগ কখনও কখনও দেখা যায়, তাদের বলা হয় Tercet বা ত্রিপদিকা।

কবিতার স্থূল এই আঙ্গিক ছাড়াও পেত্রার্কীয় সনেটে অন্ত্যানুপ্রাস বা চরণান্তিক মিলের

একটি মোটামুটি নিয়ম ছিল। সেখানে অষ্টকের মিল থাকতো এইরকম কখখক, কখখক; ষট্‌কের মিল থাকতো হয় গঘঙ গঘঙ, অথবা গঘ গঘ গঘ।

ইংরেজি সনেটে কেউ কেউ অবশ্য পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শই অনুসরণ করেছেন, যেমন জন মিলটন ও উইলিয়ম ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ। প্রধানত শেক্‌স্‌পীয়রই সনেটের অঙ্গবিভাগ ও মিলে কিছুটা ভিন্ন রীতির প্রবর্তনা করেন। তাই পেত্রার্কীয় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের পার্থক্য আছে না বলে তার সঙ্গে শেক্‌স্‌পীরীয় সনেটের পার্থক্য আছে বলাই ভাল। শেক্‌স্‌পীরীয় সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ অনেক সময়ই মেনে চলা হয়নি, কখনও আট-ছয়, কখনও আট-তিন-তিন, কখনও বা বারো-দুই বিভাগ করা হয়েছে। মিলের দিক থেকে শেক্‌স্‌পীরীয় রীতিতে বেশি দেখা যায় এই ধরনের মিল—কখ, কখ, গঘ, গঘ, ঙচ, ঙচ, ছছ।

বাংলা সনেটেও চোদ্দটি পংক্তি থাকে (কখনো বা আঠারো পংক্তির সনেটও দেখা যায়) তার নাম চতুর্দশপদী কবিতা। এর সঙ্গে আবার পংক্তিতেও থাকে চোদ্দটি হরফ বা বর্ণ।

অবশ্য আগেই বলা হয়েছে কেবল রূপকৃতি নয়, ভাবের দিক থেকেও সনেটের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পেত্রার্কীয় সনেটে বিষয় হিসাবে আদর্শ ছিল প্রেম, কিন্তু পরে এই বিষয়ের অনেক বৈচিত্র্য কবিগণ সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার সেটি হল, ভাবের অখণ্ডতা, গভীরতা ও সংযম। একটি অখণ্ড ভাব নিয়েই সনেট রচিত হয়—অষ্টকে সেই ভাবের প্রস্তাবনা, ষট্‌কে তার ব্যাখ্যা বা বিস্তৃতি। ঠিক এই নিয়ম কঠিনভাবে মানা না হলেও অষ্টক ষট্‌কের মধ্যে একটা পার্থক্যরেখা আমরা অনুভব করতে পারি, সুরের পার্থক্যও কিছু ঘটে যেতে পারে, কিন্তু উভয়ে মিলে একটি অখণ্ড ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে।

সনেটের রূপগত ও ভাবগত এই সব বৈশিষ্ট্য চিন্তা করে সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ সনেটের পাঁচটি প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করেছেন—

(১) সনেট সাধারণভাবে চতুর্দশ অক্ষর (অর্থাৎ চোদ্দটি হরফ বর্ণ) সমন্বিত চোদ্দ পংক্তির কবিতা।

(২) অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ রক্ষা করাই সনাতন রীতি, যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ এই রীতি মানেন নি।

(৩) এতে একটি মাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে।

(৪) এর ভাবে গভীরতা ও ভাষার ঋজুতা থাকবে।

(৫) বিশেষ নির্মাণরীতি অনুসরণ করতে হয় বলে গীতিকবিতার অন্যান্য শাখার মতো এটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

সনেটের জনক ইতালীয় কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) হলেও ইতালীয় ভাষায় কবি দান্তে বা ট্যাসোও সনেটের বিশেষ সমর্থ শিল্পী ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সনেট রচয়িতাদের নাম আগেই করা হয়েছে, যদিও এই ধরনের কবিতা রচনায় ওয়াট এবং সারেকে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে জন কীট্‌স্‌, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি অনেকেই প্রথম শ্রেণীর সনেট রচনা করেন।

বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তবে এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই কারণে মধুসূদনের কৃতিত্বকে ছোট করা যায় না। তিনি যে বাংলা সনেটের পথিকৃৎ তাই শুধু নয়, সেগুলি প্রায়ই সার্থক সনেটের আদর্শ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের

শ্রেষ্ঠ সনেটগুলি পাওয়া যাবে তাঁর 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। সনেট নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষাও তিনি করেছেন। সাধারণত তানপ্রধান বা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতেই সনেট রচনা করা হয়, কিন্তু তিনি ধ্বনিপ্রধান বা কলাবৃত্ত এবং শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত রীতিতেও যে সনেট রচনা করেছেন, যথাক্রমে 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের 'পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি' এবং 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি এই মেয়ে' কবিতাদুটি তার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় (দৃষ্টান্ত সংগ্রহ: শ্রীআনন্দমোহন বসু)। রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কীয় এবং শেকস্‌পীরীয় কোনো রীতিই সঠিকভাবে মানেন নি, 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে কিছু আঠারো হরফের সনেটও রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর হাতে সনেট যে উপভোগ্য উৎকর্ষ লাভ করেছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরেও সনেটের চর্চা হয়েছে বাংলা কবিতায় এবং উৎকর্ষের বিচারেও তার মান খারাপ নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট সনেট আছে, অক্ষয়কুমার বড়ালের সনেটগুলিও পড়তে ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্যদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ঙ. একটি সনেটের বিশ্লেষণ

সনেটের যেসব আঙ্গিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল সেগুলির সাহায্যে একটি বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বিচার করে দেখা যেতে পারে। বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার পথিকৃৎ মধুসূদন দত্তের একটি সনেটই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হল।

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। ক
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে; খ
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে ক
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে খ
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!— ক
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, খ
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? খ
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে! ক

আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে, গ
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে ঘ
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে গ
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে ঘ
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে গ
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে! ঘ

[মিলের সূত্র: ক = অনে, খ = অলে, গ = আবে, ঘ = ইতে]

প্রথমে রূপকৃতির বিচার। এটি চোদ্দ পংক্তির কবিতা এবং প্রত্যেকটি পংক্তিতেই চোদ্দটি করে হরফ আছে। তানপ্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির কবিতা এবং পর্ববিভাগ আট-ছয় বলে (অর্থাৎ পয়ার বলে) প্রত্যেকটি পংক্তির মাত্রাসংখ্যাও চোদ্দ।

অষ্টক এবং ষট্‌কের বিভাগ কবি এখানে যে রক্ষা করেছেন, মিল এবং কবিতার বক্তব্য বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। এই কবিতার প্রথম আট পংক্তির মিল এইরকম—কখকখ, কখখক এবং পরবর্তী ছয় পংক্তির মিল এইরকম—গঘ, গঘ, গঘ। অর্থাৎ মিলের দিকে লক্ষ্য রাখলে বলতে হয় মধুসূদন প্রধানত ধ্রুপদী রীতিই অনুসরণ করেছেন, কেবল অষ্টকের প্রথম চার পংক্তি শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির। এখানে অবশ্য চতুষ্ক বা ত্রিপদিকার কোনো বিভাগ করা হয়নি।

বক্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে এই সনেটে পেত্রার্কীয় রীতির স্পষ্ট অনুসরণ লক্ষ করা যায়, যদিও এই কবিতার বিষয় প্রেম নয়, কবির গৃহাগত প্রাণ বা নস্টালজিয়াই এই কবিতার উপজীব্য। কবি প্রথম আট পংক্তিতে অর্থাৎ অষ্টক অংশে কপোতাক্ষ নদের কেবল প্রশংসাই করে গিয়েছেন এবং এই কপোতাক্ষ নদের তীরে নিজের জন্ম বলে যেন নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। অথচ ষট্‌ক অংশে স্পষ্ট কবির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি এখানে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই নদের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হবে না, তাই তিনি যেমন এই কপোতাক্ষের প্রশস্তি রচনা করছেন, তেমনি মিনতি করেছেন কপোতাক্ষ নদও যেন চিরদিন তাঁর নাম মানুষকে স্মরণ করায়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগ থাকলেও একটি অখণ্ড ভাবই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। যে নদীর তীরে কবির জন্ম, ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে চলে এসে তার প্রতি কবি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। একদিকে যেমন ফুটেছে এই নদের প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালবাসা, অন্যদিকে তার প্রতি বিচ্ছেদের বেদনা—কিন্তু সব মিলিয়ে কবির প্রবাসী চিত্তের বিক্ষোভই এখানে সনেটের সংহতি লাভ করেছে।

কবিতাটিতে ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতা আমরা যেমন অনুভব করি, তেমনি এর ভাষার ঐশ্বর্যও চোখে পড়ার মতো। কপোতাক্ষ নদ যে প্রতিক্ষণে কবির স্মৃতিকে আর্দ্র করে রেখেছে সে কথা বোঝাবার জন্য তিনি প্রথম তিনটি পংক্তিতেই প্রথমে ব্যবহার করেছেন 'সতত' শব্দটি। এ ছাড়া একটি সাঙ্গরূপক 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে' এবং একটি সুচারু পরম্পরিত রূপক এই কবিতার সম্পদ—'যতদিন যাবে/প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে/বারিরূপ কর তুমি;'।

একটি সীমিত আকারের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মধুসূদন এই সনেটে তাঁর নস্টালজিয়ার বেদনা বিস্তারিত করার সুযোগ পাননি এ কথা ঠিক, কিন্তু তার জন্য তাঁর মনোবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এখানে ঘটেনি, এমন কথাও বলা যাবে না।

ঢ. অন্যান্য আকৃতিমূলক বিভাগ

প্রধানত ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে ইংরেজি সাহিত্যে আকৃতিমুখ্য কয়েক ধরনের কবিতার প্রচলন হয়, এদের মধ্যে **ট্রায়োলেট, রঁদো, রঁদেল, ফাবলো** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এই

সব রূপকৃতির চর্চা বিশেষ হয়নি, কেবল ট্রায়োলেট সামান্য কিছু লেখা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য থেকে পাওয়া লিমেরিকও বাংলা কবিতায় জনপ্রিয় হয়েছে, সুতরাং সে দুটি প্রকারভেদের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে পত্রকাব্য নামে এক ধরনের দীর্ঘ কবিতার আলোচনাও আমরা এখানে করে নিতে চাই, কারণ এখানেও আকৃতিটাই প্রাধান্য পায় এবং প্রকৃতির দিক থেকে মন্ময় হলেই তার আস্বাদ বাড়ে বেশি।

• ট্রায়োলেট

ট্রায়োলেট (Triolet) বা তেপাটি মোট আট পংক্তির কবিতা। এর অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল এইরকম—কখ, কককখ, কখ। এর মধ্যে আবার চতুর্থ পংক্তিতে প্রথম পংক্তির, সপ্তম পংক্তিতে প্রথম পংক্তির এবং অষ্টম পংক্তিতে দ্বিতীয় পংক্তির প্রায় অনুবৃত্তি করা হয়। অবশ্য অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে অনুবৃত্তিগুলিও বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা করে। বীরবল রচিত একটি তেপাটি কবিতার উদাহরণ দেওয়া হল—

ঊষা আসে অচল শিয়রে	ক
তুষারেতে বাঁধিয়া চরণ	খ
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে	ক
ঊষা হাসে অচল শিয়রে	ক
ধরে বুকে নীহারে শীকরে	ক
সে হাসির কনক বরণ।	খ
বসো সখি মনের শিয়রে	ক
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।	খ

• লিমেরিক

এর কোনো বাংলা নাম আমরা পাই না, যদিও আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই লিমেরিক লিখেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশ উপভোগ্য কিছু লিমেরিক আছে।

এই পাঁচ পংক্তির ছোট কবিতা, সাধারণত রচিত হয় কোনো লঘু বিষয় নিয়ে অর্থাৎ হাস্যপরিহাসের উদ্দেশ্যেই এই কবিতা রচনা করা হয়। এই কবিতার অন্ত্যমিলের ছক এইরকম —ককখখক, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মিল একরকম, তৃতীয়-চতুর্থ পংক্তির মিল অন্যরকম, আবার পঞ্চম বা শেষ পংক্তিটির মিল থাকে প্রথম পংক্তির মতোই।

ইংরেজি কবিতায় প্রচুর প্রথম শ্রেণীর লিমেরিক আছে। একটু পুরনো কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বুক অব ননসেন্স' রচয়িতা এডোয়ার্ড লিয়ার। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'-য় এই ধরনের কিছু কবিতা আছে, সেখান থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—	ক
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।	ক
আপিসেতে খেটে মরা	খ
তার চেয়ে ঝুলি ধরা	খ
ঢের ভালো—একথায় নাই কোনো সন্দ।	ক

এখনকার দিনের একটি উপভোগ্য লিমেরিকও উল্লেখ করা হল—

কঞ্জুষ বুড়ো বসে গাছে
পাখিদের বলে, 'আয় কাছে—
তোরা যদি ঠুকরিয়ে
দাড়িগুলো নিস নিয়ে,
নাপিতের খরচাটা বাঁচে।'

(সত্যজিৎ রায়)

• লিপিকবিতা

লিপিকবিতা (Epistle) একটি বিশেষ আকৃতির গীতিকবিতা। কবির মনের কল্পনা পত্রাকারে প্রকাশিত হয় এতে। রোমের কবি হোরেস এই আকৃতির কবিতার উদ্‌গাতা বলা যায়। অবশ্য এর একটি বিশিষ্ট শাখা পত্রকাব্য রচনার পথিকৃৎ ইতালির কবি ওভিদ। তাঁর 'বীরাঙ্গনা পত্র' বা 'হেরোয়িদেস'-ই মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' প্রেরণা। এই ধরনের কাব্যে অবশ্য কাব্যগুণই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে নাট্যগুণেরও প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এই ধরনের কাব্য যে-কোনো ভাষাতেই খুব বেশি রচিত হয় না।

তবে লিপিকবিতা বা পত্রের আকারে লেখা কবিতা সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর আছে। ইংরেজি সাহিত্যে পোপের 'Eloisa to Abelard' এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এরকম কিছু কবিতা রচনা করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পুরীর চিঠি', রাধারাণী দেবীর 'পরিণীতার পত্র' প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

লিপিকবিতা বা পত্রকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। মোট এগারোটি পূর্ণ পত্র ছাড়াও কিছু অসমাপ্ত পত্র আছে এতে। প্রত্যেক পত্রেরই লেখিকা পৌরাণিক নায়িকা, যদিও এদের অভিযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি মধুসূদনেরই কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধ 'কাব্যে উপে(িতা'-য় যে ধরনের কল্পনার উষ(তা আমরা ল(করি, তার সঙ্গেই এই কল্পনাঋদ্ধ উষ(হৃদয়ানুভূতির তুলনা করা যায়। যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিকতায় তারা সজীব তাতে এই আঙ্গিকের সঙ্গে কবিকল্পনার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে বলা যায়।

ণ. কবিতার উপকরণ

কবিতার প্রধান উপকরণ দুটি—অলংকার এবং ছন্দ। আর একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করতে গেলে বলা যায়, উপকরণের সংখ্যা চার—অলংকার, চিত্রকল্প বা ইমেজারি, ছন্দ এবং ছন্দস্পন্দ। অলংকারকে কবিতার বহিরঙ্গ সৌন্দর্য না বলে তার অন্তরঙ্গ বা অবিচ্ছেদ্য উপাদান বলাই ভালো। চিত্রকল্প বা ইমেজারিকে বলা যেতে পারে কবিতার প্রাণ। ব্যঞ্জনাগর্ভ ইমেজারি ছাড়া কবিতার সৃষ্টি হতে পারে না। ছন্দ এবং ছন্দস্পন্দ যদিও পদ্যমাধ্যমেরই বৈশিষ্ট্য-গদ্যেও কবিতার সৃষ্টি হতে পারে, এ কথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি, তা সত্ত্বেও কবিতার ছন্দস্পন্দকে বর্জন করতে পারে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ এখনও আছে। চারটি

উপকরণ একটি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক।

কবিতার অলংকার সৃষ্টি যে তার অন্তরঙ্গ উপাদান, এ কথা বোঝা যাবে সংস্কৃতের 'অলংকার শাস্ত্র' নামটি থেকেই—যে তত্ত্ব কাব্যের আত্মা এবং কাব্যত্ব বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করে তাকেই বলা হয় অলংকার শাস্ত্র এবং যাঁরা এই বিচার করেছেন তাঁদের এক কথায় আমরা আলংকারিক বলেই জানি। এঁদের মধ্যে অলংকারবাদী যেমন আছেন, রীতিবাদী বা বক্রোক্তিবাদীও তেমনি আছেন, এবং আছেন ধ্বনিবাদী ও রসবাদী।

অবশ্য এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন গ্রীক নন্দনতাত্ত্বিকগণ। অলংকারশাস্ত্র এবং কাব্যতত্ত্ব তাঁদের কাছে পৃথক ছিল, তাই এদের নামকরণও ছিল পৃথক। অলংকারশাস্ত্র বা Rhetoric বাগ্মিতা ও রচনার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করতো এবং কাব্যতত্ত্ব বা Poetics আলোচনা করতো ট্র্যাজেডি, মহাকাব্য, প্রহসন ইত্যাদির স্বরূপলক্ষণ, পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে। অবশ্য Poetics গ্রন্থেও রচনাশৈলি ও শব্দপ্রয়োগের বিশিষ্টতা বিষয়ে কিছু আলোচনা লক্ষ করা যায়।

অলংকার যে কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ এরকম কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে বলেছেন। অনির্বচনীয় মনের ভাবকে বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় বলেই ভাষায় অনেক রহস্যময়তা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে হয়। প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষা থেকে একে পৃথক করবার যে আয়োজন তাকেই আমরা বলি অলংকার। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ভাষার চিত্র ও সংগীতধর্মের কথা বলেছেন। ভাষার দ্বারা চিত্র ফুটিয়ে তোলা—ঠিক দৃশ্যমান চিত্র নয়, কল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট চিত্রও যার অন্তর্ভুক্ত, তাকেই আমরা বলি চিত্রকল্প বা প্রতিমান, ইংরেজিতে ইমেজারি।

পদ্যমাধ্যমের একটি বৈশিষ্ট্য, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাঠের মধ্যে মধ্যে এক-একটি ঝোঁক আসে। এই ঝোঁককেই বলা হয় ছন্দস্পন্দ বা Rhythm এবং ছন্দস্পন্দনিয়ন্ত্রিত যে বাগ্‌ভঙ্গি তাকেই বলে ছন্দ বা Metre। আসলে কবি যখন লেখেন, তখন ধ্বনিগুলি এমনভাবে সজ্জিত করেন যাতে এই ছন্দস্পন্দ এসে পড়ে। যেমন, 'পোস্তাবাজারে গিয়ে জানতে পারলুম তোমার মেয়ের নাকি বিয়ে?' এই মাধ্যমকে আমরা বলি গদ্য মাধ্যম। অথচ ধ্বনির কথা মাথায় রেখে কবি যখন এইভাবে শব্দগুলিকে সাজান তখনই নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটা করে ঝোঁক এসে তাকে ছন্দোবদ্ধ বা পদ্যমাধ্যম করে তোলে—

শুনতে পেলাম / পোস্তা গিয়ে /
তোমার নাকি / মেয়ের বিয়ে /

এখন গদ্যেও কবিতা লেখা হয়, কিন্তু সেখানেও কথ্যভাষার সঙ্গে তার একটা পার্থক্য রাখা হয় বলেই তাকে বলে গদ্যছন্দ।

চতুর্থ অধ্যায় ‖ তন্ময় কবিতা

ক. সাধারণ শ্রেণীবিভাগ—আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বিভাগ। খ. ব্যালাড বা গাথা—ব্যালাডের উৎপত্তি ও রূপান্তর—ব্যালাডের কিছু প্রধান লক্ষণ—প্রাচীন ব্যালাড—আধুনিক ব্যালাড—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যালাড। গ. আখ্যানকাব্যের কয়েকটি ধারা—মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা—মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য—মঙ্গলকাব্যের গঠন। জীবনীকাব্য—জীবনীকাব্য ও সন্ত-জীবনীকাব্যের প্রভেদ—মধ্যযুগের প্রধান জীবনীকাব্য। রূপক কাব্য—বাংলা রূপক কাব্য।। নীতি কবিতা—ইংরেজি ও বাংলা নীতি কবিতার দৃষ্টান্ত। ব্যঙ্গ কবিতা—ব্যঙ্গ কবিতার উদ্ভব—ইংরেজি ও বাংলা ব্যঙ্গ কবিতা। ঘ. মহাকাব্য—মহাকাব্যের বিভিন্ন বিভাগ—মহাকাব্য সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকদের আলোচনাক্রমে মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণসমূহ: তন্ময়তা, আদিমতা, জাতীয়তা, সারল্য, বিষয়বৈশিষ্ট্য, অবলম্বিত প্রধান রস, বৃত্তগঠন ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, নায়ক-বিচার, ভাষাবৈশিষ্ট্য। ঙ. একটি আদি মহাকাব্যের আলোচনা—রামায়ণ মহাকাব্যের লক্ষণভিত্তিক পর্যালোচনা। চ. সাহিত্যিক মহাকাব্য—সাধারণ পরিচয়—সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণসমূহ: বিষয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিশীলিত ও জটিল চরিত্র-চিত্রণ, একক সৃষ্টি আত্মপ্রক্ষেপ, স্বাধীনতা ও ভাষাবৈশিষ্ট্য। ছ. একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণ—মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-কে সাহিত্যিক মহাকাব্যের আলোকে বিচার। জ. নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য—এদের পরিচয় ও পার্থক্য—কাব্যনাট্যের বিশেষ লক্ষণ ও উদ্ভবরহস্যের আলোচনা—ইংরেজি ও বাংলা কাব্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঝ. নাটকীয় একোক্তি—এর পরিচয়—ইংরেজি ও বাংলা নাটকীয় একোক্তির কিছু দৃষ্টান্ত।

ক. সাধারণ শ্রেণীবিভাগ

যে-কোনো কবিতাতেই কবির উপস্থিতি অনুভব করা যায়, অর্থাৎ কবির মানসিকতা এবং তাঁর অনুভূতির উষ্ণতাতেই তা সজীব হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও আমরা কবিতাকে যখন মন্ময় ও তন্ময় এই দুটি ভাগে বিভক্ত করি তখন সাধারণভাবে এটাই লক্ষ্য রাখি, কোথায় কবির অনুভূতি ও আত্মময়তাই আমাদের প্রধান উপভোগ্য এবং কোথায় বিষয়ের মূল্যও মোটেই উপেক্ষা করবার নয়।

তন্ময় বা Objective কবিতার প্রধান ভাগ আকৃতিগতভাবে হতে পারে, দীর্ঘ কবিতা বা আখ্যানমূলক কবিতা এবং খণ্ড কবিতা; এর প্রকৃতিগত ভাগ হতে পারে বর্ণনামূলক কবিতা ও নাটকীয় কবিতা। আখ্যানমূলক কবিতার অনেকগুলি উপবিভাগ আমরা দেখতে পাই—পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যালাড হিসাবে কথিত আখ্যান যেমন এর মধ্যে পড়তে পারে, তেমনি মহাকাব্যও অবশ্যই আখ্যানমূলক কবিতার শ্রেণীভুক্ত হবে। বাংলা সাহিত্যে আখ্যানমূলক কবিতার সামান্য হলেও কিছু বৈচিত্র্য আছে, কারণ সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গদ্যের ব্যবহার অনেক বিলম্বে হওয়ায় আমরা মঙ্গলগাথাও যেমন পদ্যেই রচনা করেছি—ময়মনসিংহ গীতিকার মতো লৌকিক গাথাও তেমনি লিখেছি পদ্যে, 'চৈতন্যভাগবত' বা 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মতো তাত্ত্বিক গ্রন্থও তাই। নাটকীয় কবিতার ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে সেরকম প্রাচীন নয়, তবে ঊনবিংশ শতকে নতুন করে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা দিলে তাদের ব্যঙ্গ করে যেসব ছদ্ম মহাকাব্য লেখা হয়েছে তার মধ্যে নাটকীয়তা নিশ্চয়ই আছে।

এই ধরনের নাটকীয়তা খণ্ডকবিতাতেও আছে। কোনও বিশেষ কবি বা কবিতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় হয়ে উঠেছে, অথবা কবিতায় নাট্যরস সৃষ্টির

তাগিদেও কবিরা কখনও কখনও এই জাতীয় কাবতা লিখেছেন। তন্ময় খণ্ডকবিতার মধ্যে গীতিকবিতারও একটি স্থান আছে।

বাংলা তন্ময় কবিতার মধ্যে প্রধান হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত মহাকাব্য ও অন্যান্য আখ্যান কাব্য। এদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের আলোচনা বিশদ করা হবে, অন্যান্য রূপগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই এই গ্রন্থের পক্ষে সংগত হবে বলে মনে করি।

খ. ব্যালাড বা গাথা

'ব্যালাড' শব্দটি এসেছে ইতালীয় 'বালারে' শব্দ থেকে, যার মানে নাচা। কাজেই উৎপত্তির সময় অন্তত ব্যালাড-এর সঙ্গে নৃত্যের একটা সংযোগ ছিল নিশ্চয়ই। আধুনিককালেও জনপ্রিয় নৃত্যানুষ্ঠান ব্যালে (ballet) এ থেকেই এসেছে। সুতরাং, আখ্যান, নৃত্য এবং গান—এই নিয়েই ব্যালাড, অন্তত সূচনায় তাই ছিল। বাংলায় এই ধরনের আখ্যানকাব্যকে গাথাকবিতা নাম দেওয়া যেতে পারে।

সমালোচক হাডসন যেভাবে ব্যালাডের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাকেই বলতে হয় সবচেয়ে প্রাচীন কাব্যকলা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে সমস্ত সাহিত্যে, এ কথা যদি সত্য হয় তবে একে বলতে হয় লোকসাহিত্য বা লোক-আখ্যান ধরনের কবিতা। লোকসাহিত্যের সঙ্গে নৃত্যের একটা সম্পর্ক ছিল এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক যুগে সবই ছিল সংগীত, এ দুটি কথা স্মরণ রাখলে বাংলা লোকসাহিত্যকেও ব্যালাড ধরনের রচনা বলা চলতে পারে অনায়াসেই।

অবশ্য সেইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে 'ব্যালাড' কথাটিই এমন এক সুনির্দিষ্ট পরিভাষায় পরিণত হয়েছে যে ঠিক লক্ষণ মিলিয়ে কোনো বিশেষ সাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আবার একই সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম গাথাকেও ব্যালাড বলা কিছুটা বিভ্রান্তিকর হবে।* তাই প্রথাগত ভাবে যাকে ব্যালাড বলে তাকেই ব্যালাড হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের বলতে হবে মধ্যযুগে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অজ্ঞাতনামা রচয়িতাদের হাতে যেসব গাথাকবিতা লেখা হয়েছিল, একই সঙ্গে নাটকীয় অথচ লিরিক অনুভূতিসম্পন্ন এইসব কবিতাকে সাধারণভাবে বলা হয় ব্যালাড। জীবনের একেবারে মৌলিক দিকগুলিই ছিল এর বিষয়বস্তু। যেমন খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো যুদ্ধবিগ্রহ এবং রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের ওপর। উদ্ভট কাণ্ডকারখানা এবং অলৌকিক ব্যাপারের প্রতিও আগ্রহ বিশেষ কম ছিল না। অবশ্য তাই বলে প্রেম, করুণা, দুঃখ-শোক—এইসব কোমল অনুভূতি সেখানে বর্জিত হতো না। আমাদের আজকের রুচি এবং সাহিত্যবোধ নিয়ে এইসব রচনা বিচার করতে গেলে সেগুলি হয়তো আমরা উপভোগ করতে পারবো না, কারণ জীবনের সেই সহজ-সরল ছন্দ এবং

* কথাটা স্পষ্ট করবার জন্য বলা যায়, দেবদেবীর মাঙ্গল্য রচনার জন্য লিখিত এক ধরনের কাব্যই বাংলায় 'মঙ্গলকাব্য' হিসাবে পরিচিত। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' দেবী সারদারই স্তুতি এবং পাঁচ সর্গে এর কাহিনী বিন্যস্ত। তা সত্ত্বেও, এমনকি নামকরণে 'মঙ্গল' উল্লেখ করা থাকলেও, একে আমরা মঙ্গলকাব্য বলতে পারবো না, গীতিকবিতাই বলবো।

বিশ্বাসের জোর আমরা এখন অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি। জীবন যখন মৌলিক বৃত্তিগুলির দ্বারাই চিহ্নিত হতো সেই সময়ে ফিরে যেতে না পারলে এই জাতীয় রচনা উপভোগ করা সহজ হবে না।

ব্যালাডের কতকগুলি স্থূল বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ রাখতে পারি। প্রথমত ও প্রধানত, ব্যালাডে থাকে এক শিশুসুলভ সারল্য—জীবনের সহজ ও মৌলিক বৃত্তিগুলিই প্রায় নির্বিচারে সেখানে স্থান পায়।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীর নাটকীয়তা সেখানে খুব বেশি। শিশুসুলভ সারল্যের জন্যই সম্ভবত নাটকীয় উপাদান সেখানে প্রচুর ব্যবহার করা হয় এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতি বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে শ্রোতা ও পাঠক তা উপভোগ করেন। একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং তার পরেই আর একটি নাটকীয় উত্তেজনা—এই রকম রুদ্ধশ্বাস গতির সৃষ্টি করে কাহিনী এগিয়ে চলে।

নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যালাডের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। যে-কোনো ব্যালাডই একটি বিশেষ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথাও যেমন সেখানে বিশেষ থাকে না, ব্যক্তিগত মানসিকতাও সেখানে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক সিজউইকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"The first and foremost quality about Ballad is not its personality, but its impersonality."

ব্যালাডের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, তার ছন্দ। ব্যালাডের প্রতি পংক্তিতে থাকে সাতটি শ্বাসাঘাত, অর্থাৎ সাতবার সেখানে ঝোঁক পড়ে। অবশ্য আধুনিক ব্যালাডে এত দীর্ঘ পংক্তি রক্ষিত হয়নি—সেটি চার ও তিন শ্বাসাঘাতসম্পন্ন দুটি পংক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রথাগত এই মধ্যযুগীয় ব্যালাড প্রচুর রচিত হয়েছিল এবং তা প্রচুর জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। এই জাতীয় প্রাচীন ব্যালাডের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ পার্সি-র Reliques of Ancient English poetry। এক হিসেবে এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থও বটে। এরপরেও অবশ্য এই ধরনের সংকলনগ্রন্থ আরো প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো অধ্যাপক এফ্. জে. চাইল্ডের বিশাল কীর্তি।

প্রথাগত ব্যালাডের আদর্শেই আধুনিককালে বেশ কিছু ব্যালাড রচিত হয়েছে। 'সাহিত্যিক মহাকাব্যের' মতো তাদের আমরা সাহিত্যিক ব্যালাড হিসাবেই অভিহিত করি। মধ্যযুগীয় ব্যালাডের প্রথম সংকলক পার্সি নিজেও এই ধরনের ব্যালাড রচনা করেছেন। সমালোচকগণ বলেন, সার কলিনকে নিয়ে লেখা আখ্যান কবি কোলরিজকে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যালাড 'ক্রিস্টাবেল' রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ওয়র্ডস্ওয়র্থ এবং হার্ডি থেকে শুরু করে কোলরিজ, কীট্স্, রসেটি প্রভৃতি অনেকেই আধুনিক ব্যালাড লিখেছেন। কোলরিজের The Ancient Mariner বা Kubla Khan, কীট্সের La Belle Dame Sans Merci কিংবা রসেটির The King's Tragedy ব্যালাড হিসাবেও যেমন উপভোগ্য, কবিতা হিসাবেও তাই। তবে মধ্যযুগের ব্যালাডের মতো নৈর্ব্যক্তিকতা এইসব দীর্ঘ কবিতায় আশা করা সংগত হবে না।

বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ব্যালাড 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র কথাই প্রথমে মনে হয়। বহু কবির মুখে রক্ষিত এইসব গাথা ও গীতিকা উদ্ধার করেন দীনেশচন্দ্র সেন। একদিকে যেমন এখানে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ পাই, অন্যদিকে পাই নাটকীয়তা ও লৌকিক প্রেমের রোমাঞ্চ। মধ্যযুগীয় ইংরেজি ব্যালাডে রবিনহুডের যে কাহিনী পাওয়া যায়,

আমাদের এখানেও সেরকম রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাতের কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। খগেন্দ্রনাথ মিত্র এইসব কাহিনী অবশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী বা নাথ সাহিত্যের মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীও কিছুটা ব্যালাডের লক্ষণাক্রান্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক ব্যালাড বলতে প্রথমেই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গাথা কবিতার কথা যাদের অনেকগুলি কাহিনীই ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature in Nepal, সেনার সম্পাদিত 'মহাবস্তু' এবং অ্যাকোয়ার্থ সম্পাদিত 'Marathi Ballads' থেকে সংগৃহীত। এছাড়া কবি নজরুল ইসলামের 'শাত্-ইল আরব', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'শ্রীধর', জসীমউদ্দিনের 'নক্সীকাঁথার মাঠ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ. আখ্যান কাব্য : কয়েকটি প্রকরণ

ব্যালাড অবশ্যই এক ধরনের আখ্যান কাব্য, কিন্তু আখ্যানধর্মী কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের। মহাকাব্য আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য ধরনের কিছু আখ্যান কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে পারি।

● মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল কালপর্ব অধিকার করে আছে মঙ্গলকাব্য। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ বিষয়ে প্রথম নিষ্ঠ গবেষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলন ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাংলায় পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

এই সংজ্ঞাটি পরীক্ষা করলেই আমরা মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব কটি বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। প্রথমত এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য যা বলেছেন তা মোটামুটি ভাবে সত্য। এর আদিসীমা ঠিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক কিনা বলা শক্ত কারণ মঙ্গলকাব্যের আদি কবি যাঁদের বলা হয় (যথা মনসামঙ্গলের কবি কানা হরিদত্ত) তাঁদের কারো কারো রচনা পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে 'মঙ্গল' নামধেয় কিছু কাব্য রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকেই মঙ্গল কাব্যধারার শেষ উল্লেখযোগ্য কবি মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক আখ্যানকাব্য বলতে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি বলে আমাদের মনে হয়। অন্যান্য আখ্যান কাব্যের বেশির ভাগই ছিল অনুবাদমূলক—এ কথা রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত, মঙ্গলকাব্য যে ধর্মবিষয়ক সেকথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, কারণ দেবদেবীর স্তুতির উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কাব্য রচনা করা হতো। তবে ঈশ্বরস্তুতি থাকলেও এদের 'ওড্'-জাতীয় রচনা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য। কোনো কোনো সমালোচক এদের যে মহাকাব্য হিসাবে অভিহিত করেছেন সে কথাও সমর্থন করা শক্ত, কারণ মহাকাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে এদের মিল এতই অল্প যে 'রাঢ়ের মহাকাব্য' হিসাবে মঙ্গলকাব্যকে চিহ্নিত করার মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগই আছে বেশি। তাছাড়া মূলত মঙ্গলকাব্য যে সংগীত একথা ভুলে গেলেও চলবে না।

চতুর্থত, লোকসাহিত্যের মতই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিষ্ট সাহিত্য বর্তমানে এই শ্রেণীর কাব্যকে গ্রহণ করেছে, কবি মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্র যথাক্রমে ভূস্বামী ও রাজার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন—কিন্তু এর উদ্ভব যে লোক-গোষ্ঠী থেকেই তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। দেবদেবীর উগ্র প্রকৃতি দেখলেও সে কথা বোঝা যায়। এখনও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সর্পপূজা (মনসা দেবী), চণ্ডীদেবীর পূজা বা ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবদেবী ছিলেন তিনজন—চণ্ডী, মনসা এবং ধর্ম। সেই অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল (পরবর্তীকালে চণ্ডীদেবীর পরিবর্তিত রূপ অন্নপূর্ণা বা অন্নদাকে নিয়ে অন্নদামঙ্গল), মনসামঙ্গল (বা মনসার ভাসান) এবং ধর্মমঙ্গলের সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্ট হয়েছে। ড. সুকুমার সেন 'রায়মঙ্গল' নামে আর একটি ধারার উল্লেখ করলেও তাকে মঙ্গল কাব্যের প্রধান ধারা কখনোই বলা যাবে না। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপলাই প্রভৃতি, চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ প্রভৃতি এবং ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে রূপরাম, ঘনরাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রায়মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসও উল্লেখ করবার মতো কবি।

মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, মঙ্গলকাব্যের গঠনে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর প্রধান খণ্ড দুটি—দেবখণ্ড ও মানবখণ্ড। দেবখণ্ডে দেবতাদের কথা থাকে এবং মানবখণ্ডে থাকে সেই দেবদেবীর মধ্যে যাঁরা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে লীলা করছেন তাঁদের কথা। দৃশ্যত চারটি খণ্ডে মঙ্গলকাব্য বিভক্ত—বন্দনা খণ্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড। বন্দনাখণ্ডে থাকে দেবদেবীর বন্দনা—যে দেব বা দেবীর প্রশস্তি রচনা করা হচ্ছে তিনি তো বটেই, তাছাড়াও আরো অনেক দেবদেবীর যার মধ্যে গণেশের বন্দনা প্রথম। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ খণ্ডে দেবতা বা দেবীর আশীর্বাদ ও স্বপ্নাদেশই যে কাব্যরচনার কারণ, সে কথা বলা হয় এবং কবি তাঁর আত্মপরিচয়ও এখানে দান করেন। দেবখণ্ডে সেই অভিশাপের কথা বর্ণিত হয় যার জন্য দেবতা বা দেবীকে মর্ত্যেই জন্মগ্রহণ করতে হবে। নরখণ্ডে থাকে মর্ত্যধামে তাঁদের লীলা।

দ্বিতীয়ত, কতকগুলি বিষয় মঙ্গলকাব্যে থাকবেই, যেমন—বার মাসের দুঃখের কাহিনী বা বারমাস্যা, চৌতিশা স্তুতি, নারীদের পতিনিন্দা, রান্না ও খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা, ফুলফল ও পশুপাখির আলোচনা প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, গ্রন্থোৎপত্তির কারণের মধ্যে কবির তৎকালীন সমাজ, তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এইসব তথ্যসূত্র অতি মূল্যবান।

চতুর্থত, মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য হলেও মঙ্গলকাব্যে মানুষের চরিত্রও অত্যন্ত সুচারুভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ফলে চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, সনকার সকরুণ মূর্তি, ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের চাতুর্য ও খলতা প্রভৃতি অত্যন্ত ভালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

● জীবনীকাব্য

মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের মধ্যে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে জীবনীসাহিত্যের উৎস সন্ধান করা যেতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এইরকম জীবনীকাব্য যখন সংখ্যায় বেশ কিছু লেখা হয়েছে এবং কেবল চৈতন্যদেবের জীবনকথাতেই তা সীমাবদ্ধ নেই, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এমনকি অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবীর জীবন নিয়েও চরিত সাহিত্য রচিত হয়েছে তখন মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে এটিকে একটি বিশেষ ধারা হিসাবে স্বীকার করতেই হবে।

তবে সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, এগুলি ঠিক মানবিক জীবনী হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে সন্তজীবনী। ইংরেজীতে Biography এবং Hagiography-র মধ্যে যে তফাত, প্রকৃত জীবনীকাব্য ও মধ্যযুগের জীবনীকাব্যগুলির মধ্যেও সেই তফাৎ। ভক্তের দৃষ্টিতে আরাধ্যের জীবনের লৌকিক আচার-আচরণের চেয়ে অলৌকিক মাহাত্ম্য বেশি ধরা পড়ে, প্রকৃত জীবনীকাব্যে যা আমরা মোটেই আশা করি না। আসলে এগুলি চরিতসাহিত্য ঠিক নয়, 'চরিতামৃত'; এবং মূল পার্থক্যসূত্রও সেখানেই। এ বিষয়ে ড. সুশীলকুমার দে তাঁর গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—"It should, however, be remembered that it is not a *carita, but a caritamrita,* written more from the devotional than from the historical point of view.'

অবশ্য ভারতবর্ষে জীবনী রচনার ঐতিহ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতে দীর্ঘদিনের। পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জীবনী কবিরা অনেক সময়ই রচনা করেছেন। এদের মধ্যে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হেমচন্দ্রের 'কুমারপাল চরিত', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কাব্যের কবিরা বা মঙ্গলকাব্যের কবিরাও পরোক্ষভাবে জীবনী রচনার প্রবণতা দেখিয়েছেন। যেমন সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কিছুটা তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা রামপালেরই আংশিক জীবনকাহিনী। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় অংশে বস্তুত জীবনীকাব্যই রচনা করেছেন।

চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে সংস্কৃতে কিছু জীবনীকাব্য লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা, পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে সবেচেয় উল্লেখযোগ্য কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর লেখা 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত', কারণ এই গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের আকর গ্রন্থ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের বেদস্বরূপ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নাম করা যেতে পারে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের 'কড়চা' এবং চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এর।

● রূপক কাব্য

রূপক কাব্য যে খণ্ড কবিতা হতে পারে না এমন কথা নয়, আবার রূপক যে কবিতার মাধ্যমেই

The Third' নামে, সাদি-র 'A Vision of Judgement'-এর প্যারডি হিসাবে বিখ্যাত বায়রনের 'The Vision of Judgement', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্যারডি জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার কাব্য', রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি 'আনন্দবিদায়' প্রভৃতি এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সাধারণভাবে বলা যায় ব্যঙ্গ কবিতা বা Satire শব্দটি ল্যাটিন Satura Lanx শব্দ থেকে উদ্ভূত। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত চম্পু কাব্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গি থাকলে তাকে স্যাটায়ার নামে অভিহিত করা হতো। ব্যঙ্গ কবিতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্যই পাঠককে লঘু হাস্যরস বিতরণ করা, কিন্তু এর গভীরতর উদ্দেশ্য জাতি ও ব্যক্তিমানুষের চরিত্রের সংশোধন, সমাজের নানারকম অসংগতির প্রতি আমাদের সচেতন করা এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধান করা। এক হিসাবে নীতি-কবিতারও সেই একই কাজ, তবে ব্যঙ্গ কবিতায় তা লঘু রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে আসে বলে এর আবেদনও অনেকটা গভীর ও অব্যর্থ। বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে নাম করা যায় Alexander Pope-এর The Dunciad, Dryden-এর Mac Flecknoe, রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গবীর', মোহিতলাল মজুমদারের 'দ্রোণগুরু' প্রভৃতি।

ব্যঙ্গ কবিতার একটি প্রধান ধারা প্যারডিকে যদি স্বতন্ত্র শাখা বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে ব্যঙ্গ কবিতার মোট বিভাগ তিনটি—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যঙ্গ কবিতা। সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'অনাচার', রাষ্ট্রনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবে উল্লেখ করা যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেভার-নেভার' এবং আধ্যাত্মিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে নাম করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছিং টিং ছট্'-এর।

ঘ. মহাকাব্য

তন্ময় আখ্যানকাব্যের মহত্তম বিভাগটির নাম মহাকাব্য বা Epic। রচনাকালের দিক থেকে অন্যতম প্রাচীন, দীর্ঘ আখ্যানসম্বলিত এবং বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য-প্রকরণ। মহাকাব্যকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ হিসাবে অবশ্য স্বীকার করেননি বঙ্কিমচন্দ্র, 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন গীতিকবিতার মন্ময়তা এবং নাটকের বস্তুনিষ্ঠা, এই দুটি ব্যাপারের সমন্বয় ঘটেছে মহাকাব্যে—"'মহাকাব্যের' বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত।"

অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলও যেমন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Poetics-এ মহাকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, সংস্কৃত আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজও তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণ'-এ মহাকাব্যের লক্ষণ নিয়ে চিন্তামূলক আলোচনা করেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, এবং অন্যান্য সাহিত্যেও মহাকাব্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আধুনিককালেও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রাচীন মহাকাব্যের লক্ষণ অনেকটাই রক্ষিত হয়নি। প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রাচীন মহাকাব্য বিশেষ একজনের নামে প্রচলিত হলেও তা কখনই একক সৃষ্টি নয়; পক্ষান্তরে আধুনিক মহাকাব্য বিশেষ একজনেরই সৃষ্টি। ইংরেজিতে আদি মহাকাব্যকে বলা হয় Epic of growth

সৃষ্ট হতে পারে এমনও নয়—রূপক নাট্য, রূপক কথাসাহিত্য এবং লোককথাও আমরা প্রচুর দেখতে পাই, তবে কাহিনীমূলক কাব্যের প্রায় একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে রূপক কাব্য ইংরেজি সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ কাহিনীধর্মী কাব্যের একটি আপাত অর্থের অন্তরালে যখন অন্য কোনও গভীর অর্থের ইঙ্গিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় রূপক কাব্য। ইংরেজি সাহিত্যে এর বেশ কিছু বিভাগ আছে, যেমন—আধ্যাত্মিক বা ধর্মমূলক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি। প্রথম ধরনের রূপক কাব্যের মধ্যে The Hind and the Panther, দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে Piers the Plowman এবং তৃতীয় ধরনের মধ্যে Absalom and Achitophel উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদি নিদর্শন চর্যাপদ খণ্ডকবিতা হলেও তাকে অনায়াসে রূপকধর্মী কবিতা হল যায়। ইংরেজিতে যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তাতে একে আধ্যাত্মিক রূপক বলাই সংগত। আধুনিককালে রচিত আধ্যাত্মিক রূপকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর নাম করা যেতে পারে। আমাদের বাউল গান বা সুফী সংগীতও আধ্যাত্মিক রূপকের দৃষ্টান্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক রূপকের উদাহরণ হিসাবে যথাক্রমে মোহিতলাল মজুমদারের 'আহ্বান' এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংসার-সমুদ্র'-এর নাম করা যায়।

● নীতি কবিতা

যে কবিতার উদ্দেশ্য জ্ঞানগর্ভ নীতি প্রচার করা তাকে আমরা নীতিকবিতা বলতে পারি। নীতিকবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও, যে-কবিতার উদ্দেশ্য শুধুই নীতির প্রচার তাকে আমরা আদৌ কবিতা বলতে পারি কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। কিন্তু ইংরেজিতে এই ধরনের কবিতাকেও স্বীকার করা হয়েছে বলে, এবং উপযুক্ত কবির হাতে নীতিকবিতাও যে কত উচ্চাঙ্গের কবিতা হতে পারে রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা'-য় তার প্রমাণ দিয়েছেন বলে, আমরা একেও তন্ময় কবিতার একটি ধারা হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি আছি। কারণ উদ্দেশ্যমূলক হয়েও সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, কথাসাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

ইংরেজিতে নীতিকবিতার উদাহরণ Alexander Pope-এর Essay on Criticism এবং বাংলায় এই জাতীয় কবিতার উদাহরণ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি', রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাদকমঙ্গল' প্রভৃতি।

● ব্যঙ্গ কবিতা

ব্যঙ্গাত্মক কবিতার একটি বিশেষ ধারা যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে গড়ে উঠেছে সে কথা স্বীকার করলে এই বিশেষ শ্রেণীটিকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্যঙ্গ কবিতার একটি প্রধান ধারা প্যারডি, (এর প্রতিশব্দ শ্রীশচন্দ্র দাশ করেছেন লালিকা) কিন্তু তাকে স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ যে-কোনও সাহিত্যেই এই ধারা অত্যন্ত প্রবল। বিখ্যাত কবিমাত্রেরই প্যারডি রচনা করা হয়। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের Peter Bell-এর প্যারডি করেছিলেন শেলি 'Peter Bell

এবং আধুনিক মহাকাব্যকে Epic of art বা Literary Epic আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা আদি মহাকাব্যকে শুধু মহাকাব্য এবং আধুনিক মহাকাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসাবে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য একে 'আধুনিক মহাকাব্য' বলাও অসংগত নয়, কারণ এদের সাহিত্যিক মহাকাব্য বললে আদি মহাকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা হয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীগণ মহাকাব্য সম্পর্কে যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, প্রথমে তা বিশ্লেষণ করে আদি মহাকাব্য ও আধুনিক মহাকাব্যের লক্ষণগুলি জেনে নেওয়া যেতে পারে।

মহাকাব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সব অধ্যায়ে এর যে আংশিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং অন্যান্য অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর পার্থক্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা থেকে আমরা মহাকাব্যের লক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে পারি:

(১) (It is) an imitation of serious subjects in a grand kind of verse ... in narrative form.

(২) (It) should be based on a single action, one that is a complete whole in itself, with a beginning, middle, and end, so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all organic unity of a living creature.

(৩) As for its metre, the heroic has been assigned it from experience.

[অনুবাদ : ইনগ্রাম বাইওয়াটারের]

এই প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি থেকে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এইভাবে: **মহাকাব্য মিতছন্দে ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে রচিত গুরু বিষয়বস্তু আশ্রিত ও সুনির্দিষ্ট আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান, যার ঐক্য সম্বন্ধ হয় জৈবিক প্রকৃতির এবং প্রচুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যা উদ্দিষ্ট রসানুভূতি জাগাতে পারে।**

আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং দণ্ডী মহাকাব্যের অনেক লক্ষণ বর্ণনা করলেও সঠিক সংজ্ঞা দেননি। বিশ্বনাথ কবিরাজ যা বলেছেন তা স্মরণ রাখলে অবশ্য এর লক্ষণ নির্ণয় সহজ হবে, তিনি বলেছেন—

> "সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
> সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়োবাইপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
> একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোইপি বা।
> শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোইঙ্গী রস ইষ্যতে॥
> ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।
> চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং লভেৎ॥"

এবার মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, মহাকাব্য তন্ময় কবিতা। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে সম্পূর্ণ বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। একটি বিস্তীর্ণ সময় ও এক সমগ্র জাতির যথাযথ দর্পণ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত মহাকাব্যের। একটি বিশেষ যুগ ও জাতির মুখপাত্র হয়ে ওঠে একটি মহাকাব্য।

দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য যে-কোনো সাহিত্যেরই প্রায় আদি সৃষ্টি। অর্থাৎ এর প্রাচীনত্বই এর প্রথম লক্ষণ বলা যেতে পারে।

সমালোচক অ্যাবারক্রম্বি মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে এই প্রাচীনত্বের কারণটি বোঝা যাবে—"... poetry which seems an immediate response tc some general and instant need in its surrounding community– such poetry is Authentic epic."

তৃতীয়ত, মহাকাব্য শেষপর্যন্ত একজনের হাতে কাব্যরূপ লাভ করলেও তাকে একক সৃষ্টি বলা যায় না। বহুদিন ধরে বহু কবির সংযোজনের ফলে বহু উপকাহিনী একটি মূল কাহিনীর ধারায় এসে মেশার ফলেই মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। এইভাবে তার উৎপত্তিরহস্য সন্ধান না করলে সাহিত্যসৃষ্টির আদিযুগে মহাকাব্যের উদ্ভব বিস্ময়কর বলেই মনে হবে। আসলে লোকজীবনে বহু আখ্যানই মানুষের মুখে মুখে ফেরে বহুদিন থেকে। অনেক লোককবি বিভিন্ন গাথাও রচনা করে গেয়ে থাকেন দীর্ঘদিন থেকে। এইসব লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং গানই যে মহাকাব্যের মধ্যে সংহত রূপ লাভ করে, সে কথা এ নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন। রামায়ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন; হাডসন বলেছেন সাধারণভাবে মহাকাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এবং সুন্দর করে বলেছেন জেমস রীভ্‌স্ তাঁর প্যান পাইপার সিরিজের একটি ছোট বইয়ে—"... it may be taken as a bridge between the anonymous narrative poetry (like the ballads) and poems written by poets whose names are not known."

অবশ্য এ কথা বলে মহাকাব্যের আদিকবির সম্মান কোনমতেই ক্ষুণ্ণ করা যায় না। আদিকবি বাল্মীকি বা বেদব্যাস, কিংবা গ্রীক কবি হোমারের শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়েই স্বীকার করতে হবে। মহাকাব্যের উৎস-রহস্য যাই হোক না কেন, এর মূলে যতই লোককথা ও লোক-আখ্যান থাকুক না কেন, এই সমস্ত লোককথা এবং প্রাচীন সংগীতালেখ্য একত্র করা ও এক সূত্রে গ্রথিত করে তাকে সর্বকালের সৃষ্টিতে পরিণত করা অল্প ক্ষমতার সাধ্য নয়।

মহাকাব্যের চতুর্থ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তার আদিম সারল্য। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে স্থূলভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—বর্বর যুগ, বীর যুগ এবং সভ্য যুগ। এর মধ্যে বীর যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল অকৃত্রিম ব্যবহার ও শিশুসুলভ সারল্য। দৈহিক স্বাস্থ্যও যেমন ভাল ছিল মানুষের, শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিল—মানসিক স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। উপদেশ ও আচরণে, বাক্যে ও কর্মে সংগতি ছিল। জটিলতাবর্জিত সারল্যের জন্যই একজনের বিরুদ্ধে অন্যজন উরুভঙ্গের বা বুক চিরে রক্তপানের মত ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারতেন। এগুলি আজকের সভ্য যুগে চিন্তা করা যায় না, এসব কাজকে আমরা এখন চূড়ান্ত অসভ্যতা বলেই গণ্য করি। মুখে একজনের প্রশংসা করে গোপনে তার চরম সর্বনাশ করার মতো কৃত্রিমতা সভ্য যুগেই সম্ভব হয়।

পঞ্চম প্রসঙ্গ, মহাকাব্যের বিষয়। কী বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা হবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলংকারিক ও রসবেত্তার নির্দেশ থাকলেও তাঁদের মতের কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। হোমার বলেছেন, মহাকাব্যের বিষয় হল 'বীরপুরুষদের কথা।' আচার্য দণ্ডীর মতে, এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হবে কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন কাহিনী বা পুরাণ থেকে। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইতিহাসের কাহিনীর প্রতি বেশ উৎসাহী ছিলেন। এক্ষেত্রে মহাকবি ট্যাসো আবার আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, এর বিষয় হওয়া দরকার, ধর্মানুশাসিত ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং তা খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী

জাতির ইতিহাস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কাহিনী ইতিহাস, পুরাণ বা লোককথা যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং রণোন্মাদনা মহাকাব্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। সেই কারণে বিষয়বস্তুর অলৌকিকতা ও চমৎকারিত্ব মহাকাব্যিক বিষয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই, কাব্যের সত্য ও ইতিহাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে অসম্ভাব্য ঘটনার (Improable possibility) চেয়ে সম্ভাব্য অঘটনও (Probable impossibility) সাহিত্যে অনেক বেশি কাম্য। অর্থাৎ বিষয় যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, তার সম্ভাব্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার দায়িত্ব সর্বাগ্রে, এবং মহাকবিকে তা গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার মহাকাব্যের প্রধান রস কী হবে এ বিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত— এই তিনটির মধ্যে একটিকে প্রধান রস হিসাবে নির্বাচন করতে হবে, অন্যান্য রস অবশ্য তার পরিপুষ্টি সাধন করতে পারে। তাঁর শ্লোক ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ, মহাকাব্যের বৃত্ত এবং আঙ্গিক। এ বিষয়ে বেশি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে সংস্কৃত আলংকারিকদের কাছ থেকেই, কারণ মহাকাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষণ নিয়েই তাঁরা বেশি উৎসাহিত ছিলেন। অ্যারিস্টটল এ বিষয়ে শুধুমাত্র বলেছেন, কাহিনীটি যাতে একটি সম্পূর্ণতা পায়—আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত এক সমগ্র আখ্যান হয়ে ওঠে, এটাই দেখা দরকার।

আচার্য দণ্ডীর মতে, মহাকাব্য শুরু করা হবে আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া বা বস্তুনির্দেশের দ্বারা। মহাকাব্যের সর্গগুলি হবে নাতিদীর্ঘ কিন্তু এর পটভূমি হবে বিরাট, যাতে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি ও ঔদার্য ফুটে ওঠে। তাই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে সমুদ্র, পাহাড়, ঋতু, উদ্যানক্রীড়া, জলকেলি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে মহাকাব্যের সর্গসংখ্যা আটের বেশি হতে হবে এবং নাটকের মতো সন্ধি থাকবে। নায়কের জয় এবং ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘোষিত হবে। সমাপ্তি সম্পর্কে ভারতীয় আলংকারিকদের এই নির্দেশ অবশ্য পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকেরা মেনে নেন নি, এর পরিণতি তাদের মতে অশুভও হতে পারে। তবে তাঁর এর অখণ্ড শিল্পসংগত রূপ এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্যের কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

মহাকাব্যের নায়ক প্রসঙ্গ, এর সপ্তম গুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারণা, নায়ক হবেন কোনো দেবতা, ধীরোদাত্ত সদ্বংশজাত কোনো ক্ষত্রিয় অথবা উচ্চবংশজাত কিছু নৃপতি। এই মত থেকে বোঝা যায় নায়ক একের বেশি হলেও আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে যেসব মহাকাব্যিক প্রয়াস আমরা দেখেছি তা থেকে মনে হয় একাধিক নায়ক মহাকাব্যের আস্বাদের ঘনত্ব নষ্ট করতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারত কিংবা ইলিয়াড ও ওডিসিতে একটি নায়কের সংগ্রাম ও বীরত্বই আমরা দেখেছি যদিও সেখানে বীর চরিত্রের অভাব ছিল না। তাতে কাহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়নি। সুতরাং মহাকাব্যের নায়ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হলে একাধিক নায়ক-পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না।

নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় নিশ্চয়ই হতে পারেন, কিন্তু তিনি দেবতা হলে কী অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা আমরা বাল্মীকির রামচরিত্র এবং কৃত্তিবাসের অনুবাদ পাঠ করলেই বুঝতে পারি।

একটি মানুষ তার দুর্লভ চরিত্রের সাহায্যে অনেক অসাধারণ কাজ করতে পারে, বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করলেই তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, কারণ দেবতাকে অসাধ্যসাধনের জন্য কোনও সাধনা করতে হয় না। তাই কাব্যের নায়ক দেবতা হলে আমরা সেই রস থেকে বঞ্চিত হই, একটি মহৎ কাব্য পাঠ করে যে রসের আস্বাদন আমরা করে থাকি। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে দেবচরিত্র আমরা অনেক দেখেছি কিন্তু তাঁরা কেউ নায়কত্ব দাবি করেননি, দ্বিতীয়ত তাঁদের চরিত্র অনেক সময়ই মানবচরিত্রের সমতুল্য—কখনো বা মানবচরিত্রের চেয়েও হীন।

মহাকাব্যের অষ্টম ও শেষ প্রসঙ্গ, এর ভাষা। মহাকাব্যের ভাষা সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের অভিমত এই রকম যে, এটি হবে ছন্দোময় এবং সেই ছন্দের থাকবে গুরুগম্ভীর ওজস্বিতা। তিনি হেক্সামিটার ছন্দই মহাকাব্যের উপযুক্ত বলে মনে করেছেন, অর্থাৎ যে রীতির প্রত্যেকটি চরণে থাকবে দুটি শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক। ছন্দের ব্যাপারে আচার্য দণ্ডীও সচেতন ছিলেন, তিনি বলেছেন মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গের শেষেই ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

আসলে মহাকাব্য এক বিরাট ও মহান সৃষ্টি বলেই তার ছন্দব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে এই বিশালতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। অ্যারিস্টটল যে এর জন্য 'Heroic metre' সর্বোত্তম বলে মন্তব্য করেছেন, তাও এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য। তাছাড়া মহাকাব্যের গভীর উপমা ও নতুন নতুন শব্দচয়নও এই ছন্দেই স্ফূর্তি লাভ করে। সংস্কৃতেও অনুষ্টুভের মত গম্ভীর ছন্দই মহাকাব্য রচনার উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

৬. একটি আদি মহাকাব্যের আলোচনা

আদি মহাকাব্যের যেসব লক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সেই লক্ষণের আলোকে আমাদের দুটি মহাকাব্যের অন্যতম 'রামায়ণ'-এর পর্যালোচনা আমরা করতে পারি।

প্রথমত, 'রামায়ণ' যে তন্ময় কাব্য এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। একটি বিস্তীর্ণ সময় এর পটভূমি এবং ভারতবর্ষীয় মানুষের আদর্শ, মানসিকতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রায় দর্পণেই পরিণত হয়েছে এই কাহিনী। তন্ময় বা বস্তুগত ভাবে দেখার ফলেই কোনও বিশেষ চরিত্রের প্রতি আদিকবি বাল্মীকি বেশি সহানুভূতি দেখাবার সুযোগ পাননি। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা'* প্রবন্ধে লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলার প্রতি উপেক্ষার অভিযোগ করেছেন বাল্মীকির প্রতি। আসলে এটি মহাকবির প্রতি আধুনিক গীতিকবির অভিযোগ—এক্ষেত্রে মহাকবিও নিরুপায়, আবার গীতিকবির এই অভিযোগও স্বাভাবিক। 'রামায়ণ' গীতিকবিতা নয় বলেই ঊর্মিলাকে বেশি গুরুত্বদান বাল্মীকির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সঠিক সময়সীমা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা সম্ভব না

* প্রবন্ধটির নাম 'কাব্যে উপেক্ষিতা' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' দুরকমই পেয়েছি। কাব্যে যাঁদের উপেক্ষা করা হয়েছে, এই অর্থে প্রথম নামটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বিশেষ করে প্রথম নামকরণটি এত কাব্যিক ও শ্রুতিরুচিকর যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নামটি কোথাও ব্যবহার করেছেন বা পছন্দ করেছেন ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

হলেও এটি যে সুপ্রাচীন কাব্য, এ বিষয়ে কোনও সমালোচকই দ্বিমত পোষণ করেন না। রামায়ণের এই প্রাচীনত্বের জন্যই তাকে পুরাণের সম্মান জানান অনেকে। রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন প্রথা, প্রায় রূপকধর্মী কাহিনী রূপায়ণ এবং সভ্যতার আদিম স্তরের সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিচয় থেকেও এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

তৃতীয়ত, মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ কাব্য অনেক বেশি সংহত ও কেন্দ্রীয় কাহিনীর প্রতি নিষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনীর ধারা এসে যে রামায়ণের সঙ্গে মিশেছে এবং তাদের একত্র করেই যে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করতে হয়েছে এ কথা বোঝা কষ্টকর নয়। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে-কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।'

আবার সমগ্র জাতিই রামায়ণ মহাকাব্যের স্রষ্টা বলে আদিকবি বাল্মীকির ক্ষমতাকে আমরা কোনোমতেই ছোট করে দেখতে পারি না। যে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে সমগ্র কাব্যটিকে তিনি সুগ্রথিত করেছেন, যে নিখুঁত মনস্তত্ত্বের জ্ঞানে চরিত্রগুলিকে সজীব করে তুলেছেন এবং সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও ভাষাশিল্পে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশের মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই তিনি স্বীকৃতি পেতে পারেন।

মহাকাব্যের চতুর্থ লক্ষণ আদিম সারল্য ও অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস। আদিম সারল্য যে রামায়ণের যুগে বর্তমান ছিল তা সম্পর্কগুলির অকৃত্রিমতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছরের বনবাস, লক্ষ্মণের মতো ভ্রাতৃভক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদুকাকে প্রতিনিধি করে ভরতের তাঁর হয়ে রাজ্য চালানো, প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রাণপ্রিয় পত্নীর নির্বাসন—এ সবই এক আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে যা পরবর্তীকালে অনেক কৃত্রিম ও জটিল হয়ে এসেছে।

পঞ্চমত, রামায়ণের বিষয় মহাকাব্যিক কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় অঞ্চলের সাহিত্যতাত্ত্বিকদের খুশি করার মতো বিষয় অবলম্বন করেই রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়েছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনবাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের পর সীতা-উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের উপযুক্ত 'বীরপুরুষের কথা।' আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্য যে এতে ধরা পড়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। অনেকে বলেন এটি পুরাণ, অনেকে বলেন ইতিহাস, আবার অনেকের মতে দক্ষিণভারতে অনার্যদের ওপরে আর্যের বিজয়কাহিনীই রূপকের মাধ্যমে এখানে পরিবেশিত। অলৌকিক ঘটনা রামায়ণে নেই এমন নয়—হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, রাবণের মৃত্যুবীজ প্রাসাদে লুক্কায়িত থাকা, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত; কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে আমাদের মতো আধুনিক পাঠকের কাছেও তা সহনীয় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত ভাবতে হবে, রামায়ণ এমন সময়ে লেখা হয়েছিল যখন পাঠকের যুক্তিশৃঙ্খলার বোধ আমাদের মতো কঠিন ছিল না—অন্তত সাহিত্যপাঠে তার এতটা আবশ্যকতা তাঁরা বোধ করতেন না।

এই কাব্যে অন্যান্য অনেক রসের পুষ্টি সাধন করলেও, আমরা মনে করি এর অঙ্গীরস বীররস।

ষষ্ঠত, রামায়ণ বৃত্তগঠনের দিক থেকে মহাকাব্যিক এবং নিখুঁত, এই ধারণাই পোষণ করেন সমালোচকগণ। মূল কাহিনী যদি রামচন্দ্রের জীবনভিত্তিক ধরা যায় তাহলে কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং একে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করতেও আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ভারতীয় আলংকারিকদের বিচারে একটি কাণ্ড অবশ্য কম আছে রামায়ণের, কিন্তু সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কোথাও কাহিনীধারা ক্ষুণ্ণ করে বা সংক্ষিপ্ত করে তোলে, এরকম সন্দেহ আমাদের হয় না। মহাকাব্য শুরু করার যে প্রথা—আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া ইত্যাদি, তা রামায়ণে রক্ষিত হয়েছে। এর পটভূমি যে বিশাল এ বিষয়েও কোনো মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত, এমনকি লংকা পর্যন্ত তার পটভূমি বিস্তৃত। প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ কবি প্রচুর পেয়ছেন এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। ধর্ম ও আদর্শের জয় প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মহাকাব্য সমাপ্ত হয়েছে।

সপ্তমত, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের নায়ক সম্বন্ধে আলংকারিকদের কোনো নির্দেশেরই ব্যত্যয় হয় নি। রামচন্দ্রই নিঃসন্দেহে এই মহাকাব্যের নায়ক এবং তিনি যে 'ধীরোদাত্ত' ও 'সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়' সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কেবল কৃত্তিবাসের অনুবাদ পাঠ করে যে বিষয়ে সন্দেহ জাগে তা হল, রামচন্দ্র মানুষ অথবা দেবতা। বাল্মীকির মহাকাব্যে রাম ছিলেন একজন মানব, কিন্তু অতিমানব; সেই জন্যই তাঁর চরিত্র আমাদের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করতো। শুধু রামচন্দ্র নয়, সমস্ত চরিত্রই সেখানে মানব-অনুভূতিতে সঞ্জীবিত। সীতা সেখানে তেজস্বিনী জনক-দুহিতা। রামচন্দ্র মারীচের সন্ধানে গিয়ে বিলম্ব করলে লক্ষ্মণের সেখানে না যাওয়ার কারণ হিসাবে প্রাকৃতজনের মতো সীতার ভর্ৎসনা, কিংবা লক্ষ্মণের সামনে সীতাকে নিজের প্রশংসা করতে শুনে রামের বলা—'তুমি এরকম কোরনা, কারণ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষগণ স্ত্রীলোকের মুখে অন্য পুরুষের গুণগান শুনতে ভালবাসেন না'—চরিত্রের মানবীয় আস্বাদই স্পষ্ট করে। বাল্মীকির এই চরিত্রগুলিকে দেব-দেবীতে রূপান্তরিত করে তাদের কী ক্ষতি যে কবি কৃত্তিবাস করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা'-য় সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। রামচন্দ্রের যাবতীয় পৌরুষ, কোমলতা, দৃঢ়তা, সমস্ত চারিত্রিক গুণ মূল্য হারায় যদি তিনি 'পতিতের ত্রাতা', 'অনাথের নাথ' ঈশ্বর হয়ে যান। অথচ যে-রাবণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসাবে রামচন্দ্রের অকালবোধন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেছিলেন, সেই রাবণকেও মৃত্যুকালে কৃত্তিবাস রামের কাছে ঈশ্বর-বন্দনায় হাতজোড় করিয়েছেন। অবশ্য অনুবাদের জন্য মূল রচনার কবিকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই।

আদি মহাকাব্যের শেষ লক্ষণটি সম্বন্ধে বলা যায়, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের ভাষা তার সম্পদ। পৃথিবীর আদি ছন্দ হিসাবে স্বীকৃত অনুষ্টুভ্ ছন্দে এই কাব্য রচিত যার প্রথম শ্লোক—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্ব—
মগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক—
মবধীঃ কামমোহিতম্॥"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবশ্যই অনুষ্টুভ্ আদি ছন্দ নয়, বৈদিক ভাষার অন্যতম ছন্দ মাত্র; এবং বৈদিক ভাষাকে অপৌরুষেয় আখ্যা দেবার জন্যই মনুষ্যকৃত ছন্দের মধ্যে একে প্রথম বলা

হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি এক বিশাল পটভূমিসম্পন্ন মহৎ ব্যঞ্জনার মহাকাব্য অনুষ্টুভ্ ছন্দে তার যোগ্য মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে।

সুতরাং সমস্ত লক্ষণভিত্তিক বিচারে রামায়ণ মহাকাব্যকে আমরা অবশ্যই সার্থক আদি মহাকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে পারি।

চ. সাহিত্যিক মহাকাব্য

সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আধুনিক মহাকাব্য আধুনিক কালে রচিত আধুনিক কবির মহাকাব্যিক প্রয়াস। একেই ইংরেজিতে বলা হয়েছে Literary Epic বা Epic of art। সাহিত্যিক মহাকাব্য একক প্রয়াসেই সৃষ্ট এবং মন্ময়তার লক্ষণ তাতে অনেকটাই ফুটে উঠতে পারে। সেই হিসাবে আদি মহাকাব্যের তুলনায় কাব্যিক উৎকর্ষ তাতে বেশি থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, একটি সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য একদিকে যেমন আদি মহাকাব্যের কিছুটা আভাস দেয়, অন্যদিকে আধুনিক মহাকাব্যেরও একটি আদর্শ সৃষ্টি করে। যেমন 'রামায়ণ' মহাকাব্যের অংশবিশেষ অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', কিন্তু রচনার সৌকর্যে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা হয়ে থাকল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' বা নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস'—এই ত্রয়ীকাব্যের। এই ভাবেই ভার্জিলের Aeneid বা মিলটনের Paradise Lost শিল্পসৃষ্টির অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়েই তাদের মূল্য হারায় নি, তারা প্রেরণা হয়ে থেকেছে অন্যান্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের, যাদের মধ্যে আছে ট্যাসো-র Gerusalemme Liberata বা ক্যামোয়েন্স-এর Lusiadas থেকে ম্যাথু আর্নল্ডের Sohrab and Rustum পর্যন্ত।

স্বাভাবিকভাবেই আদি মহাকাব্যের সঙ্গে আধুনিক মহাকাব্যের কিছু সাদৃশ্য আছে, কারণ আদি মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আধুনিক যুগের মহাকাব্য গড়ে ওঠে। আবার সময়, মানসিকতা ও যুগরুচির কারণে তাদের মধ্যে ভিন্নতাও কম নয়। এইসব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সূত্রাকারে এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

এক।। সাহিত্যিক মহাকাব্য সাধারণত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে আদি মহাকাব্য, প্রাচীন বীরগাথা কিংবা লোকগাথা থেকে। আদি মহাকাব্যের গঠন অনুসরণ করেই তার কাব্যদেহ গঠিত হয়। কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত উপাদান তা গ্রহণ করে থাকে, আধুনিক মহাকাব্য হলেও।

দুই।। পুরাণ বা প্রাচীন ইতিহাস থেকে উপাদান সংগৃহীত হলেও সেই প্রাচীন উপাদান সাহিত্যিক মহাকাব্যে আর পুরাতত্ত্ব থাকে না, কবির আধুনিক মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কখনো কবি সেই কাহিনীর মধ্যে আবিষ্কার করেন সমগ্র জাতির সুপ্ত চেতনা, কখনো আধুনিক তাৎপর্যে তা এমন অভিনব হয়ে ওঠে যে এক নতুন জীবনদর্শন সেখানে আমরা খুঁজে পাই, মানুষ তার ভবিতব্যকে খুঁজে পায় সেখানে। কবি অ্যাবারক্রম্বি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

"There is only one thing which can master the perplexd stuff of epic material into unity, and that is, an ability to see in particular human experience some significant symbolism of man's general destiny."

তিন॥ একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, আদি মহাকাব্যের পৌরাণিক উপাদানের মধ্যে যে উদ্দাম জীবনবোধ, যে অকৃত্রিম সারল্য আছে, তার তুলনায় সাহিত্যিক মহাকাব্য অনেকটাই স্তিমিত, পরিশীলিত পুরাতত্ত্বের চর্চা মনে হতে পারে। সমালোচক হাডসন এই জন্যেই সম্ভবত মন্তব্য করেছেন—"... the epic of growth is fresh, spontaneous, racy, the epic of art is learned, antiquarian, bookish, imitative."

চার॥ চরিত্রচিত্রণে এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আদি মহাকাব্যে দেবতাও নায়কত্ব পেতে পারেন, এমন কথা তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেছেন। দেবতা না হলেও দেবকল্প ক্ষমতার অধিকারী মানুষ ছিল আদি মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্যে মানুষ, একমাত্র মানুষই, নায়কত্ব করতে পারে। তার নায়ক হবার জন্য দেবোপম গুণেরও কিছু প্রয়োজন হয় না, সাধারণ মানবিক গুণ নিয়েই সে নায়ক হতে পারে। যখন দেবতাই হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক—নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যে তা হয়েছে, তখনও কিন্তু তাঁকে দেবতা হিসাবে নায়কত্ব দান করা হয় না, মানুষ হিসাবেই সে মর্যাদা তিনি পান। ত্রয়ী কাব্যের উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে 'মহাভারত' থেকে, কিন্তু মহাভারতের তাৎপর্যই সেখানে পালটে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আদৌ কোনও দেবতা নন—একজন দক্ষ ও কূট রাজনীতিবিদ্ মাত্র, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হীনবল ভারতবর্ষে একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিয়ে তাদের এক রাজার অধীনে এনে সংহত করা, খণ্ডিত ভারতবর্ষকে এক মহা ভারতে পরিণত করা।

পাঁচ॥ আদি মহাকাব্য একজন কবি রচনা করলেও তাকে আমরা বহু লোককবির যৌথ কীর্তি আখ্যা দিতে পারি, কাব্যটিকেও বলতে পারি জাতীয় মহাকাব্য। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্য একক কবির রচনা, তার নিন্দা-প্রশংসার সব কিছুই কবি একা আত্মসাৎ করতে পারেন, অন্য কেউ নন। কাব্যটিকে আমরা তাঁরই সৃষ্টিসম্পদ বলি, জাতীয় সম্পদ নয়।

ছয়॥ বস্তুধর্মিতা মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও সাহিত্যিক মহাকাব্য তা নয়—কবিকে আমরা পরোক্ষভাবে প্রায় সর্বত্রই খুঁজে পাই তাঁর কাব্যে।

সাত॥ সাহিত্যিক মহাকাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকদের বিধিবিধান মেনে চলে না, ফলে সেইসব নিয়মের প্রেক্ষিতে তার বিচার অনেক ক্ষেত্রেই সুবিচার হবে না। অবশ্য কবিরা যে সেসব নিয়মের কথা জেনেই মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন তার প্রমাণ তাঁদের মহাকাব্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আট॥ ভাষার উৎকর্ষ সাহিত্যিক মহাকাব্যেও প্রবলভাবেই থাকে। বরং ব্যক্তিগত কীর্তি বলে সেদিকে কবি অধিকতর যত্নবান হন।

ছ. একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণ

শ্রীমধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বক্তব্যে, মানসিকতায় ও উপস্থাপনায় আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, দুটি পর্যায়ে—প্রথমে পাঁচ সর্গ ও পরে চার সর্গ। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীরঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীনবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্য পর্যন্ত সময়সীমা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ' হিসাবে পরিচিত। আমরা মনে করি এই সময়েই কিছু সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহে 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সেই কারণে একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণের জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থটিকেই আমরা নির্বাচন করলাম। সাহিত্যিক মহাকাব্যের যেসব লক্ষণ আমরা উল্লেখ করেছি, তার আলোকেই এই কাব্যের বিচার করা হবে, যদিও এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি যে, মহৎ প্রতিভা কোনো নিয়মের কাছেই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে না। নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলেই কবি অনেক স্বাধীন বৃত্তিকে সংহত করেন না এবং সেই অভিনব আলোকেই সমালোচকগণ পরবর্তীকালে সৃষ্টিলক্ষণ স্থির করেন। অতঃপর কাব্যবিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

এক॥ কবি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য থেকে। রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঢুকে লক্ষ্মণ অন্যায়-রণে কীভাবে হত্যা করেন, সেই অংশই কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং কাব্যের বিষয় মহাকাব্যের উপযোগী সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগের কাব্য হলেও দেবদেবীর আলৌকিক লীলা এবং তাঁদের যন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের চিত্রও তিনি উপস্থিত করেছেন। এতে প্রাচীন বিষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে—মূল কাহিনীকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি।

দুই॥ কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন রামায়ণ মহাকাব্য থেকে. কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা তা এক মৌলিক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং বাল্মীকির 'রামায়ণ' সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার কাব্য মনে হয়। বাল্মীকির মহাকাব্যে পাপের পরাজয় এবং ধর্মের জয়ই বড় হয়ে উঠেছে, পক্ষান্তরে মধুসূদনের কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে স্বাদেশিকতা। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ এবং সমগ্র চতুর্থ সর্গের অতিকথন বাদ দিলে কাব্যটি পাঠ করলে মনে হয় রাবণ যেন এক স্বাদেশিক রাজা, নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। দৈবশক্তিতে বলীয়ান রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে এসেছেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে, রাবণের তা প্রতিহত করার প্রয়াসে 'একে একে নিবিছে দেউটি'—তা সত্ত্বেও তিনি পরাজয় স্বীকার করে নিজের দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি নন, এই ধরনের একটি ধারণা পাঠকের হতে পারে। আমরা একটু সচেতন হলেই স্মরণ করতে পারবো, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'কৃত্রিম মহাকাব্য যুগ' নামে যে সময়টি চিহ্নিত, সেই কালপর্বে রচিত বেশির ভাগ কাব্যেরই অন্তর্নিহিত সুর স্বদেশচেতনা। সুতরাং রাবণকে কোথাও স্পষ্টভাবে দেশপ্রেমিক বলা না হলেও সমগ্র কাব্যটির প্রতীতিতে রাবণকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ নৃপতি বলেই মনে হয় এবং মেঘনাদের করুণ অপমৃত্যুও দেশভক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ হিসাবেই পাঠক গ্রহণ করতে পারেন।

তিন॥ সাহিত্যিক মহাকাব্যে জীবনের দুর্মর আবেগ ও আদিম প্রবৃত্তি যে অনেকটা সংহত হয়ে আসে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তার নিদর্শন আমরা পাই। রামায়ণে অন্ধমুনির দুর্বার ক্রোধ, কৈকেয়ীর অনাবৃত ঈর্ষা বা লক্ষ্মণের প্রতি সীতার পরুষ বচন প্রভৃতির যে দৃষ্টান্ত আমরা

পাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' তার তুলনায় অনেক সংযত। রাবণের ক্ষুব্ধ অসহায়তা ও দুর্দম ক্রোধ আমরা পেয়েছি বটে তবে তা অনেক পরিশীলিত। বীরত্বের আবেগ প্রমীলার মধ্যেও আমরা লক্ষ করি, তবে তা কতোটা স্বতোৎসারিত এবং কতোটা কাব্যিক আদর্শজাত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চতুর্থ সর্গে সরমার কাছে পূর্বজীবনের বর্ণনায় সীতা রীতিমতো রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছেন।

চার॥ আদি মহাকাব্যের মতো 'মেঘনাদবধ কাব্যেও' দেবতার আধিপত্য কিছুটা দেখা গিয়েছে। প্রথম সর্গেই রাজলক্ষ্মীর জন্য বারুণীর উতলা মনোভাব আমরা দেখেছি, রাজলক্ষ্মী লঙ্কাত্যাগ করবার জন্য কতো অস্থির তাও আমরা লক্ষ করেছি। দ্বিতীয় সর্গের প্রায় সম্পূর্ণটাই দেবদেবীর ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে বিস্তারিত। কাব্যের পরিণতিতে দেবদেবীদের এই সক্রিয়তা একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এ কথা সত্য। তবে তা সত্ত্বেও এই কাব্যে এসব বহুগুণে অতিক্রম করে গিয়েছে মানবিক আবেদন এবং মানুষের যন্ত্রণাজর্জর হৃদয়। রাম ও রাবণ পৌরাণিক মানুষ—এবং পৌরাণিক মানুষের দেবোপম গুণাবলী থাকতে পারে এ কথা আমরা জানতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তবু বলবো যে-গুণে রাবণ ও মেঘনাদ আমাদের অভিভূত করে তা লোকোত্তর গুণ বা ঐশ্বর্য নয়, একান্তই মানবিক গুণ। যে রাবণকে রামায়ণে আমরা পেয়েছি আত্মগর্বী মহাশক্তিমান এক পাপাচারের জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে, এখান থেকে পাই একটি মানুষ হিসাবে। মানুষটি পত্নীর বেদনায় সান্ত্বনা দেয়, বীরপুত্রকে উদ্বুদ্ধ করে, সুপুত্রের বিয়োগে যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে, আবার দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের বীরত্ব ও পরাক্রমকে জাগিয়ে তোলে। রামায়ণে মেঘনাদের ভূমিকা কেবল শৌর্যের, এখানে তাকে অনেকগুলি ভূমিকায় আমরা দেখি—বীরপুত্র, প্রেমিক স্বামী, বংশমর্যাদায় ঐশ্বর্যবান রাজপুত্র। এর পাশে বরং দৈবশক্তিধর পুরুষ রাম-লক্ষ্মণই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথের এরকম মনে হবার কারণ, রাম ও লক্ষ্মণ দৈবশক্তির ওপর নির্ভরতায় আদি মহাকাব্যের চরিত্রই থেকে গিয়েছেন, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ মানবিক অনুভূতির সৌজন্যে অনেকখানি মানুষ হয়ে উঠেছেন। মধুসূদন পরবর্তীকালে যেভাবে তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'-র পৌরাণিক নায়িকাদের মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন নারী করে তুলেছেন, সেই ভাবেই এখানে চরিত্রগুলিকে মানবিক করে তুলতে পেরেছিলেন এবং সেটাই এই কাব্যের প্রতি আধুনিক পাঠকের আকর্ষণের প্রধান কারণ।

পাঁচ॥ 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিঃসন্দেহে একক সৃষ্টি। এটি যে শুধু মধুসূদন দত্তের লেখা তাই নয়, এ কাব্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এই কাব্য তিনি ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারতেন না—এরকম একটি বোধও সচেতন ও মনস্ক পাঠকের মধ্যে গড়ে ওঠে।

ছয়॥ মহাকাব্যকে তন্ময় কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই objectivity বা তন্ময়তা আদি মহাকাব্যের মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান থাকে, সাহিত্যিক মহাকাব্যে কিন্তু কবির মন্ময়তাও আমরা একটু সচেতন হলেই লক্ষ করতে পারি। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কেবল যে রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি মধুসূদন বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর সহানুভূতি যে অত্যন্ত বেশি রয়েছে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের প্রতি, এই মনোভাব কাব্যেও তিনি গোপনও করতে পারেননি। রাবণের বর্ণনায় তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, ইন্দ্রজিতের নিষ্পাপ সারল্য বর্ণনা করতে গিয়েও তেমনি তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছেন। কবি তাঁর

এই মানসিকতা যে গোপন করার চেষ্টা করেননি, তাঁর চিঠিপত্রগুলিই তার সাক্ষ্য দেবে। তিনি একদিকে লিখেছেন, 'I despise Ram and his rabble', অন্যদিকে রাবণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'He was a grand fellow.' ইন্দ্রজিতের সম্বন্ধে তিনি যে অনুভূতিপ্রবণ, চিঠিতে বারবার তার উল্লেখ আছে। একবার লিখেছেন, 'I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit' অন্য চিঠিতে লিখেছেন—'It cost me many a tear to kill him.' অন্য আর-একটি চিঠিতে পাই, 'He was a noble fellow and but for that scoundrel Bivishan could have kicked the monkey army into sea.' সুতরাং কবি এই কাব্যে সর্বত্রই ধরা দিয়েছেন।

সাত॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ মহাকাব্য সম্বন্ধে যেসব বিধিবিধান নির্দিষ্ট করেছেন, খুব সংগত কারণেই তার পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিচার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তাঁর এই কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিতেই রাজি ছিলেন না তিনি। একটি চিঠিতে বলেছেন—'you must not, my deer fellow, judge of the work as a regular Heroic Poem. I never meant it such.' তিনি এই কাব্যকে কী করে তুলতে চেয়েছেন এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—'Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.' অর্থাৎ যথার্থ মহাকাব্য লেখার আগে হাত পাকাবার জন্য এটি একটি খণ্ড-মহাকাব্য বা epicling। তিনি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কোনও নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকবেন, এ কথা তিনি কখনো বলেননি, তবে এ কথা তিনি বলেছিলেন যে তিনি এমন করে লিখতে চেষ্টা করবেন 'as a Greek would have done'। সংস্কৃত আলংকারিকদের সম্বন্ধেও তাঁর প্রায় একই কথা—"I will not allow myself to be found by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan."

অবশ্য কবির মন্তব্য নয়, কাব্য বিচারই আমাদের লক্ষ্য। সেদিক থেকে দেখলে নিয়ম যে তিনি কিছুই মানেননি এমন কথা বলা যাবে না। কাব্যটি নটি সর্গে বিভক্ত, অষ্টাধিক সর্গ এখানে আছে। সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশ অনুযায়ী শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা এখানে সুকৌশলে করা হয়েছে। মহাকাব্যের অঙ্গীরস হিসেবে যেগুলি অবলম্বনের নির্দেশ আছে, কবির প্রস্তাবনায় তা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি আছে—'গাইব, মা, বীররসে ভাসি/ মহাগীত'; কিন্তু সমালোচকগণ মনে করেন কাব্যটির অবলম্বন করুণরস, বীররস নয়। যেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকগণের নির্দেশ মধুসূদন মান্য করতে পারেননি তার মধ্যে প্রধান, তাঁর কাব্য বিয়োগান্ত অথচ মহাকাব্য সর্বদাই মিলনান্তক হওয়াটাই রীতিসম্মত। এক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের শেষ পংক্তি—'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥' প্রায় আলংকারিক নির্দেশের প্রতিবাদ বলা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নায়ক কে, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ ছাড়া এই সম্মান অন্য কাউকে বোধ হয় দান করা সম্ভব নয়। এই দুজনের কাউকেই আলংকারিকদের নির্দেশ মতো সদ্বংশজাত ও ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বলা চলবে না।

আট॥ ভাষার উৎকর্ষ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আছে এবং বিপ্লবাত্মক ভাবেই আছে। মহাকাব্যিক নির্দেশমতো মধুসূদন বিভিন্ন সর্গে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী অমিত্রাক্ষর নামে যে যুগান্তকারী ছন্দরীতির প্রবর্তন করেন,

করেছেন তার প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তীকালের নাট্যকারগণ খুঁজেছেন জীবনের প্রতীকী রূপ, বাস্তব ঘটনাবাহুল্য তাতে লক্ষণীয়ভাবে স্তিমিত হয়ে এসেছে—প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। কাব্যিক অনুভূতি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সময় রূঢ়ভাবে বর্জন করা হয়েছিল, এখন তার প্রতিক্রিয়াতেই নাটক অনেক কাছাকাছি চলে এলো কবিতার।

দ্বিতীয়ত, এই ধরনের নাটকে ধরতে চাওয়া হল জীবনকে সমগ্রভাবে। কাব্যনাট্যের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা মনে করেন, সাধারণ নাটকে জীবনের তাৎক্ষণিক রূপ এবং সাময়িক সমস্যাকে ধরা হয়, পূর্ববর্তী যে-কোনও নাটকেই তাই হয়েছে। নাটক হিসাবে গ্রীক নাটক এবং শেক্স্‌পীরীয় নাটক নিশ্চয়ই সফল, কিন্তু জীবনের যে এক সামগ্রিক রূপ আছে, মানুষের চিরকালীন সমস্যা বলে যে সমস্যাগুলি আছে, তার প্রতি নাটক এতদিন সুবিচার করেনি। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রধান নাট্যফসল যিনি উপহার দিয়েছেন, সেই বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়—তাঁর নাটকে সমস্যা যতটা তাৎক্ষণিক ও আংশিক, ততোটা সামগ্রিক নয়।

তৃতীয়ত, এই জাতীয় নাটকের কালচেতনাও লক্ষ করবার মতো। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল নাটকের আলোচনায় যে তিনটি ঐক্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে কালগত ঐক্যও একটি। তিনি ট্র্যাজেডি নাটকের ঘটনাকালের এক সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কাব্যনাট্যের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা বলতে চাইলেন জীবনের এমন কিছু সমস্যা আছে যাকে কালসীমায় বাঁধা যায় না—তা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; সুতরাং নাট্যঘটনার কাল এই বিশাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত না হলে জীবনের ও সমস্যার পূর্ণরূপ বোঝা যাবে না।

চতুর্থত, মূলত কবিরাই এগিয়ে এলেন কাব্যনাট্য রচনা করতে। এঁরা যদিও প্রায় সকলেই বলে থাকেন, যে জিনিস তাঁরা রচনা করছেন তা নাটক—জীবনের অন্তর্নিহিত নাটক, তবু কবি না হলে এই ধরনের নাটকের উপজীব্য সমস্যার প্রকৃতি সঠিকভাবে ধরতে পারা সম্ভব নয়, তাই কবিরাই এই নতুন ধরনের বা নতুন শিল্পগোত্রের নাটকের জন্মদাতা হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, এই ধরনের নাটকে প্লট বা বৃত্ত রচনার গুরুত্ব অনেক কমে এসেছে। কারণ, জীবনের সামগ্রিক সত্য ও আত্মিক অনুসন্ধানই যেখানে মুখ্য ব্যাপার সেখানে বানানো ছকের প্রতি আনুগত্য আশাই করা যায় না।

ষষ্ঠত, এই ধরনের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটা কথা বোঝা দরকার। প্রাথমিকভাবে নাটক ছিল পদ্যমাধ্যমনির্ভর, কিন্তু নাটককে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে যে কথ্যমাধ্যম বা গদ্যমাধ্যমের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, গ্রীক নাটকের প্রতিভাবান স্রষ্টারা সে কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন। শেক্স্‌পীয়রও অবশ্যই সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন, নতুবা এতদিন ধরে নাটকগুলি আমাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হতো না। পদ্য এক ধরনের নির্দিষ্ট সময়ান্তর ছন্দ মেনে চলে, গদ্যে সেই নির্দিষ্ট সময়ান্তর ছন্দস্পন্দ না থাকলেও ছন্দস্পন্দ একটা আছে—যদিও তা অনিয়মিত। আমাদের কথাবার্তাতেও অনেক সময় সেই অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ থাকে। আগেকার দিনে পদ্য-সংলাপাশ্রয়ী সমর্থ নাট্যকারগণ কথ্যভাষার সেই অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-কে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁদের নাটকের ভাষায়, ফলে তা জীবনের

প্রকরণ—তাই কবিতা পদ্যমাধ্যমেও লেখা হতে পারে, গদ্যমাধ্যমেও লেখা হতে পারে। কবিত্ব নির্ভর করে বিশেষ গুণের ওপর। ঠিক তেমনি নাটকের নাটকীয়ত্ব নির্ভর করে বিশেষ গুণের ওপর, উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ একটি প্রস্তুত আঙ্গিক কৌশল—শুধু তার ওপর নির্ভর করে কোনো সাহিত্যসৃষ্টি নাটক কিনা সে বিচার করা যায় না।

আজ যখন কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এতো আগ্রহী, তখন এই দুটি নামকরণের মধ্যে কোনটি বেশি সংগত সে বিচারে কালক্ষেপ না করে একে কোনও পৃথক গোত্রের শিল্প বলা যায় কিনা সেটাই ভেবে দেখা উচিত। কাব্যনাট্য বলতে যদি আমরা বুঝতাম verse drama তাহলে কথাটা বোঝা অনেক সহজ হতো, কিন্তু কাব্যনাট্য verse drama নয়। পদ্যমাধ্যমে লেখা নাটক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের সংগ্রহে অনেক আছে। বস্তুত গ্রীক সাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাটকগুলি পদ্যমাধ্যমেই লেখা, ইংরেজি সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলা যেতে পারে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক পদ্যমাধ্যমেই রচিত—অথচ গ্রীকনাটক বা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক নিশ্চয়ই কাব্যনাট্য হিসাবে আখ্যাত হবে না, অথবা তাই যদি হতো তাহলে নতুন করে কাব্যনাট্য নামে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভবের কথা ঘোষণা করতে হতো না।

কাব্যনাট্য বলতে যদি বুঝি poetic drama এবং নাট্যকাব্য বলতে dramatic poetry, তাহলেও সমস্যা বাড়ে বই কমে না। নাটকে কাব্যগুণের তারতম্য নিয়ে বা কাব্যে নাটকীয়তার অনুপ্রবেশ চিন্তা করে এরকম বিভাগ নির্দেশ করতে গেলে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে কাব্যগুণের অভাব নেই, রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই তাই। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বিসর্জন' নাটকে লিরিকের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত অভিযোগ তুলেছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন এবং নাটকে কবিত্বগুণ অনুপ্রবেশের মাত্রা তিনি বুঝতেন ও তার যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই কারণেই কি আমরা রবীন্দ্রনাথের বা শেক্‌স্‌পীয়রের কিছু নাটককে কাব্যনাট্য বলবো! রবীন্দ্রনাথের কাহিনীধর্মী কিছু কবিতার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে, উদাহরণ হিসাবে 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'পতিতা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতার কথা আমাদের মনে পড়বেই। কী বলবো তাহলে আমরা এদের—নাট্যকাব্য! আসলে এইভাবে কাব্যিক ও নাটকীয় গুণের মাত্রা সন্ধান করে বা কাব্য ও নাটকের সমস্বত্ব মিশ্রণ হিসাবে গ্রহণ করে এই শ্রেণীটির প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। কারণ যখন একটা নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা দেখা দিতে থাকে, একটি নতুন মানসিক আন্দোলন গভীরতা লাভ করতে থাকে—তা প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্যই থাকুক, তখন সঠিক কী মানসিকতার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটতে শুরু করে, সেটা জানাই বেশি দরকার। অন্য দৃষ্টিতে তাকে বিচার করলে অর্থাৎ প্রেক্ষিতহীন বিচার করতে গেলে এই ধরনের বিভ্রান্তি জাগাই সম্ভব।

প্রথমত, কাব্যনাট্য উদ্ভবের নেপথ্যে আছে একটি সাহিত্যিক আন্দোলন যা পরিচিত হয়েছে সুর-রিয়ালিস্ট বা অধিবাস্তবতাবাদী আন্দোলন হিসাবে। এই আন্দোলনের উদ্ভব সেই বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা উদ্ভূত হয়েছিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং গুস্তাভ ফ্লবেয়ারকে যার পথিকৃৎ মনে করা হয়। বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইবসেন বা জর্জ বার্নার্ড শ সমাজসমস্যামূলক বা বাস্তব জীবননির্ভর যে নাটক রচনা

কেবল সেই জন্যই তিনি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ছন্দে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিষয়ের মর্যাদা অনুযায়ী ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিসমৃদ্ধ অপ্রচলিত তৎসম শব্দ যথা—

"দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে!"

এই ভাষার সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দেই কবির 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করলে, তিনি ভাব অনুযায়ী ভাষার কী পরিবর্তন করেছেন বোঝা যাবে—

"কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায়রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে!"

সুতরাং সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিভিন্ন লক্ষণের আলোকে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সম্ভবত সার্থক সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি দান করা যায়।

জ. নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য

এই প্রকরণটি তন্ময় কবিতা অথবা মন্ময় কবিতা, কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে, এও যেমন একটি সমস্যা, তেমনি সমস্যা এটি নাটক অথবা কবিতা—এই দুই প্রধান গোত্রের কার বেশি আত্মীয়। সমস্যা দুটি পৃথক নাম নিয়েও; কাব্যনাটক হিসাবেই যাকে অভিহিত করা যেতো এবং হয়তো সমীচীনও হতো, তাকে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য নাম দিয়া দুটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে নির্দেশ করায় বিভ্রান্তি বেড়েছে বই কমেনি। পার্থক্যের সূত্র কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটা ইঙ্গিত অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যের রূপ-রীতি' গ্রন্থের পাদটীকায় দিয়েছেন—"কাব্যনাট্য বলতে যদি কাব্যপ্রধান নাট্য বোঝায় তাহলে বেশি পরিমাণ কাব্যনির্ভর নাটককেই বলবো কাব্যনাট্য। অনুরূপভাবে নাট্যপ্রধান কাব্য হলো নাট্যকাব্য। কিন্তু কাব্যনাট্য বলতে যদি কাব্যমিশ্রিত নাট্য বুঝি তাহলে সেখানে নাট্যগুণ বেশি বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে নাট্যকাব্যেও কাব্যগুণ বেশি বুঝতে হবে।"

মন্তব্যটিকে একটু ভাষা-ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বললে এরকম দাঁড়াবে যে, দুটি সমাসবদ্ধ পদকেই যদি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ধরি তাহলে তার মানে দাঁড়ায় একরকম, আবার যদি তাকে ধরি সাধারণ কর্মধারয় তাহলে অর্থ হবে আর এক রকম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাট্যকাব্য হবে মূলত কাব্য, নাট্যস্বভাব তার বিশেষণ মাত্র; এবং কাব্যনাট্য হবে মূলত নাট্য, কাব্যস্বভাব তার বিশেষণ। সমস্যা আরো বাড়ে যখন কেউ কেউ একে দ্বন্দ্বসমাস হিসাবে গ্রহণ করতে চান, অর্থাৎ তা নাটক ও কাব্যের সংমিশ্রণ। সুতরাং কথাটা আর একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মনে করি।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার পদ্য এবং কবিতা যেমন এক জিনিস নয়, উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ এবং নাটকও এক জিনিস নয়। মধ্যযুগে সবই পদ্যে লেখা হতো, কিন্তু পদ্যে লেখা বলেই বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থকে আমরা কবিতা বলি না, ঠিক একই কারণে উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে লেখা হলেও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নাটক নয়। আসলে পদ্য একটা মাধ্যম, কবিতা এক পৃথক সাহিত্য-

অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সময় এবং গদ্যমাধ্যমের প্রতিষ্ঠার পর নাটকে কঠিন ও কঠোর গদ্য এসে গেল মাধ্যম হিসাবে। এতে জীবনের আংশিকতা বা সাময়িক উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলবার মাধ্যম একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের যে অন্তর্লীন সমস্যার যোগফলে এক সমগ্র জীবননাট্যের সৃষ্টি হয় তার রূপ ধরবার ক্ষমতা সে ভাষায় থাকলো না। এর জন্য প্রয়োজন সঙ্কেতময় ব্যঞ্জনাধর্মী একরকম গভীর ভাষা—উচ্চস্তরের কবিপ্রতিভাই যে ভাষা সৃষ্টি করতে পারে।

সপ্তমত, কাব্যনাট্যের স্রষ্টারা যে কথা বলেননি কিন্তু নিষ্ঠ পাঠক যে কথা বুঝতে পারেন তা হল, সাহিত্যধর্মে এরা ততোটা নাটকীয় নয়, যতোটা কবিতা। জীবনের দৃশ্য ও অভিনেয় রূপ, জীবনের 'বক্তব্য' অনুভূতি অপেক্ষা তার অন্তর্লীন রূপ, কিছু 'অব্যক্তব্য' অনুভূতিই কাব্যনাট্যের আশ্রয় করতে চান। ফলে অনুভূতিশীল একক পাঠকের মনে তারা যে সংবেদন জাগায়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর একদল দর্শককেও তার অভিনয় দেখিয়ে ততোটা অভিভূত করতে পারে না। এই কারণেই সমালোচকগণ এ নিয়ে এখনও বিবাদ করছেন যে কাব্যনাট্যকে আমরা closet drama কিম্বা Reading drama বলবো না কেন—একাকী নির্জন পাঠেই তো তা বেশি উপভোগ্য।

কাব্যনাট্যের সজীব সম্ভাবনাকে বাস্তবতার দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে টি. এস্. এলিয়ট, এ কথা প্রায়ই বলা হয় এবং সে কথা অনেকটাই ঠিক। কবি এলিয়ট কাব্যের আসর ত্যাগ করে নাটকের মঞ্চে এসেছিলেন সচেতন ভাবেই, তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল আয়াম্বিক ছন্দস্পন্দের ভাষা। মঞ্চে এসেছিলেন বলাটা একটু ভুল হল বোধ হয়, তিনি এসেছিলেন গীর্জায়—তাঁর 'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল' অবশ্যই ধর্মীয় নাটক। তবে প্রতিষ্ঠার আগেও একটা প্রস্তুতির পর্ব থাকে এবং তারও আগে থাকে বোধহয় সম্ভাবনার অস্তিত্ব। সপ্তদশ শতকের কবি জন মিলটন প্রাচীন গ্রীক নাটক অনুসরণ করে লিখেছিলেন যে নাটক 'স্যামসন অ্যাগনিস্টেস' তার সঙ্গে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল'-এর খুব একটা পার্থক্য বোধহয় নেই। ভিকটোরীয় যুগে কবি সুইনবর্ণও প্রায় একইভাবে লিখেছিলেন 'অ্যাটলান্টা ইন ক্যালিডন'। এলিয়টের ঠিক আগে ইয়েটসের ভাবগভীর নাটকগুলিও সার্থক কাব্যনাটক হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে এবং এই একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মেটারলিঙ্ক এবং সিঞ্জের নাম।

ইংরেজি নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যনাটকের প্রধান পুরুষ হিসাবে যেমন স্বীকার করা হয় এলিয়টকে, তেমনি প্রায় এক ধরনের সম্মানই পেয়ে থাকেন স্পেনের লোরকা, ফ্রান্সে ক্লোদেল ও কক্‌তো, ইটালিতে দানুন্‌ত্‌সিও এবং জার্মানিতে হফমান্‌স্থাল প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য এখনও বিশেষভাবে পরিণত, এ কথা বলা শক্ত। সার্থক কাব্যনাট্য রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর নাম আমরা করতে পারি। তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি' এবং 'কাল সন্ধ্যা' কাব্যনাট্যের সূচনারেখা নির্দেশ করবে বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' বা 'বিদায় অভিশাপ' কিংবা 'গান্ধারীর আবেদন' জাতীয় রচনাকে কাব্যনাট্য বলা ঠিক হবে কিনা এ বিষয়ে সমালোচকদের যতোই সংশয় থাক, প্রকৃত কাব্যনাট্যের বীজ যে এদের মধ্যেই নিহিত আছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কাব্যনাট্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে একেবারে তুচ্ছ করার মতো নয়। রাম বসু, আলোক সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনায় এখন উল্লেখযোগ্য নাম।

ঝ. নাটকীয় একোক্তি

ইংরেজি কাব্যের প্রভাবে বা দৃষ্টান্তে বাংলা কবিতায় যেসব বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে তাদের অন্যতম, নাটকীয় একোক্তি বা Dramatic Monologue। মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যেমন একক পত্রের মাধ্যমে এক-একটি পৌরাণিক নারী নিজেদের প্রণয় বা অন্যান্য অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, এই ধরনের কবিতাতেও কোনো চরিত্র অন্য কারো কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে। আত্ম-ভাষণ বা soliloquy-র সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, আত্মভাষণে অন্য চরিত্রের উপস্থিতি ছাড়াও কোনো ব্যক্তি নিজের মনে স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করতে পারেন। কিন্তু নাটকীয় একোক্তিতে একজনের অনুভূতি প্রকাশের সময় আমাদের অন্য চরিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো রকম সন্দেহ উপস্থিত হয় না। এমনকি একথাও বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় অন্য চরিত্রের জন্যই বা অন্যচরিত্র কর্তৃক উদ্বুদ্ধ এবং প্ররোচিত হলেও আসলে এটি কাব্যিক ব্যাপার। নিজের মনের অনুভূতি ব্যক্ত করা হয় বলে একে হয়তো মন্ময় কবিতা বলাই শোভন হতো, কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে একটি নাটকীয় সজ্জা আছে—অর্থাৎ অন্য চরিত্রের প্ররোচনা বা উপস্থিতি এবং আত্মকথনের পরিবর্তে এটি অন্য কারো প্রতি সংলাপ, সেজন্য একে তন্ময় কবিতার একটি শাখা হিসাবে গ্রহণ করাই সংগত হবে বলে মনে হয়।

ইংরেজি সাহিত্যে নাটকীয় একোক্তির বেশ কিছু ভালো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রবার্ট ব্রাউনিং-এর বেশ কিছু কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা 'দি লাস্ট রাইড টুগেদার', 'ফরফিরিয়াজ লাভার', 'মাই লাস্ট ডাচেস' প্রভৃতি। এলিয়টের 'জেরোনেশন' কবিতাটিও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই জাতীয় কবিতার শ্রেষ্ঠ শিল্পী যে ব্রাউনিং, সে কথা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাংলায় এই ধরনের কবিতার সংখ্যা অল্প, তবে একেবারে নেই এমন কথা বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'চাষীর ঘরে', মোহিতলাল মজুমদারের 'নাদির শাহের শেষ' প্রভৃতি বাংলা কবিতায় নাটকীয় একোক্তির উদাহরণ।

তন্ময় কবিতার সূক্ষ্ম বিভাগ বর্ণনা করতে গেলে আরো যে কিছু শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যাবে না এমন নয়, তবে সাহিত্যের প্রবেশিকা-গ্রন্থের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয় বলে আমরা অতঃপর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রকরণ নাট্যসাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায় — নাটক

ক. সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটকের বিশেষ গুরুত্ব—নাটকের দ্বন্দ্বময়তা—নাটকের বস্তুধর্মিতা—নাটকের দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব: এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণা—নাটককে সম্মিলিত শিল্পকলা বলার কারণ — অভিনয়ের ওপর নাটকের শিল্পসাফল্য নির্ভর করে কেন। খ. নাটকের উৎস ও প্রাচীনত্ব—এ বিষয়ে প্রাচ্য ধারণা—এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ধারণা—গ্রীক নাটক থেকে ইংরেজি নাটকের বিবর্তন। গ. বাংলা নাটকের জন্ম—সংস্কৃত নাটকের আদর্শ—বাংলা নাটকে সংস্কৃত আদর্শ রক্ষিত হয়েছে কিনা—মধ্যযুগীয় যাত্রা ও পালাগান—যাত্রাগানের সঙ্গে বাংলা নাটকের সম্পর্ক—বাংলার নাটকের সঙ্গে পাশ্চাত্য থিয়েটারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কিনা—পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ: ত্রিবিধ ঐক্য—ত্রিবিধ ঐক্য এবং গ্রীক, ইংরেজি ও বাংলা নাটক। ঘ. নাটকীয়তা কাকে বলে—অতিনাটকীয়তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—নাট্যশ্লেষ বলতে কী বোঝায়। ঙ. মেলোড্রামা বা অতিনাটক চ. নাট্যিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিচার—বাহ্যিক দ্বন্দ্ব—দৈব, রাজশক্তি বা সমাজ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম—দুটি একক মানুষের দ্বন্দ্ব—দুটি ভাব বা আদর্শের দ্বন্দ্ব—ব্যক্তির অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব। ছ. নাটকের বৃত্তগঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়: নাটকের পরিমিত আয়তন—পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিভাগ-বণ্টন—গ্রীক নাটকের অঙ্গবিভাগ—সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক বিভাগ—ইংরেজি নাটকের অঙ্ক বিভাগ—ইংরেজিতে সনাতন পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক বিভাগের বিস্তৃত প্রকৃতি ব্যাখ্যা: Exposition– Rising action– Climax– Falling action– Catastrophe— বাংলা ও ইংরেজি নাটক সহযোগে এইসব অঙ্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা—নাট্যবৃত্তের পিরামিড-গঠন—এই গঠনের সমালোচনা ও ব্যতিক্রম—সমান্তর ও বিপ্রতীপ বৃত্তগঠন। জ. নাটকের চরিত্রসৃষ্টি—'চরিত্র' সৃষ্টির মূলকথা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ—চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য: সংহতি—অপ্রয়োজনীয় আচরণ ও সংলাপ বর্জন—নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গি—অ্যারিস্টটলের ধারণা—সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশ—নায়ক ও নায়িকা চরিত্র—খলনায়কের চরিত্র—হাস্যরসাত্মক চরিত্র—পার্শ্বচরিত্র। ঝ. নাটকের সংলাপ—ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্তসহ—স্বগতোক্তি। ঞ. নাটকের বিভিন্ন বিভাগ। ট. একাঙ্ক নাটকের সাধারণ পরিচয়—বাংলা নাটকে এর পূর্বাভাস—একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ—একটি একাঙ্ক নাটকের বিশ্লেষণ। ঠ. ট্র্যাজেডির সাধারণ পরিচয়—ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই কেন—ট্র্যাজেডির লক্ষণ: অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা—ট্র্যাজেটির নায়ক—ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডি—একটি বাংলা ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ—হিরোইক ট্র্যাজেডি বা হিরোইক ড্রামা। ড. কমেডির লক্ষণ—কমেডির বিভিন্ন বিভাগ—রোম্যান্টিক কমেডি—স্যাটায়ারিক কমেডি—কমেডি অব ম্যনার্স—ফার্স বা প্রহসন—একটি বাংলা প্রহসন—বাংলা কমেডি—একটি বাংলা কমেডির বিশ্লেষণ—ট্র্যাজি-কমেডি—ব্ল্যাক কমেডি। ঢ. ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণ পরিচয়—এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত—ঐতিহাসিক নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ—একটি বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বিশ্লেষণ। ণ. পৌরাণিক নাটক—পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ—একটি বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিচার। ত. সামাজিক নাটকের সাধারণ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য—একটি বাংলা সামাজিক নাটকের বিশ্লেষণ। থ. চরিত-নাটক—বায়োগ্রাফি ও হ্যাজিওগ্রাফিকের পার্থক্য—একটি বাংলা চরিত-নাটক। দ. লোকনাট্য—লোকনাট্যের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ। ধ. রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক—এই দুই ধরনের নাটকের পার্থক্য—বাংলা রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক—একটি বাংলা রূপক নাটকের ব্যাখ্যা—একটি বাংলা সাঙ্কেতিক নাটকের বিচার। ন. নৃত্যনাট্য—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নৃত্যনাট্য। প. শ্রুতি নাটক ও বেতার নাটক—শ্রুতি নাটক ও বেতার নাটকের পার্থক্য। ফ. নাট্য-আন্দোলন—নাট্য-আন্দোলনে উদ্ভূত কিছু বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক—অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক—এর প্রকৃতি উপস্থাপন—একটি অ্যাবসার্ড নাটকের বিশ্লেষণ—থার্ড থিয়েটার—গণনাট্য।

ক. সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটক

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সম্ভবত নাটকই একমাত্র প্রকরণ যার সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং

প্রায় সর্বজনস্বীকৃত শিল্পরূপ বা art-form আছে। শিল্পরূপে বৈচিত্র্য আছে অনেক রকম, স্বাধীনতাও কিছু আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাকে প্রাথমিকভাবে উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ হতে হবে—এই প্রাথমিক শর্ত এখনও পর্যন্ত কেউ ভঙ্গ করেননি। অর্থাৎ উপন্যাস রচনায় যেমন বিভিন্ন শিল্পরূপের পরীক্ষা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে একালের সুবোধ ঘোষ পর্যন্ত যেমন সংলাপের অংশ কখনও কখনও নাটকের মতো উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধেই রচনা করেছেন, নাটক সেভাবে কখনও সাম্যান্যতম অংশেও সংলাপ বর্জনের দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারেননি। অবশ্য তা বলে একথাও সত্য নয় যে নাটকের শিল্পরূপ বজায় রাখলেই, অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে রচনা করলেই তা নাটক হবে। যে সাহিত্য-প্রকরণের একমাত্র আশ্রয় সংলাপ, সেখানে সংলাপের গুরুত্ব যে কতো বেশি সে কথা উপযুক্ত স্থানে ব্যাখ্যা করা যাবে।

নাটকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব কাকে দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। অনেকেই মনে করেন নাটকের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার দ্বন্দ্বময়তা। জীবন যখন শান্ত ও নির্দ্বন্দ্ব, তখন সেই জীবনের অনুভূতি নিয়ে কবিতা লেখা যায়, উপন্যাসও লেখা যেতে পারে, কিন্তু যে জীবন দ্বন্দ্বময় নয় তা নাটকের বিষয় হতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব অবশ্য স্থূল ও বাস্তব সংগ্রামের না হয়ে ভাবগত বা আদর্শগত হতে পারে—আধুনিক নাটকে সেটাই আমরা আশা করি, কিন্তু নাটকের পক্ষে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য।

অনেকে মনে করেন নাটকের প্রধান গুণ তার objectivity বা বস্তুধর্মিতা। কবিতায় কবি তাঁর মনের অনুভূতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেন, উপন্যাসেও লেখক নিজে উপন্যাসের পটভূমি বর্ণনা করতে পারেন, চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন—কিন্তু নাট্যকারের অধিকার অনেক সীমিত। তাঁর হাতে থাকে কেবল কিছু চরিত্র, তাঁর যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে সেই চরিত্রগুলিই। কিন্তু এক্ষেত্রেও নাট্যকার তাঁর নিজের বক্তব্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে যেমন খুশি প্রকাশ করতে পারেন না, কারণ চরিত্র একবার সৃষ্টি হয়ে গেলে চরিত্রগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও তৈরি হয়ে যায়। কাজেই তারা কী বলতে পারে বা কী আচরণ করতে পারে তার একটা ধারণাও আমাদের মনে তৈরি হয়ে যায়। কোনো চরিত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কথা না বললেই তা আমাদের অসংগত লাগে। এই জন্যই নাট্যকারকে বস্তুধর্মী দৃষ্টি বজায় রাখতে হয়, দর্শকের যেন কখনই মনে না হয় যে চরিত্রগুলি নাট্যকারের হাতের পুতুলমাত্র—নাট্যকারের কথাই তারা বলে যাচ্ছে। কবির বিভিন্ন কবিতা পড়ে তাঁর সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করতে পারি কিন্তু নাট্যকার তাঁর কোনও নাটকেই নিজে ধরা দেবেন না, এটাই তাঁর সাফল্যের অন্যতম উপায়। এই গুণেই শেক্‌স্‌পিয়র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সে কথা ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর একটি কবিতায় উল্লেখও করেছেন।

অবশ্য নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য-প্রকরণের একটা প্রধান পার্থক্য, এবং তাকে নাটকের বিশিষ্ট প্রকৃতিও বলা যায়, নাটকের দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব। এই প্রধান লক্ষণটিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, প্রাচীন-আধুনিক সমস্ত সমালোচকই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাটককে অন্যান্য প্রকরণ থেকে পৃথক করবার জন্য একে আখ্যা দিয়েছেন 'দৃশ্যকাব্য'। আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্রও নাটকের বিষয়গত পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, জীবনের যে অনুভূতি দৃশ্য—অর্থাৎ কথায় ও আচরণে যা অন্যের কাছে ব্যক্ত হতে পারে, একমাত্র তাই নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল নাটক বলতে প্রধানত

গুরুত্ব দিয়েছেন ট্র্যাজেডিকে এবং ট্র্যাজেডির যে সংক্ষিপ্ত-গভীর আলোচনা করেছেন তাঁর ক্ষুদ্রায়তন 'পোয়েটিক্‌স্' গ্রন্থে, তাতে অভিনেয়ত্বকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। পোয়েটিক্‌স্ গ্রন্থেই অ্যারিস্টটল নাটককে ষড়ঙ্গ বলেছেন। তাঁর উল্লিখিত নাটকের ছটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ হল দৃশ্যসজ্জা, বাচন এবং সংগীত—যাদের দৃশ্যত্ব সৃষ্টি করার উপাদান হিসাবেই ভাবা যেতে পারে। এই তিনটি উপাদান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তার ইংরেজি ভাষান্তর পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে—"The spectacle (or stageappearance of the actors) must be some part of the whole, ... Here by 'Diction' I mean merely this the compostion of the verses; and by 'Melody' what is too completely understood to require explanation."

অ্যারিস্টটলের অন্য তিনটি উল্লিখিত অঙ্গ হল বৃত্ত (গঠনের সঠিক সজ্জা), চরিত্র ও চিন্তা।

আসলে উৎকৃষ্ট কবিতা একাকী পাঠ করেই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, ভালো উপন্যাস বা ছোটগল্প সম্পর্কেও সেই একই মন্তব্য করা যায় কিন্তু, কোনো কোনো নাটক পড়তেও ভালো লাগে, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে অভিনয়ের সাফল্যের ওপরই নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এই কারণেই নাটককে Performing art, Composite art ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে ওয়র্স্‌ফোল্ডের মন্তব্য: "The drama is therefore, a composite art in which the author, the actor and the stage manager all combine to produce the total effect." অনেক সময় অভিনয়ের দিক থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটকও তেমন সফল হয় না যেমন সাফল্য লাভ করে অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটক এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করে অনেক সমালোচক নাটকের দৃশ্যত্বের বা অভিনেয়ত্বের ব্যাপারটাকে লঘু করতে চান। অভিনয়ের ব্যর্থতা যদি অভিনেতাদের ব্যর্থতা না হয় তবে কিন্তু তাকে নাটকেরই ব্যর্থতা বলতে হবে, তার প্রাথমিক কারণ, নাটক অভিনীত হবার জন্যই লেখা হয়—পাঠ করবার জন্য নয়, হলে তাতে মঞ্চনির্দেশ থাকতো না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, অভিনয়ে ব্যর্থ হওয়া মানেই চরিত্রগুলি দর্শকের কাছে তাদের আচরণে ও সংলাপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, কাহিনী তাঁদের আকর্ষণ করেনি এমনও হতে পারে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকার যথেষ্ট যত্নবান হননি, চরিত্রের সংলাপ যাতে চরিত্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক হয় সে কথা ভাবেননি, অথবা নাটকের বস্তুধর্মিতা বজায় রাখবার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাননি—ইত্যাকার বহুবিধ কারণেই এ ব্যাপার ঘটতে পারে; কিন্তু অভিনয় আকর্ষণীয় না হলে সে ত্রুটি নাট্যকারেরই—এ কথা নাট্যকার যতো বেশি মনে রাখবেন ততোই তাঁর এবং নাটকের মঙ্গল। আধুনিককালে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই কারণেই নাটকের অভিনেয়ত্ব বা দৃশ্যত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এলিজাবেথ ড্রু-এর মতে—"Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre." মার্জারি বোলটনের মত, "It is a literature that walks and talks before our eyes."

অভিনয়কে সংস্কৃত আলংকারিকগণও যে অত্যন্ত মূল্য দিতেন তা এই প্রকরণের 'দৃশ্য কাব্য' নাম থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া নাট্যাচার্য ভরত যে নাট্যসৃষ্টিকে 'রূপক' আখ্যা দিয়েছেন তার মূলেও এর অভিনেয়ত্ব। অভিনেতা এখানে অন্যের রূপ গ্রহণ করে অভিনয় করেন বলেই একে বলা হয়েছে রূপক। অভিনয় সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকদের বিশেষ নির্দেশেও বোঝা যায় একে

নাটকের পক্ষে কতো তাৎপর্যপূর্ণ তারা মনে করতেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী চার রকম অভিনয়ের কথা তারা বলেছেন—আঙ্গিক (অর্থাৎ আচার-আচরণ ও অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা অভিনয়), বাচিক (বাক্য দ্বারা অর্থাৎ সঠিক সংলাপের উচ্চারণের দ্বারা অভিনয়), আহার্য (সাজসজ্জার দ্বারা মায়া সৃষ্টি করা) এবং সাত্বিক (অভিনয়ের দ্বারা অনুভূতির সৃষ্টির প্রতি সজাগ থাকা)।

খ. নাটকের উৎস

মহাকাব্যের মতো নাটকও এক সুপ্রাচীন সাহিত্য-প্রকরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসই বহু প্রাচীন। নাটকের সঠিক উৎস অর্থাৎ তার 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণের' সন্ধান দেওয়া অসম্ভব। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত একে বলেছেন 'পঞ্চম বেদ', অর্থাৎ বেদের মতোই প্রাচীন। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ রচনা করেছিলেন খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে, তখনই তিনি শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাট্যকারদের নাটক পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছেন।

নাটকের উদ্ভব ঠিক কতোটা প্রাচীন, সে কথা বলা না গেলেও নাট্যসৃষ্টির আদিতে যে আছে নৃত্য এবং সংগীত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পুরাণ অনুযায়ী ভারতীয় নাটকের আদি অভিনয় হয়েছিল দেবলোকে। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ বিজয় উপলক্ষে মঙ্গলসূচক কিছু শ্লোকের পর যুদ্ধের কয়েকটি দৃশ্য অভিনীত হয়। এরপর ব্রহ্মার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করলে বিভিন্ন বেদের অংশ সেখানে গীত ও অভিনীত হতে থাকে।

পুরাণের অলৌকিক তথ্যাদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানতে পারি এ দেশের অনার্য সম্প্রদায়ও নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে নৃত্য এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নৃত্যশিক্ষা অনেক পরিবারে আবশ্যিক বলেই গণ্য হয়। মনে হয় আর্যগণ ক্রমে এইসব নৃত্য ও সংগীত নিজেদের সমাজে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে কিছু সংলাপ যোজনা করে একে নাট্যের আকৃতি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে উৎসাহী গবেষকগণ মনে করেন ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত যম-যমী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, পুরুরবা-উর্বশী প্রভৃতি সূক্ত ভারতীয় নাটকের আদি উৎস। উপনিষদে এরকম নাটকীয় কাহিনী অবশ্য অনেক আছে, এদের মধ্যেও নাট্যবীজ আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য নাটকের জন্মভূমি যে গ্রীস এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে প্রাচীন গ্রীস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডিত্যে ও দর্শনে যেমন তাঁরা অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলেন, শিল্পসাহিত্যেও তাদের উন্নতি ঘটেছিল বিস্ময়কর ভাবে। অন্যান্য গ্রীক শিল্পকলার মতোই গ্রীক নাট্যকলারও প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল প্রাচীনকালেই। গ্রীক নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, সমবেত সংগীত বা Choral song থেকেই নাটকের উৎপত্তি। ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে যখন কোনো পূজাপাঠ হতো, তার অঙ্গ হিসাবেই নাটকের অভিনয় হতো। সমবেত সংগীত থেকে একক সংগীতনির্ভর সংলাপ কীভাবে গ্রীক নাটকে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারপর সংলাপ-বলা অভিনেতার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, তার আভাস দিয়েছেন অ্যারিস্টটল।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীনকালে ধর্মের সঙ্গে নাটকের সংযোগ ছিল অচ্ছেদ্য। মধ্যযুগে দক্ষিণভারত ও অন্যান্য স্থানে যেসব দেবমন্দির নির্মিত হয় তার সম্মুখভাগে একটি করে নাট্যমন্দিরও স্থান পায়। পূর্ব ভারতেও এই প্রথা ছিল। বাংলায় পুরনো যাত্রাপালা, কথকতা ইত্যাদিরও বিষয় প্রধানত ধর্মাশ্রিতই হতো, তবে বিদ্যাসুন্দর-নির্ভর লৌকিক পালাও কিছু দেখা যায়।

ইংরেজি নাটকের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। গ্রীক ও লাতিন ধ্রুপদী নাটকের আদর্শে মূলত শেক্‌স্‌পীয়রের হাতেই ইংরেজি নাটকের জয়যাত্রা শুরু, অবশ্য তার আগেও যে ইংরেজি ভাষায় নাট্যপ্রয়াস দেখা যায় না এমন নয়। উপযুক্ত পূর্বসূরীর অভাব সত্ত্বেও শেক্‌স্‌পিয়র শুধু যে ইংরেজি সাহিত্যে নাটকের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন তাই নয়, নিজে এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন। তিনি গ্রীক নাট্যকলা থেকে স্বতন্ত্র এক নাট্যাদর্শের সৃষ্টি করলেন যা ইংরেজি নাট্যাদর্শ বা শেক্‌স্‌পিরীয় রীতি নামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। শেক্‌স্‌পিয়রের পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেরিডান ও গোল্ডস্মিথের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাস্তবতাবাদী আন্দোলন ইংরেজি নাটকের এক দিক্‌-পরিবর্তন সূচিত করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে আছেন জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি, জর্জ বার্ণার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি।

গ. বাংলা নাটকের জন্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, হেরাশিম লেবেডফ নামে এক রুশ নাট্যরসিক দুটি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বাংলা নাটকের জন্ম আরো অনেকদিন পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'-কেই বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত বলা চলে। অবশ্য মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সমর্থ নাট্যকারদের আবির্ভাবে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে কী ধরনের নাট্যাদর্শ নিয়ে বাংলা নাটক সৃষ্ট হয়েছে সে কথা জানা থাকলে বাংলা নাটকের বিচার ও সেই বিচারের একটা মানদণ্ড নিরূপণ আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারে।

সংস্কৃত নাটকে একটি বিশেষ ক্রম ও আঙ্গিক—এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলবার ব্যাপার আছে। এই ক্রমানুসারে প্রথমে থাকে মঙ্গলাচারণ, তারপর সভাপূজা, অতঃপর কবিসংজ্ঞা বা নাটকের বিষয় সম্বন্ধীয় কথা ও প্রস্তাবনা। মঙ্গলাচরণের সূত্রধার অবশ্যই একজন অভিনয়দক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হবেন এবং অভিনয় যাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় সেজন্য নান্দীপাঠ করবেন। অন্য দুটি ক্রম উপস্থাপিত হবার পর আরম্ভ হয় মূল নাটক। সংস্কৃত নাটকের ভাষা গদ্য বা পদ্য, অথবা পদ্যমিশ্রিত গদ্যও হতে পারে। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকে সংস্কৃত বলবার অধিকার ছিল শুধু বিদ্বান পুরুষ চরিত্রের; মহিলা ও অন্যান্য পুরুষ চরিত্র সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন। নাটকের বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল তা পুরাণখ্যাত বা কোনো প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত হবে, অবশ্য কল্পিত কাহিনীর প্রতি কোনরকম নিষেধাজ্ঞা

ছিল না। নাটকের নায়ক কেমন হবেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তাঁরা হবেন চার শ্রেণীর—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত অথবা ধীরোদ্ধত। 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে এই শ্রেণীগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না, হর্ষবিষাদে অভিভূত হয় না, বিনয় দ্বারা গর্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে, যাহা অঙ্গীকার তাহা নির্বাহ করে, তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে। যথা—যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র। যাহার নায়কসামান্য অনেক গুণ আছে, তাহাকে ধীরপ্রশান্ত কহে। যথা—ললিতমাধবাদিতে মাধবাদি। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহংকার ও দর্পে পরিপূর্ণ ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ ব্যক্তি ধীরোদ্ধত। যথা—ভীমসেন। যে ব্যক্তি নিশ্চিত, নম্র এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত, তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা—রত্নাবলীতে বৎস রাজাদি।" নাটকের প্রধান রস হবে শৃঙ্গার বা বীর, বিকল্পে শান্ত রসও থাকতে পারে; কিন্তু করুণ রস কখনই থাকবে না। পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি থেকে দশটি অঙ্ক থাকতে পারে, অবশ্য প্রত্যেকটি অঙ্কে কটি গর্ভাঙ্ক থাকবে তার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই।

বাংলা নাটক একেবারে সূচনায় কিংবা বলা যেতে পারে অপ্রস্তুত সূচনা-পর্বে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ মনে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং তার ফলে তা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই সূচনা-পর্বের শক্তিশালী নাট্যকার মধুসূদন জানিয়েছিলেন যে তিনি 'সাহিত্য দর্পণ'-এ প্রদত্ত আচার্য বিশ্বনাথের নির্দেশ মেনে চলবেন না । পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে কিছুদিন পর্যন্ত 'প্রস্তাবনা' নামে একটি পৃষ্ঠা উৎসর্গ করার প্রথা শুধু রক্ষিত হয়েছে, আর কিছু নয়।

যাত্রা ও পালাগানের একটা ঐতিহ্য অবশ্য বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যায়। কারণ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকেই পালাগানের প্রচলন গবেষক লক্ষ করেছেন। তবে লৌকিক পালাগান এবং নিম্নতর সমাজে মনসা, ধর্মরাজ বা শিবঠাকুরের পালা গাওয়ার রীতি আরো পূর্বের হতে পারে। উচ্চতর সমাজে কৃষ্ণবিষয়ক ও রামায়ণবিষয়ক পালা প্রচলিত ছিল। রামায়ণ অবশ্য পাঁচালি হিসাবেই গীত হয়ে আসছে—কৃত্তিবাস নিজেও ছিলেন পাঁচালি গায়ক। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রভৃতি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত রচনা। সপারিষদ শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণলীলা অভিনয় দেখতেন, এ উল্লেখ আমরা পেয়েছি। এগুলি অবশ্য নাট্যগীতের পর্যায়ভুক্ত বলাই ভালো। এ থেকেই পালায় বাঁধা যাত্রার উদ্ভব ঘটে, কিন্তু তাতেও গানের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকতো না বলে এগুলি পালাগান বা যাত্রাগান নামেই পরিচিত।

বাংলা মঞ্চনাটকের সঙ্গে মধ্যযুগে প্রচলিত তিনদিক খোলা প্রাঙ্গণ (অনেক সময় চারদিকই খোলা) উচ্ছ্বাসময় সংগীতবহুল যাত্রাগানের সম্পর্ক অত্যন্ত কম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দৃশ্যের সংখ্যা অনেক কমিয়ে এবং দৃশ্যসজ্জার ওপর একেবারেই গুরুত্ব আরোপ না করে বাংলা নাটককে যাত্রাগানের ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাত্রাগানের সঙ্গে বাংলা মঞ্চনাটকের যে বিশেষ কোনও সংযোগ নেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

আসলে বাংলা নাটক থিয়েটার অর্থাৎ ইংরেজি নাটকের আদর্শেই যে গড়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। নাটকের গঠনে, প্রয়োগে ও আদর্শে ইংরেজি নাটক বা শেক্স্পীয়রীয় নাটকের দৃষ্টান্ত যে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে বরাবর, এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো সফল নাট্যকার ও সমর্থ নাট্যপ্রযোজক সুযোগ পেলেই তাঁর দলের নটনটীদের শেক্স্পীয়রের নাটকের অভিনয় দেখাতেন। করুণ রসের নাটক সংস্কৃতে ছিল নিষিদ্ধ, সুতরাং করুণ রসাত্মক নাটক বা ট্র্যাজিক

সংবেদন বোধই আমরা পেয়েছি ইংরেজি নাটক থেকে। অবশ্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রীক নাটকের ধারণা বা সনাতনপন্থী ধারণা কিছু বাংলা নাটকে রক্ষিত হয়েছে। যেমন গ্রীক নাটকের আদর্শ ত্রিবিধ ঐক্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

● নাটকের ত্রিবিধ ঐক্য

গ্রীক তাত্ত্বিকদের মধ্যে ত্রিবিধ ঐক্যের ব্যাপারটা নাটকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ত্রিবিধ ঐক্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন অ্যারিস্টটল। তিনি বলেছেন আদর্শ নাটক রচনার জন্য তিনটি বিষয়ের ঐক্য বজায় রাখা দরকার—(ক) কালগত ঐক্য বা Unity of Time, (খ) স্থানগত ঐক্য বা Unity of Place এবং (গ) ঘটনাগত ঐক্য বা Unity of Action। প্রথম ঐক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে সমগ্র নাটকের ঘটনাকাল যেন চব্বিশ ঘণ্টার (Single revolution of the sun) বেশি না হয়। স্থানগত ঐক্য বলতে বোঝায়, এমন দূরত্বের স্থান যেখানে ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নাটকের পাত্র-পাত্রী যাতায়াত করতে পারে। ঘটনাগত ঐক্য বলতে বোঝায়, নাটকটি যেন আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি নিটোল কাহিনী হয় এবং এমন কোনো সুর তাতে যেন না থাকে যাতে নাটকের মূল উদ্দিষ্ট সুর কেটে যায়।

গ্রীক নাটক, বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ ঐক্য মেনে চলার চেষ্টা করেছে, ইংরেজি নাটক করেনি। ঔপন্যাসিক সমালোচক হাডসন বলেছেন, শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর দুটিমাত্র নাটকে এই ঐক্য মেনে নিয়েছেন—The Tempest এবং The Comedy of Errors নাটকে। বাংলা নাটকে, এবং ইংরেজি নাটকেও, ঘটনাগত ঐক্যের ওপর কিন্তু সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—যেখানে তা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে রসবোধেরও হানি ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহননই এই নাটকের প্রধান ঘটনা এবং সেই কারণে এই নাটকের উদ্দিষ্ট করুণ রস, অথচ মদনিকা ও ধনদাসের উপাখ্যানগুলি দর্শকের মনোহরণ করবে বুঝতে পেরে নাট্যকার মাত্রাজ্ঞান রাখতে পারেননি—বেশি মাত্রায় এই হাস্যরস পরিবেষণ করতে গিয়ে ট্র্যাজিক সংবেদন কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছেন। সাধারণভাবে স্থানগত ঐক্য বাংলা নাটকে মানা হয় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্য মেনে চলেছেন। অন্যান্য আরো অনেক দিক থেকে পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে নাটকীয় ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে বাংলা নাটকের মিল তা পরবর্তী আলোচনাক্রম থেকেই বোঝা যাবে।

ঘ. নাটকীয়তা, অতিনাটকীয়তা ও নাট্যশ্লেষ

নাট্যধারণার সঙ্গে যুক্ত কোনো ঘটনা বা অনুভূতির পরিচয় পেলেই তাকে আমরা নাটকীয় বলে অভিহিত করি, আসলে তখন ব্যাপারটা আর নাটক থাকে না, হয়ে ওঠে একটা গুণ। দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ, যখন কোনো উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে বা অসম চরিত্রের সাক্ষাৎজনিত একটি আসন্ন দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আমরা বলি উপন্যাসে নাট্যগুণ দেখা দিয়েছে বা এই অংশ 'নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ' হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা যখন শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর রাতে বনে যায়, পুরুষ-বেশী মতিবিবির সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সে দৃশ্য নবকুমার দেখে ফেলে, আমরা বলি এই অংশ নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার ' গৃহদাহ' উপন্যাসে ডিহরিতে বিপর্যস্ত অচলা যে মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বিহ্বল, তখন সকলকে নিয়ে মৃণালের সেখানে আসার ব্যাপারটাও চরম নাটকীয়।

অতিনাটকীয় বা Melodramatic কথাটি এখন নাটকের একটি ত্রুটি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উচ্চস্তরের কমেডি না হলে, মোটা দাগের হাসির নাটক হলে. যেমন তাকে আমরা বলি ফার্স, তেমনি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি হয়ে না উঠলে সেই ব্যর্থতার জন্য নাটকটিকে আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি অতিনাটক বা মেলোড্রামা। আদিতে কিন্তু কথাটির অর্থ তা ছিল না। গ্রীক ভাষায় 'মেলো' শব্দের অর্থ গান, ফলে সংগীতসমৃদ্ধ সব নাটককেই বলা হতো মেলোড্রামা, অপেরাকেও। এখন সাধারণত ট্র্যাজেডি নাটকে যখন আমরা খুব চড়ামাত্রার চরিত্র দেখি—অর্থাৎ যে ভালো সে খুব ভালো, যে খারাপ সে খুব খারাপ, আমরা তাকে মেলোড্রামা বলি। যখন ঘটনা ঘটতে থাকে একের পর এক অনেকটা অবিশ্বাস্যভাবে, তাকেও আমরা মেলোড্রামা আখ্যা দিই—যেমনটি ঘটেছে 'নীলদর্পণ' নাটকের শেষের দিকে। এছাড়া যখন সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না এমন কোনো কাকতালীয় ঘটনা ঘটে—যথা কোনও ঘটনা বা চরিত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎকার, তখন তাকে আমরা মেলোড্রামা হিসাবে অভিহিত করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন যে বিনোদিনীকে খুঁজে পাবে এ কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না, অথচ তাদের সাক্ষাৎ ঘটে একেবারে অবিশ্বাস্য ও অযৌক্তিক উপায়ে। ঋত্বিক ঘটকের অসাধারণ ছবি 'সুবর্ণরেখা'র উল্লেখও এখানে করা যায়। জীবনকে উপভোগের জন্য ভাই আসে রাতে ফুর্তি করতে। সে যে-কোন মেয়ের কাছেই যেতে পারত—কিন্তু তা সে যায় না, তাকে পাঠানো হয় তার অত্যন্ত আদরের বোনের কাছেই। এই জাতীয় অবিশ্বাস্য যোগাযোগকেও আমরা মেলোড্রামা হিসাবে অভিহিত করি।

নাট্যশ্লেষ বা dramatic irony বলা হয় তাকে, যেখানে একটি ঘটনা শ্লেষের মতোই দুটি অর্থ ব্যঞ্জিত করে। সাধারণত হয় কী, পূর্বে বলা একটি কথা ভবিষ্যতে সত্য হয়ে যায়, যা কোনো মতেই সত্য হবার সম্ভাবনা ছিল না। একে সাধারণভাবে 'ভাগ্যের পরিহাস'-ও বলে থাকি আমরা। কৌতুক ও বিষণ্নতা উভয়বিধ সংবেদন সৃষ্টির জন্যই নাট্যশ্লেষ ব্যবহার করা হয়। 'চিরকুমার সভা' নাটকে যখন চরিত্রেরা শৈলকে পুরুষ মনে করে অথচ দর্শক তার আসল সত্তা জানে, তখন সকৌতুক নাট্যশ্লেষ তৈরি হয়, আবার 'ওথেলো' নাটকে ডেসডিমোনা যখন তার সকল দুর্ভাগ্যের জন্য ইয়াগো-কে সম্বোধন করে 'Good friend, Iago' হিসাবে, দর্শক শ্লেষের জ্বালা অনুভব করে, যদিও ডেসডিমোনা-এ কথা বলে সরল বিশ্বাসেই।

ঙ. মেলোড্রামা বা অতিনাটক

মেলোড্রামা সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা দরকার এই কারণে যে আমরা মূলত অতিনাটকীয়তা নিয়ে মন্তব্য করেছি, অতিনাটক বা মেলোড্রামা নিয়ে বিশেষ কিছু বলিনি। দুটি

যে মোটেই সমার্থক নয় এ বিষয়ে সুধী সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করে রাখা খুব দরকার মনে করেই তা উদ্ধার করছি:

> "মেলোড্রামাটিক ও মেলোড্রামা এই কথা দুইটি প্রয়োগে, সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মেলোড্রামা গোটা নাটক সম্বন্ধে প্রযোজ্য আর মেলোড্রামাটিক—ঘটনা ও চরিত্রর সম্পর্কে প্রযোজ্য। যেখানে অঙ্গীরসের আলম্বন-বিভাব অর্থাৎ মুখ্য পাত্র-পাত্রী এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনা মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়ে, সেখানেই নাটকের মেলোড্রামা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।"
>
> [*এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব*: সাধনকুমার ভট্টাচার্য]

মেলোড্রামা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে স্পষ্ট করে এই কথাটি জানা দরকার যে, ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল অতি গভীর আলোচনা করলেও 'মেলোড্রামা' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি, যদিও এর প্রকৃতি ঠিক কী, সেটা তাঁর আলোচনা থেকে বুঝে নেওয়া সম্ভব। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়েই অ্যারিস্টটল বলেছেন এর বিষয় এমন নাট্যক্রিয়া যা যথেষ্ট 'সিরিয়াস'। জীবনের যে সমস্যা যত গভীর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ, তাই তত সিরিয়াস'। যে ট্র্যাজেডির ক্রিয়াসমূহ জীবনের এই গভীর স্তর বা 'inner structure' থেকে গৃহীত নয়, 'Spectacular element' সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি, তা যথেষ্ট সিরিয়াস হতে পারেনা; ফলে তাকে ট্র্যাজেডির মর্যাদাও দেওয়া যায় না। তাকে কী বলা যায় সেটা অনুমান করে সমালোচকরা 'মেলোড্রামা' নামটি দিয়েছেন অনেক পরবর্তী কালে।

'মেলোড্রামা' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ—মেলোস্ (= গান) + ড্রেম (= নাটক), অর্থাৎ সাংগীতিক নাটক। এর উৎপত্তি ইতালিতে ষোড়শ শতকের একেবারে শেষের দিকে। এই সময়ই ধ্রুপদী ট্র্যাজেডির পুনরভ্যুত্থানের জন্য অপেরার উদ্ভব ঘটে। এই জাতীয় নাটককে তখন দুই নামেই অভিহিত করা হতে থাকে, অপেরা বা মেলোড্রামা। এর প্রথম নিদর্শন ১৫৯৯ সালে রচিত 'দাফ্নে'। অষ্টাদশ শতকেও নাট্যকার Handel তাঁর এই ধরনের নাটকগুলির কোনোটিকে বলেছেন অপেরা, কোনোটিকে মেলোড্রামা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসী নাট্যকাররাই মেলোড্রামা নামে স্বতন্ত্র গোত্রের নাট্যরচনা শুরু করেন এবং সেখানে দেখা যায় বেশ চড়া সংলাপ, ঘটনার ঘনঘটা ও হিংসাত্মক ঘটনার বাড়াবাড়ি।

বিলাতি মঞ্চাভিনয়ে উনিশ শতকে যে মেলোড্রামার আধিক্য দেখা যায় তার একটা কারণ ফরাসী প্রভাব হতে পারে। ফরাসী সাহিত্যে মেলোড্রামার জনপ্রিয়তা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট, রিড, ডিকেন্যন, উইলকি কলিন্স প্রমুখের রচনার নাট্যরূপান্তরদেরও মেলোড্রামাই করে ফেলা হয়েছিল।

অসংখ্য বিদেশি মেলোড্রামার মধ্যে কয়েকটার নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি : টমাস হলক্রুফ্টের 'এ টেল অব মিস্ট্রি' ডগলাস জেরল্ডের 'ব্ল্যাক-আইড সুশান' কিংবা 'দ্য মার্ডার ইন দা রেড বার্ন, মিস ব্র্যাডনের 'লেডি অডলিদ সিক্রেট' হেনরি আরথার জোন্সের 'দ্য সিলভার কিং' প্রভৃতি।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নাটকের সমস্যা জীবনের গভীর স্তর থেকে উঠে না এলে ট্র্যাজেডি পর্যবসিত হতে পারে মেলোড্রামায়। নাট্যশাস্ত্রবিদ অ্যালারডাইস নিকল এই গভীর স্তর বা inner Structure কে বলেছেন 'inner quality' এবং সেই ভাবেই বলেছেন—'it is then

some inner qulity—the stressing of the spiritual as opposed to mere physical that makes Tragedes out of melodrame'

তবে সেই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন অধ্যাপক নিকল, এবং যেটা আমরাও বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেই মেলোড্রামা তৈরি হয়ে যায় বা ত্রুটি হিসেবে যেমন আমরা বলি ট্র্যাজেডি লাইনটিকে তিনি অতিনাটকীয় করে ফেলেছেন—ঠিক তা না করে, মেলোড্রামা লেখার সচেতন চেষ্টাতেও কেউ এই জাতীয় নাটক লিখতে পারেন। understanding Drama গ্রন্থে ব্রকস এবং হিলম্যান একথা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন বলেই তাঁদের মন্তব্য আমরা স্মরণ করব : "We should, however, guard against seeing melodrama merely a tragedy which does not coem off. Tragedy may fail to come off and yet not be melodrama. Viz. Dr. Johnson's Irene, or an author may aim only at melodrama and what he does may be good or bad melodrama" অর্থাৎ কীনা, ট্র্যাডেজি লিখতে গিয়ে পারলাম না বলেই সেটা মেলোড্রামা হয়ে গেল, এভাবে দেখাটা ঠিক নয়। ট্র্যাজেডি সার্থক হতে পারে, ব্যর্থও হতে পারে, কিন্তু তা মেলোড্রামা হয় না, দৃষ্টান্ত ড. জনসনের আইরিন। অন্যথায় এমনও হতে পারে নাট্যকার মেলোড্রামাই লিখতে চাইছেন—সেক্ষেত্রে সেটা একটা ভালো মেলোড্রামা হতে পারে, খারাপ মেলোড্রামা হতে পারে।

মেলোড্রামা নিয়ে অধ্যাপক নিকল বিশদ আলোচনা করেছেন বলেই মেলোড্রামা লক্ষণগুলি বিবৃত করার জন্য আমরা তাঁর আলোচনার কথাই মূলত মনে রাখবো। মেলোড্রামার প্রধান তিনটি লক্ষণ এইরকম মনে করা যেতে পারে—

এক।। মেলোড্রামায় প্রাধান্য থাকবে গানের, দৃশ্যাবলীর এবং চমকপ্রদ ঘটনাসম্ভারের। প্রধানত এই দিকেই নাট্যকারের নজর থাকে।

দুই।। অদ্ভুত কিছু পরিস্থিতি ও ঘটনা সৃষ্টি করে, দর্শককে বিভ্রান্ত করার একটা অনুচিত ঝোঁক (undue insistence) থাকে, অনুচিত এই জন্য বলা যায় যে ওই পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয় না।

তিন।। মেলোড্রামায় স্থূল কাণ্ডকারখানার প্রাধান্য থাকে, মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়া এত কম থাকে যে তা দর্শকের মনে গভীর কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনা।

● বাংলা সাহিত্যে একটি মেলোড্রামা

বাংলা নাট্য সাহিত্যে অবশ্যই স্পষ্টত মেলোড্রামা লিখবার সচেতন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কেউ মেলোড্রামা লেখেন নি। সেই কারণে কেবল ঘটনার ঘনঘটা বা হিংসাত্মক ঘটনার আতিশয্য দেখে আমরা দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কিংবা উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক-কে মেলোড্রামা আখ্যা দিতে পারিনা। নাট্যকারের বিভিন্ন মন্তব্য এবং উদ্দেশ্য বিচার করে, এবং অবশ্যই নাটকটি বিশ্লেষণ করে, যদি কোনো নাটককে মেলোড্রামা আখ্যা দেওয়া চলে তবে আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' নাটককে এই আখ্যা দিতে পারি। কেন, তার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তিগুলি নিবেদন করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মহৎ ট্র্যাজেডি রচনার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' নাটকে হাত দেননি। এই নাটক রচনার উদ্দেশ্যে যে একটি প্রচার—'বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান' এ কথা নাট্যকার স্বয়ং প্রচার করেছেন। এই নাটক রচনার নেপথ্যকাহিনী যাঁরা জানেন তাঁরা অবগত আছেন যে, এরকম একটি নাটক লেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন সারদাচরণ মিত্র। বাংলার পণপ্রথার কী বিষময় ফল ঘরে ঘরে দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা এবং যাঁরা এই অত্যাচারে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মনে কিছুটা আত্মগ্লানি করে দেবার জন্য এমন একটি নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত আলাপচারিতার থেকে এ কথাও জানা যায় যে, এইরকম নাটক লেখাকে তিনি মোটেই অভিপ্রেত মনে করেন নি, একটি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন, এও তাঁর ধারণা ছিলনা, বরং এরকম হীন কাজ তাঁকে দিয়ে আর কত করানো হবে, এমন অভিযোগই তিনি করেছিলেন। ফলে মেলোড্রামা লিখবার সচেতন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নি বটে, কিন্তু তাই তিনি লিখতে উদ্যত হয়েছেন, এটা পরিপার্শ্ব ও নাট্যকারের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে। অতঃপর নাটকের পরিচয়।

সংক্ষেপে নাটকের কাহিনীটি মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তিন কন্যা সন্তান এবং এক পুত্রসন্তানের জনক করুণাময় বসুর আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ নয়, আবার তেমন ভালোও নয়, চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের অবস্থা যেমন হয়ে থাকে। মেয়েদের বিবাহ-উদ্যোগের আগে করুণায়ময়-সরস্বতীর সংসারে অশান্তির বিশেষ ছিলনা, সেটা শুরু হল বিবাহ দিতে গিয়েই। খোঁজখবর নিয়েই বিয়ে দিয়েছিলেন বড়ো মেয়ে কিরণময়ীর, কিন্তু সমস্ত খোঁজই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল। কিরণময়ীর শাশুড়ি অত্যন্ত অত্যাচারী, হৃদয়হীন এবং কিরণময়ীর প্রতি সর্বদা খড়্গহস্ত। জামাইয়ের কাছে প্রতিকারের আশা ব্যর্থ, কারণ জামাই মোহিত মাতাল এবং লম্পট। সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে কিরণময়ী পিতৃআলয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল। বিয়ে চরম অশান্তির হল বটে, কিন্তু অর্থব্যয় তো নিতান্ত অল্প হয়নি, সুতরাং দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ীর পাত্রভাগ্য খুব উঁচুতে উঠল না। দ্বিতীয় পক্ষের একটি রুগ্ন বরই জোগাড় করতে পারলেন করুণাময় এবং তার ফল যা হবার তাই হল—অল্প দিনের মধ্যেই বৈধব্যদশা ঘটল হিরণ্ময়ীর। স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলেরা রত্নবিশেষ, তারা শারীরিক নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিল সৎমাকে।

দুই কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত করুণাময়, তার ওপর কন্যারা তাঁরই সংসারের গলগ্রহ। অর্থের অভাবে ছেলে ললিতের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হল। এইসময়ই ঘটল প্রথম সর্বনাশ, বাবার দুঃখে দিশাহারা হিরণ্ময়ী জলে ডুবে আত্মহত্যা করল। এমন অবস্থাতেও অনূঢ়া কন্যা ঘরে রাখা যায়না, তৃতীয় কন্যা জ্যোতির্ময়ীর বিবাহের বন্দোবস্ত হয়ে ফেললেন করুণাময়। একরকম বাধ্য হয়েই প্রতিবেশীব এক দুশ্চরিত্র ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কারণ তাতে ঋণের বোঝা কমবে। কিন্তু এই মানসিক চাপ সহ্য করতে পারলেন না করুণাময়, অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন। এই সময় সন্ধান পাওয়া গেল সচ্চরিত্র এক উদার-হৃদয় শিক্ষিত যুবকের, তার সঙ্গেই বিবাহের ব্যবস্থা করলেন বিবাহ করতে রাজি। হাতে স্বর্গ পেয়ে তার সঙ্গেই বিবাহের ব্যবস্থা করলেন করুণাময়। বিবাহসভায় অনর্থ ঘটল, পূর্বেই সেই প্রতিবেশী এসে জ্যোতির্ময়ীকে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূ হিসাবে দাবি করলেন। কিন্তু তখন আর বিবাহ ভেঙে দেবার উপায় ছিলনা, কিশোরের সঙ্গেই বিবাহ হয়ে গেল জ্যোতির্ময়ীর। তবে সত্য ভঙ্গ হল এবং প্রতিবেশী যথেচ্ছ

অপমান করে গেল—এ আঘাত করুণাময় সহ্য করতে পারলেননা, তিনি বিবাহের রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। সরস্বতী নিষ্ঠ সহধর্মিনীর মতোই স্বামীর অনুগমন করলেন।

নাট্য-কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে অফুরন্ত দৃশ্যাবলী ও চমকপ্রদ ঘটনার সাহায্যে দর্শককে প্রায় পংগু করে তোলার ব্যবস্থা করেছেন নাট্যকার। তাঁর সমস্ত দৃষ্টি এখানেই ছিল, অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি এটা করেছিলেন যাতে দর্শকের প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগে এটি দেখে। তা যে জেগেছিল, নাটকের প্রচন্ড জনপ্রিয়তাই তা প্রমাণ করে। শুধু সাধারণ দর্শক নয়, সেই সময়ের সমালোচকগণের একজনও লিখেছিলেন—'বলিদানের তুল্য বর্তমান হিন্দুবিবাহসংক্রান্ত নাটক বা উপন্যাস, এমনকি প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।'

নাটকে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলি যে বেশিরভাগই জোর করে ঘটানো, ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি যে সেগুলি নয়, সাধারণ বিচারবুদ্ধিতেই তা বোঝা যাবে।

স্থূল কাণ্ডকারখানা এবং মৃত্যুর যে সমারোহ নাটকে ঘটেছে তা অনেকটাই 'phycial' যাকে বলা যায় 'inner quality' তা থেকে এগুলির উদ্ভব ঘটেনি। অতিশয়োক্তি এবং অতিরঞ্জন যে বিরক্তিকর ভাবে এই নাটকে বর্তমান, সামান্য বিচারশক্তি থাকেলই তা বোঝা যাবে। চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের মানুষ না হয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির এক-একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কিরণময়ীর শাশুড়ির মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নেই, মানবিকতার লেশমাত্র তার মধ্যে পাই না। অন্যদিকে যে চরিত্রকে আদর্শ করেছেন সে একেবারে আদর্শের প্রতিমূর্তি, চরিত্রটি হল উন্মাদিনী জোবি। লম্পট স্বামী, অত্যাচারী শাশুড়ি, সৎমায়ের জন্য পিতৃগৃহ থেকেও বিতাড়িত, অথচ মানবিকতার পূজারী এই চরিত্র আমাদের ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয় নিশ্চয়ই কিন্তু তাকে সস্তা চরিত্র বলা যায় না। অর্থাৎ যে মেলোড্রামা গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন—সচেতনভাবে না হোক, স্বীকার না করে হোক, সেই সৃষ্টিতে তিনি সফল। এটি একটি সফল এবং অব্যর্থ মেলোড্রামা হয়ে উঠতে পেরেছে।

চ. নাট্যিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ, এ কথা পূর্বে একবার বলা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকে বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বার্ণার্ড শ অবশ্য দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, নাটক মানেই 'Discussion, discussion and discussion only', কিন্তু পরবর্তীকালে ভাবপ্রধান ও সমস্যামূলক নাটকে এই মতবাদ টেকেনি। পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে শেক্স্পীয়ারীয় নাটক এবং আধুনিক নাট্যসৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে দ্বন্দ্বহীন জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হতেই পারে না, যদিও তার প্রকৃতি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত অনেক পালটে গেছে, দ্বন্দ্বের তীব্রতা সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকের ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় গ্রীক নাটকের দ্বন্দ্ব ছিল মূলত বাইরের ব্যাপার। অর্থাৎ তার প্রকৃতি বাইরে থেকেও বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যেতো, 'যদি জানতেম তোমার কিসের ব্যথা' গোছের একটা অতলশায়ী ও দ্বিধাদীর্ণ যন্ত্রণার ব্যাপার ছিল না। মানুষ তার পুরুষকারে একটা কিছু সম্ভব করবেই এবং অদৃশ্য দৈবশক্তি নিয়তিবিধান ও নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাকে জয়ী

হতে দেবে না—এই তপ্ত লড়াইটা গ্রীক নাটকে প্রায় সর্বদাই চলেছে। অনেকটা এ যুগের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক রাবণের মতো লড়াই, 'একে একে নিবিছে দেউটি' জেনেও যিনি বিধাতার বরপুত্র রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছাড়তে পারেন না। এই লড়াই সেদিন যেমন দেখিয়েছে 'অয়দিপাউস', এযুগে দেখিয়েছে গিরিশচন্দ্রের মানসকন্যা জনা।

পরবর্তীকালে এই দৈবশক্তির বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম ও সেকারণে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ে রাজশক্তি ও শাসকশক্তি দৈবশক্তির বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা পরিবারের সংগ্রাম উৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় হয়েছে। 'নীলদর্পণ' নাটকে রাজশক্তির প্রতিভূ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে গোলোক বসুর পরিবার। রাজশক্তির পরিবর্তে বৈশ্যশক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন একক বা অসংগঠিত একাধিক মানুষের অস্পষ্ট প্রতিরোধেব সংগ্রাম বাধতে পারে তাদের সঙ্গে, নবনাট্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নাটক 'নবান্ন' বা 'ছেঁড়া তারের' উল্লেখ করতে পারি আমরা এই প্রসঙ্গে। সঙেঘর বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামেরই একটি উল্লেখযোগ্য দিক সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি নাটকে বার্নার্ড শ এবং অন্যান্য নাট্যকারের রচনায় এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

নাটকীয় দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ পৃথক একটি দিক, দুটি একক মানুষের দ্বন্দ্ব। একটি মানুষের সঙ্গে অন্য এক মানুষের দ্বন্দ্বও বিভিন্ন কারণে হতে পারে—ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব, খ্যাতিলাভের দ্বন্দ্ব, অর্থলাভের দ্বন্দ্ব। জুলিয়াস সীজারের সঙ্গে ব্রুটাসের দ্বন্দ্ব (জুলিয়াস সীজার), ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে রাজসিংহের দ্বন্দ্ব (আলমগীর), জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের বিচিত্র দ্বন্দ্ব (নূরজাহান), রমেশের সঙ্গে যোগেশের দ্বন্দ্ব (প্রফুল্ল)—সবই এই ধরনের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পড়তে পারে।

অবশ্য ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব যখন আদর্শের দ্বন্দ্ব দাঁড়ায় তখন তার প্রকৃতিও কিছুটা বদলে যায়। সংগ্রামটা তখন ব্যক্তিগতই থাকে বটে আপাতত, কিন্তু তার প্রকৃতি হয় ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র সংঘাতেই লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে ক্ষমতালাভ, খ্যাতিলাভ বা অর্থলাভ—কোনটাই এর কারণ নয়, এর কারণ দুটি ভিন্ন আদর্শ। এখানে লড়াই দুটি ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে। 'মালিনী' নাটকে দুই প্রিয় বন্ধু সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর যে একের বিরুদ্ধে অন্যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন, তারও কারণ এই আদর্শগত সংঘাত। আদর্শের মতোই দুটি ভিন্ন ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে—উপন্যাসে ও নাটকে যার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি, অন্তত আধুনিক সাহিত্যে।

দ্বন্দ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হল ব্যক্তির আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব। এখানে লড়াইটা ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির নয়, লড়াইটা তার নিজের সঙ্গে নিজের। এবং লড়াইয়ের প্রকৃতিটা এখানে 'রক্তকরবী'-র রাজার মতো এতো স্পষ্টও নয়। নিজের সঙ্গে লড়াই কতো তীব্র হতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রায় প্রবাদ হয়ে আছে হ্যামলেটের স্বগতকথন :

To be, or not to be— that is the question;
Whether 'its nobler in the mind to suffer
The slings and sorrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?

হ্যামলেটে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ম্যাকবেথের মধ্যেও ছিল, ইবসেনের নোরার মধ্যেও ছিল (এ ডলস্ প্লে,) রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব (রাজা ও রানী) বা জয়সিংহের (বিসর্জন) মধ্যেও ছিল। বস্তুত অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষত চরিত্রই আধুনিক নাটকের চরিত্র এবং ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বই আধুনিক দর্শকের কাছে সবচেয়ে আস্বাদ্য নাটকীয় দ্বন্দ্ব।

ছ. নাটকের কাহিনীসজ্জা বা বৃত্তগঠন

নাটকের শিল্পরূপ সুনির্দিষ্ট বলে নাটকের প্লট বা বৃত্তগঠনের নিয়মকানুনও মোটামুটিভাবে সংবদ্ধ। এ ব্যাপারে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের বিধিনিষেধের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যই আমরা লক্ষ করি। অবশ্য আধুনিক কালে বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনের ফলে নাট্য-আঙ্গিকের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। এ ব্যাপারে উৎসাহী মানুষকে আধুনিক নাট্য-আন্দোলনসংক্রান্ত তথ্যাদির সংবাদ রাখতে হবে, সাহিত্য-প্রকরণের এই প্রাথমিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর করাটা খুব যুক্তিযুক্ত হবে না।

নাটকের বৃত্তগঠনের নিয়ম যে নির্দিষ্ট, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, নাটকের একটা পরিমিত আয়তন আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা একেবারেই নেই, তা অনায়াসেই হতে পারে 'লা মিজারেব্‌ল' বা 'ওয়র এ্যানড পীসে'র মতো বিশাল, 'গোরা'-র মতো মহাকাব্যিক বা এ যুগের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর মতো বিশাল কলেবর। বস্তুত আধুনিক উপন্যাসেই একটা দীর্ঘতা সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব সেটি পাঠ্য বলে, নাটক যেহেতু দৃশ্য এবং একবারেই তা দেখে শেষ করতে হয়—অতএব কলেবর বৃদ্ধি তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

নাটক কতো বড়ো হতে পারে সে সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সুস্পষ্ট মত আছে। 'মহাকাব্যিক পরিকল্পনা নিয়ে নাট্যরচনা-র ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে নাট্যকার এবং নাট্যতাত্ত্বিকগণও নাটকের আয়তন সম্বন্ধে স্পষ্ট মতই ব্যক্ত করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় অভিনয়কাল দু-ঘণ্টা হওয়া বিধেয় বলে আভাস দিয়েছেন—দৃষ্টান্ত হিসাবে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' বা 'হেনরী দা এইট্‌থ্' নাটকের উল্লেখ করা যায়। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক দু-ঘণ্টায় মঞ্চস্থ করা সম্ভব কী না, সে কথা নাট্য-প্রযোজকরাই ভালো বলতে পারবেন।

নাট্যতাত্ত্বিক ফ্রেতাগের মতে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পংক্তির সংখ্যা কখনোই দু-হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয় এবং কোনও অঙ্কের পংক্তিসংখ্যাই উচিত নয় পাঁচশোর বেশি। শেক্‌স্‌পীয়রের দু-ঘণ্টার হিসাব মনে রাখলে এটাই নাটকের আদর্শ মাপ হওয়া উচিত, অথচ তাঁর নিজেরই বিখ্যাত নাটকগুলির বেশির ভাগের আয়তন অন্তত এর দেড়গুণ। যেমন 'ওথেলো'-র পংক্তিসংখ্যা ৩৩১৭, 'কিং লিয়ার'-এর ৩৩৩২, আর 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা'-র পংক্তিসংখ্যা ৩৯৯১।

এইভাবে পংক্তি দিয়ে বা সময় দিয়ে নাটকের আয়তন একেবারে গাণিতিক সূত্রের মতো স্থির করা না গেলেও, দর্শকনির্ভর শিল্প বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় এর

পরিমাপ সম্পর্কে। মুখ্যত সেইজন্যই সমগ্র কাহিনীকে তিনি বেশ কিছু দৃশ্যে বিভক্ত করে নেন। এই নির্বাচিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে কেমন করে তিনি সমগ্র নাট্যকাহিনী উপস্থাপিত করবেন সেকথা তাঁকে চিন্তা করে নিতে হয়। অবশ্য এলোমেলোভাবে দৃশ্যগুলি তিনি সাজাতে পারেন না, পূর্ণাঙ্গ নাটকে সাধারণত থাকে পাঁচটি প্রধান ভাগ বা অঙ্ক—সেই পাঁচটি অঙ্কে দৃশ্যগুলিকে তিনি বিন্যস্ত করেন। এইভাবে পাঁচ অঙ্কে এবং প্রতিটি অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত কিছু দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কে সজ্জিত করার ব্যাপারটাকেই বলা যেতে পারে নাটকের 'প্লট কনস্ট্রাক্‌শন' বা বৃত্তগঠন। নাটকের ক্ষেত্রে এই বৃত্তগঠনের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন বলেই অ্যারিস্টটল নাটকের প্রধান ছটি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন একে। কারণ, কেবলমাত্র কিছু দৃশ্যে নাট্যবস্তুকে সুসংহত করা নয়, পাঁচটি অঙ্কে তাদের সাজিয়ে দেওয়াতেই নাট্যকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না—কোন্ অঙ্কে নাটক ঠিক কতখানি অগ্রসর হবে এবং প্রতিটি অঙ্কের সঠিক গুরুত্ব কতোখানি, নাট্যকারকে তাও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। এইভাবেই নাট্যগঠনের পরিচয় তুলে ধরা যাক।

গ্রীক নাটকই সর্বপ্রাচীন বলে গ্রীক নাট্যকাহিনীর গঠনই আগে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। গ্রীক নাটক মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত—প্রোলোগ, এপিসোড, এক্সোড এবং কোরাস। কোরাস আবার বিভক্ত থাকে দুটি বা তিনটি অংশে—প্যারোড অথবা কোরাসের প্রথম স্থিতি, কোরাসসংগীত বা স্টাসিমন, কমোস (বা কোরাস) ও অভিনেতার বিলাপ। গঠন অনুযায়ী বর্ণনা করলে বলতে হবে—গ্রীক নাটক, অথবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেডি, মূলত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত—একটি প্রোলোগ, তিনটি এপিসোড এবং একটি এক্সোড বা এক্সোডাস।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য নাট্যাচার্য ভরত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক সংখ্যা তাঁর মতে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে। তবে নাটকের বিভিন্ন অবস্থা এবং সেই অনুযায়ী যে সন্ধিগুলির কথা তিনি বলেছেন তাতে বোঝা যায়, নাটকের মূল গঠনে পাঁচটি অঙ্কই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। যে-কোনও নাটকের পাঁচটি প্রধান অবস্থা তাঁর মতে—আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম। এই পাঁচটি অবস্থা দেখাবার জন্য নাটকের পাঁচটি সন্ধির নামকরণ করেছেন তিনি যথাক্রমে মুখ বা উন্মেষ, প্রতিমুখ বা উন্নয়ন, গর্ভ বা সর্বোন্নয়ন, বিমর্ষ বা অবনয়ন এবং নির্বহণ বা সমাপ্তি। যেহেতু সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা ইংরেজি নাটকের আদর্শই বাংলা নাটকে বেশি গৃহীত হয়েছে, সংস্কৃত নাটকের এই সন্ধিগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করে ইংরেজি নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগের প্রতি আমরা কিছুটা উৎসাহ দেখাবো।

ইংরেজি নাটকের আদর্শ বলতে মূলত শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের আদর্শই বোঝায়, কিন্তু কোনও নাটকের বিকাশই মূলহীন এবং নিরাশ্রয় নয়। ইংরেজি নাটকেরও মূল হিসাবে ধরতে হবে লাতিন নাটককে। বস্তুত লাতিন সাহিত্যে সেনেকার মহৎ ট্রাজেডিগুলি রেনেসাঁস-পর্বের ইংরেজি নাটককে, এবং শুধু ইংরেজি নাটক নয়—ইতালীয় ও ফরাসী নাটককেও, দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজি নাটকে যে পঞ্চাঙ্ক বিভাগকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তার মূলে লাতিন কমেডিগুলির প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয় যেখানে ষোড়শ শতকেই তাদের পাঁচ অঙ্কের বিভাগ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডিও যে প্রকৃতিগত ভাবে পাঁচটি বিভাগ মেনে নিয়েছে, সেও আগে আমরা দেখেছি।

ইংরেজি নাটকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগের সঙ্গে নাটকের নিজস্ব একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, সেই সঙ্গে আছে নাটকের সুনির্দিষ্ট গতিবেগ। প্রত্যেক নাটকই আশ্রয় করে একটি দ্বন্দ্বকে—সে দ্বন্দ্ব শারীরিক, মানসিক, ভাবগত, আদর্শগত, সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত যাই হোক না কেন। মানুষের যুদ্ধ রাজা অয়দিপাউস বা রাণা ভীম সিংহের মতো ('কৃষ্ণকুমারী') অদৃষ্টের সঙ্গে হতে পারে, অথবা হ্যামলেট, ম্যাকবেথ বা জয়সিংহের ('বিসর্জন') মতো তাদের নিজেদের সঙ্গেও হতে পারে। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা সেই দ্বন্দ্বের পরিচয়টি পেতে চাই, অন্তত তার সুস্পষ্ট আভাস, এবং সেই সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে চাই দ্বন্দ্বের দুই পক্ষের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে। যেমন 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঙ্কেই আমরা জেনে ফেলেছি সরল ও বলিষ্ঠ বীর ম্যাকবেথের সঙ্গে অপরিমিত উচ্চকাঙক্ষার মোহগ্রস্ত লেডি ম্যাকবেথের দ্বন্দ্বের আভাস। 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই রানী গুণবতীর একটি প্রাণকণিকা লাভের জন্য দেবীর কাছে প্রতি বছর চারশো প্রাণ বলি দেবার মানত থেকে এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এই দ্বন্দ্ব যে প্রথাধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের, তার আভাস আমরা পেয়ে যাই এবং তা আরো স্পষ্ট হয় রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকেও প্রথম অঙ্কেই জাহাঙ্গীরের রূপতৃষা এবং তার শিকার নূরজাহানের প্রতিহিংসার নারকীয় সংকল্পে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে এই দ্বন্দ্ব স্পষ্টতা পায় না, শক্তিমান নাট্যকার হলেও সেখানে নাটক পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ হতে পারে না, যেমনটি ঘটেছে শেক্স্পীয়রের 'হেনরী দা ফিফ্থ্' কিংবা 'টেম্পেস্ট' নাটকে, কিম্বা দীনবন্ধু মিত্র-র 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে। প্রথম অঙ্কেই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি উন্মোচিত হয় বলে একে বলা হয় Exposition বা উন্মোচন, তবে এই অঙ্ককে সাধারণভাবে প্রারম্ভ বা Initial Incident-ও আখ্যা দেওয়া হয়।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সর্বজনপরিচিত নাম Rising action বা উত্তুঙ্গ ঘটনাক্রম। এর অন্য কয়েকটি প্রচলিত নাম Growth বা বৃদ্ধি এবং Complication বা জটিলতা সৃষ্টি। এর এরকম নামকরণের কারণ, প্রথম অঙ্কে যে বিরোধ উন্মোচিত করা হয়, দ্বিতীয় অঙ্কে উত্তরোত্তর তার জটিলতা বৃদ্ধি হতে থাকে, সমস্যার সমাধান ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে—অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনাক্রম সমস্যাটিকে জটিল থেকে জটিলতর করতে থাকে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ঘটনাক্রম অগ্রসর হবে অনিবার্য গতিতে কার্যকারণ-শৃঙ্খল মেনে। কারণ জৈবিক গঠনের জন্যই তার অনিবার্যতা দরকার এবং নাটক বা উপন্যাস যে-কোনও কিছুর প্লট হতে গেলেই কার্যকারণ-শৃঙ্খল বজায় রাখতেই হবে, কেন না সেটাই প্লটের প্রাথমিক শর্ত। উদাহরণ হিসাবে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' স্মরণ করতে পারি। প্রথম অঙ্কের চারটি দৃশ্যে আমরা মূল দ্বন্দ্বের আভাস পেয়ে যাই। মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের দ্বারা বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়ে গ্রীক সম্রাট সেকেন্দর শাহের সৈন্যদলে গোপনে যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধ ও কূটকৌশল শেখার জন্য। নন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি পান আর এক নির্যাতিত ব্রাহ্মণ চাণক্যের আশীর্বাদ এবং মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব এবং তার আসন্ন প্রাবল্যের ইঙ্গিত আমরা এখানে পেয়ে যাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমরা অনিবার্য গতিতেই দ্বন্দ্বটিকে জটিলতর এবং ভিন্ন মাত্রায় ঘনীভূত দেখতে পাই। সেখানে একদিকে যেমন চন্দ্রগুপ্ত নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে চাণক্য তাঁর মাতা মুরাকে দিয়ে তাঁকে উদ্দীপ্ত করিয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন এবং প্রায়

পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরে এসে চন্দ্রগুপ্ত নন্দকে বন্দী করেছেন। এই সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ছায়ার আকর্ষণ এবং অ্যান্টিগোনেসের প্রতি হেলেনের ঘৃণা সমস্যার মাত্রা বৃদ্ধি করে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কটির সাধারণ নাম Climax বা চরমোন্নতি। এই অঙ্ককে Crisis বা চরম সঙ্কট এবং Turning point বা পরিবর্ত-বিন্দুও বলা হয়ে থাকে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় অঙ্কে জটিলতর হবার পর তৃতীয় অঙ্কে তা চরম অবস্থায় পৌঁছয়। এই ব্যাপারে সমালোচকের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ চরমোন্নতিকে নাটকের চরমতম ঘটনা ভেবে নেওয়ার ফলেই এই মতভেদ দেখা দিয়েছে। একটা নাটকের চরমতম ঘটনা অনেক সময়ই নাটকের মাঝখানে ঘটতে পারে না, কারণ তাহলে নাটকটির আর বিশেষ কোনো আকর্ষণই থাকে না। দর্শকদের কৌতূহলবৃত্তি শেষপর্যন্ত ধরে রাখার কথা নাট্যকারকে ভাবতেই হবে। আসলে একটি দ্বন্দ্ব ক্রমশ বাড়তে থাকলে একটা চরম অবস্থা আসবেই যখন তার পরিণতি কী হতে পারে তার একটা আভাস আমরা পেয়ে যাই, আমরা বুঝতে পারি এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি যেখান থেকে অন্য কোনো পরিণতি আর সম্ভব নয়। সেই পরিণতি প্রদর্শন নয়, পরিণতির সেই চমকিত ঘটনার অভিনয় নয়—আমরা তৃতীয় অঙ্কে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই সেই অপরিবর্তনীয় পরিণতির আশঙ্কা সম্বন্ধে। আমরা বুঝতে পারি, ঘটনাধারা এমন চরমে পৌঁছেছে যে অনিবার্যভাবেই এখন সমস্ত লক্ষণ একটি পরিণতির দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে।

নাটকের চরম ঘটনা তৃতীয় অঙ্কে ঘটতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই, নাট্যকারের বৃত্তগঠনের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের ওপরই তা নির্ভর করে। শেক্স্পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে সীজারের হত্যার মতো চমকিত ঘটনা তৃতীয় অঙ্কেই ঘটেছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই হত্যা যতই বীভৎস ঘটনা হোক, সমস্যার সমাপ্তি সেখানে ঘটে না—তা শুধু ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। সুতরাং তাকে নাটকের পরিবর্ত-সীমা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, চরম কৌতূহলের নিবৃত্তি নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকে তো চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, কিন্তু নাটকের বৃত্ত তো তাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি। তার একটাই কারণ, সেই ঘটনাতেই দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে এবং সেই দ্বন্দ্বই এই নাটকের আশ্রয়।

কথাটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্মরণ করলে। প্রথাধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধই এই নাটকের মূল অবলম্বন, এই বিরোধের প্রধান দুটি পক্ষ হিসাবে দেখি যথাক্রমে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যকে। দ্বিতীয় অঙ্কে রঘুপতির কিছু হীন কার্যকলাপ এবং রানী গুণবতীর অন্যায় রোষ গোবিন্দমাণিক্যকে মানবধর্মের প্রতি আরো দৃঢ়চিত্ত করে তোলে। বিরোধ এইভাবে অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লে এর সমাধান কীভাবে হতে পারে ভেবে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। একই সঙ্গে জয়সিংহ নামক একক ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বও চলে সমান্তরাল গতিতে। পালকপিতা রঘুপতি জয়সিংহের কাছে সর্বস্ব, আবার মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যও তার জীবনে আদর্শ পুরুষ। এই দুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে কার পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, ভেবে পায় না সে। 'বিসর্জন' নাটকের সবচেয়ে চমকিত ঘটনা জয়সিংহের আত্মহনন; তা ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই নাটকের উপান্তে। কিন্তু জয়সিংহের এই পরিণতিই যে ঘটতে চলেছে, এবং এই উপায়েই যে সমস্যার সমাধান ঘটবে তার স্পষ্ট আভাস আমরা পেয়ে যাই

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে। এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে জয়সিংহের সঙ্গে অপর্ণার একটি কোমল করুণ সাক্ষাৎকার আছে। অপর্ণার মন্দির ছেড়ে চলে আসার আমন্ত্রণ শুনে জয়সিংহ বলে—

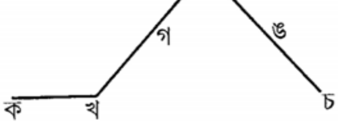
"যাব যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব।"

রাজকর পরিশোধ করার ব্যাপারটা যে তার আত্মহত্যা, তার রক্তপাতের মধ্যেই যে বিরোধের প্রকৃত অবসান ঘটবে, সে কথা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের সাধারণ নাম Falling Action বা অবনয়ন। এর যে নামান্তরগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল Resolution বা সিদ্ধান্ত এবং Denouement বা গ্রন্থিমোচন। তৃতীয় অঙ্কের সঠিক তাৎপর্য মেনে নাটক লেখা হলে সেখানে আমরা পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই বা তার একটা আভাস পাই। পরবর্তী অঙ্কের সজ্জিত দৃশ্যগুলি সেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, নাটকে জটিলতার বন্ধনগুলি সমাধানের লক্ষ্যে সরলীকৃত হতে থাকে। যেমন 'বিসর্জন' নাটকে ক্ষিপ্ত রঘুপতি তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে নীচত্বের শেষতম বিন্দুতে চলে যান, গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার চরমতম আয়োজন সম্পূর্ণ হয়, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই একটি পরিবারের বিষণ্ণ করুণ পরিণতি দেখবার জন্য।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের সর্বশেষ অঙ্কের নাম Catastrophe বা সমাপ্তি; একে Conclusion বা উপসংহারও বলা হয়। এই স্তরে সমস্ত জটিলতার অবসান এবং যে দ্বন্দ্ব নাট্যকার অবলম্বন করেছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি তাঁকে ঘটিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীকালে এ প্রশ্ন অবশ্য উঠেছে যে জীবনেরই যখন সুস্পষ্ট পরিসমাপ্তি নেই, এবং নাটক যেহেতু জীবননির্ভর শিল্প, নাটকের অতিনিরূপিত ছেদচিহ্ন থাকা উচিত কী নয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, নাটক এক বিশিষ্ট শিল্পপ্রকরণ, সুতরাং শিল্পের নিয়মই তার পক্ষে প্রযোজ্য, জীবনের নয়।

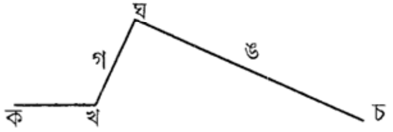
নাটকের এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ বা সুনির্দিষ্ট গঠনকে প্রসিদ্ধ নাট্যতত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফ্রেতাগ তাঁর 'নাটকের শিল্পরূপ' নামক একটি গ্রন্থে (Die Technik des Dramas) এক পিরামিডের গঠনের দ্বারা প্রতীকায়িত করেছেন। তাঁর এই প্রতীক ব্যবহার করার পর সাধারণত নাটকের সনাতনপন্থী গঠন দেখাবার জন্য এই পিরামিড-আকৃতি আমরা ব্যবহার করি। চিত্রটা হয় এইরকম—



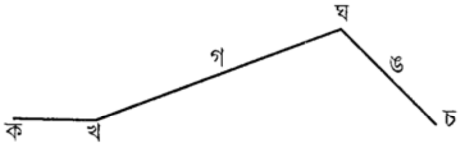
এখানে ক-কে বলা যেতে পারে উন্মোচন, খ-কে বলা যায় সেই প্রাথমিক ঘটনা, যেখান

থেকে নাটকীয় গতিবেগ শুরু হয়, গ-কে বলতে হবে চরমোন্নতির জন্য ঘটনার অগ্রগতি, ঘ হল সেই পরিবর্ত-বিন্দু, ঙ-কে বলতে পারি গ্রন্থিমোচন এবং চ-কে নাটকের পরিসমাপ্তি। নাটকের কাঠামো ও পিরামিডের গঠনকে সন্নিহিত মনে করলে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে নাটকের প্রথম অঙ্ক উন্মোচন হল ক-খ, দ্বিতীয় অঙ্কের উত্তুঙ্গ ঘটনাক্রম হল খ-গ, তৃতীয় অঙ্ক বা চরমোন্নতি হল গ-ঘ, চতুর্থ অঙ্ক বা অবনয়ন হল ঘ-ঙ এবং পঞ্চম অঙ্ক বা উপসংহার হল ঙ-চ।

Climax বা চরমোন্নতিকে ঘটনার উত্তুঙ্গ চমক মনে করে সমালোচক হাডসন বলতে চেয়েছেন, এই পিরামিড-গঠন নাটকের অন্যতম গঠন হিসেবে ধরা গেলেও এর বাইরে অন্য বহুরকম গঠনও থাকতে পারে যেখানে চরমক্ষণ তৃতীয় অঙ্কে আসে না, আসে অন্যত্র। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন শেক্স্‌পীয়রের 'কিং-লীয়র' এবং 'ওথেলো' নাটকের কথা। 'কিং লীয়র' নাটকে যেহেতু চরম ঘটনা ঘটে প্রথম অঙ্কেই, তার গঠন এইভাবে দেখিয়েছেন তিনি—



আবার 'ওথেলো'র গঠনের রেখাচিত্র এইরকম হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন—



এখানে আমাদের বক্তব্য, আমরা আগেই বলেছি, Climax-কে চরমতম 'ঘটনা' না মনে করে তাকে নাটকীয় দ্বন্দ্বের পক্ষে চরমক্ষণ বা পরিণতির প্রথম স্পষ্ট আভাস অথবা নাটকের পরিবর্ত-বিন্দু হিসাবে স্বীকার করে নিলে এইভাবে গঠন পরিবর্তনের কথা ভাবার কোনো প্রয়োজনই হয় না।

অবশ্য আধুনিক কালে আর এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের সময় থেকে প্রথাগত পঞ্চাঙ্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মালা সাজিয়ে এক-একটি অঙ্ক গঠনের পদ্ধতি নাট্যরচনায় অপসারিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের পথিকৃৎ জর্জ বার্নার্ড শ বেশির ভাগ নাটকই লিখেছেন তিন অঙ্কে, তবে প্রকারান্তরে পিরামিড-গঠন তিনিও বজায় রেখেছেন বলতে পারি, কারণ প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় অঙ্কে চমকিত ঘটনা এবং তৃতীয় অঙ্কে টানটান উত্তেজনার মধ্যে পরিসমাপ্তি—এই তাঁর সাধারণ ছক। সেই সময়ের বলিষ্ঠ নাট্যকার ইবসেন তাঁর বেশির ভাগ নাটক লিখেছেন চার অঙ্কে।

বাংলা নাটকে অবশ্য প্রথানুগত্যই বেশি দেখা যায়, ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। প্রথমদিকে তিনিও পঞ্চাঙ্ক বিভাগ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু পরে যেমন বেশির ভাগ প্রথা অতিক্রম

করেছেন, গঠনের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়। 'মালিনী' নাটক শুধু চারটি দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'-র মতো উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ নাটকেও দৃশ্যের সংখ্যা কেবল এক। বাংলা নাটকে গঠনের পরিবর্তন এবং এ ব্যাপারে স্বাধীনতা গ্রহণে ব্যাপক দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের সময় থেকে। বিজন ভট্টাচার্য বা তুলসী লাহিড়ীর নাটকগুলি স্মরণ করলেই সে কথা বোঝা যায়।

নাটকের বৃত্তগঠন সম্পর্কে আর একটি কথা বলবার আছে, এটিকে সমালোচক হাডসন উল্লেখ করেছেন 'Principle of Parallelism and Contrast' অর্থাৎ সমান্তর ও বিপ্রতীপ উপকাহিনী গঠনের রীতি হিসাবে। উপন্যাসে যেমন জটিল প্লট রচনা করা হয়, নাটকেও তেমনি মূল কাহিনীর পাশাপাশি উপকাহিনী সৃষ্টি করা হয়। উপন্যাসে উপকাহিনী থাকে, হয় মূল কাহিনীর বক্তব্য জোরদার করবার জন্য, অথবা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে মূল বক্তব্য স্পষ্টতর করে তোলার জন্য। নাটকের উপকাহিনী সৃষ্টি করা হয় মূল কাহিনীর উদ্দেশ্যকে সমান্তরভাবে পুষ্ট করার জন্য অথবা বিপ্রতীপ কাহিনীর দ্বারা তাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য। উপন্যাসে দুটি ব্যাপার একই সঙ্গে ঘটেছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে—সেখানে নগেন্দ্র কুন্দ-র মূল কাহিনীর সমান্তর ধারায় এসেছে দেবেন্দ্র-হীরার পদস্খলনের ভয়াবহ বৃত্তান্ত এবং বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্য এসেছে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির বিপ্রতীপ উপকাহিনী। বাংলা নাটকে সমান্তর ধারার উপকাহিনী সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেক হয়েছে, যেমন—'নীলদর্পণ' নাটকে গোলোক বসুর পরিবারের বিপর্যয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি সাধুচরণের পরিবারের দুর্ভোগ। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে ধনদাস-মদনিকা উপকাহিনীর সম্পর্ক কিছুটা বিপ্রতীপ ধরনের বলা যেতে পারে।

জ. নাটকের চরিত্রসৃষ্টি

বৃত্ত ও চরিত্রসৃষ্টি নাটকের দুটি বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হলেও, খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে কিন্তু এ দুটিকে স্বতন্ত্র উপাদান মনে করাই সম্ভব নয়—অন্তত এই দুটি উপাদান যে প্রথম শ্রেণীর নাটকে বা উপন্যাসে প্রায় অভিন্ন হয়ে পড়ে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। নাট্যকার কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন বা কিছু চরিত্রের পরিকল্পনা করেন যাদের সুনির্দিষ্ট মানসিকতা আছে, অনুভূতি আছে, লক্ষ্য আছে এবং সেই সঙ্গে আছে সীমাবদ্ধতা। চরিত্র যদি সেইভাবে নাট্যকারের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পড়লে বা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটলে একটি বিশেষ চরিত্র কী আচরণ করবে তা অভ্রান্ত ভাবে বোঝা যায়। সুতরাং বৃত্ত তখন চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ীই গঠিত হয়, তাকে অন্যরকম ভাবে গঠন করা সম্ভব হয় না। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাই বলেছিলেন, তিনি প্রথমে কতকগুলি চরিত্র স্থির করে নেন, তারপর যে-কোনও ঘটনার সম্মুখীন হলে তারা কী আচরণ করবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়—সুতরাং গল্প সম্বন্ধে তাঁকে পৃথক করে ভাবতে হয় না।

চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং নাটকীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ অনেক কথা বলেছেন। সেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবার আগে একটা কথা

স্মরণ রাখা প্রয়োজন মনে করি। নাটকে কোনো চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেই তাকে আমরা 'চরিত্র' মনে করে থাকি; কিন্তু নাট্যজগতেই হোক বা বাস্তব জগতেই হোক, শুধু উপস্থিতি দ্বারা কোনো মানুষ চরিত্র হতে পারে না। বাস্তব জগতে যেমন রাস্তাঘাটে দেখা যে-কোনও মানুষ আমাদের কাছে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে না, বিশেষ চারিত্র দ্বারা সে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হলে তবে তাকে চরিত্র বলে গণ্য করি, নাটকেও তেমনি নাট্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকলে এবং আমাদের অনুভূতির কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই তাকে আমরা বলতে পারি 'চরিত্র'। অর্থাৎ উপযুক্ত সজীবতার দ্বারাই নাটকে একটি চরিত্র 'চরিত্র' হয়ে উঠতে পারে। এই সজীবতা সৃষ্টির উপায় অবশ্যই সাধারণভাবে নাট্যকারের সহানুভূতি এবং বাস্তব সংসারে এই ধরনের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; সেই সঙ্গে দরকার নাট্যক্রিয়ায় চরিত্রটির অনিবার্য ভূমিকা—কেবল বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য উপস্থাপিত অভিনেতা চরিত্রের সম্মান পেতে পারে না।

সমালোচক হাডসন অবশ্য এই প্রসঙ্গটি অনেক বিস্তারিত করেছেন এবং বিশেষ করে নাটকীয় চরিত্রসৃষ্টির জন্য নাট্যকারের যেসব বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন তার উল্লেখ করেছেন। নাটকের বৃত্ত গঠনের মতোই, সংহতি তার চরিত্রসৃষ্টিরও প্রধান গুণ বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাসের মতো বিস্তারের অবকাশ নেই বলেই অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে কেবল প্রয়োজন অনুসারেই চরিত্রের ব্যবহার নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে সবচেয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক, অনেক সমালোচকই এই ধারণা পোষণ করেন। ম্যাকবেথের মতো একটি যুগোত্তীর্ণ রচনা কোনো সফল নাট্যকারও খুব বেশি রচনা করতে পারেন না। অথচ সমালোচক ব্যারেট ওয়েন্ডল তাঁর 'উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়র' গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই নাটকের দুটি অমর চরিত্র লেডি ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথকে কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন নাট্যকার যথাক্রমে প্রায় ষাটবার ও দেড়শোবার—কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠিক এইভাবে সমালোচনার রীতি বাংলাতে নেই, তবু আদি যুগের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' থেকে আমরাও এই ধরনের একটি হিসাব গ্রহণ করতে পারি। দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটকের নায়ক নিশ্চয়ই বলতে হবে নবীন মাধবকে। নবীন মাধব 'নীলদর্পণ' নাটকে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে মোট তেত্রিশবার—প্রথম অঙ্কে সাতবার, দ্বিতীয় অঙ্কে ছ-বার, তৃতীয় অঙ্কে চোদ্দবার এবং চতুর্থ অঙ্কে ছ-বার। পঞ্চম অঙ্কে তার উপস্থিতি আছে, কিন্তু কোনও সংলাপ নেই। নাটকীয় চরিত্রের সংহতি বোঝাবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করবার মতো নয়।

এই একই কথা একটু অন্যভাবে বলা যেতে পারে। স্থানের অভাব নাটকে এতো বেশি এবং অপব্যয়ের সুযোগ সেখানে এতো কম যে চরিত্রসৃষ্টিতেও প্রতি মুহূর্তে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও যেন কোনো বিশেষ চরিত্র না বলে। এই প্রয়োজন প্রধানত দুটি—নাটকের প্লট বা বৃত্ত অথবা তার ঘটনাধারা পরিস্ফুট করতে গেলে যেটুকু ক্রিয়াশীলতা ও সংলাপ চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য সেটুকু, এবং দ্বিতীয়ত নাটকের স্বার্থে চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। এর বাইরে যদি নাটকীয় চরিত্র কোনও আচরণ করে বা সংলাপ উচ্চারণ করে, তাহলে আমরা সেখানে 'over-characterisation' বা চরিত্রসৃষ্টিতে বাড়াবাড়ির অভিযোগ আনতে পারি। এরকম অভিযোগ বিখ্যাত নাট্যকারদের সম্বন্ধেও আনা সম্ভব। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বলিদান'

নাটকে ঘটনাক্রমের দ্বারাই করুণাময় চরিত্রের প্রতি দর্শকের যথেষ্ট সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারতেন, করুণাময় চরিত্রের এতো বেশি সংলাপ থেকে মনে হয়, নাটকের প্রয়োজনের চেয়ে চরিত্রটিকে আলাদাভাবে সজীব করার প্রতিই নাট্যকারের উৎসাহ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে। চারদিকের বিশৃঙ্খল অবিচার থেকে আমরা স্পষ্টই বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানের অসহায়ত্ব বুঝতে পারি, সেজন্য নিরন্তর তাঁর প্রলাপ এবং দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের অপরিহার্যতা ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন তা ঘটে তখন আমাদের সন্দেহ হয়, নাটক নয়—চরিত্রটির প্রতিই বোধহয় নাট্যকার বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এমন অভিযোগ শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' সম্বন্ধেও আনা যায় এবং বস্তুতই তা উঠেছে। হাডসন সেই কারণেই মন্তব্য করেন—"There is undoubtedly more in the character of Hamlet, for example, than in actually required to account for his part in the plot."

নাটকীয় চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে আর একটি যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন হাডসন, আমরা নাটকের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই তার উল্লেখ করেছি—সে বৈশিষ্ট্য হল নাটকের বস্তুধর্মিতা বা নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতা। যে নৈর্ব্যক্তিকতা কাহিনী-গ্রন্থনে নাট্যকারকে বজায় রাখতে হয়, চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তা তাঁকে গভীর ভাবে স্মরণ করতে হবে। এখানেই উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রচিত্রণের পার্থক্য। মানুষের জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতা, প্রবৃত্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা, তার সমস্ত রকম চিত্তবৃত্তির ব্যাখ্যা উপন্যাসে থাকতে পারে, উপন্যাসে তা আশা করতে পারেন নিষ্ঠ সমালোচক, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তা ব্যাখ্যা করার কোনো রাস্তা খোলা নেই। তিনি চরিত্রগুলিকে শুধু উপস্থিত করতে পারেন, কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমে তার মানসিকতার কিছু বিশেষ দিক পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু জীবন ব্যাখ্যার সচেতন উৎসাহ তাঁকে সম্বরণ করতেই হবে, পাঠক যদি তা বুঝে নিতে পারে, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নাটকীয় চরিত্র নিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য আলোচনা অ্যারিস্টটলের। তিনি অবশ্য আলোচনা করেছেন মূলত ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেই। তাঁর মতে নাটকীয় চরিত্র মানেই কিছু নৈতিক গুণ ও অপগুণের সমষ্টি। তা অবশ্য প্রকাশ পায় চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ থেকে। এই গুণাবলীর মধ্যে আমরা চারটি বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে পারি। প্রথমত, চরিত্রটি হবে না-অতি-ভালো, না-অতি-মন্দ অর্থাৎ মাঝামাঝি ধরনের। দ্বিতীয় গুণটিকে বলা যায় যথাযোগ্য বা appropriateness, অর্থাৎ চরিত্রটি যেমন ঠিক সেই ভাবেই তাকে প্রকাশ করতে হবে। তৃতীয় গুণটিকে বলতে পারি বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতার অর্থ হল আমাদের মনের বাস্তববোধ চরিত্রচিত্রণ দেখে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। চতুর্থ গুণটি হল consistency বা সংগতি, অর্থাৎ চরিত্রটি আগাগোড়া যেন সুসংগত হয়; কারণ তা না হলে চরিত্রটি বিশ্বাস্যতা হারায়। কোনো চরিত্র বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে তাকে আর নাটকীয় চরিত্র হিসাবে আমরা গ্রহণই করতে পারি না।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অবশ্য নায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে সুনির্দিষ্ট এবং এ বিষয়ে বিধিবিধানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। মহাকাব্যের নায়কপ্রসঙ্গে এইসব বিধান ও নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকও যেহেতু কাব্য, দৃশ্যকাব্য, সুতরাং নায়কের ব্যাপারে এখানে

পার্থক্য বিশেষ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে নায়ককে বিবিধ গুণের অধিকারী হতে হবে। এই গুণের তালিকায় মধ্যে অনুপস্থিত প্রায় কোন গুণই নেই, যথা—সুদর্শন, উদার, বিনয়ী, কলারসিক, বাগ্‌পটু, কুশলী, বীর, বলিষ্ঠচিত্ত প্রভৃতি আরো অনেক কিছু। এতো গুণের সমাবেশ ঘটলে তাকে আর সাধারণ মানুষ বলা চলে কিনা, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে; কিন্তু এ প্রশ্ন আধুনিক পাঠকের। অ্যারিস্টটল মাঝারি মাপের মানুষকে নায়কত্বের সম্মান দিয়েও বলেছিলেন, তাঁকে হতে হবে অধ্যবসায়ী এবং উন্নতিকামী (Illustrious and prosperous)। তাছাড়া নায়ককে বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী ও বিখ্যাত হতে হবে—এ কথাও অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, যদিও আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে অত্যন্ত 'কমন ম্যান'-ও নাটকের নায়ক হতে পারে, এমনকি একটি জনগোষ্ঠীও—সেদিনকার 'ছেঁড়াতার' বা 'নবান্ন' থেকে আজকের 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা' পর্যন্ত তার উদাহরণ।

আমাদের এ যাবৎ আলোচনা থেকে ভুল করবার অবকাশ আছে যে নাটকীয় চরিত্র বলতে বোধহয় নায়ককেই বোঝায়, অথবা নায়ক ছাড়া অন্যান্য চরিত্র বোধ হয় অকিঞ্চিৎকর। এ কথা কখনোই সত্য নয়। নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র তো বটেই, দুটি একটি সংলাপ নিয়ে যে চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে তার প্রতিও নাট্যকারের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকা দরকার।

নায়ক প্রসঙ্গেই নায়িকার আলোচনা সেরে ফেলা ভালো। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের বিশেষ কোনও নির্দেশ নেই, কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিগণ এ বিষয়েও নির্দিষ্ট মন্তব্যই করেছেন। নায়িকার শ্রেণী-নির্ণয় তাঁরা করেছেন নায়কের সঙ্গে তার সম্পর্ক হিসাবে। বিভাগটি এই রকম—অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা নায়িকা, স্বকীয়া অর্থাৎ নায়কের বৈধ স্ত্রী হিসাবেই নাটকে যে উপস্থিতি এবং পরকীয়া অর্থাৎ নায়কের কাছে যে পরস্ত্রী। তবে যে শ্রেণীরই নায়িকা হোক, তাকে রমণীয় এবং নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হতে হবে। নায়কের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ অনুযায়ী নায়িকাদের শ্রেণীভেদ আট রকমের, যে মানসিকতার প্রায় প্রত্যেকটিরই দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ করি বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা রাধার আচরণে। শ্রেণীবিভাগগুলি এই—বাসকসজ্জিকা, অভিসারিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতপ্রিয়া এবং স্বাধীন-পতিকা।

নায়কের মতো খলনায়কের ভূমিকাও নাটকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষত যেখানে খলনায়ককে মূর্তিমান শয়তান হিসাবে না দেখিয়ে ভালো ও মন্দ প্রবৃত্তির মিশ্রণে বেশ খানিকটা জটিল করে তোলা হয়। যেমন বলা যেতে পারে লেডি ম্যাকেবেথের চরিত্র। রাজা ডানকানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের জন্য তিনিই স্বামীকে প্ররোচিত ও উত্যক্ত করেন, অথচ নিজে সে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, মৃত পিতার কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতিকে সেভাবে বিচার করলে খলনায়ক আমরা বলতেই পারি না বোধ হয়, তিনি নানারকম দুষ্কর্ম করা সত্ত্বেও। আদর্শ ও বিশ্বাস এবং জয়সিংহের প্রতি আবাল্য স্নেহ তাঁর চরিত্রটিকে জটিল করে তোলে। তুলনামূলকভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশ নির্ভেজাল শয়তান চরিত্র, যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে শাইলক বা 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগো।

হাস্যরসাত্মক নাটকে হাস্যোদ্দীপক চরিত্র অনেকেই থাকতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডি নাটকেও আমরা হাস্যরসসৃষ্টির উপযুক্ত দু-একটি চরিত্রের অবতারণা দেখতে পাই। ট্র্যাজেডির গাঢ়

করুণ রস ভালোভাবে উপভোগ করবার জন্যই এই অবকাশ বা 'tragic relief' সৃষ্টি করার দরকার আছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের 'দা মেরী ওয়াইভস অব উইন্‌জর' নাটকে ফলস্টাফ চরিত্র যেমন আছে তেমনি গাঢ় ট্র্যাজেডিতেও তিনি এই ধরনের ট্র্যাজিক অবকাশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে এই পরিহাস-রসিকতার কাজটি যাঁরা করে থাকেন এক কথায় তাঁদের বলা হয় বিদূষক। এই চরিত্রটি সাধারণত হন ভোজনপ্রিয় ঔদরিক ব্রাহ্মণ, চেহারায় বামন বা বিকৃতদেহ, প্রায়শই নায়কের পার্শ্বচর এবং আচরণ এমনই স্থূল যে প্রতি আচরণে বা সংলাপেই তিনি পরিহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ান। কিছু উচ্চস্তরের হাস্যরসিক চরিত্রও অবশ্য বাংলা নাটকে আমরা দেখেছি, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকে বিদূষক, অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকে দিলদার।

নাটকে অন্যান্য যেসব পার্শ্বচরিত্র থাকে, আগেই বলা হয়েছে, কারো প্রতিই নাট্যকার অমনোযোগী হতে পারেন না। নাটক এমনই একটা সংহত শিল্প যে এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রই আসে বিশেষ কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ করতে, সুতরাং অবান্তর চরিত্রের স্থান এখানে হয় না। স্বল্পতম প্রয়োজনে যে চরিত্র আসে তার প্রতিও নাট্যকারের দায়িত্ব থাকে, এবং তা থাকে বলেই 'বিসর্জন' নাটকে জনতার মধ্যে যে চরিত্রটি বলে, দক্ষিণের লোক হয়ে উত্তর দিতে আসা উচিত নয়, কিংবা যে ভীরু লোকটি বারবার তার আপন মামাতো ভাই হিসেবে সেখানকার দফাদারের উল্লেখ করে অথবা 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের যে মুচি নিজের পরিচয় দেয় 'I am a mender of bad soles' বলে—তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নাট্যকার সচেতন ছিলেন বলেই এই রকম দুটি-একটি সংলাপের মধ্যেও চরিত্রগুলি আমাদের মনে গেঁথে আছে।

ঝ. নাটকের সংলাপ

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব কতোখানি, এ কথা না বলে বলা উচিত সংলাপই নাটক, কারণ সংলাপ ছাড়া নাটকে আর কিছু নেই—নাটকে সংলাপ আছে, এবং সংলাপই আছে। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঘৃণা-ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি চরিত্রকে নির্বাচন করেন এবং তাঁর সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করে।

তাই বলে এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে নাট্যকার তাঁর যাবতীয় বক্তব্যই চরিত্রের সংলাপে প্রকাশ করতে পারেন। চরিত্র সেই সংলাপ উচ্চারণ করার ব্যাপারে যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে না ওঠে তবে তার মুখে সে সংলাপ দেওয়াই চলে না। বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপারটাকে নাটকে আগাগোড়া বজায় রাখতে হয়, কারণ নাটক দেখে বিভিন্ন রুচির মানুষ এবং নাটক দেখতে কাউকে বাধ্য করা চলে না। এই জন্যও সংলাপের গুরুত্ব নাটকে এতো বেশি।

উপন্যাসের ভাষারীতিতে যেমন বাখ্যিক, বর্ণনামূলক, নাটকীয় ইত্যাদি ভাগ করা হয়ে থাকে, নাটকের সংলাপে সেরকম ভাগ করার কোনো তাৎপর্য নেই। নাটকের চরিত্র যে প্রকৃতির হবে, সংলাপের প্রকৃতিও হবে সেই রকম, এটাই স্বাভাবিক। একই নাট্যকারের লেখা

বিভিন্ন নাটকে তাই সংলাপও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে জুলিয়াস সীজার যে ভাষায় কথা বলেন, ম্যাকবেথ সে ভাষায় কথা বলেন না, আবার লেডি ম্যাকবেথ যে ভঙ্গিতে কথা বলেন, হ্যামলেটের ভাষা তার চেয়ে অনেক আলাদা। বাংলা নাটকের আদিযুগে সংলাপ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র। শুধু 'নীলদর্পণ' নাটকটি থেকেই বিভিন্ন রীতির সংলাপের উদাহরণ আমরা উদ্ধার করতে পারি। সাধারণভাবে ভদ্র চরিত্রের সংলাপে দীনবন্ধু তেমন পারদর্শী নন, একথা বলা হয়ে থাকে এবং নবীনমাধবের কিছু কিছু সংলাপ রচনায় কৃত্রিম আড়ষ্টতা যে ছিল না এমন কথাও নয়, তবু সর্বত্রই ভাষা একরকম নয়। যেমন গোলোকচন্দ্র বসুর প্রথম সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত—"বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাতপুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা করে গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়;"

গ্রাম্য স্ত্রীলোকের ভাষার নমুনা নেওয়া যাক রেবতীর সংলাপ থেকে—"ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও অ্যামিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ওযে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর।"

তোরাপের সংলাপে পাওয়া যাবে ভদ্রেতর পুরুষচরিত্রের সংলাপের নমুনা, যার জন্য দীনবন্ধুর খ্যাতি আজও অম্লান—"দুন্তোর প্যারেকের মার প্যাট কর্‌য়ে, লৌ দিখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বলবো, সমিন্দিরি একবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।"

ভাবলে অবাক লাগে আজ পর্যন্ত সাহেবের বাংলা সংলাপের যে আদর্শ আমরা মেনে চলি, তার রূপ দীনবন্ধুই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে উড সাহেব ও রোগ সাহেবের সংলাপে যে বিপর্যস্ত ক্রিয়ার রূপ, মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি লক্ষ করি, প্রায় তাই এখনও ব্যবহার করা হয়—শুধু দন্ত্য ধ্বনি সাহেবি উচ্চারণে নেই বলে তার মূর্ধন্যীভবন ঘটে মাত্র। উড সাহেবের সংলাপের একটু উদাহরণ—"তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।"

আসলে, চরিত্র-অনুযায়ী সংলাপের বদল তো নিশ্চয়ই নয়, নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ীও চরিত্রের সংলাপ বদল হয়। গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডির ভাষা, লঘু হাস্যরসাত্মক নাটকের ভাষা অথবা সাঙ্কেতিক নাটকের ভাষা এক রকমের হতে পারে না। ঠিক একই রকম ভাবে বলা যায়, নাটকের সংলাপ পদ্য ও গদ্য উভয় মাধ্যমেই রচিত হতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে যেমন আমরা পদ্য সংলাপই বেশি উপভোগ করি। তবে ভাষার নিজস্বতা আনবার জন্য অথবা নিজস্বতা পরিহার করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য কখনও কখনও চরিত্র তার সংলাপে অন্য চরিত্রের চেয়ে পৃথক হতে পারে না, এতে নাটকের ক্ষতিই হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে অল্প শক্তিমান ছিলেন না, কিন্তু সংলাপে তিনি প্রায় অহেতুক কাব্যময়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কোনো কোনো চরিত্রে। এতে কিন্তু চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়েছে—চরিত্রকে তার নিজস্ব

সীমাবদ্ধতা দান করাও নাট্যকারের এক বিশেষ কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও তাঁর সাহিত্যের সম্পদ। এই ভাষা যখন সাঙ্কেতিক নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তখন তার উপভোগ্যতার মাত্রাও বেড়ে যায় অনেক বেশি। কিন্তু সাধারণ নাটকে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র যখন অনুকরণীয় রাবীন্দ্রিক ভাষায় কথা বলে তখন তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে সচেতন দর্শকের একটু অসুবিধা হয় বৈকি।

সংলাপ প্রসঙ্গে স্বগতোক্তির উল্লেখ করতেই হয়। এটি বাংলা আদি নাটকে ঘনঘন ব্যবহৃত হতো, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকেও এর ব্যবহার ছিল খুব বেশি। বর্তমানে এই ধরনের সংলাপের প্রয়োগ কম দেখা যায়। একটি চরিত্র তার মনের গোপন কথা বা অন্তরঙ্গ ব্যথা-বেদনা, ঠিক অন্যান্য চরিত্রকে না জানিয়ে যেন নিজের মনেই নিজে উচ্চারণ করে— এইভাবেই স্বগতোক্তি অংশগুলি লেখা হয়। এতে দর্শক চরিত্রটির মনের কথা জানতে পারেন কিন্তু নাটকের পাত্রপাত্রী তার কিছুই বুঝতে পারেন না। ইংরেজি নাটকে একে বলে soliloquy, কখনো aside হিসাবেও একে নির্দেশ করা হয়। ইংরেজি নাটকের স্বগতোক্তির মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে হ্যামলেটের 'টু বি অর নট্ টু বি'। খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বগতোক্তি দেখা যায় মার্লোর 'ডক্টর ফাউস্টাস' নাটকে—সেখানে নাটক শুরুই হয় একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে এবং নাটক সমাপ্তও হয় আর একটি স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' নাটকে পদ্মলোচনের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর একটি স্বগতোক্তির উদাহরণ—"আজ ভোর পর্যন্ত জেগে থাকবো। অনেক রেতে বাড়ি আসেন, আর নুঠ্ করে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আসবে অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। বগী অবাগী ঘুমুয়েছে, সাড়াশুড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়ুয়ে থাকি।"

আধুনিককালে স্বগতোক্তির প্রয়োগ কমে এসেছে, বা বলা যায় লুপ্তই হয়ে এসেছে, মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, বাস্তবতার বিচারে ব্যাপারটিকে হাস্যকর মনে হয়। মঞ্চে অন্যান্য চরিত্র অত্যন্ত কাছে থাকা সত্ত্বেও একটি চরিত্রের স্বগতোক্তি কেউ শুনতে পাচ্ছে না, অথচ প্রেক্ষাগৃহের দর্শক শুনতে পাবার মতো যথেষ্ট জোরে তা বলা হচ্ছে—এই ঘটনা বাস্তবতার দিক থেকে স্বীকার করে নেওয়া শক্ত। দ্বিতীয় কারণটি শিল্পগত। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নাট্যধারা এবং অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে তার ধারণা তার নির্ধারিত সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। একটি চরিত্র নিজের মনের কথা বা অন্যের সম্বন্ধে গোপন কোনও কথা একা-একা উচ্চারণ করে, এর মানেই হল, লেখক চরিত্রদের সংলাপে বা আচরণে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। এইসব কারণে স্বগতোক্তির ব্যবহার আধুনিককালে অত্যন্ত কমে গিয়েছে।

ঞ. নাটকের বিভিন্ন বিভাগ ও একাঙ্ক নাটক

নাটকের বিভাগ-নির্বাচন তাৎপর্য অনুসারেই ঘটতে পারে। একেবারে আকৃতিগত একটি বিভাগ আমরা মনে করতে পারি, পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং একাঙ্ক নাটক। পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে বোঝায় একাঙ্ক নাটক এবং পঞ্চাঙ্ক নাটক বলতে বোঝায় একটি অঙ্ক-সমন্বিত নাটক। কিন্তু বিশুদ্ধ আকারগত

এরকম কোনও বিভাগ মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কারণ প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ নাটককে যে পঞ্চাঙ্ক হতেই হবে এ বিধান এখন অনেকেই মেনে চলেন না। আধুনিককালে পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কে কিছু নিয়মিত দৃশ্যবিভাগ প্রায় উঠেই গিয়েছে। গণনাট্য আন্দোলনের সময় যেসব নাটক রচনা করা হয়েছে তাতে প্রথাগত অঙ্ক সন্নিবেশের প্রশ্নই প্রায় অবান্তর হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনেরও অনেক আগে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রথা ভাঙার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখি। রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন'-এর মতো রীতিমত পঞ্চাঙ্ক নাটক যেমন লিখেছেন, তেমনি 'মালিনী'-র মতো চারটি দৃশ্যের নাটক লিখেছেন। আবার 'মুক্তধারা' নাটকে দৃশ্যপট একটিই এবং তা হল পথ—নাটকটি আমরা দেখতে পাই ওই পথের দৃশ্যেই। তা হলে কী বলবো আমরা সে নাটককে—পূর্ণাঙ্গ নাটক, অথবা একাঙ্ক নাটক!

দ্বিতীয়, যদি আকারগত বিভাগ হিসাবেই পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটককে তফাৎ করি, তাহলে প্রশ্ন উঠবে পূর্ণাঙ্গ নাটকে আমরা যেমন কয়েকটি দৃশ্যসম্বলিত অঙ্ক দেখতে পাই, একাঙ্ক নাটকের অঙ্কটিও সেরকম কয়েকটি দৃশ্যসমন্বিত হবে তো! অথচ প্রথাগত ভাবে একাঙ্ক নাটকে দৃশ্য আমরা একটিই দেখি, একাধিক নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এর নামকরণ নিয়ে। একে আমরা একাঙ্ক নাটক বলবো অথবা একদৃশ্য নাটক, তা নিয়েও তাহলে চিন্তা করা দরকার।

তৃতীয়ত, একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, সংক্ষিপ্ত পরিসর ও একটি দৃশ্যে নাট্যবস্তুর বিন্যাস ছাড়াও একাঙ্ক নাটকের প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। কাজেই একাঙ্ক নাটককে পুরোপুরি আঙ্গিক বিভাগ মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না—তবে আকৃতি এই বিভাগের প্রধান বিচার্য বিষয় বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

নাটকের প্রধান বিভাগ হতে পারে রসগত এবং সেদিক থেকে এর প্রধান দুটি ভাগ ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উপবিভাগও অবশ্য নিতান্ত কম নয়—এর ওপর আবার ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উপাদান সংমিশ্রিত করে ট্র্যাজি-কমেডি নামক এক শ্রেণীর নাটকও রচনা করা হয়। এর বিস্তৃত পরিচয় উপযুক্ত প্রসঙ্গেই পাওয়া যাবে।

নাটকের বিষয়-অনুযায়ী এক ধরনের বিভাগও প্রচলিত আছে। বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে আমরা বলি ঐতিহাসিক নাটক, পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলে পৌরাণিক নাটক, কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত নাটককে এইভাবে বলি সামাজিক নাটক এবং লোককথা থেকে নাট্যবস্তু সংগ্রহ করা হলে তাকে বলি লোকনাট্য। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা লক্ষণীয় সেটা হল, নাট্যলক্ষণ নিঃসংশয়ে রক্ষিত হওয়াই এদের প্রধান দায়িত্ব, তারপর দেখতে হবে, যে বিষয়ের নাটক হিসাবে এদের বিশেষিত করা হয়েছে, তার প্রতি সুবিচার করা হল কিনা। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ হলেও প্রত্যেক বিভাগেরই কিছু প্রকৃতিগত বেশ কিছু লক্ষণ আছে এবং তা সুনির্দিষ্ট। ইতিহাস এবং ইতিহাসনির্ভর সাহিত্যের মূল পার্থক্য নিয়ে অ্যারিস্টটল সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। এই স্পষ্টতা পৌরাণিক বা অন্যান্য নাটকের আলোচনাতেও আছে।

নাটকের আরেকটি বিভাগ হতে পারে আন্দোলনকে ভিত্তি করে। বাংলা সাহিত্যে যেমন গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন হয়েছে, ইংরেজি বা ইউরোপীয় সাহিত্যেও তেমনি বিভিন্ন সময়ে নাট্য-আন্দোলন হয়েছে। এক-একটি বিশেষ আন্দোলন-উদ্ভূত নাট্যকর্মের এক-একটি বিশেষ ধরনের নামকরণ হয়েছে, যেমন—রোম্যান্টিক নাটক, বাস্তববাদী

নাটক, অভিব্যক্তিবাদী নাটক, অ্যাবসার্ড নাটক প্রভৃতি। সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্ভবের নেপথ্যে সাঙ্কেতিকতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল বটে, কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটক বলতে আসলে এমন ব্যাপক প্রয়োগকৌশল বোঝায় যে সাঙ্কেতিক ও রূপক—এই দুই শ্রেণীর নাটককে আমরা নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করাই সঠিক মনে করি। এই কারণে নাটকের আন্দোলনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের পরিচয় দেবার আগেই আমরা এদের আলোচনা করবো।

ট. একাঙ্ক নাটক

বর্তমান সময়কে নাট্যসৃষ্টির পক্ষে সুসময় অনেকেই মনে করেন না, কারণ গত শতকে এবং বর্তমান শতকের একেবারে প্রথম দিকে প্রচুর উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে মৌলিক নাটকের সংখ্যা খুব কম। একমাত্র একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে না। একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর জনপ্রিয়তা। পূর্ণাঙ্গ নাটকই যখন প্রায় সর্বস্ব ছিল তখন বড় জোর নাটকের মুখবন্ধ হিসাবে একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের কথা ভাবা যেতো। এখন শুধু যে একাঙ্ক নাটক প্রচুর লেখা হয় তাই না, তা প্রকাশও হয় খুব বেশি, একাঙ্ক-সংকলনের সাক্ষাৎ আমরা এখন পাই, এমনকি একাঙ্ক বিষয়ক আলোচনার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেও নিয়মিত একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার এটি একটি বড় প্রমাণ।

একাঙ্ক নাটক বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, একটি দৃশ্যে, সীমিত সময়ে—বোধ হয় প্রতিযোগিতার নিয়মের কথা স্মরণে রেখেই, এক ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়যোগ্য এক ধরনের নাটক। তবে একাঙ্ক নাটকের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে জানতে হলে এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁদের শরণাপন্ন হতে হবে।

নাট্যসাহিত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন ড. অজিতকুমার ঘোষ এবং সাধনকুমার ভট্টাচার্য। অজিত বাবুর মতে—"ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা, এগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ।" এ বিষয়ে সাধনবাবুর মত—"দেশকালের অবিচ্ছেদ বা ঐকান্তিক এককত্বকে আমরা একাঙ্কিকার অপরিহার্য লক্ষণ বলেই স্বীকার করব। ...স্থান-ঐক্য কাল-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যেই একাঙ্কিকার বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে।"

একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে জন হ্যাম্পডেন বলেছেন—"An one-act play deals with a single dominant dramatic situation and aims at producing a single effect..., since the play is to be acted in a short space of time, the greatest artistic unity and economy are essential to success."

এই 'Unity and economy'-র কথা সমালোচক হার্ম্যান আউল্ড-ও বলেছেন, তবে সেই সঙ্গে তার বৈচিত্র্যের দিকটাও দেখিয়েছেন—"It may be neat, compact and rigid, but

it may also be way ward, expansive and flexible. So long as it does not conflict with the fundamental principles of drama, it may venture into a hundred different directions and exploit as many themes as the ingenuity and inventiveness of the author can suggest."

একাঙ্ক নাটকের এইসব লক্ষণনির্দেশ এবং বাংলা একাঙ্ক আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের আলোচনা স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি, একাঙ্ক নাটকের প্রধান লক্ষণগুলি হল—(ক) তীব্র একমুখিনতা, (খ) সংবদ্ধতা ও বাহুল্য বর্জন (গ) ত্রিবিধ ঐক্যের আদর্শ সমন্বয় (ঘ) ঘটনার দ্রুতময়তা এবং (ঙ) নাটকের মৌলিক সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে প্রচুর স্বাধীনতা। সুতরাং একাঙ্ক নাটকের একটি দৃশ্যে অভিনয়যোগ্যতার কথা স্মরণ রেখে এই সব লক্ষণের সাহায্য নিয়ে এর একটা সংজ্ঞাও আমরা নিরূপণ করতে পারি এইভাবে:

একাঙ্ক নাটক হল এক দৃশ্যে অভিনয়যোগ্য দ্রুত-সঙঘটিত, বাহুল্যবর্জিত এমন এক ধরনের সংবদ্ধ নাটক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তীব্র একমুখিনতা, অথচ নাটকের মৌল লক্ষণ অবিকৃত রেখে যাতে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একাঙ্ক নাটকের এই লক্ষণসমূহ এবং তার সংজ্ঞার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল আছে ছোটগল্পের। এ বিষয়ে কোনো কোনো সমালোচক আমাদের সচেতনও করেছেন। কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণ একাঙ্ক নাটকের উৎস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা। অনেক সমালোচকই একাঙ্ক নাটকের উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে গিয়ে বড় দীর্ঘ পথপরিক্রমা করেছেন। সংস্কৃত নাটকে ভাসই প্রথম একাঙ্ক নাটকের সূচনা করেন এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন এবং তাঁর 'মধ্যম ব্যায়োগ' 'দূত ঘটোৎকচ', 'কর্ণভার', 'উরুভঙ্গ' প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কালিদাসের পূর্বে আবির্ভূত নাট্যকারদের মধ্যে বররুচির 'উভয়াভিসারিকা', শূদ্রকের 'পদ্ম প্রাভৃতক' প্রভৃতির নামও কারও মনে পড়েছে। পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসে তেমনি সমালোচকের মনে হয়েছে, পঞ্চাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে একাঙ্কিকার অস্তিত্ব লক্ষ করা সম্ভব। এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণার ফলে একাঙ্ক নাটকের যে বীজই আবিষ্কার করা সম্ভব হোক, ছোটগল্প যেমন আধুনিক জীবনের সাহিত্য-ফসল, একাঙ্ক নাটকও তাই।

একাঙ্ক নাটক এবং ছোটগল্প মোটামুটি একই প্রেরণা ও তাড়না, একই সাহিত্য প্রযত্ন ও সচেতনতায় সৃষ্টি। জীবনের কোনো তীব্র অভিজ্ঞতা বা গাঢ় অনুভূতি এ দুয়েরই জন্মদাতা। তীব্রতা বা গাঢ়তা একমুখী সৃষ্টি না হলে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই একমুখিনতা বা singleness of purpose দুটি সাহিত্য-প্রকরণেরই মূল কথা। ছোটগল্পের মতোই একাঙ্ক নাটকে দৃষ্টি থাকে হয় একটি বিশেষ চরিত্রের ওপর, আখ্যানের বিশেষ এক চরম মুহূর্তের ওপর, সত্য আবিষ্কারের বিশেষ ভঙ্গির ওপর, বা এই রকমই কোনো একক উদ্দেশ্যের ওপর। সংবদ্ধতা নাটকেরই অন্যতম প্রধান গুণ, কারণ তার আয়তন সীমিত—একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা লঙঘন করা অমার্জনীয় শিল্পস্খলন, কারণ আয়তনের ক্ষুদ্রতর সীমা ছাড়াও আবেদনসৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখিতা তাতে বিঘ্নিত হয়। ত্রিবিধ ঐক্যের কথা পূর্ণাঙ্গ নাটকে বলা হয়েছে, আমরাও তার আলোচনা করেছি। পূর্ণাঙ্গ নাটকে তিনটি ঐক্যই অপরিহার্য বলে আমাদের মনে হয়নি, কিন্তু সমালোচক ড. ভট্টাচার্য একাঙ্ক নাটকে এদের অপরিহার্য মনে করেছেন। ঘটনা বা

ক্রিয়াগত ঐক্য তো বজায় রাখতেই হবে, নইলে একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, স্থানগত ঐক্য বজায় থাকে তা একটি দৃশ্যের নাটক বলে, এবং কালগত ঐক্য বজায় না রাখলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—যেহেতু নাটকে দৃশ্যান্তর নেই।

আধুনিক জীবনে ছোটগল্পের মতোই একাঙ্ক নাটকের আবেদন তীব্র, এই কারণেই একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বেশি হতে পারে। এর উৎস সন্ধানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অতীতবীক্ষা না চালিয়েও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে এই প্রকরণটি উদ্ভবের জন্য আমরা ইউরোপীয় ও ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী। ইংরেজি নাটক এবং নাট্য-আন্দোলনের সন্ধানই অবশ্য আমরা বেশি রাখি, তাই বলতে পারি ইংলণ্ডে বাস্তববাদী নাটকের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় আইরিশ নবনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন জন মিলিংটন সিন্‌জে, সঙ্গে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন বর্ষীয়ান কবি ও নাট্যকার ডব্লিউ.বি.ইয়েট্‌স, লেডি গ্রেগরী, সীন ও'ক্যাসি, সেন্টজন আরিভন প্রভৃতিকে। সিন্‌জে-র যে একাঙ্ক নাটকগুলি এই উপলক্ষে রচিত হয় তাদের মধ্যে 'দি শ্যাডো অব দা গ্লেন', 'দি প্লেবয় অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড,' 'দি রাইডার্স টু দি সী' প্রভৃতি প্রধান।

ইংরেজি একাঙ্ক নাটকে তার বিবিধ বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ হার্ম্যান আউল্ড যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তার স্বরূপ আমরা ইংরেজি নাটকে অনুভব করি। ঘটনার নাটকীয়তা যখন একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্য তখন তা কত রসঘন হতে পারে তার উদাহরণ জো কোরি-র 'হিউয়ারস্ অব কোল', চরিত্রপ্রধান একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহুপরিচিত নাটক 'দা বিশপ্‌স্ ক্যাণ্ডল্‌স্টিক', যে নাটকে নরম্যান ম্যাকিনেল-এর প্রধান আকর্ষণ চরিত্রের পরিবর্তন। চরিত্রপ্রধান একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন গল্‌স্‌ওয়াদির 'দি লিট্‌ল্ ম্যান', ডেভিড স্কট ড্যানিয়েলের 'দা কুইন এ্যান্ড মিস্টার শেক্সপীয়র', আলিভার কনোয়ের 'বেকি শার্প', লেডি গ্রেগরীর 'দি রাইজিং অব দি মুন' প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম একাঙ্ক নাটক কী, এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে অজ্ঞাত নাট্যকার রচিত 'বল্লালী খাত নাটক' (১৬৬৮) প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটক। ঠিক প্রথম নাটক না বললেও, 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাশ এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এ দুটি নাটকের নাম করেছেন। এই মত সমর্থন করেছেন ড. সরোজমোহন মিত্র। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রকে একাঙ্ক নাটকের পথিকৃৎ বলেছেন, তবে তাঁর নির্বাচন গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার।' গিরিশচন্দ্রেরই 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'সভ্যতার পাণ্ডা' ইত্যাদি নাটককেও কেউ কেউ প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসাবে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে পথিকৃতের দাবীদার হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (কিঞ্চিৎ জলযোগ) এবং অমৃতলাল বসু (চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে)। এভাবে তালিকাবৃদ্ধির ইচ্ছা থাকলে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ডাক্তারবাবু' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ' পর্যন্ত অনেক নাটকের কথাই আমরা স্মরণ করতে পারি। তবে বিদেশি একাঙ্ক নাটকের কথা যদি আমরা মনে রাখি, সঠিক ভাবে এই প্রকরণের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা স্মরণ করি, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রথম প্রবক্তা মন্মথ রায়। মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক'। এরপর বহু একাঙ্ক নাটকই তিনি লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'চাঁদসদাগর', 'দেবাসুর', 'কারাগার', 'সবিত্রী',

'মাতৃ-মূর্তি', 'খনা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজবাটী', 'রূপকথা' প্রভৃতি। মন্মথ রায় ছাড়া বহু নাট্যকারই বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন প্রবোধ মজুমদার (শুভযাত্রা), বনফুল (শিক্‌কাবাব), শিবরাম চক্রবর্তী (চাকার তলে), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (নতুন তারা), শচীন সেনগুপ্ত (ঝড়ের রাতে), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দাম্পত্য কলহে চৈব), বিধায়ক ভট্টাচার্য (তাহার নামটি রঞ্জনা) প্রভৃতি।

● একটি একাঙ্ক নাটকের বিশ্লেষণ

একাঙ্ক নাটকের প্রকৃতি এবং বিশেষ লক্ষণগুলির পর্যালোচনা করা হল। এবার দৃষ্টান্তসহ তা ব্যাখ্যা করবার জন্য বাংলা একাঙ্ক নাটকের পথিকৃৎ মন্মথ রায়ের একটি নাটকই গ্রহণ করা যেতে পারে। 'রাজপুরী' মন্মথ রায়ের অন্যতম বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক, দেখা যাক সেটি সার্থক একাঙ্ক নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা।

'রাজপুরী' নাটকের কাহিনী মন্মথ রায় গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ আখ্যান 'ভদ্রশালজাতক' থেকে। এর আখ্যানভাগ মোটামুটি এই রকম। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বিবাহ করেছিলেন শাক্যদুহিতা বাসবক্ষত্রিয়াকে। নাটক শুরু হয় এমন একটি দিনে যেদিন রাজপুরীতে বিরাট উৎসব। একদিকে চৈত্রমাসের বসন্তোৎসব, অন্যদিকে কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি পালন—তার ওপর আবার মাতুলালয় থেকে সেদিনই ফিরেছেন ষোল বছরের যুবরাজ বিরূধক, তাকে নিয়ে আসছেন বাসবক্ষত্রিয়ার পূর্বপ্রণয়ী সুগায়ক কবিশেখর। উৎসব উপলক্ষে শাস্তার পায়ে আবিরকুঙ্কুম ছুঁইয়ে এনেছেন রাজা, রাণীকে বলেন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাদের সেই পবিত্র ধূলি বিতরণ করতে। রাণী কিন্তু কৌশলে সে অনুরোধ এড়িয়ে যান। বাসবক্ষত্রিয়া মান-অভিমানের পর রাজাকে বলেন, তিনি জানেন রাজা তাঁকে ভালবাসেন না—বিবাহ করছেন শুধু বংশমর্যাদার জন্য। রাজা একথা স্বীকার করলে তিনি ভালবাসার জন্য আর্তি জানান।

এরপর সভাগৃহে কবিশেখরের গান শুরু হবে, রাজা সেখানে যেতে অনুরোধ জানান রাণীকে। রাণী এ প্রস্তাবও এড়িয়ে যান বিরূধকের সঙ্গে আগে দেখা করার অজুহাতে। যেতে হয় অগত্যা রাজাকেই একা। কিছুক্ষণ পরে কবিশেখর এসে দেখা করেন রাণীর সঙ্গে। গুপ্ত বিদ্রোহের খবর পেয়ে রাজা চলে গেছেন দুর্গে, রাতে হয়তো ফিরবেন না। রাণী খুশী হলেন কবিশেখরের সঙ্গ পেয়ে। অতীত স্মৃতিচারণায় দুর্বল রাণী কবিশেখরকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে নিয়ে পালানোর জন্য, সম্মত হন না কবিশেখর—চলে যান রাণীকে ছেড়ে।

ক্রুদ্ধ রাণী মূক ক্রীতদাসকে বলেন কবিশেখরের চোখ উপড়ে আনার জন্য। ক্রীতদাস ভুল বোঝে, সে উপড়ে নিতে যায় রাজশেখরের চোখ। জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচান কবিশেখর এবং রাণীর আদেশ বুঝতে পেরে নিজের চোখ দুটি উপড়ে উপহার পাঠান রাণীকে। যন্ত্রণাদগ্ধ রাণী রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যান বুদ্ধের আশ্রমে।

এদিকে চরমতম দুঃসংবাদ দেয় বিরূধক রাজা ফিরে এলে। সে জানায় রাণীর আসল পরিচয়। রাণী মোটেই শাক্যবংশের মেয়ে নয়, রাজার এক নর্তকীর কন্যা—প্রসেনজিৎকে ঠকাবার জন্যই শাক্যরা এই কৌশল করেছে। বিরূধক রাজপুরীতে ফিরেই শাক্যদের রক্তে বন্যা

বইয়ে দিতে বলেছে এবং আনতে বলেছে শান্তার ছিন্নমুণ্ড। রাজা রাণীর প্রকৃত পরিচয় শুনে ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তিনি দেন নির্বাসনদণ্ড, কিন্তু শোনেন, রাণী স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে চলে গেছেন। এতে রাজা এবং তাঁর পুত্র দুজনেই ব্যথিত হন, দুজনেই ক্ষমা করে দেন রাণীকে এবং সংকল্প করেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন। ঠিক সেই সময়ই প্রতিহারী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে আসে বুদ্ধের আশ্রম থেকে। বিরূধক মনে করেন এ মুণ্ড শান্তার—কিন্তু আবরণ উন্মোচন করে দেখা যায় তা রাণীর।

এবার লক্ষণ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে সার্থক একাঙ্ক নাটকের পর্যায়ে এটি উন্নীত হয়েছে কিনা। প্রথমত, প্রায় এক ঘণ্টা সময়ে অভিনয়যোগ্য এই একাঙ্ক নাটকটিতে যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে তা এর উদ্দেশ্যের একমুখিনতা। বলগর্বে দীপ্ত রাজা প্রসেনজিৎ প্রায় জোর করেই শাক্য বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নিজের বংশগৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য—এর পেছনে প্রেম বা করুণার কোনো সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল প্রয়োজনের। শাক্য বংশের মানুষও যে তাই এর প্রতিশোধ নিয়েছে, শাক্য রাজকন্যার পরিবর্তে প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে রাজার নাচনেওয়ালীর কন্যার—এই সংবাদটি ষোল বছর ধরে গোপন রেখে এসেছেন রাণী সুকৌশলে। আখ্যানের এই নাটকীয় রহস্য-উন্মোচনই এই নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখিনতা। অথচ সেই সঙ্গে চরিত্রের গভীর অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব নাটকটিকে উজ্জীবিত করেছে, কারণ দ্বন্দ্বময়তাই নাটকের প্রাণ। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

রাণী যে শাক্যদুহিতা নন, এই গোপন তথ্যটির ওপর সমগ্র নাটকীয় আখ্যানটি নির্ভরশীল কারণ রাজা প্রসেনজিৎ জানেন তিনি শাক্যদুহিতাকে বিবাহ করে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সংগত কারণেই নাটক শুরু হয় রাজার বিবাহের দীর্ঘদিন পরে, ষোল বছরের বিরূধক মাতুলালয় থেকে রাজপুরীতে যেদিন ফিরে আসছে সেদিন। নাটকটির নাটকীয় গ্রন্থিমোচন যে অন্যত্র থাকতে পারে, এটা বোঝাবার জন্যই সম্ভবত রাণীর পূর্বপ্রণয়ী কবিশেখরকে বিরূধকের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই। সভাগৃহে কবিশেখরের গান শুনতে যাওয়ার ব্যাপারে রাণী অসম্মত অথচ রাজা দুর্গে চলে যাবার পর রাণী যেভাবে কবিশেখরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন—"অসম্ভব! ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব! কেমন করে ভুলি। আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছো। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কতদিন ঢেকে রাখতে পারি"?—এরপর আর সন্দেহ থাকে না, রাণীর এই গোপন প্রণয়ই বোধহয় রাজপুরীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে তা নয়, তার প্রথম আভাস নাট্যকার দিয়েছেন মঙ্গলধূলি প্রজাদের বিতরণ করার ব্যাপারে রাণীর অসম্মতি দেখিয়ে। আসলে নীচ বংশের কন্যা হিসাবে রাণীর যে এই মঙ্গলকর্মে কোনও অধিকার নেই, সে কথাটি ইঙ্গিতের দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে।

নাটকের দ্বিতীয় ইঙ্গিত এর পরেই এসেছে। রাণী রাজাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করেছেন, রাজা তাঁকে কী জন্য গ্রহণ করেছেন—তাঁর রূপের জন্য অথবা বংশমর্যাদার জন্য। তিনি আকুল হয়ে বলেন, "আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না? তুমিও মানুষ আমিও মানুষ—জন্ম আমাদের যা-ই হোক না কেন"।

নাটকের তৃতীয় ইঙ্গিত এই বিগত ঘটনার উন্মোচনে যে, কাশী থেকে আগত এক নর্তকী তাঁদের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শনকালে বিবসনা হয়ে পড়লে রাণী তাঁর মস্তক মুণ্ডনের আদেশ

দিয়েছিলেন। সাধারণ নর্তকীর কাছে যে আচরণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য রাণীর এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কেন, সচেতন দর্শক সে কথা ভাবতেই পারেন। বিশেষ করে, এই ঘটনা স্মরণ করার পরেই রাণী বলেন, "এখন আমার ইচ্ছে হয়—আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি—দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্নভিন্ন করে ফেলি"—প্রকৃতপক্ষে যিনি রাজনর্তকীর কন্যা তিনি একথা বলতেই পারেন এবং নর্তকীর অসৌজন্যে তাঁর পূর্বোক্ত আচরণও অস্বাভাবিক নয়।

নাটকের চতুর্থ ইঙ্গিত, কবিশেখরের প্রত্যাখ্যানে রাণীর উন্মত্তের মতো আচরণ। এইসব আচরণের মূলে যে সত্যটি রয়েছে—সমগ্র নাটকে যে সত্যটি উন্মোচিত হবার জন্য অপেক্ষা করেছে, তা আমরা শুনি বিরূধকের মুখে। এই সত্য জানবার পর রাণীর প্রত্যেকটি আচরণের রহস্য আমাদের কাছে সহজ ও স্পষ্ট হয়ে আসে।

এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে এর মধ্যে নাট্যধর্ম যাতে বজায় থাকে সে ব্যাপারে নাট্যকার অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বহিরঙ্গ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে, ঘটবেই—কারণ নাটক বলতে কেবল চরিত্রের সংলাপ আমরা বুঝি না, তার আচরণ বুঝে থাকি; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, বাইরের এই সব দ্বন্দ্বময়তা আসলে প্রতিফলিত করেছে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই। অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচক হিসাবে চমকিত বাহ্যিক ঘটনাকে গ্রহণ করতে পারলে আমরা নাটকীয় দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝতে পারবো। রাণী সর্বদা কেন অস্থির, কেন তিনি বিরূধকের সঙ্গে কথা না বলে অন্য কিছু করতে পারেন না, সে আমরা পরে বুঝি। তিনি আশঙ্কিতা পাছে বিরূধক সত্য সংবাদ জানতে পারে। রাণী কবিশেখরের সঙ্গে পালাতে চান ওই মিথ্যার প্রলম্বিত অধ্যায় টানতে পারছেন না বলে। নৃশংস আদেশ দিতে পারেন তিনি নর্তকীর কন্যা বলে, আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন অপরাধবোধের তীব্রতা থেকে। হৃদয়-সমুদ্রের ওপরের তরঙ্গভঙ্গ দেখে বিচার করলে নাটকটির প্রতি অবিচার করা হবে, চোখের আড়ালে কতো আশ্রয় ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে তার সঠিক অনুভবেই এর প্রকৃত নাটকীয়ত্ব বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়ত, নাটকটির সংবদ্ধতা ও বাহুল্য বর্জনক্ষমতা একাঙ্ক নাট্যকারদের আদর্শ হতে পারে। অনেকগুলি কাহিনীর স্রোত একটি দৃশ্যে সংহত করতে হয়েছে মন্মথ রায়কে—বিরূধকের রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন, রাজার বসন্ত-উৎসব, রাণীর সঙ্গে কবিশেখরের অবৈধ সম্পর্ক, রাজার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং তারপর মূল নাট্যদ্বন্দ্বের বিস্তার। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব কটি স্রোত তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যে ঘটনার ঠিক যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত তাকে ততটুকুই গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকটি যেমন চমকিত ঘটনা সত্ত্বেও অতি সংহতভাবে মালিনীর 'ক্ষম ক্ষেমংকরে' দিয়ে শেষ হয়েছিল, এখানেও রাণীর ছিন্নমুণ্ড দেখার পর দুটি মাত্র সংলাপ আমরা পাই—

"দেহরক্ষী॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা—

বিরূধক॥ আশ্রমের শেষ হত্যা—মা! মা!"

তৃতীয়ত, একাঙ্ক নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যকে নিষ্ঠভাবেই মেনে চলা হয়েছে। রাজপুরীর চৌহদ্দির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নাটকের সমগ্র নাট্যক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। ক্রিয়া বা ঘটনাগত ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে এই কারণে বলা যায় যে সর্বক্ষণই একটি টানটান উত্তেজনা এবং রহস্যের মধ্যে নাটক সংঘটিত হয়েছে। সংলাপে ও আচরণে কোথাও নাট্যকার এই একাগ্রতা নষ্ট হতে দেননি।

চতুর্থত, নাটকটি অত্যন্ত গতিশীল—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক কোথাও ক্লান্তি অনুভবের বা একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হবার কোনো সুযোগ পান না।

এইসব কারণেই আমরা আমরা বলতে পারি, সার্থক একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ বিচারে মন্মথ রায়ের 'রাজপুরী'কে একটি রসোত্তীর্ণ ও শিল্পোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ঠ. ট্র্যাজেডি

নাটকের অন্যতম প্রধান রসগত বিভাগ ট্র্যাজেডি। গুরুগম্ভীর বিষয়ের যে নাটকের শেষে থাকে বিয়োগব্যথা বা বিষাদ, তাকেই স্থূল অর্থে ট্র্যাজেডি বলা হয়। এই কারণেই বাংলায় এর পরিভাষা বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক। কিন্তু 'ট্রাজেডি' শব্দটি আমাদের কাছে এতোই পরিচিত ও বহুব্যবহারে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে যে আমরা সাহিত্যের অন্য যে-কোনও প্রকরণ সম্বন্ধেও শব্দটিকে প্রায় বিশেষণের মতো ব্যবহার করি—যথা ট্র্যাজিক কবিতা, উপন্যাসের ট্র্যাজেডি প্রভৃতি। এমনকি জীবনে কোন বিষণ্ণ ঘটনা ঘটে গেলে তাকেও আমরা ট্র্যাজিক ঘটনা বা জীবনের ট্র্যাজেডি ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করি। ট্র্যাজেডির বিস্তৃত লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে এবং প্রচুর সমালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে আলোচনা সমালোচকদের শিরোভূষণ হয়ে আছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির স্বরূপ, তার বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের অন্য রসগত বিভাগের সঙ্গে তার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের শরণাপন্ন আমাদের হতেই হবে। তবে তার আগে সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে দুটি-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

বাংলা পরিভাষায় ট্র্যাজেডি ঠিক কী হওয়া উচিত—বিয়োগান্ত অথবা বিষাদান্ত, এ বিষয়ে পরিভাষাবিদ্‌গণ এখনও নিঃসংশয় হতে পারেননি, কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল ব্যাপারটা স্মরণে রাখলে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ছিল না। ট্র্যাজেডি আসলে কোনো মানুষের এমন কোনও বেদনা বা ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী যা তার প্রাপ্য ছিল না—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। এ ব্যাপারটা তার সাংঘাতিক কিছু করে ফেলার (by doing something terrible) জন্যও ঘটতে পারে, অথবা সাংঘাতিক কিছু সহ্য করার ফলেও (by suffering something terrible) ঘটতে পারে। কাজেই, যে ভাবেই হোক, আপাত-নির্দোষ একটি মানুষের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ও সেই দুর্ভোগই যখন ট্র্যাজেডির প্রাণ, তখন মানুষটির যন্ত্রণা দিয়েই ট্র্যাজেডির বিচার হতে পারে। যদি মৃত্যুই সবচেয়ে দুঃখের বলে মনে হয় তবে মৃত্যুকেই আমরা ট্র্যাজিক বলে মনে নেব, যদি বেঁচে থাকার যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়েও বড় মনে হয় তখন বেঁচে থাকাটাই ট্র্যাজিক বলে মনে হবে। যেমন ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রথাগত বিচারে এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে কুন্দনন্দিনীর কথা চিন্তা করলে তার মৃত্যুকে আমরা বলবো ট্র্যাজিক, কেনো না তেমন কোন দোষ না থাকলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অন্যান্য চরিত্রের আচরণের কারণে তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করলে এই প্রথাধর্ম মেনেই বলতে হবে একটি মিলনান্ত বা কমিক সমাপ্তি ঘটেছে উপন্যাসের, কারণ নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী

উপন্যাসের শেষে আবার আগের মতোই 'সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল' গোছের মধুর পরিণতি দেখানো হয়েছে। বস্তুত ব্যাপারটা তাই ঘটেছে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কুন্দনন্দিনী বিবাহের পরের দিন থেকেই নগেন্দ্রের রূঢ় ব্যবহার সহ্য করেছে—ভালো কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে, সূর্যমুখীর নাম পর্যন্ত তার মুখে সহ্য করতে পারেননি নগেন্দ্র। নগেন্দ্র যদি বালসুলভ আচরণ না করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো এই বিবাহই মেনে নিতেন এবং সূর্যমুখী সত্যিই যদি মারা যেতেন আগুনে পুড়ে, তাহলে কুন্দর জীবন কেমন বিষময় হয়ে উঠতো সে কথা যদি একবারও কেউ চিন্তা করেন তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে, কুন্দ মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে থাকাটা হতো তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ, সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিক ঘটনা। পক্ষান্তরে নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী পুনর্মিলিত হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি এ মিলন নির্বিকল্প সুখের! সূর্যমুখীর মতো স্ত্রী থাকতেও নগেন্দ্রর চিত্তস্খলন ঘটেছিল এবং কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করবার জন্য তিনি এমন পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার নিবৃত্তি ঘটেনি—এই ঘটনাটি পুনর্মিলিত দম্পতির কেউই কি ভুলতে পারবে! তাদের পরবর্তী জীবনে কুন্দনন্দিনীর অশরীরী অস্তিত্ব কি মিলনের পথে অলঙঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করবে না—যেমন করেছিল রবীন্দ্রনাথের গল্পে হরসুন্দরী ও নিবারণের মাঝখানে মধ্যবর্তিনী শৈলবালার অস্তিত্ব!

কাজেই আমরা বুঝতে পারি, বিয়োগ বা মৃত্যু ট্র্যাজেডির মূল কথা নয়, কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে সেই বিষাদ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, সেটাই মুখ্য ব্যাপার যা আমাদের মনে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করবে। সুতরাং বিয়োগান্ত নাটক না বলে বিষাদান্ত নাটক বললে ট্র্যাজেডির চরিত্র ঠিক মতো প্রকাশ পেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডি নেই কেন, এ প্রশ্নের উত্তরও এই ট্র্যাজিক সংবেদনের রহস্য থেকেই পাওয়া যাবে। ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনায় অ্যারিস্টটলই এখন শিরোধার্য বলে, ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল কথা তাঁর রচনার ইংরেজি ভাষ্য থেকেই স্মরণ করা যাক। তিনি মাত্র দুটি শব্দে এটি বোঝাতে চেয়েছেন—unmeritted misfortune, অর্থাৎ এমন কোনও misfortune বা ভাগ্যবিপর্যয় যা কিনা unmeritted–যেটা একেবারেই অপ্রাপনীয়, কোনমতেই তার জীবনে প্রত্যাশিত নয়। এই যদি হয় ট্র্যাজিক সংবেদন, তবে সংস্কৃত নাটকে তার যে স্থান হবে না এতো সহজেই বোঝা যায়। কারণ ভারতীয় ধর্মচিন্তার মূল কথা, যেমন কর্ম তেমনি ফল—একটি মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনই সে ফল লাভ করে, এই চিন্তার বিরোধী কোনো ঘটনা সংস্কৃত নাটকে আমরা দেখাতে পারি না। আর তা দেখাতে না পারলে অর্থাৎ প্রাপনীয় নয় এমন ফলই মানুষ লাভ করছে, এ ঘটনা না দেখালে ট্র্যাজিক সংবেদনও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত নাটকে যথার্থ ট্র্যাজেডি নেই। এমন কি বাংলা পৌরাণিক নাটকেও ব্যাপারটা ওইখানেই অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। শেক্স্পীয়রের নাটক দেখে অনুপ্রাণিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টির ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। তিনি জনার জীবনে সুন্দর ট্র্যাজিক উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন, তাকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, অথচ জনার শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্যের পরই এমন এক ক্রোড়-অঙ্ক রচনা করলেন যাতে ভারতীয় ধর্মাদর্শেরই জয় ঘোষিত হল—পাশ্চাত্য ট্র্যাজিক সংবেদন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

● অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা ও তার বিচার

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পেয়োটিক্স্' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, বাইওয়াটার তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

"A tragedy, then, is the the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions."

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা ট্র্যাজেডির কতকগুলি প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য পাই। প্রথমত, ট্র্যাজেডি কোনো বিশেষ ঘটনার অনুকরণ। এ থেকে ট্র্যাজেডির বস্তুগত চরিত্রই ফুটে ওঠে, অর্থাৎ ভাবনাচিন্তার রূপায়ণ নয়, ট্র্যাজেডি কোনো ঘটনার অনুকরণ। এই ঘটনারও অবশ্য বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে বলে তিনি সংজ্ঞায় বলেছেন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) ঘটনাটিকে গুরুগম্ভীর হতে হবে, কোনও তরল ঘটনা নিয়ে ট্র্যাজেডি রচিত হওয়া উচিত নয়।

(খ) ঘটনাটি বেশ কিছুটা আয়তনবিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদ্র হবে না।

(গ) ঘটনাটি খাপছাড়া হবে না, তাকে সম্পূর্ণ হতে হবে। এর অর্থ হল তার সুস্পষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, এর আঙ্গিক হবে আনন্দদায়ক উপাদান দিয়ে তৈরি। এই উপাদান বা diction সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল এই অধ্যায়েরই পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মূলত ছন্দ এবং গীতিময়তাকেই বোঝাতে চান। যে অংশে যে রকম ছন্দ প্রয়োজন সেখানে সেইরকম ছন্দ প্রয়োগ করতে হবে, এই তাঁর অভিমত।

তৃতীয়ত, সমস্ত ব্যাপারটি লেখা হবে নাটকীয় ভাবে, বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে নয়। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য যে কোনও নাটকেরই মেনে চলা উচিত। কোন ঘটনা কীভাবে ঘটছে, অন্যান্য চরিত্র তার বর্ণনা দিলে তার নাটক হয় না—নাটকে ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ বর্ণনা থাকা প্রয়োজন, তাকেই বলে নাটকীয় উপস্থাপন।

চতুর্থত, ঘটনাক্রম যেন মানুষের মনে করুণা এবং ভীতির সঞ্চার করে। ট্র্যাজিক সংবেদন বলতে আমরা যা বুঝিয়েছি তা যদি নাটকে ফুটে ওঠে তবে চরিত্রের প্রতি করুণা আমাদের নিশ্চয়ই জাগবে, এবং সেই সঙ্গে জাগবে ভীতি এই কারণেই যে, মানুষ কৃতকর্ম ছাড়াও এই রকমের যন্ত্রণা বা বেদনা ভোগ করে। এই দৃশ্য আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করাই স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, করুণা ও ভীতি ইত্যাদি অনুভূতির বিশ্লেষণ ঘটিয়ে ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে। অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার অন্যান্য অংশের মতো অনুভূতির 'বিমোক্ষণ' বা 'ক্যাথারসিস' নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলা যায়, ক্যাথারসিস বলতে মনের সেই রূপান্তরিত অবস্থা বোঝানোই সম্ভব যাতে একটি শোকবহ ঘটনাও মনে আনন্দের অনুভূতি দান করে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসবাদী কাব্যতাত্ত্বিকগণ স্থায়ীভাব থেকে সিদ্ধিলাভ করে রসে পরিণত হবার

যে প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন তার সঙ্গে এর মিল থাকা অসম্ভব নয়। ক্যাথারসিসের অন্য যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে লেসিং এবং লুকাসের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য।

ট্র্যাজেডির এই সংজ্ঞা দান করেই অ্যারিস্টটল তার উপাদানের প্রসঙ্গে এসেছেন এবং বলেছেন ট্র্যাজেডির অপরিহার্য উপাদান ছটি—কাহিনী বা বৃত্ত (plot), চরিত্র (character), বাচন (Diction), মনন (Thought), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) এবং গীতিময়তা (Melody)। উপাদানগুলি বলতে সঠিকভাবে কী বোঝায় তাও তিনি বলেছেন। বৃত্ত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন নাটকটির মূল পরিকল্পনা বা design, এর মধ্যে সমগ্র নাটকের ভাববস্তু বা Idea-ও লুকিয়ে আছে। সেই কারণেই ছটি অঙ্গের মধ্যে তিনি বৃত্তকেই সবচেয়ে প্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন, এমন কী এ কথাও বলেছেন যে নাটকের শেষ কথা হল এই ঘটনা-সংস্থাপন এবং বৃত্তগঠন। এদের গুরুত্ব অ্যারিস্টটল কীভাবে দিয়েছেন এবং ক্রমটা কেমন নির্দেশ করেছেন তা বাইওয়াটারের ইংরেজি অনুবাদ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে—We maintain, therefore, that the first essential, the life and soul, so as to speak, of Tragedy is the plot; and that the Characters come second. ...Third comes the element of thought... Fourth among the literary elements is the Diction... the Melody is the greatest of the pleasurable accessories of Tragedy. The spectacle, though an attraction, is the least artistic of all the parts'.

অ্যারিস্টটলের এই মত, বিশেষত বৃত্তনির্মাণকে চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দেওয়া, পরবর্তীকালের অনেক নাট্যতাত্ত্বিককেই খুশি করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ অ্যারিস্টটলের যুক্তিকে তাঁরা সম্ভবত সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেননি। অ্যারিস্টটল চরিত্রকে মোটেই অল্পমূল্য দান করেননি, তাঁর যুক্তি ছিল এইরকম যে, ট্র্যাজেডি জীবনের রূপ, চরিত্রের মুখ দিয়ে বা আচরণে তার প্রকাশ ঘটলেই সেটা আমরা কিছু বাহ্যিক ঘটনা হিসাবেই দেখি। ঘটনাগুলি ঘটায় চরিত্র, কিন্তু ঘটনাই শেষ পর্যন্ত চরিত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয়ত, খুব সূক্ষ্ম চরিত্রসৃষ্টি করতে না পারলেও একটা ট্র্যাজেডি লেখা অসম্ভব নয়, কিন্তু নির্দোষ ঘটনা-বিন্যাস ছাড়া এ কাজ অসম্ভব। তৃতীয়ত, চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য হয়তো সুন্দর ভাব ও ভাষার সৃষ্টি করা হল কিন্তু নাটক তেমন জমলোনা, এমন দৃষ্টান্ত যেমন দেখা যায়; তেমনি এরকম দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে এগুলির অভাব সত্ত্বেও কেবল বিন্যাসের পারিপাট্যের জন্যই নাটক রসোত্তীর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং বৃত্তকে বলতেই হবে ট্র্যাজেডির আত্মা।

দ্বিতীয় স্থান অবশ্যই চরিত্রের, কারণ নাটকের চরিত্রকেই আমরা মঞ্চে সংলাপ ও বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে দেখি। ট্র্যাজেডির ভাবসত্য তাদের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তুলতে হবে। কাজেই চরিত্র যদি অসংগত আচরণ করে বা দর্শকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় তবে সে নাটক রসোত্তীর্ণ হতেই পারে না।

মননকে অ্যারিস্টটল তৃতীয় স্থান দিয়েছেন কেন, এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ইংরেজি রূপান্তরের মাধ্যমে গ্রহণ করলেই বুঝতে পারা যাবে। তিনি বলতে চেয়েছেন—'Thought is shown in all they say when proving a particular point, or it may be, enunciating a general truth.'

অ্যারিস্টটলের সময়ে নাটকের ভাষা ছন্দোবদ্ধ ছিল বলেই বাচন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'the composition of the verse,' কিন্তু পরবর্তীকালে গদ্য সংলাপের ব্যাপক প্রচলনের পর আমরা একে 'expression of the meaning in words'—এইভাবেই গ্রহণ করতে পারি। গীতিময়তা তখন এতোই অনিবার্য ছিল যে, এর কোনরকম ব্যাখ্যাই তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল—'Spectacle (or stage appearance of the actors) must be some part of the whole.'

● ট্রাজেডির নায়ক

ট্রাজেডির নায়ক কী ধরনের চরিত্র হতে পারে এবং তার চরিত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সঠিক ট্র্যাজিক সংবেদন ঘটাবার কাজে সাহায্য করতে পারে, এ নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টটল।

প্রথমত, মানুষকে চিত্রিত করার যে তিনটি উপায় লেখকের কাছে আছে—সে যেমন ঠিক তেমনি, সে যেমন তার চেয়ে হেয় এবং সে যেমন তার চেয়ে উন্নত—এর মধ্যে তৃতীয়টিই ট্র্যাজেডির নায়কের ক্ষেত্রে আমরা আশা করি, কারণ নায়ক মহিমাসম্পন্ন না হলে যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির নায়ককে হতে হবে বিখ্যাত এবং উচ্চাকাঙক্ষী। কথাটা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্যশালী না হলে ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়া যাবে না, অ্যারিস্টটলের এই কথা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। আসলে কমেডিতে থাকে একটু নীচু ধরনের মানুষ, ট্র্যাজেডিতে থাকে কিছুটা উঁচু ধরনের মানুষ—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। বিখ্যাত না হলেও ট্র্যাজেডির নায়ক যে হওয়া যায়, পরবর্তীকালে তার প্রচুর উদাহরণ আমরা দেখেছি। উচ্চাকাঙক্ষা অবশ্য ট্রাজেডির নায়কমাত্রেরই থাকা উচিত। যাঁর জীবনের সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি যার পঙ্গু হয়ে গিয়েছে,—উদাহরণ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের কথা—তাকে কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক বলা যাবে না; তার অন্তত 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রধান পুরুষ রাবণের মতো সহ্য করবার ক্ষমতা থাকবে অসীম।

তৃতীয়ত, অতিভালো মানুষ বা অতিধার্মিক ব্যক্তি কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ এরকম মানুষের করুণ ভাগ্যবিপর্যয় দেখলে আমরা আশাহত হয়ে পড়ি। তাঁদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী আমাদের মনে করুণা জাগায় না, আমাদের দুঃখে অভিভূত করে ফেলে। অবশ্য এই মত পরবর্তীকালে অনেকে মেনে নিতে পারেননি।

চতুর্থত, অতি মন্দলোক বা শয়তানও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ তাঁর পতন আমাদের কোনও সহানুভূতি জাগায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা, যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদনও সৃষ্টি করা যায় না অতি-মন্দ লোকের ক্ষেত্রে। তিনি যে ধরনের ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হোন না কেন, সেই বিপর্যয় আমাদের অপ্রাপণীয় বা unmeritted মনে হয় না। এই মতটিও পরবর্তীকালে প্রচুর সমালোচিত হয়েছে।

পঞ্চমত, ট্র্যাজেডির নায়কের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটার জন্য বাহ্যিক কারণ কিছু নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান কারণটিকে বলা হয়েছে Hamartia বা আরো সাধারণ

কথায় Tragic flaw। গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রধান হ্যামারশিয়াকে বলা হয় 'Hubris' অর্থাৎ নায়কের আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্য—তার জন্য তিনি এতো অতিরিক্ত গর্বিত যে দেবতার সাবধানবাণীকেও গ্রাহ্য না করে নিজের পতন ডে.কে আনেন। শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে এটা দেখা যায় নায়কের বিচার-বিভ্রম (Error of judgement) বা অন্তর্নিহিত কোনো দুর্বলতা (Frailty) হিসাবে।*

● ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: গ্রীক ও ইংরেজি সাহিত্য

ট্র্যাজেডির উদ্ভব যে গ্রীসে, এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। অ্যারিস্টটল যখন তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্‌' রচনা করেন তখনই গ্রীক সাহিত্যের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি রচয়িতা ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিদিস প্রাচীন হয়ে এসেছেন।

ট্র্যাজেডির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 'ট্র্যাজেডি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'goat-song' বা ছাগগীতি বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন কালে ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে ছাগল বা ভেড়া বলিদানের সময় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, তা থেকেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি।

আর একটি মত অনুসারে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি আরো প্রাচীনকালে। অতীতে যেসব দীক্ষাবিধি ছিল সেইগুলোই ট্র্যাজেডির প্রাচীনতম রূপ।

সমালোচক রিজওয়ে তাঁর Origin of Tragedy, with special reference to Greek Tragedians' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে ডায়োনিসাস দেবতার কাছে ছাগ বলির অনুষ্ঠান থেকে মোটেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব নয়, গ্রীকদের পূর্বসূরীদের পূজা বা মৃতের উদ্দেশে এক ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকেই ট্র্যাজেডি উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে প্রথম প্রথাসম্মত আলোচনা অ্যারিস্টটলই করেন, সেই জন্য তাঁর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রাচীন ডিথাইরাম্ব (Dithyramb) গান থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব ঘটেছে। উদ্ভবের পর তার বিবর্তন কীভাবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটেছে সে সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেছেন, "Tragedy advanced by slow degrees, each new element that showed itself was in turn developed. Having passed through many changes, it found its natural form."

প্রাচীন গ্রীক নাটকের নির্মাণরীতিতে পাঁচটি বিভাগ আছে, সর্বত্রই অবশ্য সমবেত সংগীত বা chorus-এর একচ্ছত্র প্রাধান্য। কোরাসের এই প্রাধান্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মন্তব্য :

The Chorus must be regarded as one of the actors, and a part of the whole as joining in the action." প্রথম ভাগে কোরাসের আগে থাকে প্রোলোগ (Prologos)—সেখানে স্বগতোক্তি বা দুই চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগ প্যারোড (Parodos) যেখানে গান গাইতে গাইতে সমবেত সংগীতের কুশীলব প্রবেশ করে। তৃতীয় ভাগ এপিসোডিয়া (Epeisodia), এটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং এখানে কোরাস ও কিছু চরিত্র নাট্যবস্তুকে আরো বিশদ করেন।

* এ সম্বন্ধে এবং ট্র্যাজেডির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা পাওয়া যাবে লেখকের 'সাহিত্য-বীক্ষণ' গ্রন্থে।

চতুর্থ বিভাগ ট্যাসিমা (stasima)—এখানে কোরাস একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গান করে যায়। সর্বশেষ বিভাগটিকে বলা হয় এক্সোডাস (Exodos)।

এই বিভাগ অবশ্য কেবল আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যই বোঝায়। গ্রীক নাটকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সামান্য পরিচয় জেনে রাখা ভাল।

এককথায় বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেডিকে ধর্মমূলক এবং ঈশ্বরের বিধানের প্রতি নিষ্ঠামূলক বলা যেতে পারে। আমাদের সাধারণ ধারণা, এখানে মানুষকে ঈশ্বরের ক্রীড়নক এবং অদৃষ্ট বা অদৃষ্টের দেবতা নেমেসিসের দাস হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা যে ঠিক নয় তা স্কাইনবার্গ-সহ অনেক পণ্ডিত সমালোচকই দেখিয়েছেন। কিছু বিধান আছে যা ধর্মীয় বলে নয়, স্বাভাবিক ও নৈতিক দিক থেকেই লঙঘন করা উচিত নয়। কোনও মানুষ যদি তা লঙঘন করার চেষ্টা করে তবে ঈশ্বরের রোষ তার ওপর নেমে আসে—মোটামুটি এই হল গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্তর্গত সত্য। যেমন সোফোক্লেসের বিখ্যাত নাটক 'ইলেক্‌ট্রা'-য় একদা ক্লাইটেমনেস্ট্রা স্বামী হত্যা করে অন্যায় করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নিয়েছে তাঁর দুই ছেলে ওরেস্টাস এবং ইলেক্‌ট্রা তাদের মাকে হত্যা করে এবং এ কাজে দেবতা অ্যাপোলোরও পুরোপুরি সম্মতি ছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নীতিগর্ভ বাক্যের সমাবেশ, অলংকৃত ভাষা, নাটকে একটা প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া মঞ্চে প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখিয়ে তার বর্ণনা দেওয়া প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত রোমান ট্র্যাজেডির কথা বলা দরকার। রোমান নাটক ও সেনেকান ট্র্যাজেডি কথাদুটি প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে, কারণ প্রাচীন নাট্যকার সেনেকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৪ সাল থেকে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) যে ট্র্যাজেডিগুলি লিখেছেন, পরবর্তী কালে তা ইংরেজ নাট্যকারদের আদর্শ হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা দশটি নাটকের কথা জানা যায়, এগুলি হল মিডিয়া, ফায়েড্রা, অয়দিপাউস, অ্যাগামেনন প্রভৃতি। রোমান বা সেনেকার ট্র্যাজেডিগুলি ছিল বক্তৃতাধর্মী, সেজন্যই সমালোচক অ্যাব্রাম্‌স্‌ বলেছেন, "Senecan tragedy was written to be recited, rather than acted."

ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যযুগে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সেই সময়ে যেসব নাট্যগাথা পাওয়া যায় তার মধ্যে লোকসাহিত্যের লক্ষণ প্রবল। ইংরেজি ট্র্যাজেডির গৌরবময় যুগ বলা যায় এলিজাবেথীয় যুগকে। এই সময়ে সেনেকার নাটক দুটি ধারায় ইংরেজি নাটককে প্রভাবিত করে। একটা ধারাকে বলা যেতে পারে সেনেকার আদর্শে প্রথাগত ট্র্যাজেডি, যেখানে কোরাসের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে মেনে চলা হয় এবং আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা হয় সযত্নে। এর একেবারে প্রাচীন উদাহরণ স্যাকভিল এবং নর্টনের লেখা 'গর্বোডাক' নাটক। অন্য যে ধারাটির উল্লেখ করা হয়েছে তাকে সাধারণভাবে বলা যায় প্রতিশোধমূলক ট্র্যাজেডি বা রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি। সেনেকার যেসব নাটকে প্রতিহিংসা, হত্যা, রক্তপাত, নৃশংসতা ইত্যাদি আছে, তারা এই ধারাটির আদর্শ। কিন্তু সেনেকা যেখানে বর্ণনার মাধ্যমেই এই বীভৎস ব্যাপারগুলি সেরেছেন, এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারগণ সেখানে এই রোমহর্ষক দৃশ্যগুলি মঞ্চের ওপরেই নিয়ে এসেছেন। এই ধরনের ইংরেজি ট্র্যাজেডির মধ্যে উল্লেখ করা যায় টমাস কীডের 'দি স্প্যানিস ট্র্যাজেডি', মার্লোর 'দি জু অব মালটা' এবং শেক্‌স্‌পীয়রের 'টাইটাস অ্যানড্রোনিকাস'—অবশ্য এই ধারাতেই এসেছে তাঁর অমূল্য সৃষ্টি 'হ্যামলেট'।

১৫৮৫ থেকে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ, প্রায় চল্লিশ বছরের এই কালসীমার মধ্যেই ইংরেজি ট্র্যাজেডির বিখ্যাত স্রষ্টাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন মার্লো, শেক্‌স্‌পীয়র, চ্যাপম্যান, ওয়েবস্টার, বোমন্ট, ফ্লেচার, ম্যাসিঞ্জার প্রভৃতি। এদের অনেকেই অ্যারিস্টটলের নির্দেশিত আদর্শ মেনে চলেননি, শেক্‌স্‌পীয়র তো ননই—এবং সেই কারণেই আমরা গ্রীক নাটক ও শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের দুটি আদর্শ লাভ করেছি। যেমন ধরা যাক 'ম্যাকবেথ' নাটকের কথা। একটি ভালো মানুষ বিচার-বিভ্রমের জন্য ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন—একথা ম্যাকবেথ সম্বন্ধে বলা যাবে না, তবে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙক্ষী মানুষ তাঁকে নিশ্চয়ই বলা যায়। অ্যারিস্টটল বলেছেন অতি মন্দলোক ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কিন্তু 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের নায়ককে কোনো মতেই অতি মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য সব নাটকেই যে শেক্‌স্‌পীয়র অ্যারিস্টটলের নির্দেশ লঙঘন করেছেন এমন নয়, যেমন 'ওথেলো' পুরোপুরি অ্যারিস্টটলীয় ধারণাকেই সমর্থন করে। এলিজাবেথের যুগের ট্র্যাজেডির মধ্যে হাস্যরসাত্মক কিছু অংশ, পরে যার সাধারণ নাম হয়েছে 'কমিক রিলিফ'। পরবর্তীকালে রেস্টোরেশন যুগে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মাঝামাঝি একটি প্রকরণের উদ্ভব হয় যাকে অবশ্য ট্র্যাজেডির একটি প্রকারভেদ বলাই সংগত, এর নাম মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডি।

অষ্টাদশ শতকের আগে পর্যন্ত ইংরেজি ট্র্যাজেডিগুলি পদ্যেই লেখা হয়েছে এবং অজ্ঞাত নাট্যকার-রচিত 'এ ইয়র্কশায়ার ট্র্যাজেডি'-র মতো ব্যতিক্রমী নাটক বাদ দিলে তারা বিখ্যাত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষকেই নায়ক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। অষ্টাদশ শতকেই আমরা গদ্যমাধ্যমে লেখা নাটক পাই এবং এক ধরনের ট্র্যাজেডি পাই যাকে বলা হয় 'ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি'—যেখানে সাধারণ মানুষও নায়কত্ব করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে জর্জ লিলোর 'দি লন্ডন মার্চেন্ট' নাটকের নাম করা যায়। এরপর থেকে গদ্যে বহু বিখ্যাত ট্র্যাজেডিই লেখা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষ কেবল নয়, শ্রমজীবী মানুষকে নিয়েও লেখা হয়েছে ট্র্যাজেডি। একেবারে আধুনিক কালে লেখা নাটকের মধ্যে বিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলারের 'দি ডেথ অব এ সেল্‌সম্যান' (১৯৪৯) নাটকের উল্লেখ করা যায়, রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের কাছেও যার অভিনয় অত্যন্ত পরিচিত। এর ন্যায়ক উইলি লোম্যানের সঙ্গে আমরা যে সহানুভূতির বন্ধন অনুভব করি তার প্রকৃতি অ্যারিস্টটলের 'pity and fear'-এর চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র। এসব থেকেই সম্ভবত প্রথাবহির্ভূত নায়ক বা 'anti-hero'-র ধারণা গড়ে উঠেছে এইসব প্রতিবাদী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে। স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকে ভল্যাদিমির ও এস্ট্রাগনের কথা ভাবলেই এই 'অ্যান্টি-হিরো'-র ধারণাটি বোঝা যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংরেজি ট্র্যাজেডির ধ্যান-ধারণা অনেক পালটে গেছে। প্রাচীন নাটকের নব্য রূপায়ণ যেমন ঘটেছে তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে কম না। উদাহরণ হিসাবে ইউজিন ও'নীলের 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' বা এলিয়টের কাব্যনাট্য 'মার্ডর ইন দা ক্যাথিড্রাল'-এর উল্লেখ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডির উদ্ভবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা লোকসংস্কৃতি যাত্রাগান বা পাঁচালির বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়, তবে যাত্রাপালায় সংগীতের আধিক্যে কোরাসের কথা মনে পড়তে পারে। তার চেয়েও বড়ো কথা, কোরাস যে

কাজটি সম্পাদন করতো, যাত্রাপালায় সে কাজ দীর্ঘদিন করে এসেছে বিবেক নামক একটি চরিত্র—সংগীতেরই মাধ্যমে। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে সংস্কৃত নাটকেই যখন ট্র্যাজেডির উত্তরাধিকার নেই তখন ইংরেজি থিয়েটার ছাড়া বাংলা নাটক ট্র্যাজেডির আদর্শ আর পাবে কোথা থেকে!

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি রচনার প্রচেষ্টা 'কীর্তিবিলাস', লেখক জি. সি. গুপ্ত; শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের অনুমান পুরো নামটি গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। 'রচনা অমার্জিত এবং বিশৃঙ্খল হইলেও বিষাদান্ত নাটক-রচনায় প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া কীর্তিবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে'—এই অভিমত তাঁর।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি হিসাবে স্বীকার করা হয় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণ কুমারী নাটক'কে। এই নাটকে অবশ্য শেক্স্পীয়রীয় আদর্শ অপেক্ষা গ্রীক নাটকের আদর্শই বেশি দেখতে পাই আমরা। অপাপবিদ্ধা তরুণী কৃষ্ণকুমারীর আত্মহননে তার নিজের কোনো বিচারবিভ্রম বা fraiity আমরা দেখতে পাইনি—মনে হয়েছে যেন অপরিহার্য নিয়তি তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। সমালোচকগণ বোধহয় সেই কারণেই ইউরিপিদিসের 'ইফিগেনিয়া' নাটকের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে। তবে অ্যারিস্টটলীয় ধারণার বাইরে গিয়ে এখানে ধনদাস-মদনিকা বৃত্তান্ত নিয়ে নাট্যকার বেশ কিছুটা comic relief তৈরি করেছেন। একই সঙ্গে বাংলা নাটকের আদি যুগে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের উল্লেখ করতে হবে। ট্র্যাজেডির আদর্শে তাকে খুব উচ্চাসন দেওয়া যাবে না, যদিও এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ এবং জনপ্রিয়তার বিচারেও প্রথম যুগের কোনো নাটক এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্স্পীয়রীয় নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রচুর নাটকের মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটকই যদিও সংখ্যায় বেশি—'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক ট্র্যাজেডিও তিনি রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটক রচনায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু ট্র্যাজেডিও আছে। 'সাজাহান' ও 'নূরজাহান' তাঁর দুটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করলেও সামাজিক নাটকে বিশুদ্ধ গদ্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যভাষা একেবারেই পদ্যগন্ধী, যেমন 'নূরজাহান' নাটকে জাহাঙ্গীরের সংলাপ—"সেদিন গবাক্ষপথে দেখিলাম কি সে মূর্তি!—যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনের প্রেমের প্রভাত।"

রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডি-চেতনাতেও ছিলেন বিশিষ্ট, বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভাবে বিচার না করলে এর মৌলিকত্ব বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রকরণের আলোচনায় তাঁর নাটক ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। 'বিসর্জন' নাটককে আমরা তাঁর প্রথানুসারী সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বলতে পারি। অন্যান্য ট্র্যাজেডিতে তিনি যে শেক্স্পীয়রকেই অনুসরণ করেছেন একথা তিনি আভাসে বলেছেন, তবে 'মালিনী' নাটকে গ্রীক নাট্যরীতির প্রভাব বিশিষ্ট গ্রীক সাহিত্যের সমালোচকগণও লক্ষ করেছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যকার হিসাবেও সমর্থ ছিলেন, ট্র্যাজেডির লেখক হিসাবেও। পরবর্তীকালে নাটক এবং ট্র্যাজেডি রচনায় যাঁরা

খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন নিশিকান্ত বসু ('দেবলাদেবী'), বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ('মিশরকুমারী'), মন্মথ রায় ('জীবনটাই নাটক'), যোগেশ চৌধুরী ('সীতা'), শচীন সেন ('গৈরিক পতাকা'), বিধায়ক ভট্টাচার্য ('মাটির ঘর')।

বাংলা নাটকের জাত বদল হয়, গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলনের সময়। ইংরেজি নাটকে যাকে বলে anti-hero, সেই প্রথায় জনসাধারণকে প্রাধান্য দিয়ে mass-theatre বা গণনাট্য দেখা যায়। এই পর্যায়ে সব নাটকই যে ট্র্যাজেডি এমন নয়। তবে 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি কিছু ভালো ট্র্যাজেডি এই সময় লেখা হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য এবং তুলসী লাহিড়ী ছিলেন এই সময়ের দুজন শক্তিমান নাট্যকার। এই ধারায় পরে অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যকার উৎপল দত্ত কিছু ভালো নাটক রচনা করেন।

নাটকের আধুনিক পর্যায়কে অনেকে দীন মনে করেন। বিখ্যাত বিদেশী নাট্যকারদের রচনার অনুবাদ, রূপান্তর বা ভাবানুসরণে লেখা নাটকের সংখ্যা এখন বেশি, তবে মৌলিক ট্র্যাজেডিও একেবারে নেই তা নয়। বুদ্ধদেব বসুর হাতে জন্ম হয়েছে কাব্যনাট্যের এবং রাম বসু, অলোক সরকার প্রভৃতি কবিদের হাতে এই শ্রেণীটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

● একটি বাংলা ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন লক্ষণ সম্পর্কে যা আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম তার আলোকে একটি বাংলা ট্র্যাজেডির শিল্পসার্থকতা বিচার করা যেতে পারে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের স্বীকৃত প্রতিভা গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 'জনা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ্য নাট্যকীর্তি। সুতরাং বিচারের জন্য এই নাটকটিই আমরা গ্রহণ করবো।

'জনা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা নীলধ্বজের পত্নী জনা এবং তাঁর ট্র্যাজেডিই যখন নাট্যকারের ঈপ্সিত তখন এটিকে ইংরেজি ট্র্যাজেডির আদর্শে She-tragedy ধরনের নাটক ভাবাই ভালো। মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন এবং দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্যে সেই অশ্ব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যপরিক্রমায় বার হয়েছেন অর্জুন ও কৃষ্ণ। তাঁরা নীলধ্বজের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন, এই খবর জানিয়ে অগ্নিদেব রাজাকে অনুরোধ করেন শ্রীকৃষ্ণকে পুজোপচারে বরণ করে নেবার জন্য। রাজ্যের সকলেই এই প্রস্তাবে একমত, শুধু জনা এ কথা মানতে পারেন না। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূজা পাবার জন্যই তাঁদের কাছে মাহিষ্মতী পুরীতে আসতেন, তাহলে তাঁকে বরণ করে নিতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কারণ তিনি নিজেও কম হরিভক্ত নন। কিন্তু তিনি বলেন, 'হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বাকার।' শ্রীকৃষ্ণ এখন ঈশ্বর হিসাবে এখানে আসছেন না, 'অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।' সুতরাং তাঁকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই আহ্বান না জানানো হয় তবে ক্ষাত্র ধর্মের অসম্মান ঘটে। জয়-পরাজয় মানুষের হাতে নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই রণের আহ্বান উপেক্ষা করা কোনও ক্ষত্রিয় বীরেরই উচিত নয়।

জনার এ কথা সকলে অগ্রাহ্য করে, করতে পারে না মাতৃভক্ত ও তাঁর বীরপুত্র প্রবীর। প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটকায় এবং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সে তিলমাত্র ভীত নয়, কারণ মাতৃভক্তি তার অপরিসীম—'মাতৃনাম কবচ আমার' এবং সে জানে

মায়ের আশীর্বাদ যদি থাকে—'ধরি তোর পদধূলি শঙ্কুরে না ডরি।' সকলে প্রবীরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু জনার কথা—'রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিব।' শেষ পর্যন্ত প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধের প্ররোচনাও কৃষ্ণেরই পরিকল্পনা, কারণ—

"মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে।
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।"

কাজেই প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, অন্যায় ভাবে ছলনাময় কৃষ্ণ তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নেন, অর্জুনের হাতে সে নিহত হয় এবং জনার রোষবহ্নি থেকে কেমন করে অর্জুন নিজেকে বাঁচাবে, সে উপায়ও কৃষ্ণ বলে দেন অর্জুনকে। অসহায় জনা শেষ অবলম্বন হিসাবে অনুরোধ জানান ভাইকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য। ভাই অসম্মত হওয়ায় শেষপর্যন্ত জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জন করা ছাড়া কোনো উপায় তাঁর থাকে না। ক্রোড় অঙ্কে অবশ্য দেখা যায় জনার যাবতীয় ক্লেশের অবসান ঘটেছে—তিনি প্রসন্ন মুখে মাতা জাহ্নবীর কোলে বসে আছেন।

অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা হিসাবে বিচার করলে আমরা বলতে পারি—

(ক) ঘটনাটি যে গুরুগম্ভীর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য সকলে যখন ভক্তির আবেগে প্রবাহিত তখন যুক্তির বলিষ্ঠতায় জনা নিজের চিন্তাশক্তি অটল রাখতে পেরেছেন। ক্ষাত্র ধর্মের সঙ্গে ভক্তি ধর্মের এই সংঘাত যথার্থ ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিষয়, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

(খ) নাটক হিসাবে এটি স্বল্পায়তন নয়।

(গ) একটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি গঠিত হবার মতো আয়তন এই নাটকের আছে। এর সুস্পষ্ট আরম্ভ আছে, দ্বন্দ্বময়তায় কাহিনীর স্পষ্ট নাট্যদেহ আছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারও আছে।

(ঘ) জনা নাটকের গঠনশৈলি বা ভাষার আলোচনা পৃথকভাবে করা অর্থহীন। মোটামুটিভাবে বলা যায় গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যভাষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন। শুধু গৈরিশ ছন্দের আবিষ্কারক হিসাবে নয়, চরিত্রের মানসিকতা এবং বক্তব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষা-পরিবর্তনে তিনি দক্ষ ছিলেন। সেই জন্যই প্রবীরের মুখে যখন দিয়েছেন উচ্ছ্বসিত সংলাপ, বিদূষকের মুখে তখন রেখেছেন দ্ব্যর্থবোধক সরস সংলাপ। সাধারণভাবে গদ্যসংলাপে ঘটনা এগিয়ে চলে, অথচ যখনই তা ভাবগম্ভীর বা আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ে তখনই ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায় পদ্যমাধ্যমে। প্রকৃতি অনুযায়ী এই ভাষারীতির পরিবর্তন সর্বত্রই যে স্বাদু হয়েছে তা নয়, কোথাও তা রসাভাসও ঘটিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় জনার মস্তিষ্কবিকৃতির সময় এই সুসংবদ্ধ সংলাপ—

"যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান।
যথা জড় জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত
ঘোর ঘুম মাঝে
চলে প্রলয় জীমূতশ্রেণী
বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে।"

তবে এগুলিকে ব্যতিক্রম হিসাবে মেনে নেওয়াই ভালো।

(ঙ) ট্র্যাজেডি সার্থক করে তুলতে হলে যে বর্ণনামূলক রীতি বর্জন করে নাটকীয় রীতি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা-সংঘটন মূলক রীতির দিকে নজর রাখতে হয়, 'জনা' নাটকে সর্বত্র তা নাট্যকারের স্মরণ ছিল। এই নাটকে প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, মোহিনী মায়ায় প্রবীরের বর্ম ও তীর ধনুক অপহরণ, প্রবীরের মৃত্যু, পুত্রশোকে উন্মাদিনী জনাকে সামলানোর প্রচেষ্টা, প্রাণ বিসর্জন ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছেন, অন্য চরিত্রের মুখে বর্ণনা করেননি।

(চ) যে নাটকীয় ঘটনাগুলি দেখানো হয়েছে তা আমাদের মনে করুণা ও সহানুভূতির সঞ্চার করে কিনা—এ প্রশ্নটি ট্র্যাজেডি-বিচারের পক্ষে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপরই যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন নির্ভর করে। জনার মানসিকতার যে দ্বন্দ্ব অনাবৃতভাবে এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে তাঁর প্রতি করুণা ও সহানুভূতি আমাদের মনে নিশ্চয়ই জাগবে। সকলেই যখন কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত তখন জনা যে যুক্তিতে কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পেতে চান বা পুত্রের রণস্পৃহা সমর্থন করেন তা আমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। নিজের যুক্তিতে অটল থেকে বহুর বিরুদ্ধে একা তিনি যেভাবে সংগ্রাম করেন তাতে spectacle of doing something terrible যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি প্রবীরের মৃত্যুতে এবং ভাইয়ের প্রত্যাখানে ফুটে ওঠে তাঁর suffering of something terrible; তাই চরিত্রটির ট্র্যাজিক উপাদান এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তার ব্যবহারের প্রতি কোনো সন্দেহই আমাদের থাকতে পারে না। গঙ্গার জলে তাঁর অসহায় আত্মহত্যা ট্র্যাজেডির উদ্দিষ্ট pity এবং fear দুইই জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে।

শুধু অসুবিধা এই যে, নাটকটি যেখানে শেষ হলে আমরা তাকে নির্দ্বিধায় একটি মহৎ ট্র্যাজেডি হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারতাম, গিরিশচন্দ্র সেখানে নাটকটি সমাপ্ত করেননি। তিনি পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'জনা'-র প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে এর পরেও একটি ক্রোড়-অঙ্ক সংযুক্ত করেছেন এবং তাতেই ট্র্যাজিক সংবেদন দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। জনার সুবিশাল প্রতিরোধ, অপরিমেয় যন্ত্রণা এবং ট্র্যাজিক সমুন্নতি একেবারে হাস্যকর হয়ে যায় যদি এ সমস্ত মর্ত্যলীলাই 'প্রপঞ্চ' হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারেন যে জনা এখন 'নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী'—কিন্তু পুত্রশোকের যে বেদনা আমাদের মনে ট্র্যাজিক অনুভূতির গভীর দাগ রেখে যায়, তা কিন্তু তাতে সান্ত্বনা লাভ করে না। ফলে ক্রোড়অঙ্ক পুরাণ ও ধর্মপ্রিয় পাঠকের চিত্তে ভক্তিরস সঞ্চার করতে পারে কিন্তু যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(ছ) 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল সঠিকভাবে কী বুঝিয়েছিলেন তা নিয়ে যদিও জল্পনা কল্পনা এখনও শেষ হয়নি, এবং ক্রোড় অঙ্কে গঙ্গার কোলে জনাকে আদর খেতে দেখে আমাদের মনে যদিও আনন্দই হয়—তবু এ আনন্দ যে ক্যাথারসিস বা বিমোক্ষণজনিত আনন্দ নয়, তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায়। এই জন্যই বলা যায় যে, দুটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ট্র্যাজিক সংবেদনও যেমন মানবিক, তার আনন্দও তেমনি মানবিক। জনাকে দেখে আমরা যে অভিভূত হই, তাঁর আচরণ ও পরিণতি যে আমাদের মনে ট্র্যাজিক সংবেদন জাগায়, তার কারণ একেবারে মানবিক। পক্ষান্তরে জনাকে জাহ্নবীর কোলে আদর খেতে দেখে যে আনন্দ আমাদের মনে জাগে তা আধ্যাত্মিক—সুতরাং ট্র্যাজেডি বা তার অন্তরঙ্গ লক্ষণ ক্যাথারসিসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাই উপযুক্ত ক্যাথারসিস ঘটার পেছনেও সবচেয়ে বড়ো বাধা ওই ক্রোড় অঙ্ক, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

কাজেই অ্যারিস্টটল-নির্দেশিত ট্র্যাজেডির লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করলে আমাদের একথা বলতেই হবে ক্রোড় অঙ্ক বর্জিত হলে 'জনা' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি হিসাবে গণ্য হতো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রোড় অঙ্কটি তার ট্র্যাজিক সংবেদন যে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে, একথাও বিশেষ কোনো সংশয় না রেখেই বলা যায়।

● হিরোইক ট্র্যাজেডি বা হিরোইক ড্রামা

ইংরেজি সাহিত্যের রেস্টোরেশন যুগে এক জাতীয় নাটককে হিরোইন ট্র্যাজেডি বা হিরোইক ড্রামা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সাহিত্যিক মহাকাব্যের আদলে লেখা নাটক এর আদর্শ। সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য বাংলা সাহিত্যেও এক সময় লেখা হয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু হয়ে নবীনচন্দ্র সেন এই ধরনের কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁদের সময়কাল, বা আছে ভালো ভাবে বলতে গেলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত আটত্রিশ বছরের কালসীমাকে 'কৃত্রিম বীর যুগ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময়ের কবিদের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনই ছিলেন নাট্যকার। তিনি বীররসাত্মক নাটক লিখেছিলেন একটি, 'কৃষ্ণকুমারী', অবশ্য একে বীরত্ব প্রেমের যুগল সম্মিলন বলা চলে। তাঁর 'ময়ামানস' নাটকটির প্রকৃতিও সেইরকমই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ধরনের নাটকের পরিচয় দিতে গিয়েও এই এই বীরত্বব্যঞ্জক আবরণ এবং প্রেমের প্রকৃতির কথাই বলা হয়েছে। জে. এ মাডন তাঁর পেংগুইন ডিকশনারিতে লিখেছেন— 'It was drama in the epic mode—grend, rhetorical and dedamatory; at its weorst, fomfastic. His themes were love and honour'

হিরোইক ট্র্যাজেডির প্রথম দিকের রচনার মধ্যে 'The siege of Rhodes' এবং 'the spaniards in Peru'-র নাম করা যায়, দুটিরই নাট্যকার সার উইলিয়াম ডেভেনান্ট। ইংরেজি অপেরার জনক হিসাবেই এঁর নাম অবশ্য বেশি বিখ্যাত। এ ছাড়া যাঁরা এই ধরনের নাটকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে কবি জন ড্রাইডেনের নাম উল্লেখ করতেই হবে। তাঁর দুটি এই ধরনের নাটক বেশ জনপ্রিয়—The Indian Emperor এবং The conquest of Granada। তিনি শেকসপীয়রের 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা'কেও একটি হিরোইক ট্রাজেডির হিসাবে রূপান্তরিত করেছিলেন।

হিরোথি ট্র্যাজেডির অন্যান্য কয়েকজন নাট্যকারের নাম—রবার্ট হাওয়ার্ড (দা ইন্ডিয়ান কুইন), নাথানিয়েল লী (দা রাইভ্যাল কুইনস) টমাস অটোয়ে (ভেনিস প্রিজারভ্ড্) প্রভৃতি।

এই ধরনের নাটককে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল 'দা রিহার্স্টাল' (নাট্যকার বাকিংহাম), 'দা ক্রিটিক' (নাট্যকার কোরিচান) প্রভৃতি।

ড. কমেডির সাধারণ পরিচয়

কমেডির সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে নাটকে চরিত্র এবং ঘটনাসজ্জা এরকম থাকে যাতে আমরা আনন্দ পেতে পারি এবং যার অন্তে মিলন থাকে, তাকেই কমেডি বলা যায়। কমেডির বাংলা পরিভাষা হিসাবে এই কারণেই 'মিলনান্তক নাটক' কথাটি বহুল

প্রচলিত, যদিও এর 'হাস্যোদ্দীপক' এবং অন্যান্য দু-একটি পরিভাষাও দেখা যায়। শুধুমাত্র নাটকের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এটি যে অন্যান্য প্রকরণেও রচিত হতে পারে, সমালোচক আব্রাম্স্ সে কথা বলেছেন—"The term 'comedy' is customarily applied only to dramas; it should be noted, however, that the comic form, so defined, also occurs, in prose fiction and narrative poetry."

কমেডি আনন্দ দেয় এবং ট্র্যাজেডি করুণ বেদনার সঞ্চার করে, অতএব প্রকৃতিতে এরা সম্পূর্ণ বিপরীত, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, "কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখের জল আসে। ... অসঙ্গতির তার অল্প অল্প চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"

এ বিষয়ে দার্শনিক হবস্-এর অভিমত, অপরের কোনও দুর্বলতার সঙ্গে নিজের তুলনা করে যখন আমরা নিজেদের যোগ্যতর মনে করি তখনই ওই চরিত্রের প্রতি আমাদের হাস্যোদ্রেক হয়। ফিল্ডিং-এর মতে অযোগ্য মানুষের আস্ফালন এবং আত্মম্ভরিতাই কমেডির প্রাণ। মেরিডিথের মতে কমেডির হাস্যকে বলা যায় 'sword of commonsense'। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতই শিরোধার্য, তিনি নিজেও ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "There is only a very fine line of distinction between great Comedy and Tragedy."

অবশ্য অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থে কমেডি নিয়ে কোনো পৃথক অধ্যায় রচনা করেননি, ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য বোঝাতেই কমেডির প্রসঙ্গ এনেছেন। এই ভাবেই পোয়েটিক্সের পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর কমেডির সংজ্ঞা আমরা পেয়ে যাই—"As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one, particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others."

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞাতেই কমেডির বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। প্লেটো তাঁর 'ফিলেবাস' গ্রন্থেও প্রায় এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। অপরের দুর্দশা আমরা ট্র্যাজেডির মতো কমেডিতেও দেখি কিন্তু সে দুর্দশা আমাদের মনে বেদনার উদ্রেক করে না, আনন্দ দেয়। পোয়েটিক্সের অন্যত্র অ্যারিস্টটলের আলোচনা স্মরণ রাখলে বলা যাবে, কমেডিতে চিত্রিত হয় আমাদের চেয়ে 'হীন' মানুষের চরিত্র—অবশ্য হীন বলতে অন্য কিছু নয়, কোনো একটা হাস্যকর আচরণে তিনি হাসির খোরাক জোগান এবং কমেডি লেখক তাকেই ব্যবহার করেন, অনেক সময় একটু অতিরঞ্জনের সাহায্য নিয়েই।

কমেডির উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলা নয়, তবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী সে বিষয়েও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেবলমাত্র নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করাও কমেডির উদ্দেশ্য হতে পারে, কারণ পৃথিবীতে তাও খুব সুলভ নয়। শেক্স্পীয়রের কমেডির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ডাওডেন তার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বলেছেন—"A Shakespearean comedy is a delightful story, conducted in some romantic

region, by gracious and gallant persons thwarted or aided by the mirthful God, Circumstances, and arriving at a fortunate issue."

আবার সমালোচক গর্ডন কমেডির একটা বিরাট উদ্দেশ্য লক্ষ করে বলেছেন—"Comedy is critical, and its main use is to teach the world what ails it."

কমেডির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় গ্রীসের দেবতা ডায়োনিসাসের বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজেডি এবং শীতকালীন উৎসব থেকে কমেডির উৎপত্তি ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের মতে, কমেডির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। কবি আর্কন 'কমিক কোরাস'-কে গৌরব দান করেছিলেন, এথেনীয় লেখকদের মধ্যে ক্রেটিস এ বিষয়ে অগ্রসর হন। গ্রীক ভাষায় 'কমেডি' শব্দের অর্থ আমোদকারীদের গান। একে ভিত্তি করে ডোরীয়, গ্রীসের মোগরীয় এবং সিসিলির মেগারীয়—প্রত্যেকেই দাবী করেন তাঁরাই কমেডির জন্মদাতা। ইংরেজি সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ও কমেডির উদ্ভব ঘটেছে যথাক্রমে মর‍্যালিটি ও ইন্টারলুড থেকে। সংস্কৃত নাটকে 'কমেডি' নাম না থাকলেও হাস্যরসাত্মক নাটকের অভাব ছিল না। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে দশরূপকের কথা বলেছেন তার অন্যতম ছিল প্রহসন। এই শ্রেণীটিকে তিনি বলেছেন হাস্যরসাত্মক দৃশ্যকাব্য। অবশ্য প্রহসন না হয়েও উচ্চস্তরের কমেডি হিসাবে গণ্য হতে পারে, এমন নাটক সংস্কৃতে অনেক লেখা হয়েছিল, যেমন ভাস-এর 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' বা 'মালবিকাগ্নিমিত্র', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' প্রভৃতি।

বাংলা নাটকের উৎপত্তির সময় প্রহসন ধরনের নাটকই বেশি দেখা যায়। সূচনাপর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই ধরনের নাটকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তবে কমেডি নাটকে সিদ্ধিলাভ করেন মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের দুটি একাঙ্ক 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' বা 'জামাই বারিক' প্রথম শ্রেণীর কমেডির মধ্যে পড়তে পারে। পরবর্তীকালেও কমেডির অভাব ঘটেনি। অবশ্য ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক রিলিফ তৈরি করবার জন্য যেমন কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্রের সৃষ্টি আমরা ইংরেজি সাহিত্যে দেখি, বাংলা সাহিত্যেও তার অভাব নেই। উল্লেখ করার মতো চরিত্র ধনদাস ও মদনিকা (কৃষ্ণকুমারী নাটক), বিদূষক (জনা), দিলদার (সাজাহান) প্রভৃতি।

কমেডির বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, উপস্থাপন এবং রসনিষ্পত্তির বিচারে তার শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই এ বিষয়ে সমালোচক M. H. Abrams-এর A Glossary of Literary terms গ্রন্থের বিভাগটিই আমরা গ্রহণ করছি। অবশ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে, বাংলা নাটকেরও উল্লেখ করা হবে। সেখানে বিভাগগুলি এই রকম :

(১) রোম্যান্টিক কমেডি

অ্যারিস্টটল যাকে বলতে চেয়েছেন বিশুদ্ধ কমেডি, তাকেই আমরা আখ্যা দিতে পারি রোমান্টিক কমেডি বা কাব্যধর্মী কমেডি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের হাতেই রোমান্টিক কমেডির প্রতিষ্ঠা ঘটে। সাধারণত প্রেমঘটিত এই কমেডিতে নায়িকারা সুন্দরী ও

আদর্শ নারী হয়—অনেক সময় তারা পুরুষের ছদ্মবেশেও থাকে, যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের রোজালিন্ড। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছদ্মবেশী' বা রবীন্দ্রনাথ মৈত্রর 'মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল' নাটকেও এ ব্যাপার ঘটেছে। অবশ্য রোমান্টিক বলেই যে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ থাকে তা নয়, অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়েই মিলন ঘটে নায়ক-নায়িকার। যেমনটি ঘটেছে প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে। তবে শেষ পর্যন্ত কৌতুককর ঘটনা এবং তার ক্রমান্বয়ে নাটকটি উপভোগ্য করে তোলার দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি থাকে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। অবলাকান্তর (অর্থাৎ কিনা শৈলবালা) প্রতি নির্মলার আকর্ষণ, নীরবালার রুমাল ও নীরবালার গানের খাতা পেয়ে যথাক্রমে শ্রীশ ও বিপিনের প্রেমোন্মাদনা এবং সমস্ত কিছু ফলশ্রুতি, চিরকুমার সভার সভ্যদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। এই শ্রেণীর কমেডি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নর্থ্রপ্‌ ফ্রাই বলেছেন আমাদের পুরাকাহিনী ও প্রাচীন রীতিনীতিরই প্রকাশ ঘটেছে এই ধরনের কমেডিতে এবং জীবনে দুঃখের মলিনতা কেটে গিয়ে সুপ্রভাত আসে—এই বিশ্বাসই তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(২) স্যাটায়ারিক কমেডি

অ্যারিস্টটল কমেডির কোনও বিভাগ করেননি, কিন্তু তাঁর আলোচনাকে ভিত্তি করে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য যে বিভাগ নির্দেশ করেছেন সেই অনুসারে এই সমাজ-ব্যঙ্গাত্মক কমেডিকে তিনি বলেছেন অবিশুদ্ধ কমেডি। সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে বা নৈতিকতা বর্জন করে সমাজবিরোধী আচরণ যারা করে, তাদের নিয়েই লঘু ভাবে একটু অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে এই রকম কমেডি গড়ে ওঠে। আসলে তাদের আচরণের অসংগতিকেই নাট্যকার ব্যবহার করেন, যেমন আমরা বেন জনসনের 'ভলপোন' বা 'দি অ্যালকেমিস্ট' নাটকে দেখতে পাই। এই দুটি নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যাব্রাম্‌স্‌ যে সুন্দর মন্তব্য করেছেন তা এই রকম—"the greed and ingenuity of one or more highly intelligent but rascally swindlers, and the equal greed but stupid gullibility of their victims, are made grotesquely ludicrous rather than highly amusing."

অবশ্য এই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক কমেডি 'highly amusing' হয়ে ওঠবার দৃষ্টান্তও আমরা একেবারে পাই না এমন নয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি এর উদাহরণ। অনেকে এই ধরনের সামাজিক ব্যঙ্গকে দুভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছেন—ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ ও সমষ্টিগত ব্যঙ্গ। তবে এই বিভাগ অনেক সময় ঠিক মতো করা সম্ভব নয়।

(৩) কমেডি অব ম্যানার্স

এই ধরনের কমেডিও ব্যঙ্গমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিই এর মুখ্য আকর্ষণ, তবে কমেডি

অব ম্যানার্স বলতে সঠিক ভাবে আমরা যা বুঝি, সেখানে আক্রান্ত হন সমাজের কিছু উচ্চস্তরের মানুষ এবং তাদের হৃদয়সম্পর্কহীন কিছু যান্ত্রিক আচরণ। এখানে বুদ্ধি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ছটা বেশি থাকে, এটাও এই জাতীয় কমেডির এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শাণিত সংলাপের বিনিময়ই এই কমেডির প্রাণ, যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের আরম্ভ—

"নকু॥ ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে?

নিম॥ পানায়, খায় না।

নকু॥ সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি?

নিম॥ creating a concourse of hypocrites."

এই রকম কমেডিতে অবশ্য কিছু নির্বোধ চরিত্রও থাকে, যাদের আপাত-এলোমেলো সংলাপে সমাজের বিকৃত ব্যবস্থা অনাবৃত হয়ে পড়ে।

এই জাতীয় নাটকের সূত্রপাত ঘটে শেক্‌স্‌পীয়রের হাতে। তাঁর 'লাভ্‌স্‌ লেবার লস্ট' এবং 'মাচ এ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং' এই রকম কমেডির দৃষ্টান্ত বলতে পারি। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে রেস্টোরেশন যুগ বলা হয়, সেই সময় এর অনেক উন্নতি ঘটে। এর জনপ্রিয়তা কমে আসে ঊনবিংশ শতকে, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষের দিকে আবার তা জনপ্রিয় হতে থাকে প্রধানত এ. ডাবলু. পিনেরো এবং অস্কার ওয়াইল্ডের হাতে। এরপর এই জাতীয় নাটকের চরমোৎকর্ষ দেখতে পাই জর্জ বার্নার্ড শ-এর হাতে।

ইংরেজি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কমেডি অব ম্যানার্স নাটক বহু আছে যেমন—কন্‌গ্রীভের 'দি ওয়ে অব্ দি ওয়র্ল্ড', উইচার্লির 'দি কান্‌ট্রি ওয়াইফ', অলিভার গোল্ডস্মিথের 'শী স্টুপ্‌স্‌ টু কংকার', রিচার্ড শেরিডানের 'দি রাইভ্যাল্‌স্‌' ও 'এ স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল', জর্জ বার্নার্ড শ-র 'আর্মস্‌ অ্যান্ড দি ম্যান', 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্‌ প্রোফেশন' প্রভৃতি। বাংলায় কমেডি অব ম্যানার্স খুব ভালো নেই, যা আছে তার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাঙ্ক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন', অমৃতলাল বসুর 'কালাপানি' বা 'ব্যাপিকা বিদায়' উল্লেখযোগ্য।

(৪) ফার্স বা প্রহসন

প্রহসনকে কেউ কেউ নাটকের অন্যতম শ্রেণী বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু অ্যাব্রাম্‌স্‌ যেহেতু তাকে কমেডিরই একটি বিভাগ বলে মনে করেন, আমরা সেই ভাবেই তাকে বিন্যস্ত করলাম। ফার্স বলতে বোঝায় অত্যন্ত লঘু কল্পনাসিদ্ধ, অতিরঞ্জিত এক ধরনের হাস্যোচ্ছল নাটক। সহজ সরল এই রকম কমেডিতে হাস্যময়তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত। আসলে, এখানে বুদ্ধির খেলা বিশেষ দেখা যায় না এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দেখাবার অবকাশও কম বলে একে একটু নীচু ধরনের কমেডি বলে মনে হতে পারে, নইলে অ্যাব্রাম্‌স্‌ এখানে 'বেলি লাফ্‌স্‌' (অর্থাৎ কিনা কাতাকুতু দিয়ে হাসানোর ব্যাপার) আছে বলে মন্তব্য করতেন না। অপর এক ইংরেজ সমালোচক একে বলেছেন 'the type of drama stuffed with low humour and

extravagant wit'। সংস্কৃত আলংকারিক প্রহসন সম্বন্ধে বলেন—'হাস্যোদ্দীপক কাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।'

কোনও কোনও সমালোচক ফার্সকে অত্যন্ত পুরনো ধরনের কমেডি মনে করে অ্যারিস্টোফেন্সের 'দি ফ্রগ্স্'কেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু মধ্যযুগের মিরাক্ল্ প্লে-র মধ্যে যে ফার্সের উপাদান ছিল একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই—দৃষ্টান্ত, ওয়েকফিল্ডের প্লে-র অন্তর্গত 'নোয়া' এবং 'সেকেন্ড শেফার্ডস প্লে'। শেক্স্পীয়রের নাটককে প্রহসনের স্তরে নামানো ঠিক হবে না, তবে তাঁর 'দি টেমিং অব দি শ্রু' কিংবা 'দি মেরি ওয়াইভ্স্ অব উইন্জর'-এ যেসব 'নক্-অ্যাবাউট' দৃশ্যগুলি আছে, প্রকৃতিতে তারা প্রহসনই। এছাড়া ফরাসী নাটকের মধ্যে মলেয়েরের নাটক 'লে মিসানথ্রোপ্', ইংরেজি নাটকের মধ্যে রিচার্ড শেরিডানের 'দি স্কিমিং লেফটেন্যান্ট', আমেরিকান নাটক হিসাবে ব্র্যান্ডন টমাসের 'চার্লিজ আন্ট', বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবু', দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' বা অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার'কে প্রহসনের কিছু দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

● একটি প্রহসনের আলোচনা

মধুসূদন দত্ত প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রকৃত অর্থে ট্র্যাজেডি যেমন আমাদের উপহার দিয়েছেন, প্রথম বাংলা প্রহসনদুটিও তাঁরই রচনা। আমরা সেই প্রহসনদুটির একটি, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'কে আলোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমে নাটকটির সারসংক্ষেপ একটু জেনে রাখা যাক। দুটি অঙ্কে এবং চারটি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ এই ছোট নাটকের মুখ্য চরিত্র গ্রামের জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবু। এছাড়া আছে তাঁর প্রধান সহচর ভৃত্য গদাধর, আছেন গ্রামের সজ্জন পণ্ডিত পঞ্চানন বাচস্পতি, আর আছে গ্রামের অতিদরিদ্র মুসলমান চাষী হাজিফ গাজি এবং তার স্ত্রী ফতেমা। ভক্তপ্রসাদ বাবুটি বাহ্যিক আচার-আচরণের যতই ভক্ত এবং ভক্তিভাবাপন্ন হন, আসলে তিনি একটি তুলসীবনের বাঘ। নিত্যনতুন নারীসম্ভোগ ছাড়া তিনি বাঁচতে পারেন না। একাজে তাঁর প্রধান সাগরেদ গদাধর এ ব্যাপারে এতদিন প্রচুর কুকর্ম করেছে এবং গ্রাম্য নারী-সংগ্রাহক পুঁটিকে দিয়ে প্রভুর সব ইচ্ছাই পূর্ণ করেছে। এক্ষেত্রে অকাতরে অর্থব্যয় করতে ভক্তিপ্রসাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সদ্ব্রাহ্মণের মাতৃদায়ে পাঁচটি টাকা দিতে তাঁর বুক ফেটে যায়। গদাধরের প্ররোচনায় হাজিফের বউ ফতেমাকে উপভোগ করতে গিয়ে ভক্তপ্রসাদ কীরকম বিপদে পড়ে—আগে থেকে প্রস্তুত হাজিফ-ফতেমা-বাচস্পতির পরিকল্পনায় নাজেহাল হয়ে, প্রথমে ভূতের ভয়ে এবং তারপর লোকলজ্জার ভয়ে প্রচুর অর্থদণ্ড দিয়ে তাঁকে কোনোরকমে মুক্তি পেতে হয়।

আমরা বলেছি, প্রহসন একরকমের লঘু কল্পনাসিদ্ধ রচনা। অতিরঞ্জন এর প্রধান কথা এবং সেই অতিরঞ্জন এই ছোট নাটকেও আছে ভয়াবহভাবে। বৃদ্ধবয়সে নারীসংসর্গের প্রলোভন বিকৃতরুচির পরিচয় হলেও কোনো চরিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বা খানিকটা থাকতেও পারে, কিন্তু ভক্তপ্রসাদ যতবারই কথা বলেছেন ততবারই তিনি নিজের এই প্রবল আসক্তির কথাই বলেছেন, গদাধরও তাঁকে কেবল সংগৃহীত নারীদের কথাই মনে করিয়েছে, যেমন—

'গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে ঐ যে ভট্চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—...

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেকতে ছিল ভাল বটে।'

শুধু তাই নয়, সেদিন রাতে হানিফের বউকে তিনি পাবেন, এই রকম কথা পাকা হয়ে যাবার পরও পীতাম্বর তেলির বউ ভগী এবং তার মেয়ে পঞ্চীকে দেখে তাঁব বাসনা সিক্ত হয়ে উঠেছে। কাছে ডেকে আলাপ করার পর তিনি বলেছেন—'ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো।'

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এসব নাটকে বিশেষ থাকেনা, এই নাটকেও নেই। তবে এক-একটি মেয়ের সর্বনাশ কামনা করেই সঙ্গে সঙ্গে 'প্রভো, তোমারই ইচ্ছা' কিংবা 'রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য' ইত্যাদি নাটক সংলাপ জমবার পক্ষে ভালো। সামান্য উঁচু দরের রসিকতা আছে কিছু উদ্ধৃতিচয়ন, যেমন—

'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।।'

কিংবা,

'তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।।"

তবে সবই ওই আদি রসসংক্রান্ত। সেই কারণেই এদের, সমালোচকদের ভাষায় বলা যায়, 'extravagant wit।'

অত্যন্ত লঘু হাস্যরসের ব্যাপার বলেই ভক্তপ্রসাদবাবুকে এই একটি ঘটনাতেই মুহ্যমান করে দেওয়া হয়েছে এবং চরিত্র তাঁর পালটে গিয়েছে, এইরকম তিনি বলেছেন—'এ জঘন্য কর্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এবারে যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর পারা গর্দভ আর নাই।'

অ্যাব্রাম্‌স্ এই ধরনের নাটককে বলেছেন কাতাকুতু দিয়ে হাসানোর নাটক। বোধহয় তাই, নইলে প্রায় প্রথম থেকেই যেখানে বোঝা যায় ভক্তপ্রসাদের কুকীর্তি ধরা পড়ে যাবে সেখানেও আমরা আদ্যন্ত তা উপভোগ করি কেমন করে। বিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য সব ঘটনাই এই লঘু কল্পনার জগতে ভারহীন হয়ে যায়, নতুবা হাজিফ কেবলমাত্র 'ওষ্ঠ ও চিবুক 'বস্ত্রাবৃত' করে আসা সত্ত্বেও তাকে কেউ চিনতে না পেরে ভূত মনে করে অজ্ঞান হয়ে পড়বে, এটাও কখনই সম্ভব হতে পারে না।

অ্যাব্রাম্‌স্ কমেডির পঞ্চম বিভাগটির নামকরণ করেছেন 'হাই কমেডি', কিন্তু এভাবে উচ্চস্তরের কমেডি ও নিম্নস্তরের কমেডির (লো কমেডি) বিভাগ খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এ বিভাগ মূলত কমেডির সৃষ্টিসামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। আসলে জর্জ মেরেডিথের 'দি আইডিয়া অব কমেডি' গ্রন্থটি বোধ হয় এই ধরনের বিভাগের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করেছে। বিভিন্ন সমালোচক আরো নানা ধরনের বিভাগের কথা বলেছেন, যেমন—কৃত্রিম কমেডি, যথা প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল', চক্রান্তমূলক কমেডি বা 'কমেডি অব ইন্‌ট্রিগ্' (ড্রাইডেনের 'দি স্প্যানিশ ফ্রায়ার'), চরিত্রনির্ভর কমেডি (বেন জনসনের 'ভলপোন'), সংলাপমুখ্য কমেডি

(শেক্স্পীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'), ভাবপ্রবণ কমেডি (যথা ব্যারির 'দি অ্যাডমিরেব্ল্ ক্রিচ্টন'), বাস্তব কমেডি (দৃষ্টান্ত, মলিয়রের 'দি মিড্লক্লাস জেন্টলম্যান') উদ্ভট কমেডি (যেমন ব্রিডির 'টোবিয়াস অ্যান্ড দি অ্যাঞ্জেল'), স্ল্যাপস্টিক কমেডি (লরেল-হার্ডির প্রচুর ছবি যার দৃষ্টান্ত) প্রভৃতি।

● একটি বাংলা কমেডির বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ঠিক পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তিনটি দৃশ্যে সংহত একটি প্রহসন ধরনের কমেডি বলা যেতে পারে। অবশ্য দৃশ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের নাটককে পূর্ণাঙ্গ বা নক্সাজাতীয় কিছু আখ্যা দেওয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব, কারণ তার পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মালিনী' মাত্র চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং 'মুক্তধারা' নাটকে দৃশ্য কেবল একটি, সেটি হল পথ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' কী ধরনের কমেডি এবং কমেডির বৈশিষ্ট্য এতে কী পরিমাণ রক্ষিত হয়েছে তা আলোচনা করার আগে অতি সংক্ষেপে এর কাহিনীটি মনে করে নেওয়া যাক।

ঘটনাস্থল বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভায়ের সংসার। বিপত্নীক বিধবা কন্যাও আছে। এ সংসারে অবিনাশ অবশ্য অবিবাহিত—তাদের দেখাশোনা করে বহুদিনের ভৃত্য ঈশ্বর। অবস্থা এককালে ভালো ছিল নিশ্চয়ই, তাই বৈকুণ্ঠকে কিছু করতে হয় না, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও বই লেখার বাতিক নিয়েই তিনি সময় কাটিয়ে যাচ্ছেন। অবিনাশ ভালই চাকরি করে। বৈকুণ্ঠের এই বাতিকের সূত্র ধরেই তাঁর কাঁধে চেপে বসে অবিনাশের একদা-সহপাঠী কেদার এবং কেদারের সহচর তিনকড়ি। কেদার উপার্জনহীন বলে এ বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে বসবাসের জন্য নিজের শ্যালিকার সঙ্গে অবিনাশের বিবাহের বন্দোবস্ত করে এবং সে বিবাহ সুসম্পন্নও হয়ে যায়। এরপর অবিনাশের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সংখ্যা বাড়তে থাকে এ বাড়িতে, একেবারে বৈকুণ্ঠের ঘরেই ঘাঁটি গেড়ে উৎপাত শুরু করেন বিপিনবাবু নামে অবিনাশের এক খুড়শ্বশুর। বাধ্য হয়ে বৈকুণ্ঠ সমস্ত গুছিয়ে টুছিয়ে চাকর ঈশ্বর ও মেয়ে নীরুকে নিয়ে যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তখন অবিনাশ সব জেনে একেবারে ফেটে পড়ে। বাড়ি থেকে সমস্ত আবর্জনা বিদায় করে বাড়িকে আবার স্বাভাবিক করে সে।

নাটকটি অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে বলতে হবে, এখানে কমেডির প্রধান উপাদান যে দুটি চরিত্র, বৈকুণ্ঠ এবং কেদার—তারা আর যাই হোক স্বাভাবিক চরিত্র নয়। কেদারকে অনায়াসেই বলা চলতে পারে, সাধারণের চেয়ে হীন চরিত্র কিন্তু বৈকুণ্ঠ তা নন। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা গেলে কেদার একটি ভণ্ড প্রতারক, মানুষকে ঠকিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাই তার কাজ—এই ভাবেই যে সে দীর্ঘকাল চালিয়ে আসছে, তিনকড়ির কথা শুনে তা বুঝতে পারা যায়। বৈকুণ্ঠ মানুষটিকে 'অ্যাভারেজ' তো বটেই, তার চেয়ে ওপরেরও ধরা যেতো, কিন্তু তিনি তাঁর আচরণে যে 'রিডিকিউলাস' হয়ে পড়েছেন তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। প্রাচীন পুথি সংগ্রহের বাতিক তাঁর এমনই তীব্র যে কেদার চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরনো জুতোর হিসেবের খাতাও তাঁকে বহুমূল্য চীনা সংগীত-পুস্তক বলে গছিয়ে দিতে পারে। এই বাতিককেই বলা যেতে পারে এমন অসংগতি যা অপরের ক্ষতি করে না বা বেদনার কারণ হয়েও দাঁড়ায় না। এই বাতিকই কিছু অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন নাট্যকার।

নাটকে অবিনাশের একটি বাতিকের প্রসঙ্গও আছে—'নিলেম ডেকে বিলিতি গাছ কেনা', কিন্তু সেটা নাটকে আমরা দেখতে পাই না।

উত্তম কমেডি এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে তফাৎটা যে শুধু মাত্রার, সে কথা এই ছোট নাটকে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কেদারের জীবনে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই এখন, কিন্তু সে যখন বলে "যখন ছেলেবেলায় কলেজে পড়তুম তখন ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম"—তখন তার চরিত্রের ট্র্যাজিক দিকটি আভাসিত হয়ে ওঠে। এই আভাস স্পষ্টতা পেয়েছে তিনকড়ির চরিত্রে। অবিনাশ যখন তাকে বলে 'আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি' তখন সে সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে—"তা হলে আজ আর তিনকড়িকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।" বোঝা যায় তিনকড়ির জীবনেও এক ট্র্যাজিক হাহাকার লুকিয়ে আছে, তা নইলে তাকে তাকে বলতে হয় না—"শিশুকাল থেকে আমি কারও জন্য ভাবিনি, আমার জন্যও কেউ ভাবেনি, ওটা আমার আর অভ্যাসই হল না।"

অনেক রকম টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে অনেক সময় ট্র্যাজেডি হবার লক্ষণ দেখিয়েও, সমাপ্তিতে নাটক কমেডি হয়ে যেতে পারে—অনেক ভালো কমেডিতেই হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকেও সেই টানা-পোড়েন আমরা দেখেছি। কেদারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর বাড়ি ভোগদখলের জন্য সে অবিনাশের শ্বশুরালয়ের বিস্তর মানুষকে এনে বৈকুণ্ঠকে উৎখাত করবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে ফেলেছিল। এদের সম্মিলিত আক্রমণে অস্থির হয়ে বৈকুণ্ঠ বাড়ি ছেড়ে যাবার আয়োজনও করতে আরম্ভ করেছিল। যদি বৈকুণ্ঠ সত্যি সত্যিই গৃহত্যাগ করতেন, অবিনাশের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী নীরু এবং ভৃত্য ঈশান যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতো, অবিনাশের জীবনে তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছু হতে পারতো না। কিন্তু তা হয়নি, সেই চরম মুহূর্ত থেকে নাটক ফিরে এসেছে কমেডির দিকে—অবিনাশের দ্রুত হস্তক্ষেপে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' ঠিক কোন্ শ্রেণীর কমেডি তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। রোম্যান্টিক কমেডির বেশ কিছু লক্ষণ এ নাটকে আছে, অবশ্য যদি অবিনাশের সঙ্গে কেদারের শ্যালিকার বিবাহঘটিত ব্যাপারটি আদৌ প্রাধান্য পায়। সম্পূর্ণ প্রেম-পরিণয় গোছের নাটকের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'-র কথাই আমাদের মনে পড়বে, তবে অনেক ঝামেলার পর বৈকুণ্ঠের জীবনে শান্তি এসেছে এবং অন্যায় ও অধর্মের পর ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে—এই উপসংহার মনে রাখলে একে রোমান্টিক কমেডির কিছুটা সদৃশ বলে আমরা মনে করতে পারি।

আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে কমেডি অব ম্যানার্স হিসাবেও আমরা একে গ্রহণ করতে পারি। শাণিত সংলাপের বিনিময় এই ধরনের কমেডির প্রাণ, যাকে 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এরও প্রাণ বলা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই সংলাপের এই বৈশিষ্ট্য কমবেশি আছে। ঠিক সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিও অবশ্য এই নাটকের বিষয় নয়, চরিত্রের একটি উৎকেন্দ্রিক আচরণ বা বৈশিষ্ট্যকেই বড়ো করে দেখিয়ে এই নাটকের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে নাটকটিকে ফার্স বা প্রহসনের মতো মনে হতে পারে, এর আকার এবং সংক্ষিপ্তীকরণ সেজন্য দায়ী হতে পারে, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একে প্রহসন বলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। প্রহসন একটু মোটা দাগের ব্যাপার, অথচ বুদ্ধির দীপ্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এর সর্বত্র এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে যে নাটক হিসাবে একে বেশ উচ্চস্তরের বলতে হয়: বিশেষত, ফার্সের কাহিনী নিয়ে একরকমের যে অতিরঞ্জন থাকে, এখানে তার

বিপরীত ব্যাপারই ঘটেছে। একটি বিরাট কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সংহত করে রেখেছেন মাত্র তিনটি দৃশ্যে। অবিনাশের কাছে কেদারের বিবাহের প্রস্তাব পাড়া, অবিনাশের প্রণয়বৃত্তান্ত, পরিণয়োত্তর জীবনের দুর্বিপাক ইত্যাদি ঘটনা অনায়াসে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাঁচটি অঙ্কের বিষয় হতে পারতো। যে সংযম এবং সংহতি নাট্যকার এখানে দেখিয়েছেন তাতে এটি একটি উচ্চস্তরের কমেডি হয়ে উঠেছে। এতে রোম্যান্টিক কমেডি করে তোলার মতো বিস্তার তিনি ঘটাননি বলে, সব দিক চিন্তা করে, কমেডি অব ম্যানার্স আখ্যায় একে ভূষিত করলেই ভালো হয় বলে আমরা মনে করি।

● ট্র্যাজি-কমেডি

প্রথাগত ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সংমিশ্রণে নাটকের এই ধারাটি দেখা যায় এলিজাবেথীয় যুগে। উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর, উভয় স্তরের মানুষকে নিয়ে ট্র্যাজি-কমেডি লেখা হতে পারে। সাধারণত কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েই ট্র্যাজি-কমেডি লেখা হয়। প্রতি মুহূর্তেই ঘটনাধারা থেকে মনে হয় এর পরিণতি হতে চলেছে বিষাদময়, কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন কোনো ঘটনা ঘটে যায় যার জন্য এর পরিণতি বিষাদময় না হয়ে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।

শেক্স্পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ট্র্যাজি-কমেডির একটি ভালো উদাহরণ। কারণ এখানে দুই স্তরের মানুষের সাক্ষাৎই আমরা পাই—নাটকে যেমন ল্যান্সলট গোবোর মতো চরিত্র আছে, তেমনি শাইলকের মতো নৃশংস কসাইও আছে। আন্তোনিওর অদৃষ্টে কী ঘটতে চলেছে শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না, ভালোর চেয়ে মন্দ হবার আশঙ্কাই যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তখনই তার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে।

শেকস্পীয়রের আরো দুটি নাটককে আমরা ট্রাজি-কমেডির উদাহরণ বলতে পারি, একটি হল 'সিম্বোলিন', অন্যটি 'দা উইন্টার্স টেল।'

তবে আরো সঠিকভাবে চিন্তা করতে গেলে ট্র্যাডি-কমেডি জাতীয় রচনাকে এলিজাবেথীয় এবং জ্যাকোবিয় যুগের সৃষ্টি বলা চলবে না, বরং এদের উৎস আরো অনেক বেশি প্রাচীন বলে মনে করতে হবে। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকের গ্রীক নাট্যকার প্লটাস তাঁর নাটক অ্যাম্ফিট্রুয়োকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ট্র্যাজিকো কোমেদিয়া।' ট্র্যাজি-কমেডির ধারণা ইউরিপিদিসের 'অ্যালকেসটিস' এবং 'ইফিজেনিয়া'-তেও পাওয়া যায়, যদিও সাধারণভাবে এদের ট্র্যাজেডিই বলা হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে ট্রাজি-কমেডির দুটি ধারা বেশ সজীব দেখা যায়। একটিকে বলা যেতে পারে নিওক্ল্যাসিকাল ধারা, অন্যটি জনপ্রিয় ধারা। বেশ কিছু ইতালিয় নাট্যকার এই ধরনের ট্র্যাজেডি লিখেছিলেন যার বেশির ভাগ অংশ ট্র্যাজেডির মতো, অথচ শেষটা হয়ে যায় মিলনের বা আনন্দের। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন জিরাল্ডি সিথথিরো। তিনি নিজে অবশ্য এ ধরনের নাটককে মিশ্র ট্র্যাজেডি বলেছেন। আর এক ধরনের নাটক দেখা যায় যাকে আমরা বলেছি জনপ্রিয় ধারা—এদের ট্র্যাজিকাল কমেডিও বলা যায়, আবার কমিকাল ট্র্যাজেডিও বলা যায়। এগুলির মূল বিষয় গুরুগম্ভীর এবং মোটামুটি বিচার করতে গেলে ট্র্যাজেডিও বলতে হবে, কিন্তু এদের উপকাহিনীগুলি হাস্যরসাত্মক। ষোড়শ শতকের ইতালীয় নাট্যকার গুয়ারিনি আর এক ধরনের ট্র্যাজি-কমেডি রচনা করেছিলেন যাতে রাখালিয়া

নাটকের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ট্র্যাজেডি নাটকে অফুরন্ত হাসির উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন বলে কেউ কেউ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হিসাবে স্বীকার করতে চাননা, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজ নাট্যকার জন ফ্লেচারকে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় ফ্লেচারের The Faithful Shepherdess নাটকটি পড়লে।

বাংলায় ঠিক ট্র্যাজি-কমেডি জাতীয় নাটক সচেতনভাবে বিশেষ কেউ সৃষ্টি করেছেন কিনা তা বলা যায়না তবে কোনো কোনো ভাবে এরকম নাটক সৃষ্টি হয়েছে, এ কথাও বলতে হবে। মধ্যযুগের ইতালিতে রচিত 'জনপ্রিয়' নাটকের ধারার সঙ্গে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' বেশ মিল আছে, কারণ গোটা নাটক এবং নাটকীয় সমস্যা যে গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডির, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ধনদাস ও মদনিকার উপকাহিনী এত বেশি দীর্ঘ (নাটকের গোটা চতুর্থ অঙ্ক এদের নিয়েই রচিত, মূল কাহিনী তখন ভেসে গিয়েছে) এবং এত বেশি তরল যে একে এই শ্রেণীর নাটক বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আবার শেকসপীয়রের ট্র্যাজি-কমেডির কথা বলে রাখলে গিরিশচন্দ্রের 'জনা'-কে সেইধরনের নাটক বলতেই হবে, কারণ জনার করুণ আত্মহননের পরও আমরা ক্রোড়সঙ্গে দেখি জনা মায়ের কোলে আরাম করছেন এবং 'নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী', কারণ এতক্ষণ যে মৃত্যু ইত্যাদি দেখানো হল তাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলই'। এই প্রসঙ্গেই ট্র্যাজি-কমেডির পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের নাটকের ভূমিকায় ফ্লেচার যে কথা বলেছিলেন তা, খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি বলেছেন—'A tragic meds is not so called in respect of nirth and killing, but in respect it crants deaths, which is enough to make it no tragedy, get brings scime near it, which is enough to make it no comedy.'

ট্র্যাজি-কমেডির নতুন একটি নামকরণ হয়েছে ডার্ক কমেডি। এটি অবশ্য সাম্প্রতিককালের নামান্তর। ১৯৬২ সালে এই নামে তাঁর একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক এই নাকরমণকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন শেকভের নাটকগুলি এর সার্থক উদাহরণ।

• ব্ল্যাক কমেডি

কমেডির এই নামকরণটি একেবারে আধুনিক কালের সংযোজন, যদিও এর দ্বারা নাটকের যে প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে, তা আগে ছিল না এমন নয়। যাকে ব্ল্যাক কমেডি নাম দেওয়া হয়েছে তাকে কেউ কেউ 'ব্ল্যাক হিউমার' বা 'সিক জোক'-ও আখ্যা দিয়েছেন।

এই নামটি দিয়েছেন নাট্যকার Jean Anouith, তাঁর নাটককে তিনি বলেছেন 'কমেদিয়া নোয়ার' অর্থাৎ ফিগ ব্ল্যাক কমেডি। এই নামটি সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন আঁদ্রে ব্রেতঁর Anthologic de l'humeur noire থেকে।

জীবনের অর্থহীনতা, মানুষের উদ্দেশ্যহীনতা নৈরাশ্যবাদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের অসম্ভব চিন্তা ও অসম্ভব পরিস্থিতি সজ্জাই এরকম নাটকের বৈশিষ্ট্য। এই চিন্তাধারার সঙ্গে যাকে আমরা বলি Theatre of the Absurd বা অ্যাবসার্ড নাটক, তার অনেকটা মিল আছে। কিন্তু সেগুলিকে কমেডি বা মিলনান্ত নাটক বলা অনেক ক্ষেত্রেই

সম্ভব হয় না। বাংলায় ঠিক এই ধরনের নাটক বিশেষ নেই বলেই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই বোধহয়।

চ. ঐতিহাসিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের আলোচনায় এবার আমরা প্রবেশ করতে পারি। এই জাতীয় বিভাগের মধ্যে প্রধান ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক এবং সামাজিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক দিয়েই আলোচনার সূচনা হতে পারে।

খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, তাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক নাটক। এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমত, বিষয়বস্তু যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, সাহিত্যকৃতিকে আগে নাটক হতে হবে। নাটক হয়ে ওঠার শর্ত আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি, কেবল উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে রচিত হলেই তা নাটক হয় না—জীবনের দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, তা যদি ইতিহাসের আশ্রিত কোনো কাহিনীতে পাওয়া যায় নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু ইতিহাস থেকে যে-কোনো কাহিনী আহরণ করলে তা নিয়ে নাটক রচনা করা যায় না—কারণ তা নাটকও হয় না, ঐতিহাসিক নাটকও হয় না। 'ঐতিহাসিক' শব্দটি নাটকের বিশেষণ, এটি মনে রাখতে হবে। ইতিহাসের কোনো কাহিনীতে উপযুক্ত নাটকীয়তার সন্ধান পেলে তাকে সমর্থ নাট্যকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারেন, যেমন পেরেছেন শেক্‌স্‌পীয়র জুলিয়াস সীজার বা ক্লিওপ্যাট্রার জীবনের দ্বন্দ্বময়তা নিয়ে, অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্রাট সাজাহানের পিতৃসত্তা ও রাজসত্তার দ্বন্দ্ব নিয়ে।

দ্বিতীয় কথা, ইতিহাসের সত্যতা ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে। দুটি ব্যাপার এখানে মৌলিক সত্যের মতো মনে রাখা প্রয়োজন—ইতিহাসের পাঠ নেবার জন্য যেমন কেউ ঐতিহাসিক নাটক পড়েন না তেমনি ইতিহাসের ধারণাকে বিকৃত করার অধিকারও কোনো সাহিত্যিকের নেই। সাহিত্যিক যেহেতু ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসের খুঁটিনাটি তথ্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত থাকবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না—যেমন মুঘল আমলের কোনও একটি ঘটনা বা রাজপুত জাতির ইতিহাসে সংগঠিত কোনও ঘটনার প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খ লেখক বিবৃত করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা হতে পারে না, কারণ তিনি ইতিহাসের বিবরণ দিতে বসেন নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কোনো চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছেন তা বিকৃত করার অধিকারও নাট্যকারের নেই। জুলিয়াস সীজার চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা ঐতিহাসিকগণ গড়ে তুলেছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক পড়ে যদি সে ধারণা ভেঙে যায় তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবেন নাট্যকার—তিনি স্বসৃষ্ট চরিত্রের প্রতীতি নির্মাণ করতে পারেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া চরিত্রকে পালটে দিতে পারেন না।

তৃতীয়ত, ইতিহাস থেকে নাটক বা উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তার প্রকৃতি কী রকম হবে, অর্থাৎ ইতিহাস ও কাব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কী, এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল সংক্ষেপে হলেও কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্‌' গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত হলেও

মন্তব্যগুলি অতি মূল্যবান, এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বক্তব্য উদ্ধার করছি এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ থেকে (অনুবাদ বাইওয়াটার)—"The poets function is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen *i.e.* what is possible as being probable necessary ... one describes the thing that has been, and the other a kind of thing that might be ... Hence poetry is something more philosophic and of graver importance than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars.

মনে রাখবার মতো কথা হচ্ছে যা ঘটে তার বর্ণনা দেওয়া নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সেটা করে ইতিহাস—সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন সম্ভাব্যতার সূত্র মেনে যা ঘটতে পারে তাই। সুতরাং ইতিহাস ব্যক্তিগত মানুষের বিশেষ কালের কাহিনী, সাহিত্য সাধারণভাবেই মানুষের সর্বকালের কাহিনী। সেই জন্যই ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্য অনেক উচ্চস্তরের।

সম্ভবত এই মহত্ত্বের ধারণা মনে রেখেই ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে কোনো কোনো নাট্যকার একটি মহৎ ভাব প্রচার করতে চান, অবশ্য সে চরিত্র ইতিহাসানুগ না হতে পারে, এমনকি ঐতিহাসিক চরিত্রও না হওয়া সম্ভব। যেমন 'মেবার পতন' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট করবার জন্য যথাক্রমে বেছে নিয়েছিলেন কল্যাণী, সত্যবতী এবং মানসী নামক তিনটি নারী চরিত্রকে—সম্ভবত যাদের প্রত্যেকটিই অনৈতিহাসিক। এদের মধ্যে আবার জয়যুক্ত হয়েছিলেন মানসী তাঁর বিশ্বপ্রেমের বাণী নিয়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক ধারণা থেকে বিশেষ বিচ্যুত না হওয়ায় অনেকেই 'মেবার পতন'-কে মোটামুটি একটি সমর্থ সৃষ্টির সম্মান দিয়ে থাকেন।

আসলে এই ধরনের ব্যাপার মূলগতভাবে নাট্যধারণার বিরোধী, কারণ নাট্যকার কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বক্তব্য বস্তুগত ভাবে এই সব চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন—নিজের বক্তব্য তিনি চরিত্রের ওপর আরোপ করতে চাইছেন, এ ধারণা দর্শকের মনে সৃষ্টি হলে নাটকের শিল্পমূল্য কমে যায়। আমাদের উল্লিখিত 'মেবার পতন' নাটকে মানসী চরিত্র এতো বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই হয়নি যে বিশ্বপ্রেমের দুরূহ ও সুমহান আদর্শ তার একান্ত নিজস্ব বলে আমাদের মনে হবে। যেমন ধরা যাক জর্জ বার্নার্ড শ-এর 'সেন্ট জোয়ান' নাটক—সেখানেও চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য। অথচ এই দুটি নাটককেই আমরা প্রথম শ্রেণীর নাটকের মর্যাদা দিই। সে কারণে মনে হয়, ইতিহাস বিকৃত না করে কুশলী নাট্যকার ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁর নিজের মতবাদ প্রচার করার সুযোগও কোথাও কোথাও পেয়ে যান।

● একটি ঐতিহাসিক নাটকের বিশ্লেষণ

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সিদ্ধি ও সার্থকতা কতখানি সম্যকভাবে জানবার জন্য আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে গৃহীত নাটকটিকে অবলম্বন করতে পারি। নাটকের নাম 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনার আলোকে নাটকটির গুরুত্ব পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, অর্থাৎ পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত নাটক। এর প্রথমাঙ্কে আমরা পাই দুটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। এই নাটকের মূল বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে টডের রাজস্থান-বিষয়ক গ্রন্থ থেকে, মূল চরিত্র জগৎ সিংহ, ভীম সিংহ কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি ইতিহাস থেকেই সংগৃহীত, যদিও কিছু কল্পিত চরিত্রও এখানে আছে। নাটকের প্রাণশক্তি যে দ্বন্দ্বময়তা, এখানে তাকেও সবিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের আশায় জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহ এবং মরুদেশের রাজা মানসিংহের মধ্যে সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং পরিণতিতে কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহনন এই নাটকের উপজীব্য। সুতরাং নাটকের প্রার্থিত দ্বন্দ্ব এখানে আগাগোড়াই রক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নাটকে ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠা যেটুকু রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তা এখানে রক্ষিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়। জয়পুরের রাজার চরিত্রদোষ এবং লাম্পট্যবৃত্তির সমর্থন ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, কৃষ্ণকুমারীর করুণ অপমৃত্যুও ইতিহাসের সত্য—যদিও মৃত্যুর কারণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। ইতিহাসের ধারণা যেখানে কিছুটা লঙ্ঘিত হয়েছে সেটি হল ভীমসিংহের চরিত্র। এই চরিত্রটিকে আমরা প্রথম থেকেই নির্জীব, নিরানন্দ এবং হতোদ্যম হিসাবে দেখি। রাজপুত জাতির অনেক রাজাই তখন অন্তর্কলহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রাণা ভীমসিংহের এই রকম কাপুরুষোচিত ব্যবহার ইতিহাস সমর্থন করবে বলে মনে হয় না। এছাড়াও তথ্যের কিছু ছোটখাট বিচ্যুতি এ নাটকে আছে, তবে নাট্যকার যেহেতু ঐতিহাসিক নন, ইতিহাস জ্ঞানের পূর্ণতা নেই বলে এ ব্যাপারে কোনও শৈল্পিক অভিযোগ করা যায় না। মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক ধারণা মধুসূদন বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই আমরা মনে করি।

অসুবিধা যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছে অনৈতিহাসিক চরিত্র নিয়ে। ঐতিহাসিক নাটকে কল্পিত চরিত্র নিশ্চয়ই আসতে পারে, নাট্যকার তাদের সৃষ্টি করেন ইতিহাসের ঘটনাগত অসংগতি দূর করবার জন্য বা ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করবার জন্য। এখানেও তার প্রয়োজন ছিল। মানসিংহ এবং জগৎসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস সমর্থন করলেও, তাদের মধ্যে শত্রুতার কোনো উপলক্ষ ইতিহাস আমাদের দেয় না। মধুসূদন ধনদাস ও মদনিকা নামে সম্পূর্ণ দুটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করবার জন্য। কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে প্রায় কিছুই যিনি জানতেন না, সেই জগৎ সিংহকে তার পাণিপ্রার্থী করে তুলবার কৃতিত্ব যেমন ধনদাসের, তেমনি আর এক রাজপুত রাজা মানসিংহকে সুকৌশলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেনে এনেছে মদনিকা। একদিকে নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তারা পালন করেছে, অন্যদিকে লঘু কৌতুক পরিবেষণ করায় চরিত্র হিসাবেও দর্শকদের কাছে তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নাটককে জনপ্রিয় করবার প্রলোভন মধুসূদন সামলাতে পারেননি বলেই এই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক চরিত্রদুটিকে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি সংযত হতে পারেননি। মাত্রাজ্ঞানের অভাবের জন্যই অনৈতিহাসিক এই চরিত্রদুটি ঐতিহাসিক চরিত্রদেরও অতিক্রম করে গিয়েছে এবং কার্যত কিছুটা শিল্পমূল্যও ক্ষুণ্ণ করেছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি এরকম মন্তব্যও সমালোচকগণ করে থাকেন বলেই বিশেষ করে এ কথা বলা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এই পরিণতিকেন্দ্রিক dramatic

irony আমরা পাই কৃষ্ণকুমারীর পরিহাসে—"পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি কে জেতেন!"

এরপর তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাই পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস, যখন রাজপুত-কুললক্ষ্মী পদ্মিনী কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁরই মতো আত্মত্যাগের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন, কারণ "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই!" কৃষ্ণকুমারীর আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় যখন সচেতন দর্শকের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকার কথা তখন সমগ্র চতুর্থ অঙ্ক জুড়ে ধনদাস ও মদনিকার কার্যকলাপ এবং মদনিকার চাতুর্যে ধনদাসের শাস্তিবিধান একাধারে নাটকের রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং রসজ্ঞ দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়। নাটকের ঘটনাগত ঐক্য বা 'unity of action'-ও এতে ব্যাহত হয়। আমাদের আরো আপত্তি, দুটি কাল্পনিক চরিত্র ঐতিহাসিক নাটকের এই বিপত্তি ঘটিয়েছে বলে।

তৃতীয়ত, ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে যে সম্ভাব্যতা ও সর্বজনীনতার কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন, সেই সূত্রে ব্যাখ্যা করতে গেলে মধুসূদনের প্রশংসাই আমাদের করতে হবে। ইতিহাসের যে তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন তাতে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব নিশ্চয়ই ছিল। ধনদাসের ধনস্পৃহা এবং মদনিকার প্রতিশোধস্পৃহার অবতারণা করে নাটকের সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি অনেক বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা চলে যে, একটি বিশেষ কাহিনীকে কিছুটা শাশ্বত সত্যের মর্যাদা তিনি দিতে পেরেছেন এই কারণেই যে, রাজপুত জাতির আত্মক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রাজপুত-রমণীর আত্মত্যাগের প্রায় সাধারণ একটি সত্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং ত্রুটিমুক্ত না হলেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-কে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

ণ. পৌরাণিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের অন্যতম, এবং সম্ভবত প্রধানতম বিভাগ পৌরাণিক নাটক। অন্তত বাংলা নাটক সম্বন্ধে এ কথা একশো ভাগ প্রযোজ্য, কারণ পৌরাণিক নাটক দিয়েই বাংলা নাটকের জয়যাত্রা শুরু। এই ধরনের নাটকেই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যাত্রাপালার সঙ্গে তার পার্থক্যের সূত্রগুলিও স্পষ্ট। পৌরাণিক নাটক আমাদের কাছে যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একথাও স্বীকার করতে হবে। পুরাণ মানেই ভক্তিমূলক বিষয় এবং ভক্তিমূলক কিছু পেলে বাঙালীর আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যে, তা আজকের দিনেও ধর্মমূলক কোনো যাত্রাপালা—এমনকি ছায়াছবি এলেও বুঝতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে লেবেডফের আকস্মিক এক নাটকীয় প্রয়াস বাদ দিলে প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কে পৌরাণিক নাটকই বলতে হবে। প্রায় একই সময়ে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই লেখা হয় যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের

'কীর্তিবিলাস'—যদিও তাকে পুরাণকথা বলা হবে, না রূপকথা, এ নিয়ে সংশয় আছে। এই দুটি নাটকের অব্যবহিত পরেই আমরা পাই মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা', মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণীহরণ' প্রভৃতি। অবশ্য বাংলা পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এখনও পর্যন্ত বলা হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে।

বাংলা নাটকের উদ্ভব যে যাত্রাপালা থেকে হয়নি, এ কথা সমালোচকগণ প্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে বললেও পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে যাত্রাপালার কিছুটা আত্মীয়তা আমরা খুঁজে পাই, যেহেতু যাত্রাপালার বিষয়ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরাণ থেকে আহৃত। পৌরাণিক নাটকের ভাষার উচ্ছ্বাস ও তরলতাকে কিছু পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলে সাদৃশ্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালোভাবেই ধরা পড়ে। আসলে কিন্তু উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতি ভালোভাবে আলোচনা করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

পুরাণ বলতে সাধারণভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বোঝালেও পৌরাণিক অভিধানের মতে পুরাণ "অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। ... পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮; যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।" নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে অবশ্য বিভিন্ন লৌকিক পুরাণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পুরাণ বলতে এই যে ব্যাপক বিষয়ের উল্লেখ করা হল, এর মধ্যে সাদৃশ্যসূত্র একটাই আছে, সেটা হল ভক্তিপ্রগাঢ় কাহিনী। পৌরাণিক নাটকেরও প্রধান লক্ষণ সেটাই—ভক্তিরসগাঢ়তা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ যে নবরসের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ভক্তির স্থান না থাকলেও বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগণ রতিভাবকে কৃষ্ণরতিতে রূপান্তরিত করে তার সিদ্ধিকে বলেছেন প্রেমরস বা ভক্তিরস। আমরা সেইভাবেই ভক্তিরস ব্যাপারটিকে বুঝে নিতে পারি।

প্রচলিত ছক হিসাবে পৌরাণিক নাটকে কয়েকটি সাধারণ ব্যাপার আমরা লক্ষ করতে পারি, যেমন—অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকতা, নীতির প্রতিষ্ঠা, অবতারত্ব, ভক্তি ও বিশ্বাসের জয়, ভগবৎ উচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও আলংকারিকদের শান্তরসের প্রভাব, মৃত্যু ও বিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্তি না ঘটিয়ে পরলোকে মিলন ও প্রশান্তি দেখানো প্রভৃতি। আসলে সাধারণ মানুষের মনে অনেক রকম সংস্কারের মতো দৈবী সংস্কারও থাকে, ধর্মভাব ও সংস্কারের যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তাদের মনে থাকে, পৌরাণিক নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। তাই দেবদেবী চরিত্রের মতোই পৌরাণিক নাটকেও ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, যমদূত-দেবদূত ইত্যাদিরাও ঘন ঘন আবির্ভূত হয়ে থাকে।

কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা ভিন্ন কারণে পৌরাণিক নাটককে কেউ কেউ আধুনিককালের সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে মানতে চান না। আধুনিক সাহিত্য যুক্তিলালিত, অথচ পৌরাণিক নাটকে যুক্তির স্থান গ্রহণ করে ভক্তি। যুক্তি দিয়ে যাকে কোনরকমেই ব্যাখ্যা করা যায় না, ভক্তি তাকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। ভক্তি যেহেতু পৌরাণিক নাটকে প্রাণরস সঞ্চার করে, সাহিত্য হিসাবে তাকে আধুনিক প্রকরণ বলে মানাটাই ঠিক নয় বলে অনেকের ধারণা। আবার কোনো কোনো সমালোচক বলেন 'পৌরাণিক নাটক' কথাটির মধ্যে এমন স্ববিরোধ আছে যে একে প্রায় অসম্ভব বলাই ভালো। নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসযোগ্যতা

নাটকের বৈশিষ্ট্য, নির্বিচার গ্রহণ বা 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' গোছের মানসিকতা পুরাণের আসল কথা—সুতরাং এ দুয়ের সমন্বয়ে যে 'সোনার পাথরবাটি' তৈরি হতে পারে তাকে অন্তত আধুনিক সমালোচকদের গ্রাহ্য করা উচিত নয়।

আমাদের মনে হয় এ সব যুক্তিই গভীরভাবে ভেবে দেখবার মতো, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো যে শৈল্পিক সমস্যা ঘটতে পারে সেটা এই যে, যে-দ্বন্দ্বময়তা নাটকের প্রাণ, পৌরাণিক নাটকে তা পরিস্ফুট করার অসুবিধা আছে। দেবতার আধিপত্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেমন মানুষের প্রতিরোধী সত্তা ফুটে উঠবার বিশেষ অবকাশ ছিল না, এখানেও দর্শক যখন চান দেবতার মহিমা এবং অলৌকিক লীলা, তখন দ্বন্দ্বময়তা প্রদর্শনের সুযোগ তো সেখানে অল্প।

এইসব সমস্যা মেনে নিয়েও বলতে হবে, পৌরাণিক নাটক রচনায় যাঁরা সামর্থ্য দেখিয়েছেন তাঁরা ভক্তি ও যুক্তির মধ্যে, নির্দ্বন্দ্ব দৈবী আধিপত্য ও দ্বন্দ্বময়তার সঙ্গে, একটা সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের শৈল্পিক প্রচেষ্টা করেছেন। পৌরাণিক নাটকের ঊষালগ্নে অলৌকিকতা ও মিথের বাড়াবাড়ি থাকলেও পরবর্তীকালে তাকে যুক্তি অনুশাসনে গ্রহণ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই কারণে দেবত্ব অপেক্ষা পূর্ণ মানবত্বও ক্রমে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যে দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, সেই দ্বন্দ্বও পৌরাণিক নাটকের উপজীব্য হয়ে উঠেছে—কখনো দেবতার সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, কখনো আস্তিকতার সঙ্গে নাস্তিকতার, কখনো বা বিভিন্ন স্তরের ধর্মের মধ্যেই বিরোধ। একটি বাংলা পৌরাণিক নাটক বিশ্লেষণ করলে কথাটি ভালো করে বোঝা যাবে।

● একটি পৌরাণিক নাটকের বিচার

পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটিকে পৌরাণিক নাটকের একটি ভালো দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় বলে আমাদের মনে হয়, কারণ এটিতে একদিকে যেমন পুষ্ট হয়েছে পৌরাণিক নাটকের ঈপ্সিত ভক্তিরস, অন্যদিকে এটি আধুনিক অর্থেই নাটক হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার স্বয়ং অবশ্য এই নাটকের শ্রেণী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, এটি 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক' এবং যেহেতু বিল্বমঙ্গল চরিত্রটিকে নাভাজী-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে অন্যতম ভক্ত হিসাবে পাওয়া যায়, একে অনেক চরিতনাটকও বলে থাকেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃতিতে একে যে পৌরাণিক নাটক ছাড়া অন্য কিছু মনে করা সম্ভব নয় সে কথা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকের কাহিনী এক কথায়, একটি সাধারণ বেশ্যাসক্ত মানুষের ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার কাহিনী। অবশ্য সাধারণ মনে হলেও বিল্বমঙ্গল যে চিন্তামণি নামক এক গণিকার কাছে দেহের প্রলোভনেই যেত না, তার মনে যে প্রকৃত প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল, তা চিন্তামণির কথা থেকেই বোঝা যায়—

"কাছ থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাত ভ্যান্ ভ্যান্। মাথামুণ্ডু নেই—খালি, ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।"

প্রেমের এই প্রমত্ত আবেগ মনে লালন না করলে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে চিন্তামণির কাছে আসার মতো অসাধ্যসাধন সে করতে পারতো না। এর পর যখন চিন্তার

কাছে সে শুনেছে—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হত!" তখনই বিল্বমঙ্গলের মনে কথাটি একেবারে আমূল গভীরতায় ঢুকে গিয়েছে। প্রেমেরই সার্থকতা খুঁজতে চেয়েছে সে তার পরমার্থ ঈশ্বর-প্রেমের মধ্যে, বলেছে—

"কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যাহে হবে লয়?"

এরপরই তার কঠোরকঠিন, যন্ত্রণাবিক্ষত ভগবৎ আরাধনা—শেষপর্যন্ত যা সার্থক হয়ে উঠেছে।

যে কোনও শ্রেণীর নাটক-বিচারেই আমাদের প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত তা নাটক হয়েছে কিনা এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় 'বিল্বমঙ্গল' অত্যন্ত উচ্চস্তরের নাটক, কারণ এখানে আমরা একেবারে আধুনিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাই—ব্যক্তির নিজের সঙ্গেই নিজের বিরোধ, তার প্রেমিক সত্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম সত্তার বিরোধ এবং তার বিচিত্র এক সমীকরণ, যেখানে উপনীত হলে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বলতে পারে তার 'প্রেমশিক্ষাদাতা'।

প্রথাগত বিচারে 'বিল্বমঙ্গল'-কে পৌরাণিক নাটক বলার অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে কারণ এর বিষয়বস্তু পুরাণ হিসাবে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়নি, রামায়ণ বা মহাভারত থেকেও নাট্যকার এই আখ্যান গ্রহণ করেননি। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের অঙ্গীরস যে ভক্তি, তা এই নাটকে সর্বাংশে আছে—আলংকারিকদের ভাষায় বলা যায়, এর ঔচিত্য কোনো মতেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেই হিসাবে বলতে হবে, পৌরাণিক নাটক হিসাবে এর আস্বাদ্যমানতা সম্পূর্ণই বজায় আছে। উপরন্তু নাটক হিসাবেও এটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ উপাদান যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, আধুনিক সাহিত্যে মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীই আমরা শুনতে চাই। 'বিল্বমঙ্গল' সেদিক থেকে আধুনিক দর্শকের কাছেও রুচিকর হবে, কারণ সাধারণ একটি মানুষের কামনা এবং সেই কামনার ঊর্ধায়নই এখানে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে—ফলে পৌরাণিক নাটকেও নাট্যকার আশ্চর্যভাবে মানবিক স্বার্থ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এই কৌশল আমরা অন্যত্রও দেখি। পৌরাণিক নাটকে অনেক অবাস্তব ও অপার্থিব লীলা দেখাতে হয় যাতে ভক্তপ্রাণ দর্শক তা উপভোগ করতে পারেন। দর্শক সম্বন্ধে অতিঅভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র তা স্মরণ রেখেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা এই নাটকে অনেক প্রদর্শন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে রাখাল বেশে দেখিয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি হয়নি, শেষ দৃশ্যে দোলমঞ্চে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, কুশলী নাট্যকার কখনো অলৌকিক লীলাকে নাটকের প্রত্যক্ষ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন না। অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতকে তিনি জনরুচির স্বার্থে গ্রহণ করেন কিন্তু শিল্পের স্বার্থে তাকে করে রেখে দেন বহিরঙ্গ উপকরণ। এই নাটকেও আমরা অলৌকিক লীলা বেশ কয়েকবারই দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে প্রধান অবশ্য অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া। কিন্তু একে যদি আমরা রূপক হিসাবে দেখি, ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ জীবনে আবির্ভূত হবার পর তার চোখে এলো নতুন দৃষ্টি বা নতুন করে দেখবার ক্ষমতা—তাহলে বোধহয় এই রকম জোরালো অলৌকিক ঘটনাকেও আমরা মেনে নিতে পারি।

সচেতন দর্শককে এ কথাটা বোঝাবার জন্য, অথবা মানবিক নাটকের মধ্যে অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করবার জন্য, আর একটি কৌশলের প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার। নাটকে তিনি

সাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন গদ্য সংলাপ এবং সে গদ্য একেবারেই মুখচলতি ভাষা, অথচ যে-মুহূর্তে নাটকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটেছে অথবা অলৌকিকের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিশিষ্ট গৈরিশ ছন্দ। যেমন বিল্বমঙ্গলের প্রথম কাব্যছন্দের ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। অত্যন্ত সাধারণ সংলাপই নাট্যকার ব্যবহার করেছেন তার মুখে, অথচ যে মুহূর্তে তাকে আন্দোলিত করার মতো কথা সে শোনে চিন্তার মুখে, সেই মুহূর্তে তার মুখের সংলাপের চরিত্র-পরিবর্তন ঘটে—

"এই পরিণাম!
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী—এরও এই পরিণাম।
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?"

কাজেই, অলৌকিক লীলাকে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাকে নাটকের বহিরঙ্গ উপাদানে পরিণত করে, দর্শকের রুচিকে মান্য করেও শিল্পের দাবী অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রখরতায় একে আধুনিক দর্শকের উপভোগ্য করে গিরিশচন্দ্র যে এই নাটকে সার্থক পৌরাণিক নাটকের সংবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছেন এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

ত. সামাজিক নাটক

সাধারণভাবে নাটক বলতে আমরা সামাজিক নাটকই বুঝি। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্ত ছেড়ে নাটক যে মুহূর্তে সমাজের বিশেষ কোনো সমস্যাকে আশ্রয় করেছে, সেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পেরেছি বাংলা যাত্রাগান থেকে নাটকের পথ-পরিক্রমা কত স্বতন্ত্র হতে চলেছে। নাটক জীবননির্ভর, এবং জীবন বলতে প্রধানত মানুষের সামাজিক জীবনই বোঝায়, তাই আধুনিক নাট্যকলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক নাটকের উন্মেষের এক দৃঢ় সম্পর্ক আছে।

সামাজিক নাটক বলতে অবশ্য আমরা ঠিক সামাজিক মানুষের নাটক বুঝি না, বুঝি এমন এক ধরনের নাটক যার বিষয় কোনো সামাজিক সমস্যা। সেই হিসাবে যেসব নাটক সমস্যাপ্রধান নাটক হিসাবে চিহ্নিত, সেই সমস্যার প্রকৃতি সামাজিক হলে তাকে নিশ্চয়ই সামাজিক নাটক বলা যায়। আবার বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে উদ্ভূত নাটককেও সেই একই কারণে সামাজিক নাটকই বলতে হবে। এই সূক্ষ্ম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন সময়ের যেগুলি প্রধান সামাজিক সমস্যা সেগুলিকে অবলম্বন করে লেখা নাটককেই আমরা আখ্যা দিই সামাজিক নাটক। যেমন ঊনবিংশ শতকের প্রধান সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা, বালবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি। এই সঙ্গে ছিল অন্তঃসারশূন্য জমিদারদের আভিজাত্যবোধ এবং এইরকম দুই পরিবারের বংশানুক্রমিক লড়াই প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সামাজিক সমস্যার

পালাবদল ঘটেছে। যৌথ পরিবারের অবলুপ্তি এবং সংসার ক্রমশ ছোট থেকে আরো ছোট করার প্রবণতাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রকট। এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি এখনও ব্যক্তিগত সমস্যা হয়েই আছে, কিন্তু অচিরেই তা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হবে, সে আশঙ্কা এখনই দেখা দিতে শুরু করেছে।

প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভবত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। সেকালে কুলীনদের বহুবিবাহ ছিল অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং এই সমস্যাকেই তাঁর জনপ্রিয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। রামনারায়ণ সামাজিক প্রহসনও কিছু লিখেছিলেন, যেমন বহু বিবাহের দোষ নিয়েই লিখেছেন 'উভয় সঙ্কট', স্বামীর লাম্পট্য দূর করায় স্ত্রীর কৌশল নিয়ে লিখেছেন 'চক্ষুদান', বড় প্রহসন হিসাবে লিখেছেন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক' যদিও তাঁর জনপ্রিয় নাটক, নিটোল কাহিনীর অভাবে একে খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গচিত্রের মতো মনে হতে পারে। নাটক হিসাবে বরং তাঁর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নবনাটক' অনেক শিল্পত্রুটিমুক্ত।

বাংলা নাটকের আদি যুগে রামনারায়ণের পরবর্তী অনেক নাট্যকারই সামাজিক নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক', তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কাদম্বিনী নাটক', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রভৃতি। মধুসূদন দত্ত সামাজিক নাটক লেখেননি, কিন্তু তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুটি সামাজিক প্রহসন এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অবশ্যই সামাজিক নাটক। যদিও আজ তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, দীনবন্ধু যখন ও নাটক লেখেন তখন এই নৃশংস প্রথা ছিল নির্মমতম সামাজিক সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনযাত্রা গঠনের অপদার্থতা নিয়ে লেখা তাঁর 'সধবার একাদশী', কিংবা ছোট প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও পুরোপুরি সামাজিক প্রহসন এবং রচনাসৌকর্যে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সর্বশ্রেণীর উপভোগ্য প্রহসন 'জামাই-বারিক'।

● একটি বাংলা সামাজিক নাটকের বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সামাজিক নাটকগুলির অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', সুতরাং এই নাটকে সামাজিক নাটকের লক্ষণ কতোটা আছে এবং তার শিল্প-সার্থকতাই বা কতোখানি, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

'প্রফুল্ল' নাটকের নাট্যকাহিনী মোটামুটিভাবে এইরকম যে, অল্প বয়সে পিতৃহারা যোগেশ নিজে প্রচুর কষ্ট করে বিধবা মা এবং দুটি নাবালক ভাই রমেশ ও সুরেশকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। জীবনে যখন তিনি সৎপথে থেকে, ন্যায়নিষ্ঠভাবেই প্রতিষ্ঠিত, মেজভাই রমেশকে ওকালতী পাশ করিয়েছেন, ছোট ভাই সুরেশকে পড়াশুনায় কৃতী করতে না পারলেও অমানুষ হতে দেননি—সেই সময়েই সংসারে বিপর্যয় দেখা দেয়, তাঁর ব্যাঙ্ক ফেল করে এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁর এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মেজভাই রমেশ তাঁকে দিয়ে বাড়ি ও সম্পত্তি লিখিয়ে নেয় নিজের নামে এবং এ পথের একমাত্র কাঁটা যোগেশের পুত্র যাদবকে মেরে ফেলার

চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে মিথ্যা চুরির অপবাদে সুরেশকে জেলে ঢোকায়। যোগেশ আঘাতের পর আঘাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং মদ্যপানে বিভোর হয়ে সমস্ত ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। সংসারের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়, ছোট ছেলের শোকে মা উন্মাদিনী হন—শেষে যাদবকে মারার অপকীর্তি রোধ করতে এসে রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লও মারা পড়ে এবং প্রচলিত রমেশ বোধহয় এতোদিনে প্রথম ধাক্কা খায়।

নাটকটি আমাদের দেশের একদা সামাজিক অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। এখানে যদিও আমরা কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে একক ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি না, কিন্তু আমরা সবাই বুঝি, একান্নবর্তী পরিবারের মূল সমস্যা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একার আয়ে যখন সংসার দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ পোষ্য থাকে অনেকগুলি, তখন সেই একার বিপর্যয়ে গোটা সংসারটাই ভেসে যাবার উপক্রম হয়। এখানে অবশ্য যোগেশের আয়ে সংসার চললেও তিনি রমেশকে মানুষ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন আছে। ভায়েরা যাতে ঠিকমতো পড়াশুনা করতে পারে, কোনো আর্থিক অসুবিধা যাতে তাদের উচ্চাকাঙক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এ ব্যাপারে তাঁর যতো দৃষ্টি ছিল, ভাইগুলি সত্যিই 'মানুষ' হচ্ছে কিনা এদিকে দৃষ্টি তাঁর একেবারেই ছিল না। ফলে, একচক্ষু হরিণের মতো তিনি তাদের পেছনে অকাতরে অর্থব্যয়ই করে গিয়েছেন, ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে তাদের শাসনের দিকটা দেখতেই পাননি। এর আশঙ্কিত ফললাভও তিনি করেছেন। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যায়, বর্তমান সমাজে একটিমাত্র ছেলে বা মেয়েকে সেরা করার যে-প্রতিযোগিতায় বাবা-মা নেমেছেন, সেখানেও প্রচুর অর্থব্যয় করেই তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব শেষ মনে করছেন—নিজেরা সময় দিতে চান না, ছেলেমেয়ের মনোভাবও বুঝতে চান না। তার ফল কিন্তু ফলতে শুরু করেছে।) এই সঙ্গে অবশ্য আর একটি সামাজিক সমস্যার দিক উন্মোচিত করা দরকার, সেটি হল বেসরকারী ব্যাঙ্কের সমস্যা। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে আমরা এখন যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি তার মধ্যে প্রধান হল ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। মানুষ তার অর্থ সঞ্চয় করে তিল তিল করে, অথচ বেসরকারী ব্যাঙ্কিং প্রথায় যে-কোনদিন এক মুহূর্তে তা নস্যাৎ হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল—সেই আশঙ্কার বিধ্বংসী চেহারা আমরা 'প্রফুল্ল' নাটকে দেখতে পাই। সুতরাং সমস্যার প্রকৃতি বিচার করলে নাটকটিকে সামাজিক নাটক বলে স্বীকার করতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। অবশ্যই এর শিল্পসাফল্যের কথাটা এরপর আমাদের চিন্তা করতে হবে।

যে-কোনও ভাল নাটকেই চরিত্র ও ঘটনাকে আমাদের স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। প্রফুল্ল যেহেতু ট্র্যাজেডি হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকৃত, এর পরিণতি এবং নায়ক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই নাটকের পরিণতি এবং ঘটনাধারার মধ্যে যে একটা কার্যকারণ-শৃঙ্খলের অভাব আছে এবং রোমহর্ষক ঘটনার প্রতি নাট্যকারের যে বেশি আগ্রহ আছে তা আমরা বুঝতে পারি। দর্শকদের অভিনন্দন পাওয়ার জন্য জগমণি ও কাঙালীচরণকে তিনি প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে পরিণত করেছেন। প্রফুল্ল শেষ দৃশ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নায়িকা হয়ে যায়, সে প্রাধান্য তাকে প্রথমাবধি দেওয়া হয়নি। রমেশের মতো আদ্যন্ত শয়তান চরিত্র কোনো মানুষের হতে পারে কিনা এটাও ভাববার কথা। বিশেষ করে যোগেশ কেন মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন, সারাজীবন যিনি নিজে দাঁড়াবার ও ভাইদের

প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি একটি আঘাতেই—তা সে যতোই বড়ো হোক না কেন, ভেঙে পড়েন, তা আমাদের বিস্মিত করে। এ কথা আরো ভাববার এই কারণেই যে, উদ্যম ও মনোভাব পঙ্গু হয়ে গেলে তাকে তো আমরা ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক বলতেই পারি না, এবং যোগেশ ছাড়া নায়ক হিসাবে ভাববার মতো অন্য কোনো চরিত্রও 'প্রফুল্ল' নাটকে নেই। অবশ্য যোগেশ চরিত্রকে একটু অন্য ভাবেও চিন্তা করা যায়। তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি বা frailty যদি আমরা ধরি অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ এবং ভাইয়ের আচরণে তিনি যদি বুঝে থাকেন এতোদিন তিনি পণ্ডশ্রম করেছেন—সঞ্চিত ধনের চেয়েও বড় সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, এই অনুভূতি যদি তাঁর জেগে থাকে, একমাত্র তবেই তাঁর আচরণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ফলত, বিষয়ের বিচারে তো বটেই, রূপায়ণের ক্ষেত্রেও আমরা 'প্রফুল্ল'কে মোটামুটিভাবে শিল্পসফল সামাজিক নাটক হিসাবে মেনে নিতে পারি।

থ. চরিত-নাটক

যে-কোনো বিশেষ এক ব্যক্তির জীবন নিয়ে রচিত নাটককেই চরিত-নাটক বলা হয়। সুতরাং সেই বিশেষ ব্যক্তি 'সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বা ধর্মনীতি-রাজনীতি যে-কোনো ক্ষেত্রের মানুষই হতে পারেন, এটা ধরে নিতে হবে। সংস্কৃতি সাহিত্যে ভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের জীবন নিয়ে নাটক রচনার রীতি ছিল, যেমন বাণভট্ট রচিত 'হর্ষরচিত' বা ভবভূতিরচিত 'উত্তররাম চরিত'।

মধ্যযুগে চরিত-নাটক লেখা শুরু হয় চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করেই। সংস্কৃত ভাষায় লেখা নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি কর্ণপূর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক। জীবনী অনেক লেখা হলেও বাংলা ভাষায় নাটকের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য সেসব নাটককেও বিশেষ ধরনের চরিত-নাটক বলাই শ্রেয়, কারণ জীবনী (Biography) ও সন্ত-জীবনীর (Hagiography) মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে।

আধুনিক যুগে, অর্থাৎ ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে নাটক রচিত হবার পর অবশ্য প্রচুর চরিত-নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে চরিত্র বাছা হয়েছে তা সাধুসন্ত বা ঈশ্বরকল্প চরিত্র। আধুনিক নাটকে চরিত-নাটকের সবচেয়ে উল্লেখাগ্য রূপকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটকেই তাঁর সাধ ও সিদ্ধি ছিল বেশি, তাই সন্তজীবনীই তিনি গ্রহণ করেছেন বেশি। চৈতন্যজীবনী নিয়ে এবং চৈতন্যসমসাময়িকদের নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক তিনি লিখেছেন। চৈতন্যদেবের বাল্যজীবন থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনদান নিয়ে লিখেছেন 'চৈতন্য-লীলা' এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী জীবন নিয়ে লিখেছেন 'নিমাই-সন্ন্যাস'। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর মধ্যে প্রধান রূপগোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর জীবন নিয়ে তিনি লেখেন 'রূপ-সনাতন'। রূপ গোস্বামীর কাহিনী অবশ্য এখানে এতই সংক্ষিপ্ত যে নাটকের নাম নিয়েও একটি নাটক গিরিশচন্দ্র রচনা করেছিলেন, এটার নাম নিত্যানন্দ বিলাস। নাটকটির অবশ্য বিশেষ অভিনয় হয়েছে বলে জানা যায়নি।

চৈতন্য-পরিমণ্ডল ছাড়াও চরিত-নাটক গিরিশচন্দ্র কম রচনা করেননি। যেসব নাটক তিনি রচনা করেন তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর, কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 'বুদ্ধদেব-

চরিত'। 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটকের প্রধান অবলম্বন ছিল এডুরিন আর্নল্ডের কাব্য Light of Asia। সেইজন্য নাটকটি তিনি আর্নল্ডকেই উৎসর্গ করেন। তবে নিজের দেশের দর্শক কী চান তা জানতেন বলেই করুণরসের পরিবর্তে ভক্তিরসে তিনি পূর্ণ করেন নাটক। বিবাহের সময়েই স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতী করমেতি বাঈ কীরকম ভাবোন্মাদের বশে বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিল, তাই নিয়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন 'করমেতি বাঈ'। তাঁর লেখা চরিত-নাটক 'শঙ্করাচার্য'-ও প্রাকৃত জীবনের পরিবর্তে অবলম্বন করেছে, অলৌকিক ঘটনাবলী। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটির বৈশিষ্ট্যও তাই। নাভাজীদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের যে জীবনী পাওয়া যায় তাকে আরো বেশি অলৌকিক অনুষঙ্গে পূর্ণ করে নাটক লিখেছেন গিরিশচন্দ্র। যে-কোনো Hagiographical play বা সন্ত-জীবনীমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্যই তাই। সেদিক থেকে গিরিশচন্দ্র জনপ্রিয় নাটকের হিসাবে জনপ্রিয়তার সঠিক পথই বেছে নিয়েছেন।

বরং আরো পরবর্তীকালে কিছু চরিত-নাটক লেখা হয়েছে যা মহাপুরুষের বা সাহিত্যিকের জীবন অবলম্বন করে লেখা কিন্তু সন্ত-জীবনী নয় বলেই অলৌকিতার যাদু তাতে প্রবেশ করাতে হয়নি, ভক্তিরসে, সিঞ্চনও সেখানে দরকার হয়নি। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে পারি বনফুলের লেখা নাটক 'শ্রীমধুসূদন'। শেষ দৃশ্যে অবশ্য এই নাটকটিও কিছুটা অলৌকিক হয়ে পড়েছে। তুলনামূলকভাবে তাঁর 'বিদ্যাসাগর' নাটকটিকে চরিত-নাটকের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনীনির্ভর উপন্যাস লিখেছেন—'অমাবস্যার গান', ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন সেখানে উপজীব্য। তিনি নাটক লিখেছেন 'রামমোহন'-কে নিয়ে। এটিও সাম্প্রতিক কালের চরিত-নাটকের একটি ভালো উদাহরণ।

● একটি বাংলা চরিত-নাটক

গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে যে দুটি নাটক রচনা করেন তার মধ্যে একটি হল 'নিমাই-সন্ন্যাস'। এটি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবন নিয়ে লেখা। এখানে তিনি গ্রহণ করেছেন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে একেবারে শেষ জীবন অর্থাৎ নীলাচল পর্ব পর্যন্ত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের অনেক নাটকীয় ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ আছে, গিরিশচন্দ্র মূলত সেই উপাদানগুলিই আরো নাটকীয়ভাবে তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন, 'বাঙালির মর্মে মর্মে ধর্ম, তাই মর্ম স্পর্শ করতে হলে ধর্মভাব জাগ্রত করতে হবে, এটি তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। চৈতন্যের জীবনের শেষ পর্বে তার সুযোগও অনেক ছিল। এই সময়ে, চৈতন্যদেব প্রায়শই ভাবাবেশে থাকতেন। দিব্যোন্মাদনায় এমন অনেক আচরণ করতেন যা পরিবেশন হবে, ভক্তপ্রাণ দর্শককে বিচলিত করা যায়। নাট্যকার প্রত্যেকটি সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি আর-একটি জিনিস এই নাটকে করতে পেরেছেন, সেটিও দর্শক মনোরঞ্জনের অব্যর্থ উপায়। 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের জীবনের প্রচুর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, গিরিশচন্দ্র সেগুলি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস তাঁকে দেখেছিলেন অংশাবতার রূপে, অর্থাৎ জীবের কারণেই অবতার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব, যাতে আচন্ডালে নামগান বিতরণ করে পাপীদের উদ্ধার করতে পারেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিন্তু চৈতন্যদেবকে দেখেছেন পূর্ণাবতার

রূপে, অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনে নয়, শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রয়োজনেই চৈতন্য হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন—রাধার প্রেমরসের সীমা রুখবার জন্য 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণ হিসাবে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। নাট্যকার এই তথ্য রায় রামানন্দের মূল দিয়ে বানিয়েছেন বলে নাটকের নাটকীয়তা ও তাত্ত্বিক মর্যাদা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাটকটির ভাষা সুললিত এবং সুখশ্রাব্য। সেটিও নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। সামান্য অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। চৈতন্যের উক্তি—

'হে শ্যামা যমুনা পুলিনে তোমার—
মুরলিমোহন বাজাত বাঁশী
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি
উথলিত তব লহররাশি।
বিরহবিধুরা আসি ব্রজবালা
মনেরি বেদনা জানাত তোরে,
জান তো সজনি, বলে দেহ মোরে
কোথা গেলে পাব সে চিতচোরে।'

নাটকে চৈতন্যের চরিত্র সৃষ্টির দিকেই নাট্যকার বেশি যত্নবান হয়েছেন, চরিত্রটি তিনি প্রচুর অলৌকিকতা সত্ত্বেও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। এ ছাড়া সন্ন্যাস জীবনের পরবর্তী অংশ অবলম্বন করলেও বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটিকে নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদেও সজীব চরিত্র করে তুলেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরঙ্গ-কথনে নিজের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, অর্থাৎ চৈতন্যজীবনীমূলক যে গ্রন্থগুলিকে সাধারণভাবে আমরা আদর গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ কবি, তাদের যাহায্য ব্যতিরেকেই এই অংশের নাট্যকলেবর গঠন করেছেন। তবে সব মিলিয়ে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, চরিত-নাটক হিসাবে 'নিমাই-সন্ন্যাস'কে গিরিশচন্দ্র উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন।

দ. লোকনাট্য

সাধারণভাবে প্রত্যেক জাতির লোকনাট্য বা Folk drama থেকেই তার নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশেই তার ব্যতিক্রম হয়েছে। লোকনাট্য এবং যাত্রাপালা থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব তো হয় নি, বরং ইংরেজি theatre-এর আদর্শে,বাংলা নাটক তৈরি হবার পর লোকনাট্যকেই তা প্রভাবিত করেছে।

লোক-নাট্য অন্যান্য লোক সাহিত্যের মতো লোকসমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়, সুতরাং এর মূল নিরূপণ করা খুবই শক্ত ব্যাপার। তবে সভ্যতার যতই অগ্রসর হোক, একটু অন্ত্যজ সমাজ বা শ্রমজীবী এবং নিম্নবিত্ত সমাজের মধ্যে এর কিছু চর্চা থেকেই যায়। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এ ব্যাপার দেখা যায়। যেমন ইংলন্ডে এখনও খুব পুরনো লোকনাট্য দুটি আছে---- The Mumming Play বা St. George Plan এবং Thje Plough Monday Play।

বাংলায় লোকনাট্যের ঐতিহ্য বহু পুরাতন এবং বৈচিত্র্যময়। মূলত দুটি আঙ্গিকে এই সব

লোকনাট্য পাওয়া যেত— নাট্যগীত এবং গীতিবহুল যাত্রা, যার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রাই প্রধান। নাটগীত কত প্রাচীন সে কথা বলা শক্ত, তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে বেদ এবং মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে—

'নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতুহলে।
কেহো বেদ পরে কেহ পরএ মঙ্গলে।।"

পুথি পাওয়া গিয়েছে এরকম নাটগীতের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বলতে হবে, বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন এর শ্রেণী বোঝাতে গিয়ে একে বলেছেন 'নাট্যগীত পাঞ্চালিকরা'। সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হওয়াই এর সনাতন রীতি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে তা হয়েছে বলেই বোঝা যায় বহু পুরনো কাল থেকেই নাটগীতে এই রীতিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু পুথি বা সংগ্রহ হওয়ায় এর কোনো লিখিত রূপ আমরা পাই না। তা সত্ত্বেও এর অস্তিত্ব যে প্রাচীন কাল থেকেই ছিল এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষকরা একমত। নাট্যসাহিত্যের এক বিদগ্ধ গবেষক এমন কথাও বলেছেন যে, লোক সাহিত্যের এই লোক-নাট্যের ধারাকেই সংস্কার করে ভরতের নাট্যশাস্ত্র তাকে একটি আদর্শরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে বলেই প্রাক-চৈতন্য যুগের মঙ্গলগান ও পাঁচালি গানেও এর প্রভাব পড়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে র গাজন কিংবা পূর্ববঙ্গে কুমারী মেয়েদের মাঘমণ্ডল ব্রতের অন্যতম আচার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে ছড়া কাটা এর মধ্যে নাটগীতেরই লক্ষণ পাই। পশ্চিমবঙ্গেও ব্রত কথার মধ্যে এই ভঙ্গি, যার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা— 'কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা?
হাসতে খেলতে পাটের শাড়ি পরতে...' ইত্যাদি।

লোকনাট্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিক ও বিষয় ছিল কৃষ্ণযাত্রা। শুধু কৃষ্ণ নয়, যাত্রায় ধর্মবিষয়ক যে কোনো আখ্যানই অবলম্বন করা হত। পরবর্তী কালে রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল নিয়েও পালাগান লেখা হয়েছে। কৃষ্ণের জীবন নিয়ে যেসব কৃষ্ণযাত্রা লেখা হয়েছে, সেখানে ঘটনার পরিবর্তে রসের প্রাধান্যই ছিল বেশি। তাই সংলাপের চেয়ে গানই সেখানে বেশি। কৃষ্ণকথা আমাদের লোকজীবনের মধ্যে এমন প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল যে এই বিয়ে পালা গান হলেই তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করত—বিস্তর নাট্যিক দ্বন্দ্ব বা প্রচুর নাট্যপরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন হত না। এই কারণেই কৃষ্ণযাত্রায় পালাগুলি সংখ্যায় ছিল এত বেশি। উনিশ শতকে যখন ধর্মীয় কাব্যের প্রায় অবসান ঘটেছে তখনও আমরা নতুন করে কৃষ্ণযাত্রায় পালার সন্ধান পাই। কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই ধরনের বহু পালা রচনা করেছেন এবং সেগুলি জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল, যার মধ্যে আছে—'নিমাই সন্ন্যাস', 'স্বপ্ন বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'নন্দবিদায়', 'গন্ধর্বমিলন' প্রভৃতি। এ থেকেই বোঝা যাবে সাধারণ লোকসমাজে লোকনাট্যের ধারাটি কতদিন থেকে প্রচলিত ছিল।

ধ. রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটককে এক সঙ্গে আলোচনা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই, তাদের

একই বিভাগে স্থান দেওয়া আরো অর্থহীন। অথচ সাধারণভাবে যে আমরা দুটি শ্রেণীকে একই ধরনের দুটি বিভাগ বলে মনে করি তাই শুধু নয়, সাহিত্য-প্রকরণের কোনো কোনো গ্রন্থে তাদের পৃথক পর্যন্ত না করে আলোচনায় বার বার 'রূপক-সাঙ্কেতিক' নাটক হিসাবে উল্লেখ দেখি। এই বিপর্যয় সাহিত্যালোচনাতেও সংক্রামিত হয়েছে, সেইটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনাতেও একই নাটককে কেউ বলেছেন রূপক, কেউ সাঙ্কেতিক, কেউ তত্ত্ব নাটক। নাটকে তত্ত্ব থাকতেই পারে এবং যখন সেই উদ্দেশ্যমূলকতা নাট্যরসের মতোই প্রধান হয়ে ওঠে তখন তাকে তত্ত্বনাটক বলা যায় না, এমন নয়। কিন্তু একই নাটককে রূপক ও সাঙ্কেতিক, অথবা রূপক-সাঙ্কেতিক বলা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না, অন্তত বললে তা রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অস্পষ্টতাকে প্রমাণ করে।

সাঙ্কেতিক নাটক আসলে একটি আধুনিক নাট্যপ্রকরণ। আগেও হয়তো এর বীজ ছিল, কিন্তু সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী আন্দোলনের পূর্বে এ জাতীয় নাট্যরচনা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের—বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই অবশ্য, এবং নাটকে তা ব্যবহারের জন্য আধুনিকমনস্কতার কোনো প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প থেকে শুরু করে আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যের' আখ্যানগুলি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'তোতাকাহিনী'ও রূপকধর্মী। ইংরেজি সাহিত্যে বুনিয়নের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস', স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন', জোনাথন সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেল্স্' ইত্যাদির সমস্ত রচনাকেই রূপকধর্মী বলা চলতে পারে। রূপকধর্মী রচনা যে কতো প্রাচীন তা বোঝাবার জন্য সমালোচক আব্রাম্স্ ঈশপের গল্প এবং চসারের দু-একটি রচনার নামও করেছেন। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে রূপক ও সাঙ্কেতিক রচনার প্রভেদটি ভালো করে জেনে রাখা দরকার, তাহলে কোনও নাটকের সঠিক শ্রেণী নির্ণয়ে আমাদের অসুবিধা হবে না।

● রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য

প্রথমত, রূপকের কাজ বক্তব্য বিষয়কে গোপন করে তার একটা প্রতিরূপ খাড়া করা। অর্থাৎ রূপক-কাহিনীতে দুটি কাহিনী চলে সমান্তরালভাবে—একটি আপাতকাহিনী, যার অন্তরালে আত্মগোপন করে লেখক দ্বিতীয় কাহিনীটির ওপর বেশি জোর দিতে চান এবং সেটিকে পরিস্ফুট করার জন্যই প্রথম কাহিনীটির পরিকল্পনা করেন। আসলে প্রচ্ছন্ন কাহিনীটিই মূল কাহিনী যেটি বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করার অসুবিধা তাঁর থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রাথমিক ভাবে আমরা পেয়েছি একটি লোভী বাঘের গল্প যে তার নিষ্ঠুর হত্যালীলার স্বপক্ষে বেশ কিছু কথা বলে যায়। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি এর সমান্তর ভাবে লেখক বলতে চান ইংরেজের আগ্রাসী মনোভাব, উদ্যত লোভ এবং পরিকল্পিত শোষণকার্যের কথা। সে কথা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। এই কারণেই অ্যাব্রাম্স্ রূপক বা Allegory-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—
"An allegory is a narrative in which the agents and action, and sometimes the setting as well, are contrived not only to make sense in themselves, but also to signify a second, correlated order of persons, things concepts, or events."

সঙ্কেত বা প্রতীক বলতে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি বুঝি। এই ধরনের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর্থার সিমন্সের অভিমত—"It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority ... in this endeavour to disengage, the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciouness."

এখানেও অবশ্য আপাতকাহিনীটির অন্তরালে অন্য কোনো কথা থাকে, কিন্তু কোনো সমান্তর কাহিনী থাকে না—থাকে একটা অনুভূতি বা অব্যক্ত সংবেদন, যাকে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব বলেই প্রতীকধর্মী একটি কাহিনী লেখককে বেছে নিতে হয়। সাঙ্কেতিক নাটকের কাহিনী স্বাভাবিক কারণেই রূপকের মতো নিটোল হয় না এবং প্রকৃত কাহিনী গোপন রাখার দায়ও তার থাকে না—রহস্যময় ভাবে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকের সাহায্যে তা অব্যক্ত সেই অনুভূতির প্রতি আকর্ষণ করে যে অনির্বচনীয়কে বচনীয় করবার অসম্ভব প্রয়াস থাকে সাঙ্কেতিক কাহিনীর।

দ্বিতীয়ত, রূপক কাহিনী স্পষ্ট বোঝা যায়—যেমন বোঝা যায় তার আপাতকাহিনী তেমনি তার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকে বা অন্যান্য আখ্যানধর্মী সাহিত্যে এই স্পষ্টতা মোটেই থাকে না। তার নেপথ্যে যে অনুভূতি লেখক সঞ্চারিত করতে চান তা বোঝা পাঠকের পক্ষে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে অবশ্য নাট্যকারের কিছু করবার থাকে না, কারণ যে অনুভূতি অত্যন্ত গভীর ও প্রায় অনির্বচনীয়, তাই তিনি প্রকাশ করতে চান। এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি যেমন প্রতীকধর্মী কাহিনী নির্বাচন করেন, তেমনি নীলকণ্ঠ পাখির পালক, লোহার জাল, রক্তকরবী ফুল প্রভৃতি কিছু প্রতীক গ্রহণ করে থাকেন। এই সব প্রতীক এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষার সাহায্যে বক্তব্য পরিবেষণের চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকে না।

তৃতীয়ত, রূপকের আবেদন সম্পূর্ণত বুদ্ধির কাছে, সঙ্কেতের আবেদন বোধের কাছে। এই কারণেই বুদ্ধিমান পাঠক রূপকের দ্বিতীয় কাহিনীর অর্থ খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, কিন্তু যথার্থ অনুভূতিশীল মানুষ ছাড়া সঙ্কেতের রহস্য উদ্ধার করা অথবা লেখকের ব্যঞ্জনার কাছাকাছি পৌঁছোন পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, সমালোচকের পক্ষে রূপক নাটকের অর্থ বিশ্লেষণ করা বা তার ব্যাখ্যা করা মোটামুটি ভাবে সহজ, কারণ বুদ্ধিপ্রধান নাটকের অর্থ মননশীল সমালোচকের পক্ষে বিশ্লেষণ করতে না পারার কোনও কারণ নেই। সাঙ্কেতিক নাটক অনুভূতিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য একদিকে যেমন সমালোচক নিজেই তার রহস্যে বিভ্রান্ত হয়ে যান, অন্যদিকে আর একটা সমস্যাও আছে—একটি গভীর অনুভূতির বিষয়কে যতোটা ভালোভাবে বলা সম্ভব, ঠিক সেইভাবেই উপস্থাপিত করা হয় একটি নাটকে। তাকে এর চেয়ে ভালোভাবে বোঝানো আর সম্ভব নয়—অন্য যে-কোনও ভাবে বোঝাতে গেলে সেই সুন্দর সৃষ্টির তুলনায় তা অসুন্দর হতে থাকে। সেই কারণে রূপকের ব্যাখ্যা আমাদের তৃপ্ত করে, সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যাখ্যা আমাদের সেভাবে সন্তোষ দান করতে পারে না।

পঞ্চমত, রূপক নাটক উদ্দেশ্যমূলক এবং সেই কারণেই রূপকার্থ স্পষ্ট হয়ে গেলেই, অর্থাৎ নাটকটি অর্থবোধকভাবে শেষ হলেই, দর্শক তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি নাট্যকার যা বলতে চান তার অর্থ বুঝতে পারেন এবং তাঁর অন্তরে আর কোনো প্রশ্ন বা অস্বস্তি থাকে না। কিন্তু

সঙ্কেতের ক্ষেত্রে তা হয় না। যে দর্শক গভীর অনুভূতির সাহায্যে নাটকের মূল ব্যঞ্জনার কাছাকাছি উপনীত হতে পারেন তিনি নাট্যকারের গভীর অনুভবের সিংহদ্বারে পৌঁছে যান। এবার নাটকটি সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যে গভীর অনুভূতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন তাঁর তীব্রতা তাঁকে অভিভূত ও এক আনন্দিত অতৃপ্তি দান করে। রূপক ও সঙ্কেতের পার্থক্য বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এখানে সাঙ্কেতিক কাব্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইয়েটসের একটি বক্তব্য উদ্ধার করছি—"A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of the many possible representation of an embodied thing."

● একটি বাংলা রূপক-নাটকের ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্কেত এবং সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা কখনোই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না, কিন্তু নাটকের শ্রেণী বিচার করার সময় মূল প্রবণতা এবং সঠিক প্রকৃতিই লক্ষ করা উচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে, রথ, পথ, রশি প্রভৃতি অনেক সঙ্কেতের ব্যবহার থাকলেও মূলত রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটককে রূপক নাটকের শ্রেণীতেই ফেলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি, অন্তত রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের যে পার্থক্যগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি সেই সূত্রে বিচার করলে।

এমনিতেই 'কালের যাত্রা'-র যা আয়তন তাকে নাটিকা বলাই ভালো। মোট তিনটি অংশে বিচ্ছিন্ন এই নাটকের মূল অংশ প্রথমে সন্নিবিষ্ট 'রথের রশি', দ্বিতীয় অংশ 'কবির দীক্ষা' একটি দীর্ঘ কবিতামাত্র এবং 'রথযাত্রা' 'রথের রশি'-র পুনরাবৃত্তি। 'রথের রশি' অংশের প্রথমেই দেখি রথযাত্রার মেলায় সম্মিলিত মেয়েদের দুশ্চিন্তা, কারণ 'রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।' তাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবার জন্য সন্ন্যাসী এসে বলেন—

"সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।'

মেয়েরা আতঙ্কিত হয়, ব্যাপারটা বোঝে না, মনে করে তারা মেলা দেখতে এসেছে—অথচ পূজো আনে নি, তাই এই অঘটন। তারা ছোটে পূজো আনতে। এরপর নাগরিকরা আসে সেখানে, ঘটনাকে তারা অন্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সন্ন্যাসী এসে তাদেরও ভয় দেখান। মেয়েরা এরপর ফিরে এসে তাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মাদি শুরু করে দেয়। 'দড়ি-নারায়ণ'-কে প্রসন্ন করবার জন্য তাতে ঘি, দুধ, পঞ্চগব্য, গঙ্গাজল ঢালা শুরু হয়। নানা নারী নানা মানতও করে ফেলে। এতেও যখন রথের চাকা নড়ে না, সন্ন্যাসী এসে বলে যান—

'কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।'

এই শুনে 'রাস্তা-ঠাকুর'কে পূজো দিতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেয়েরা।

এরপর আছে সৈনিকরা, তাদের কথায় জানা যায় ব্রাহ্মণের মন্ত্রে রথের চাকা ঘোরে নি, তারপর স্বয়ং রাজাও হাত লাগিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। নাগরিকদের আলোচনায় শোনা যায়, শূদ্রদের বাড় বেড়েছে বলেই এই অঘটন। এক নাগরিকের কাছে জানা যায় এ যুগে 'চলে কেবল স্বর্ণচক্র।' তাই রাজা ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে। সৈনিকরা বিশ্বাস করে না, তাদের হাতে যে রথ চলে না তা চলবে ধনপতির হাতে। ধনপতি আসার আগে আরো একটা খবর পাওয়া যায়, 'নর্মদা-তীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল/দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে।' তাঁর হাত লাগামাত্র 'রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নিচে।' কিন্তু ধনপতিও এসে যখন ব্যর্থ হলেন মন্ত্রী তখন মেয়েদেরই ডাকলেন আবার, যদি তাদের ভক্তির জোরে রথ চলে। সে চেষ্টাও চলে, কিন্তু কোনও কাজ হয় না। তখন চরের মুখে শোনা যায় শূদ্রেরা দলে দলে ছুটে আসছে, রথ নাকি তারাই চালাবে। তারা এসে পড়ে, দলপতির সঙ্গে তর্ক বাধে পুরোহিতের, সৈনিকের, মন্ত্রীর। কেউ তাদের বাধা দিতে পারেন না যখন, তখন সবাই দ্বিধায় জর্জরিত—ওদের আটকানো হবে, না ওদের কাজে সাহায্য করা হবে। এই দ্বিধার মাঝখানেই ওরা হাত দেয় দড়িতে, এবং রথ চলে। কবি আসেন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, বললেন অন্যান্য শ্রেণীর মাথা অত্যন্ত উঁচু ছিল বলেই ঠাকুর এবার নিচুর দিকে ফিরেছেন। তবে এই নিচু শ্রেণী যদি কোনোদিন গর্বে অন্ধ হয়ে মনে করে তারাই চালাচ্ছে রথ, তবে আসবে আবার উল্টোরথের পালা।

এই রথযাত্রার মেলা এবং রথ না চলা উপলক্ষে রাজা, মন্ত্রী, ধনপতি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় রূপকথার মতো যে আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যায়, তার আড়ালে একটি সমান্তর কাহিনী চলেছে। এই নেপথ্য-কাহিনীর মূল সূত্র পাওয়া যাবে কবির ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ তারিখে লেখা শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন—"মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, ... তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসত্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

বেশ বোঝা যায়, সমাজ-প্রগতির মার্কসীয় দৃষ্টির কথাই এখানে দ্বিতীয় সমান্তর কাহিনী হিসাবে অগ্রসর হয়েছে। এই তত্ত্বদর্শনের মূল কথা হল, যে-কোনও সমাজ-সভ্যতার প্রথম অবস্থায় নেতৃত্ব দেন ব্রাহ্মণ্যসমাজ। তাঁদের মন্ত্রতন্ত্র এবং বিধিনিষেধ স্বয়ং নৃপতিও মানতে বাধ্য হতেন। অবশ্য এরপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রে এক ধরনের সামঞ্জস্য দেখা যায়, বা বলা যায় কোথাও কোথাও সামান্য বিরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র রাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজশক্তির সামর্থ্য নির্ভর করে ধনিকশ্রেণীর ধনসঞ্চয়ের ওপর, এ বিষয়ে যখন ধনিকশ্রেণী সচেতন হয় তখন ফিউডাল আধিপত্য ঘুচে সমাজের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণী। কালের রথ দাঁড়িয়ে থাকে না, সে যতোই অগ্রসর হয় ততোই শূদ্রসমাজ বা শ্রমিকসমাজ সংগঠিত হয়, তারা বুঝতে শেখে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফার মৌলিক উপাদান তাদের শ্রম। এই বোধে উদ্দীপ্ত হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর জাগরণ ঘটে এবং সমাজের নেতৃত্ব যায় তাদের হাতে। সমাজ-বিবর্তনের এই সত্য আমাদের সমাজ বলে নয়, পৃথিবীর অনেক সমাজ সম্বন্ধেই সত্য এবং আমাদের সমাজও যে ঠিক এই পথেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে, নাটকে বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।

নাটক আরম্ভ হওয়ার সামান্য পরেই দ্বিতীয় নাগরিকের মুখে শুনি—

'সেদিন নেইরে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।'

এরপর যখন শোনা যায় রাজা নিজেও হাত লাগিয়ে পারেননি চাকা নড়াতে এবং বণিককে ডাকা হয়েছে রথচক্র সচল করতে, প্রথম সৈনিক বলেছে,

'রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।'

তৃতীয় সৈনিক বলেছে—

'এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।'

কিন্তু ধনপতি যখন ব্যর্থ হয়, সর্বনাশের আশঙ্কা তার মনেই সবচেয়ে আগে আসে, সেটাই স্বাভাবিক। সে বলে,

'আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।'

এবং দিয়েওছে তাই। শূদ্রদল ছুটে আসছে শুনে মন্ত্রী সবচেয়ে বুদ্ধিমান সত্যদ্রষ্টার মতো কথা বলেছেন—

'বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।'

শেষ পর্যন্ত ওরাই পেরেছে কালের রথচক্র সচল রাখতে। আমাদের দেশে অবশ্য সে অবস্থার সৃষ্টি এখনো হয়নি, বণিক সভ্যতার অগ্রগতিকেই আমরা দেখেছি। কিন্তু শ্রমজীবীর মধ্যে চেতনার লক্ষণ ধীরে ধীরে যে ভাবে দেখা দিচ্ছে তাতে সামাজিক এই বিবর্তনও অসম্ভব নয় বলেই আমাদের মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে ভাববাদী ও সৌন্দর্যবাদী কবি হয়ে এই বস্তুবাদী চিন্তার সঙ্গে কেমন করে পরিচিত হয়েছিলেন ও তাকে নিজের শিল্পকীর্তির সত্য করে নিয়েছিলেন, এই চিন্তা আমাদের বিস্মিত করে, তবে আমরা অভিভূত হবো এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। শ্রমজীবী মানুষ সমাজের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিলেই সমাজের বিবর্তন বন্ধ হয়ে যায় না, সে দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। কালের প্রবাহে অধিকারের খাতবদল হয়, কিন্তু সমাজে মানববন্ধন থাকলে সে কালের রথ এমনিই চলে—অধিকার যার হাতে সে যখন ভাবে আমিই চালক, অনর্থ তখনই ঘটে। শ্রমীজীবী মানুষের হাতেও এ অনর্থ ঘটবে—

'একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।'

অন্তত এই চিৎকৃত ভাষণগুলি আমাদের দেশে এবং আমাদের কালে কারো কারো শোনা বলে মনে হতে পারে, যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আজ থেকে অনেক বছর আগে। তবে শ্রমিক

শ্রেণীর আধিপত্য বাড়াবাড়ি শুরু করলে 'উল্টোরথের পালা' আসবে অর্থাৎ ফিউডাল শাসন আবার ফিরে আসবে—এমন কথা কিন্তু মার্কস বলেন নি।

এবার রূপক-সাঙ্কেতিকের লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো, প্রথমত, একটা মোটামুটি স্পষ্ট প্রতিরূপ এই আখ্যানের আছে, মানে এই রূপকথাসুলভ আপাতকাহিনীর।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই কাহিনী এবং নেপথ্যকাহিনীর ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমাদের বিশেষ বেগ বেতে হয় না, যদিও দড়ি, রাস্তা, পথ, গর্ত প্রভৃতিকে প্রায় সঙ্কেতের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে, এই বায়বীয় নাটকে নারী চরিত্রগুলিই জীবন্ত এবং বাস্তব। তারা যে আচার-অনুষ্ঠানকেই ভক্তি বলে মনে করে, সংস্কারকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে, এই ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ওই বস্তুগুলির ব্যবহার, প্রতীক হিসাবে ততোটা নয়।

তৃতীয়ত, এই নাটকের আবেদন যতোটা না হৃদয়ের কাছে, ততোটা বুদ্ধির কাছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথের অতিবড়ো ভক্ত-সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না।

চতুর্থত, রূপক নাটক বলেই 'কালের যাত্রা' অথবা আরো সঠিক অর্থে 'রথের রশি' নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর দর্শক বা পাঠকের কাছে সরলতর ও সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যাখ্যা নাটককে এতো প্রাঞ্জল করতে পারে না।

পঞ্চমত, নাটক সমাপ্ত করে যে তৃপ্তি আমরা পাই, তাও প্রমাণ করে এই নাটকের শ্রেণী রূপকই, সাঙ্কেতিক নয়।

● একটি বাংলা সাঙ্কেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'কে আমরা বিশ্লেষণের জন্য গ্রহণ করতে পারি। রূপক, সাঙ্কেতিক অথবা তত্ত্বনাটক—নাটকের কোন্ শ্রেণীতে এর স্থান হতে পারে, এ বিষয়ে সুধী পণ্ডিতদের মধ্যেই মতভেদ আছে। আমরা এই নাটককে সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবেই চিহ্নিত করতে চাই এবং কেন তা চাই তার কারণগুলি অবশ্যই উল্লেখ করবো কিন্তু তার আগে পুনর্বার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক ও তত্ত্ব অনেক সময়ই এমন ভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে যে তাঁর সাঙ্কেতিক নাটককেও আমরা পুরোপুরি রূপকবর্জিত বা তত্ত্বনিরপেক্ষ হয়তো বলতে পারি না। আসলে নাটকে কোন ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে এবং রসপরিণতিতে তা ঠিক কী ধরনের আবেদন সৃষ্টি করেছে সেটাই প্রধান কথা।

'রক্তকরবী' নাটকের দৃশ্যপট একটিই—মাটির তলায় শ্রমিকরা সোনা খননের কাজে যেখানে নিযুক্ত আছে, সেই যক্ষপুরী। এর কালসীমা সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই এবং সেই কারণেই এ নাটকে কালের মাত্রা যে এক অভিনব ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ বিষয়ে কবি-সমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের অনেকেরই পড়া আছে। নাটকের কাহিনী বলতে সঠিক ভাবে কিছু নেই, অন্তত প্রথাগত ভাবে যাকে আমরা নাট্যকাহিনী বলে থাকি। যে কাহিনীটুকু আছে তাতেও রহস্যময়তা প্রচুর। যক্ষপুরীতে যারা কাজ করেছে তারা যে এককালে মাটির ওপরে ফসল ফলাতো, অর্থাৎ তারা কৃষক, এ কথা বোঝা যায়। অবশ্য এখন নামটাম ভুলে তারা অনেকেই পরিণত হয়েছে সংখ্যায়। সোনার মাদকতায় ভুলিয়ে, ধর্মের নেশা ধরিয়ে তাদের যন্ত্রের মতো কাজ করানো হয়; কিন্তু সামান্য কেউ কেউ এর মধ্যে

ব্যতিক্রম—যেমন ৬৯৬ সংখ্যাধারী বিশু পাগল। সে তার দুঃখসাধনার কথা ভুলতে পারে না। যক্ষপুরীতে ঢুকেছে প্রাণময়ী এক নারী, নন্দিনী। যক্ষপুরীর রাজা, যিনি জালের আড়ালে থেকে নিষ্প্রাণ দৃঢ়তায় যক্ষপুরীর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করেন, তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করাই 'ঈশানী পাড়ার' নন্দিনীর ব্রত। সে জানে এ কাজে সে সহায়তা পাবে রঞ্জনের, সে যে যক্ষপুরীতে ঢুকে পড়েছে—এই খবর তার জানা আছে। নাটকের একেবারে শেষে রাজা নিজেই জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখা যায় জালের মধ্যে মৃত রঞ্জন পড়ে আছে। রাজা বুঝতে পারেন নিজের ভুল, বলেন—"আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি।" তারপর আমরা দেখি নিজের বিরুদ্ধে নিজেই লড়াই করবার জন্য ধ্বজা ভেঙে ফেলে রাজা পথে বেরিয়ে পড়েছেন।

কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত আভাস থেকেই বুঝতে পারা যাবে, এখানে সমান্তরাল কাহিনীর প্রশ্ন দূরে থাক, ঠিকমতো বলতে গেলে আপাতগ্রাহ্য কোনও বাইরের কাহিনীই গড়ে ওঠেনি। নন্দিনী কেন যক্ষপুরীতে আসে, রঞ্জন তার সঠিকভাবে কে হয়, রাজার এই জাল ছিন্ন করা এবং তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার দায়িত্ব সে কেন নেয়, যক্ষপুরীর প্রায় প্রত্যেকটি শ্রমিককেই সে কেন চেনে, যক্ষপুরীর ভেতরে বসে সে বার বার ফসলকাটার গান কেন গায়, এ সব কিছুই আমাদের কাছে রহস্য হয়েই থাকে। এর কাহিনী আমাদের অনেক কিছুর দিকে ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায় বটে, কিন্তু স্পষ্ট করে যেন কিছুই বলে না। এই সুস্পষ্ট আপাতকাহিনীর অভাব ও সমান্তর দ্বিতীয় কাহিনীর অভাব একদিকে যেমন রূপক নাটক হিসাবে একে অভিহিত করবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে এর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে—কারণ এমন এক রহস্যময়তা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যাতে লেখকের অনির্বচনীয় এক অনুভব এর মধ্য থেকে আভাসিত হয় অথচ সঠিকভাবে ধরা দেয় না। একেই যে সঙ্কেতের প্রাণ বলা যায়, সিমেন্সের পূর্বোল্লিখিত মন্তব্য স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়ত, রক্তকরবীর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা যায় না, বেশি ব্যাখ্যা করতে গেলে এর সৌন্দর্যহানি ঘটবে মনে করেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গেলে অনর্থ ঘটবে। তিনি শুধু মনে রাখতে বলেছেন, এটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। গল্পাংশ এখানে নিটোল হয়নি তা নিটোল করা সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু রক্তকরবীর মঞ্জরী, জালের আবরণ, ধ্বজাপূজার ধ্বজা ইত্যাদি প্রতীক এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যে যায় না, এই সত্যই ইঙ্গিত করে এটি সাঙ্কেতিক নাটক হতে পারে।

তৃতীয়ত, এ কথা মেনে উপায় নেই যে, 'রক্তকরবী' নাটকের যদি কোনও আবেদন থাকে তবে তা হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। বার বার পাঠ করলে বা একটি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠে আমরা এর ব্যঞ্জনা বা গভীর অর্থের কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পারি কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এর কাছে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়।

চতুর্থত, 'রক্তকরবী' নাটক ব্যাখ্যা করার অনেক চেষ্টা সমালোচকগণ করেছেন। কেউ বলেছেন আমেরিকার ধনতন্ত্রের স্বরূপ দেখে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ বলেছেন এই নাটকে আমরা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এক কল্পিত চেহারা দেখতে পাই—এ ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়েই কবি এ নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে এই নাটক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন—কখনো বলেছেন এটি কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব, কখনো বলেছেন এটি আসলে রামায়ণেরই আধুনিক রূপ, এই নাটকের রাজা এক দেহে রাম ও রাবণ। এই নাটককে মানবিক সংকট এবং মানবিক ভাবনার নাটক হিসাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই নাটকের পক্ষে একটি মানবিক ব্যাখ্যাই সংগত। কিন্তু বিভিন্ন সমালোচক যে বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন, কেউ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন না এবং আমরা কোনো ব্যাখ্যাতেই যেন নাটকের নিহিতার্থ সম্পূর্ণ করে পাই না, রবীন্দ্রনাথ যে বারবার এই নাটকের ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেন, আমরা যতো ব্যাখ্যা করি ততোই নাটকের প্রকাশিত রূপের চেয়ে তা অসুন্দর হয়ে পড়ে—এই যাবতীয় ঘটনাই প্রমাণ করে এই নাটকের প্রকৃতি সাঙ্কেতিক, রূপক নয়।

পঞ্চমত, এই নাটক সমাপ্ত করার পর পরম তৃপ্তিতে আমরা সমাচ্ছন্ন হতে পারি না। রাজা কেমনভাবে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যোগ দিতে চলে যান, সবাই শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয়ধ্বনি দেয় কেন, নন্দিনীর কাজ সমাপ্ত করবার জন্য বিশু পাগল তার রক্তকরবীর কঙ্কন কেন হাতে তুলে নেয়—তার গভীর ব্যঞ্জনা আমাদের মনের মধ্যে গিয়ে বাজতে থাকে, কিন্তু রূপকের মতো স্বচ্ছ ব্যাখ্যায় তা আমাদের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না। তাই আমরা বুঝতে পারি এ নাটক আরো বহুদিন আমাদের মনোরম অতৃপ্তিতে ভরিয়ে রাখবে—বিশু পাগলকে তার দুখজাগানিয়া যেমন জাগিয়ে রেখেছিল, এ নাটক আমাদের জাগিয়ে রাখে। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করে একে সাঙ্কেতিক নাটক বলা ছাড়া কোনও উপায় নেই বলেই আমাদের মনে হয়।

ন. নৃত্যনাট্য

নাটকের সঙ্গে নৃত্য বা সংগীত নাট্যসৃষ্টির আদিযুগেই দেখা যায়, কিন্তু নৃত্যনাট্য বা Dance-drama বলতে যে বিশেষ ধরনের নাটককে বোঝানো হয় তার উদ্ভব আধুনিক কালেই এবং প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথই তার স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সেই এই বিশেষ ধরনের নাটকের প্রবর্তন করেন। নিজেরই লেখা কিছু পদ্য-আখ্যান এবং নাট্যকাব্যকে তিনি নৃত্যনাটে রূপান্তরিত করেন।

এই ধরনের নাটকের বৈশিষ্ট্য কী, সাধারণ বুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়। নাটকে নৃত্যের সঙ্গে সংগীত এবং সংলাপ থাকবেই, থাকাটা অন্তত স্বাভাবিক কিন্তু নৃত্যই এই ধরনের নাটকের প্রধান অঙ্গ। ফলে এই নাটকের বোধগম্যতা ও রসগ্রহণ করার ক্ষমতা ব্যাপকতর দর্শকের কাছে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ভাষা এখানেই খুব বড়ো বাধা হয়ে থাকেনা। এর সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি :

বিভিন্ন ধরনের নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করে আদ্যন্ত তাদের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি অখন্ডভাব দর্শকমনে সঞ্চারিত করাই যে নাটকের উদ্দেশ্য তাকে বলে নৃত্যনাট্য।

এবার এই জাতীয় নাটক সম্বন্ধে বিভিন্ন শিল্পী ও সুধী সমালোচক যা বলেছেন তার

সাহায্যে এর প্রকৃতি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন (চৈত্র সংখ্যা, ১৩৪৩)। সেই আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করলে আমরা নৃত্যনাট্যের কিছু লক্ষণ জানতে পারবো— 'নৃত্যনাট্যের কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করেনা, তার ভাষা হল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহ রেখায়। এই রেখার খেলামাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্য পটভূমিকা দরকার হয় রঙ্ ও আলো। এই রঙ্ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষত যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোন অবান্তর ভঙ্গী তালের সঙ্গে ভঙ্গীর, সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতালাভ করতে পারেনা। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকম পার্থক্য।'

কবিতা এবং গদ্যের তফাৎটা মূলগত নয়, আমরা জানি, কারণ কবিতা এখন গদ্য মাধ্যমেও লেখা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র নৃত্যের রেখা ও তাল দিয়ে নাটক সৃষ্টি হওয়া শক্ত, কারণ নাট্যক্রিয়ার প্রধান কথাই হচ্ছে একটি দ্বন্দ্ব প্রকাশ করা, সেটি নৃত্য-ক্রিয়ার মূল কথা নয়। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ নৃত্য-নাট্যেই গ্রহণ করেছেন এক-একটি কাব্য-নাট্যকে যার মধ্যে নাট্যিক দ্বন্দ্ব আছে এবং নৃত্যের দ্বারা দেহের ভাষাকে যথাসম্ভব কাজে লাগালেও তার সংলাপের অংশকে মোটেই উপেক্ষা করেন নি। যে ভাব নিয়ে নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করা হবে তার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব থাকতেই হবে, নতুবা কোনোরকম নাটকের জন্যই তাকে নির্বাচিত করা যাবেনা। কিন্তু কাব্যনাট্যের জন্য যখন কোনো ভাব বা বক্তব্য গ্রহণ করা হয় তখন তার অনুভূতির দিকটা আরো গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। এবার সেই কাব্যনাট্য যখন অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার কথা চিন্তা করা হয়, তখন সংলাপের অংশে যদি সুর সংযোজন করা হয়, তবে কথা যতটা প্রকাশ করতে পারেনা, ততটাও সে প্রকাশ করতে পারবে, অর্থাৎ নৃত্য যদি তার সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে আরও একটা মাত্রা বৃদ্ধি হয়—অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশ করার প্রায় সর্বাত্মক সুযোগ গ্রহণ করা হয়।

এই কথাটাই বিভিন্ন আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন। এই নৃত্য-নাট্যগুলি ভাবা রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গদ্যকবিতার ভাষায়। নতুন গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন বটে, কিন্তু নৃত্যনাট্যে আগেকার লেখা অনেক গানও সংযোজিত হয়েছে। এমনও হয়েছে যে আগে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয় নিয়ে কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন, শেষ বয়সে অনেক আগেই এটি রচিত হয়েছিল। এর বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি একে নৃত্যনাট্যে পরিণত করলেন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য বলা চলে, 'চিত্রাঙ্গদা'-কে। অবশ্য সংখ্যায় খুব বেশি নৃত্যনাট্য তিনি রচনা করেনও নি। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনা করা দু বছর পর লেখেন 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।' এটিও আগে তিনি নাটকের আকরেই লিখেছিলেন। নৃত্যনাট্যে পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন কিছু রবীন্দ্রনাথ করেননি। তুলনামূলক বিচারে বলা যায় 'চণ্ডালিকা' বিষয় হিসাবে নৃত্যনাট্যের আরো উপযোগী। নাটকীয়তাও এখানে অত্যন্ত বেশি। চণ্ডালের কন্যা নিজেকে অন্ত্যজ জানতো, সেইভাবে সকলের কাছে হীনভাবে গৃহীত হবে, এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ যখন তাকে বোঝালেন 'যে মানব তুমি সেই মানব আমি কন্যা' এবং তার হাতের জল খেলেন, তখন তার মধ্যে মানবী জেগে উঠল। কিন্তু

আনন্দ তাকে ছেড়ে চলে গেলেন, এটা সহ্য হল না বলে মাকে পাইয়ে মন্ত্র পড়িয়ে সেই আনন্দকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল চণ্ডালিকা। এভাবে কাউকে যে পাওয়া যায় না, সে শিক্ষাও তার হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। এর কাহিনী তিনি পেয়েছিলেন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবস্তুবদানে'। এই বিষয় নিয়ে 'পরিশোধ' নামে একটি কাহিনী কবিতাও তিনি লেখেন আগে। 'শ্যামা'-র বিষয়বস্তু বেশ নাটকীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু বেশি নাটকীয় বলেই তা নৃত্যনাট্যের কতখানি উপযোগী, অর্থাৎ তাতে বস্তুভার বেড়ে গিয়েছে কিনা, এ প্রশ্ন কিছু সমালোচকের মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে কিন্তু এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে করেছেন—'এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্ট রূপে বানানো হয়নি—গানে তারা বাধা দিয়েছে—চারিদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারেনি যা কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত, আকস্মিক। অথচ জগতের সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন আবর্জনা; তাদের সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বেআইনী বিধি মানাতে মন বাধছে। অন্তত গানে একথা ভাবতেই পারিনে।'

[চৈত্র, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ]

প. শ্রুতি নাটক ও বেতার নাটক

নাটককে সংস্কৃত আলংকারিকগণ আখ্যা দিয়েছেন 'দৃশ্যকাব্য', কারণ দৃশ্যত্ব অর্থাৎ মঞ্চে তার দৃশ্যরূপ দেখানো সম্ভব এবং দৃশ্যময় অভিনয়ের ওপর তার রসগ্রহণ নির্ভরশীল। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির ছটি অঙ্গ নির্দেশ করার সময়ও তার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন তার Spectacle-এর অর্থাৎ দৃশ্যত্বের। কাজেই এই দৃশ্যত্ব বাদ দিয়ে নাটকের অভিনয়ের কথা দীর্ঘদিন ভাবা যায় নি। আধুনিক কালে তার এই দৃশ্যত্ব বাদ দিয়ে, অর্থাৎ সজ্জিত রঙ্গমঞ্চ এবং চরিত্রানুযায়ী অভিনেতাদের মেক-আপ বাদ দিয়ে, তাকে পুরোপুরি শ্রাব্য করে তোলা হয়েছে। এই ধরনের শ্রাব্য নাটক অর্থাৎ যার অভিনয় কানে শোনা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না, তাকেই বলা হয় শ্রুতি নাটক। সুতরাং এক কথায় বলা যেতে পারে, কেবল শ্রুতির মাধ্যমে যে নাটকের রসগ্রহণ সম্ভব তাকেই বলা যায় শ্রুতি নাটক।

শ্রুতির মাধ্যমেও যে নাটকের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব তার কারণ, দৃশ্যত্ব নাটকের অন্যতম প্রধান গুণ হলেও একমাত্র গুণ বা শর্ত নয়। নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে তার আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর—প্রথমত, একে বলা হয়েছে 'উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ' এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এটি তন্ময় সাহিত্য। প্রথমটি যদিও আকৃতির সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত তবু একে পুরোপুরি আকারগত বৈশিষ্ট্যও বলা যায় না। নাটকের বস্তুধর্মিতা যদি বজায় রাখা যায় তাহলে কেবলমাত্র শ্রুতিনির্ভর নাটককেও আমরা নাটক বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য সাহিত্য-প্রকরণের থেকে নাটককে পৃথক করতে গিয়ে বলেছিলেন বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নাটককে। শ্রুতি নাটকে বাক্য আমরা অভিনয়ের মাধ্যমেই শুনতে পাই, যেটুকু পাই না তা দৃশ্যসজ্জা এবং পাত্র-পাত্রীর আচরণ। এর মধ্যে দৃশ্যসজ্জা বাদ দিয়েও যে এই জাতীয়

পালার রসগ্রহণ সম্ভব, আমাদের পুরনো যাত্রাপালা থেকেই সে কথা বোঝা যাবে। আমরা যাত্রার আসরে চারদিক খোলা মঞ্চে যেভাবে বিভিন্ন দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারি, সেভাবে কানে শুনে পাত্র-পাত্রীকে উপযুক্ত মেক-আপে ভেবে নিতেও পারি। তাদের আচার-আচরণ আমরা দেখতে পাই না ঠিকই, কিন্তু শ্রুতি নাটকে তারও কিছু ব্যবস্থা আছে।

ক্রিয়া সংঘটিত হলে কিছু শব্দ হয়, বিশেষ দৃশ্যপটেরও বিশেষ কিছু শব্দ আছে। চলতে গেলে এক রকমের শব্দ হয়, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে অন্য ধরনের শব্দ হয়। আবার নদীর ধারে, স্টিমার বোটে, রেলগাড়িতে বিভিন্ন রকমের শব্দ হয়। শ্রুতি নাটকে এই বিভিন্ন ধরনের শব্দানুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়। ফলে একদিকে যেমন পাত্র-পাত্রীকে চোখে না দেখা এবং মঞ্চসজ্জা দেখতে না পাওয়ার অভাবটা ঢাকা পড়ে যায়, অন্যদিকে একটা সুবিধাও পাওয়া যায়। নাটকের কালগত ও স্থানগত ঐক্য এখানে মেনে চলার কোনও প্রয়োজন হয় না। 'আজ থেকে কুড়ি বছর পরে' শুনিয়ে দিয়ে ঘটনাকালকে আমরা অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যতোটা খুশি। আবার 'ওঃ, কালই তো এই সময় দিল্লী' সংলাপ শুনিয়ে একটু ট্রেনের শব্দের রেকর্ড বাজিয়ে আমরা দিল্লীতে অন্য নাট্যদৃশ্য শুরু করতে পারি। কাজেই শ্রুতি নাটকে দুটি ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—মাইক্রোফোনে কণ্ঠস্বরের ব্যবহার এবং ক্রিয়া এবং দৃশ্যাদি বোঝাবার জন্য ধ্বনি প্রক্ষেপণ। ক্রিয়াকলাপ বাদ দিয়ে শুধু কণ্ঠস্বর শোনা যায় বলে কণ্ঠস্বর কী-ভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা শ্রুতি নাটকের পক্ষে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন এবং ওঠানামা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মডিউলেশন', এই বিদ্যা শিক্ষা শ্রুতি নাটক অভিনয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রুতি নাটকে যেহেতু কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন এবং ধ্বনি প্রক্ষেপণই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, এই ধরনের নাটক যাঁরা লিখছেন তাঁরাও এ দিকে বেশি জোর দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রী যাতে মডিউলেশনের সুযোগ বেশি পান সেদিকে যেমন তাঁরা সতর্ক থাকেন, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করা যেতে পারে এই রকম পরিস্থিতি তাঁরা পছন্দ করেন' বেশি। ফলে শ্রুতিনাটক নামে ভিন্ন একটি শ্রেণীর নাটক এখন গড়ে উঠছে।

শ্রুতি নাটকে যেহেতু শুধুমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়কেই কাজে লাগানো হয়, এর সময়সীমা মিনিট কুড়ির বেশি হলে শ্রোতার আগ্রহ ধরে রাখা খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য শ্রুতি নাটকের সময়সীমা হওয়া উচিত ঊর্ধ্বপক্ষে আধ ঘণ্টা—অন্যথা শ্রুতি নাটক হিসাবে তার আকর্ষণ জিইয়ে রাখা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

● শ্রুতি নাটক ও বেতার নাটকের পার্থক্য

বেতার-নাটকের প্রচলন যদিও শ্রুতি নাটকের অনেক আগে থেকে, গোত্র বিচার করতে গেলে একেও শ্রুতি নাটকই বলতে হবে; অর্থাৎ শ্রুতিনাটক কথাটা যখন প্রচলিতই হয়নি, বেতার-নাটক তখনকার শ্রুতি নাটক। অবশ্য তাই বলে শ্রুতি নাটক এবং বেতার নাটকের যে পার্থক্য নেই এমন নয়। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে, বেতার নাটকে আমরা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ ইত্যাদি অভিনীত হতে দেখেছি, দূরদর্শনের সিরিয়ালের মতো ধারাবাহিক বেতার নাটক প্রযোজনাও অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে, কিন্তু শ্রুতি নাটকের অভিনয় কখনোই

দীর্ঘ সময় ধরে হতে পারে না। দ্বিতীয় পার্থক্যটি প্রয়োগগত। বেতার নাটককে চলচ্চিত্রের মতো বার বার রেকর্ডিং করার, ডাবিং করার, শব্দ পুনর্যোজনা করা.্র যেসব সুবিধা আছে তাতে এর প্রযোজনা অনেক উচ্চস্তরের করা সম্ভব, শ্রুতি নাটকে সেই সুবিধা নেই।

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে এই ধরনের নাটক সম্প্রচারের কথা প্রথম ভাবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যাঁর আকাশবাণী কেন্দ্রের মহালয়া-অনুষ্ঠানের ভাষ্যপাঠ এখন প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাই বেতার নাটক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, এ দুটি নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

যে নাটক চোখে দেখা যায় না, কেবল কানে শোনা যায়, তা শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু নাটককে পুরোপুরি শ্রুতির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এর একটা শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ দেওয়ার কথা ভাবেন, এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করবার জন্য ছিলেন বাণীকুমার ও শ্রীধর ভট্টাচার্য। এই ভাবে তিনিই বেতার-নাট্যরূপ রচনা করান এবং আকাশবাণীতে অভিনয় করান।

বর্তমানে দূরদর্শনের আধিপত্যের জন্য বেতার-নাটকের আকর্ষণ কম হলেও প্রথম যখন এই নাটক প্রচার শুরু হয় তখন শ্রোতাদের মধ্যে এই নাটক শোনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় এক ঘণ্টা ধরে এই নাটক সম্প্রচার করা হতো। বেতারযন্ত্র সকলের বাড়ি না থাকায় অন্তত এই সময়টির জন্য সম্পন্ন বাড়িতে অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। সকলকে এই সাপ্তাহিক বেতার-নাটক শোনবার আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁদের বসবার ব্যবস্থা করাও এক ধরনের আভিজাত্য হিসাবে গণ্য হতো।

সাধারণত বিখ্যাত নাটক বা বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসের বেতার-নাট্যরূপই আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হতো। একদিকে যেমন 'সাজাহান', 'প্রফুল্ল', 'মহারাজা নন্দকুমার' প্রভৃতি নাটকের বেতার রূপ অভিনীত হতো, অন্যদিকে 'তটিনীর বিচার', 'কানু কহে রাই' বা রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প নাটক হিসাবে প্রচার করা হয়েছে। বেতার-নাটকের অতি সফল নাট্যকার ছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। তাঁর 'মাটির ঘর' থেকে শুরু করে 'তাহার নামটি রঞ্জনা' পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল; অবশ্য তাঁর মঞ্চনাটকও কম জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

পরবর্তীকালে আকাশবাণীর বেতার-নাটক জনপ্রিয়তার জন্যই সপ্তাহে একাধিক করবার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া সম্ভবত একদিন দিল্লী থেকে প্রচারিত অখিল ভারতীয় কার্যক্রমেও নাটক শোনা যেতো। আকাশবাণীর অন্যান্য সফল নাট্য-প্রযোজকদের মধ্যে আছেন শ্রীসূর্য সরকার, শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজগন্নাথ বসু, শ্রীবিশ্বনাথ দাশ, শ্রীসুভাষ দাশ প্রমুখ। আকাশবাণী কেন্দ্রের বার্ষিক বেতারনাট্য প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সফল নাট্য-প্রযোজক শ্রীসমরেশ ঘোষ। এ পর্যন্ত তিনি চারবার এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছেন।

বেতার নাটক উন্নতধরনের শ্রুতিনাটক, একথা মনে রাখলে শ্রুতি নাটক সম্বন্ধে যেসব কথা নাট্যকারকে স্মরণ রাখতে হয়, বেতার-নাটকেও তা মনে রাখতে হবে। একেবারে বেতারে প্রযোজিত হবে বলেই এ ধরনের নাটক লেখা হতে পারে আবার কোনো জনপ্রিয় উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ রচনাও করা যেতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই নাট্যকারকে যেটা মনে রাখতে হবে সে কথাগুলো হচ্ছে এই :

১) চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা, সবটাই কানে শুনে বুঝতে হচ্ছে—এটা সর্বদা খেয়াল

রাখতে হবে। ফলে 'এরকম তো হবেই' গোছের কিছু ধরে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। নাটক যিনি শুনছেন, ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য হল কিনা এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, একটা সিগারেট ধরানো হচ্ছে হয়তো দুটো কাঠি নিবে যাওয়ার পর তৃতীয় কাঠিতে। যেক্ষেত্রে তিনবার দেশলাইটের কাঠি ঘষার, শব্দতো শোনাতেই হবে, কিন্তু দুটো শব্দের পর একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ('হুস্' কিম্বা 'ধ্যাৎ') থাকলে ভালো।

২) শুধু গলা শুনিয়ে চরিত্র চেনাতে হয় বলে চরিত্রের সংখ্যা যত কম হয় তত ভালো, শ্রোতা তত ভালো নাটকটাকে ধরতে পারেন। 'চরিত্র' বেশি হলে কথাটা কে বলছে সেটা বোঝা মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে উঠতে পারে।

৩) মঞ্চনাটকে বড়ো সংলাপ চলতে পারে, বেতারনাটকে কাটা কাটা সংলাপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিতান্ত কোনো সংলাপ বড়ো হলে মাঝে মাঝে অন্য চরিত্রের প্রতিক্রিয়া থাকা ভালো।

৪) যেহেতু কানে শুনিয়ে বোঝাতে হয় গোটা ব্যাপার, যিনি প্রযোজক তিনি তো সচেতন থাকবেনই, কিন্তু নাট্যকারকেও সংলাপে ও চরিত্রের প্রতিক্রিয়া-প্রকাশক নির্দেশে তৎপর থাকতে হবে। যেমন খুব অবাক হয়ে একজন আর একজনের কথা শুনছে, এটা মঞ্চে দেখানো যায়, কিন্তু বোবার-নাটকে এটা কথা শুনিয়েই বোঝাতে হবে, যেমন—'বাপরে! মুখের হাঁ-টা বন্ধ কর এবার।' কিম্বা হয়তো বিরাট বস্তা কেউ টেনে আনছে, সেখানে সংলাপের আগে এমন নির্দেশ থাকতেই হবে—'খুব ভারি জিনিস টেনে আনছে, এমন ভঙ্গিতে'।

৫) পুনরুক্তি বর্জন করতেই হবে। মঞ্চ নাটকে এককথা একাধিক বার দর্শক মেনে নেন, কিন্তু বেতার-নাটকে কান অত্যন্ত সচেতন থাকে বলে একবার বলা কথা দ্বিতীয়বার বললেই শ্রোতা বিরক্ত হতে পারেন।

৬) সবশেষ কথা উচ্চারণ। আকাশবাণীতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অবশ্য এ বিষয়ে সবাই সচেতন, কিন্তু বেতার নাটক যাঁরা করেন তো অনেকেই আকাশবাণীর কর্মী নন। মঞ্চ নাটকে অভিব্যক্তির জন্য অনেক সময় কিছু কথা হয়তো জড়িয়ে যায়, কিন্তু বেতার-নাটকে প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেতার নাটকের প্রযোজনাকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে কোনও শব্দের উচ্চারণ যাতে জড়িয়ে না যায় বা শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা না হয়।

নাটকের প্রকরণগত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে আর এক ধরনের নাটকের কথা না বললে, সেটি হল দূরদর্শনের নাটক। সিরিয়াল বা মেগা সিরিয়াল নাম দিয়ে দীর্ঘকাল যে সব দূরদর্শন নাটকের সম্প্রচার চলছে তাকে অবশ্যই নাটকের আওতায় এনে লাভ নেই, বস্তুত তাকে ঠিক কী জাতীয় শিল্প বলা হবে তা নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় থাকা স্বাভাবিক। তবে দূরদর্শনের নিজস্ব প্রযোজনায় যে সব নাটক প্রচারিত হয়েছিল, সাধারণভাবে যাদের বলা হয় টেলিফিল্ম বা টেলি প্লে, সেটাকেই একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা দরকার। স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রশ্ন ওঠে এই কারণেই যে, একদিকে দেখতে গেলে এদের চলচ্চিত্র বা ফিল্ম বলাই সঙ্গত, কারণ বস্তুতই এগুলি চলচ্চিত্র—সচল ক্যামেরায় তোলা সেলুলয়েডে গৃহীত চলমান ছবি। কিন্তু পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং বড় পর্দার ছবির যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তা এখানে সবটা রক্ষিত হয় না, এবং নাটকের বৈশিষ্ট্যই থাকে এখানে বেশি—নাটকের মতোই এখানে খুব অল্প সেট থাকে, দৃশ্যগ্রহণ একটু দীর্ঘ হয়, অভিনয়-কাল সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। এককথায় একটি

মঞ্চাভিনয় চিত্রায়িত করলে যেমন দেখাতে পারে প্রায় সেই ধরনের প্রতীতিই এসব ছবিতে ফুটে ওঠে। কোনো ক্যামেরা একই দূরত্ব থেকে দৃশ্যগুলি না দেখিয়ে দূরে, মাঝামাঝি বা কাছে থেকে, অর্থাৎ ছবি ছোট, মাঝারি বা বড়ো করে দেখিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে।

কলকাতা দূরদর্শনের যে টেলিফিল্মগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলির কয়েকটি হল 'অপূর্ণ', 'লোনা স্বাদ', 'মুখগুলি', 'শেষ দেখা হয় নাই', 'সীমানা' এবং 'আশ্রয়'। টেলিফিল্মের বিশিষ্ট প্রযোজকদের মধ্যে আছেন রাজা সেন, রাজা দাশগুপ্ত, সন্দীপ রায়, কল্যাণ ঘোষ প্রভৃতি।

সংহত আকারের জন্য টেলি প্লে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে, বাংলার মতো বা হিন্দীভাষাতেও অনেক টেলি প্লে দূরদর্শনে প্রচারিত হয় এবং তাদের মান বেশ উন্নত।

ফ. আন্দোলনে উদ্ভূত কিছু বিশিষ্ট শ্রেণী

সাঙ্কেতিক নাটককে সঠিকভাবে আন্দোলনভিত্তিক নাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত মনে করাই সংগত হতো বোধহয়। বাস্তববাদী নাটকের স্থূল বাস্তবকে অনুসরণের প্রতিক্রিয়াতেই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্ভব ঘটেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে ইয়েট্‌স, জার্মান নাট্যকার হাউপ্ট মান এবং কিছু আইরিশ নাট্যকারের অবদান এক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্য নিছক গদ্য ভাষায় নাটক লিখেও যে সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ আনতে পেরেছিলেন তাতে সাঙ্কেতিক নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদানকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে।

বাস্তবতাবাদী নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। আবেগের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশি আশ্রয় করা, ব্যস্তব সংসারকে সাহিত্যের বৃত্তে নিয়ে আসা এবং সামাজিক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া বাস্তববাদী নাট্য-আন্দোলনের কয়েকটি প্রধান দিক। দার্শনিক পরিমণ্ডলে উদ্ভূত এই আন্দোলন সাহিত্যজগতে আসে প্রধানত গুস্তাভ ফ্লবেয়রের 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসের মাধ্যমে, পরে ইবসনের 'দি ডল্‌স হাউস', ইউজিন ও নীলের নাটক এবং অবশ্যই বার্নার্ড শ-এর অবিস্মরণীয় নাটক এই ধারায় রচিত হয়।

আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত নাটকের মধ্যে **ক্ল্যাসিক নাটকের** নাম আমরা করতে পারি, যার মধ্যে স্পষ্ট দুটি উপবিভাগ করা যেতে পারে, প্রাচীন ক্ল্যাসিক নাটক এবং নব্য ক্ল্যাসিক নাটক। সব রকম নিয়মকানুন এবং বিধিনিষেধ দৃঢ়ভাবে মেনে চলাই ক্ল্যাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। আবার এই শৃঙ্খলার বাড়াবাড়িতে জন্ম নেয় সব রকম রীতিনীতি লঙঘন করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত **রোমান্টিক নাটক**। ইংল্যান্ডে ও স্পেনেই এই ধরনের নাটকের জনপ্রিয়তা বেশি দেখা যায়, বাংলা নাটকেও রোম্যান্টিক মানসিকতার পরিচয় কিছু বেশি ধরা পড়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

এক্সপ্রেশনিস্ট বা অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উদ্ভব ঘটে মোটামুটি বর্তমান শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১৯১৫-১৯২৫), যদিও এই আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে পূর্বসূরী স্ট্রিন্ডবার্গের নাম উল্লেখ করতেই হবে। বাস্তবতার প্রতিক্রিয়াতেই এই আন্দোলনের উদ্ভব। বস্তুজগৎকে শিল্পী নিজের মানসিকতায়—তা যতোই আবেগময় বিক্ষুব্ধ বা অস্বাভাবিক হোক না কেন, দেখে

থাকেন এবং সেই ভাবেই এই ধরনের নাটক রচনা করেন। জার্মান নাট্যকার জর্জ কাইজার, আর্নস্ট্ টলার এবং বারটোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

উদ্ভট নাটক অর্থাৎ অ্যাবসার্ড নাটক বা থিয়েটার অভ দি অ্যাবসার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যজগতের অন্যতম বিশিষ্ট নাট্য-আন্দোলন। এর উৎস খুঁজতে গেলে হয়তো অনেক পেছনে সরে যাওয়া সম্ভব, তবে আমাদের মনে হয় প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের ফরাসী নাট্যকার অ্যালফ্রেড জারি-কেই এর পথিকৃৎ বলা সংগত। এই ধরনের নাটকে কোনো সুগ্রথিত প্লট থাকে না, তেমন নাটকীয়তাও থাকে না—বরং জীবন সম্বন্ধে আপাত অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ভাবই ফুটে ওঠে পরস্পর-অসংলগ্ন অবাস্তব কিছু ঘটনার সজ্জায়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে একটি গভীরতর বাস্তববোধই এই জাতীয় নাটককে নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধরনের নাটক সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

● অ্যাবসার্ড নাটক : প্রকৃতি ও উপস্থাপন

সাধারণভাবে 'অ্যাবসার্ড নাটক' হিসাবে পরিচিত এবং উল্লিখিত হলেও ঠিক এই নামে কোনো নাট্য-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, বিভিন্ন সাহিত্যতাত্ত্বিক এই আন্দোলনকে উল্লেখ করেছেন The Theatre of the Absurd হিসাবে। যে বিশিষ্ট মানসিকতা থেকে এই ধরনের নাট্যাদর্শের জন্ম, তা বুঝতে গেলে ঈষৎ পূর্ববর্তী কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কথা আমাদের বুঝতে হবে।

অস্তিত্ববাদী বা Enistentialist দার্শনিকদের মানসিক চিন্তাই প্রধানত প্রতিফলিত হয় অ্যাবসার্ড নাট্যকর্মে, সুতরাং তাঁদের দার্শনিক যে শুধু সামাজিক বিপর্যয় ঘটেছিল বা রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছিল তাই নয়, মানসিক জগতে আলোড়ন ঘটেছিল সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। বহুবছর পূর্বে একদিন দার্শনিক জিয়ের্কেগার্ড বলেছিলেন মানুষের জীবনে সুশৃঙ্খল ঘটনা বলে কিছু নেই, সমস্তই যুক্তিহীন এলেমেলো ঘটনার সমষ্টি। প্রায় একশো বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এবং সাহিত্যিকরাও প্রায় সেই একই কথা বললেন, যুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কোনো কিছুই মানুষের জীবনে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে ঘটেনা। কথাসাহিত্যে অস্তিত্ববাদের প্রতিফলন ঘটেছে জাঁ পল সর্ত্র, জাঁ আনুট, গ্যাব্রিয়াল, মার্সেল, এবং প্রধানত আলেবেয়ার কামু-র রচনায়। বস্তুত কামুর যে গ্রন্থটি অ্যাবসার্ড-দর্শন বা অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের নাট্যরচনায় উৎসাহিত করেছে সেটি হল, 'দা মিথ অব সিসিফাক'। জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে অবলম্বন করেই অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের পথিকৃৎ সুইডিশ নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ এবং ইতালিয় নাট্যকার লিউজি পিরানদেল্লোর আবির্ভাব ঘটেছে। পরে অবশ্য এই মানসিকতায় উৎসাহিত হয়ে বেশ প্রতিভাবান নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এঁরা হলেন ফরাসি নাট্যকার ইউজিন ইয়োনেস্কো, ব্রিটিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট, মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও' নীল প্রভৃতি।

কীরকম ছিল অ্যাবসার্ড নাটকের প্রকৃতি। এই ধরনের নাটকের প্রকৃতি বিচার সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং কিছু অভিধান থেকে আগে তার পরিচয় গ্রহণ করা যাক। 'দা থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড' গ্রন্থে মার্টিন এসলিন এই নাটকের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—'The Theatre of the

Absurd is involved in the relatively few problems that remain : life deal isolation and communication and it can by its nature only communications one poet's most intimate and personal intution of the huma situation his sense of being, his individual vision of the world.'

ঠিক কথা, কিন্তু এই 'অস্তিত্বের অনুভূতি' (sence of being) বা 'জগৎ সম্বন্ধে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি' (individual vision of the world) আসলে কী, সেটা কিন্তু এখানে ভালো বোঝা গেলনা। যেটা বোঝা গেল সেটা হল এটা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং নিঃসঙ্গ তার সমস্যা। তাই আন্দোলন হিসাবে এর উদ্ভবের তত্ত্ব জানতে গেলে আমাদের শরণাগত হতে হবে The penguin Dictionary of the Theatre-এ অ্যাবসার্ড নাটকের পরিচিতিতে :

'Term applied to a group of dramatists in the 1950s who did not regard themselves as a school but who all seemed to share certain attitudes towards predicament of man in the universe : essentially summerized by ALBERT CAMUS in his essay The Myth of sisyphus (1942). This diagnoses humanity's plight as purposelessly in an existence out of harmony with its surrounding (absurd literally means out of harmony)'

এই পরিচয়টি অবশ্যই অনেক স্পষ্ট। মানুষের জীবনের সংগতির অভাব, অর্থহীনতা ও যুক্তিহীনতাকেই অ্যাবসার্ড নাটকে উপজীব্য করে তোলা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের পরিবেষণরীতি লঘুতরল, অন্তত এমনভাবে আপাত হাস্যকর যাতে দর্শক কিছু উদ্ভট পরিস্থিতিতে কৌতুকই অনুভব করতে পারেন। ইউজিন ইনোনেস্কো হয়তো এই কারণেই তাঁর এই ধরনের নাটকগুলিকে বলতে চেয়েছেন Anti-play।

বাংলায় অ্যাবসার্ড নাটকের দুটি পরিভাষা চালু আছে—উদ্ভট নাটক এবং কিমিতিবাদী নাটক। দুটো আসলে প্রায় একই ব্যাপার হল, উদ্ভট কিছু দেখলে মানুষ স্ববভাতই প্রশ্ন করবে এটা কী হল (কিম্ + ইতি = কিমিতি)! বাংলায় অ্যাবসার্ড নাটকের উল্লেখযোগ্য রূপকার বলা হয় শ্রীবাদল সরকারকে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভট নাটক, কিন্তু এছাড়াও তিনি 'বাকি ইতিহাস', 'পাগলা ঘোড়া', 'যদি আর একবার', 'ত্রিংশ শতাব্দী' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত আর একজন নাট্যকারের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি, তিনি শ্রী মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' প্রভৃতি নাটক নিয়মিত অভিনয় করেছেন 'নক্ষত্র' গ্রুপের নাট্যাভিনেতারা।

● একটি অ্যাবসার্ড নাটক : এবং ইন্দ্রজিৎ

শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী শ্রীবাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি বেশ কয়েকবার অভিনয় করেন। শম্ভু মিত্রের অভিনয়গুণেই হোক বা নাটকের 'উদ্ভটত্বে'-ই হোক, নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

তিন অঙ্কের নাটক, নাটকের পাত্রপাত্রী মামিমা, মানসী, অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ, অবশ্যই সেই সঙ্গে আছেন লেখকও চরিত্র হিসাবে। নাটকের গল্প বলতে বিশেষ কিছুই নেই।

লেখক লিখছেন, বর্ষীয়সী তাঁকে মাসে মাসে খাতার তাড়া দেন, মানসীও দেয়। লেখকের লেখা যে কিছুই হচ্ছে না, এটা বোঝা যায়, কারণ কোনো চরিত্রকেই সে চেনে না। চারটি চরিত্র মঞ্চে ঢোকে। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ জানায় সে নিজের ছদ্মনাম নিয়েছে নির্মল কারণ নিয়মের বাইরে যেতে সে রাজি নয়। এরপর চরিত্রগুলি বয়স বদল করে, পরিচয় বদল করে, নিজেদের ভূমিকা বদল করে বার বার মঞ্চে আসে। তাদের আপাত অসংগত এবং কখনো হাস্যকর আচরণ ও কথাবার্তায় যেটা বোঝা যায়, এ জীবনটা একটা প্রচ্ছন্ন হাস্যকর বস্তু। এখানে সবই ছকবাঁধা, মানুষ চেষ্টা করেও আলাদা হতে পারেনা, কিছুই করতে পারেনা। মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি জীবন পালটে একটা বিরাট শুভ দিন আসছে, কিন্তু সেটা যে কত বড়ো মরীচিকা তা অচিরেই ধরা পড়ে যায়। তখন আর সেই হতাশা, একঘেয়েমি এবং ক্লান্তি। মানুষ শুধু অর্থহীন একপথ পরিক্রমা করবে আর কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, এটাই তার বিধিলিপি।

আসলে তেমন কোনো ঘটনা নেই, তেমন কোনো পরিস্থিতিও নেই যা নাটকের বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো আভাস দেবে। যদি সেটা কিছু দিতে পারে তা হল নাটকে গানও কবিতা। জীবন কীরকম, কবিতায় বলা হয়েছে—

'নাগরদোলার আবর্ত ছাঁদে গড়া
আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা,
অজ্ঞ বাতাসে চেতনার বিষে মেশা
না জানা ছন্দে ভাঙাচোরা বোঝাপড়া।

ভাষা মানুষকে কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, কারণ—

'ভাষা তো প্রাচীন ক্ষতবিক্ষত কথা,
আলো দিশাহারা শিথিল অপ্রকাশে
সমাধি-মৌন জড়তায় নানা পাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত, বাচালতা।'

জীবনে প্রচুর স্বপ্ন-সাধ-আকাঙক্ষা-প্রত্যাশামতো থাকে এক সময় কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা যায় সে সব কত অলীক—

'মেঘের ওপারে যতো সোনামোড়া রাজ্যপাট আছে,
আকাশে তারার কাছে যতো স্বর্গ ভাসে,
এ প্রবাসে সবই মিথ্যে হোলো।'

নাটক শেষ হয়েছে যে কবিতাটি দিয়ে, সেটি এরকম :

'আজো তাই
এ পথের শেষ নাহি পাই।
ফুরালে এ পথ
পূর্ণ হবে সর্ব মনোরথ
দেবতার সোপানশ্রেণীতে
এ আশ্বাস নাই আর পথশ্রমে দূর করে দিতে।
এ যাত্রায় তাই
উদ্দেশ্য হারালো আজ অর্থ কিছু নাই।

তবে তাই হোক।
বৃথা প্রশ্ন চাপা থাক, ভুলে যাই শোক।
জীবনের প্রথম প্রভাতে
বিনাদ্বন্দ্বে বিনাপ্রশ্নে উন্মুক্ত দু হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের মনে যেন রয়।'

অবশ্য এমন কথা মনে হতেও পারে, এর কোনো কথাই খুব নতুন নয়। ভিন্ন তাৎপর্যে রবীন্দ্রনাথ এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসব কথা একেবারে বলেননি এরকম নয়।

● থার্ড থিয়েটার

থার্ড থিয়েটার কথাটা প্রথম সচেতন ভাবে ব্যবহার করেন নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক ইউজেনিও বারবা ১৯৭৬ সালে। নিজের নাট্যদল এবং নাট্যপ্রযোজনাকে তিনি ওই নামে অভিহিত করেছিলেন। এর প্রকৃতিগত যে রূপ তাঁর আলোচনায় ফুটে ওঠে তাতে থার্ড ওয়ার্ল্ড বা তৃতীয় বিশ্ব কথাটার সঙ্গেও এর একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিশ্ব বলতে যেমন আমরা বুঝি তুচ্ছ অবজ্ঞাত এক বিত্তহীন পৃথিবীর মানুষকে, তিনি থার্ড থিয়েটার বলতেও প্রায় সেইরকমই দরিদ্র এবং অতি স্বল্প অর্থের প্রযোজনাকে বুঝেছিলেন।

পোল্যান্ডের গ্রোটোস্কি। তিনি স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছেন থার্ড থিয়েটার মানে হল Poor theatre অর্থাৎ গরিবের নাটক, এছাড়া তিনি একে মুক্ত থিয়েটার বা Free Theatre-ও আখ্যা দিয়েছিলেন।

বাংলায় শ্রীবাদল সরকারই থার্ড থিয়েটার নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তৃতীয় থিয়েটার একটি বিশেষ মাধ্যমেই হতে পারে; গবেষণাগারে নাট্যসৈনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই থিয়েটারের উৎস নয়।

উৎস তবে কী, সে সম্বন্ধে শ্রীসরকারই বিশদ আলোচনা করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বর্জন করতে বললেও নিজেই 'অঙ্গন-মঞ্চে'র উদ্ভাবনা ঘটিয়েছেন এবং তাতে নিয়মিত নাটক করিয়েছেন। তাই তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ীই এর প্রকৃতি স্পষ্ট করা যাক।

বাদল সরকার মনে করেন বাংলা নাটকের দুটো প্রধান ধারা—লোকনাট্য এবং নগরনাট্য বা প্রোসেনিয়ম থিয়েটার। লোকনাট্য মধ্যযুগ থেকেই চালু থাকে, আমাদের যেমন কৃষ্ণযাত্রা, বিভিন্ন যাত্রাপালা ইত্যাদি। গ্রামের মানুষের কাছে এটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিনোদন। এর প্রযোজনার ব্যয় ছিল অনেক কম—চারদিক খোলা মঞ্চ, নদী পাহাড় ইত্যাদি বোঝাতে সংলাপে শুধু ব্যবহার করলেই হত। সাধারণ মানুষের সংস্কারে যেগুলি ভালো লাগার মতো, সেইসব পালাগানই ছিল লোকনাট্যের বিষয়।

তুলনামূলকভাবে প্রোসেয়িনাম থিয়েটার ব্যয়সাধ্য—দৃশ্যপট, সাজপোশাক, আলোকসজ্জা, শব্দনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। ফলে এক-একটি প্রযোজনা ব্যয়ভার

সামলে করে ওঠাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। নগর নাট্যেরও দুটি প্রধান ধারা আছে—পেশাদারী এবং অপেশাদারী। পেশাদারী নাটকে বিনোদনই মূল্য, তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নতুন বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ সেখানে হয়। কিন্তু অপেশাদারী নাটক প্রযোজনা করেন গ্রুপ থিয়েটার ও অ-ব্যবসায়িক নাট্যদল। ফলে পরীক্ষার কিছু সুযোগ সেখানে থাকে।

তবু নগরনাট্যে যে বাধাটা প্রবলভাবে থাকে সেটা হল নাটকের অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আলোকিত মঞ্চে অভিনয় করেন নাটকের কুশীলবরা—তাঁরা যেন এক স্বতন্ত্র জগতের অধিকারী। আর নীচে অন্ধকার অডিটোরিয়ামে কালো কালো মুখ—তাঁরা নাটকের সঙ্গে অন্বিত হতে পারছেন কিনা, গোটা নাটককে গ্রহণ করার জন্য তৈরি আছেন কিনা কিছুই বোঝার উপায় নেই। এই অসুবিধা দূর করার জন্য, অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে ব্যবধান মোচন করার জন্যই থার্ড থিয়েটারের উদ্ভব। একে তিনি বিকল্প থিয়েটার নাম দিয়েছেন এবং তা অভিনয় করার জন্য উপস্থাপনা করেছেন অঙ্গনমঞ্চ। এখানে দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে কোনোরকম ব্যবধান থাকেনা, অভিনেতারা দর্শকদের মধ্যে দিয়েই অভিনয় করেন। দৃশ্যপট, মেকআপ, সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা ইত্যাদির যেমন কোনো বালাই থাকেনা, এ নাটক দেখতে গেলে কোনো প্রবেশমূল্যও লাগেনা—যিনি খুশি তিনিই অভিনয় চলাকালীন এসে বসতে, পারেন এবং তিনিই হয়ে গেলেন নাটকের অঙ্গীকৃত। অবশ্য নাটকের অভিনবত্ব ও উপস্থাপনার অভিনবত্বকে ভালোবেসে যদি তিনি কিছু অর্থসাহায্য দিতে চান, সংস্থা তা গ্রহণ করবে।

প্রথমে আকাদেমি মঞ্চের তিনতলার প্রশস্ত ঘরটি নিয়ে শ্রীবাদল সরকার তাঁর থার্ড থিয়েটার শুরু করেছিলেন। মঞ্চের নাম তখন তিনি দিয়েছিলেন 'মুক্তমঞ্চ।' পরে মৌলালির কাছে আর একটি মঞ্চ নির্দিষ্ট করেছেন, তাকে বলেছেন 'অঙ্গনমঞ্চ'। এসব জায়গায় প্রথম অভিনীত নাটক 'ভোমা' প্রচণ্ড সাড়া ফেলেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। কেতকী কুশারী ডাইসন এর অভিনয় সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভোমা একটা লোকের নাম, সে একটা গোষ্ঠীর প্রতীক যাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্বার্থপরতা ছাড়াও অন্য কিছু আছে। নাট্যকার এমনভাবে তাকে উপস্থিত করেন যাতে আমরা তাকে ভালোবেসে ফেলি।

শ্রীসরকারের দ্বিতীয় থার্ড থিয়েটার 'স্পার্টাকুস'-ও বেশ জনপ্রিয়, হয়েছিল। এরপর তিনি এখানে পরপর অভিনয় করেছেন 'সাগিনা মাহাতো', 'গড়ির গন্ডি', 'আবু হোসেন' প্রভৃতি।

শ্রীবাদল সরকারের মতে থার্ড থিয়েটার নাটকের কোনো বিশেষ পরীক্ষা বা উপস্থাপন-রীতির পরীক্ষা নয়, এটি নাট্যজগতের একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন অভিনেতা ও দর্শকদের একযোগে একটি সমাজবিপ্লবের জন্য তৈরি হতে বলে। থিয়েটারের তথাকথিত ব্যবধান এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাকে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ করে দিতে চায়।

• গণনাট্য

গণনাট্য আন্দোলনকে সাহিত্যিক আন্দোলন না বলে রাজনৈতিক আন্দোলন বলাই ভালো। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন

জন্মগ্রহণ করেছে। সাহিত্যে যেমন কলাকৈবল্যবাদী ও উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিকামীর দুটি দল আছে, ঠিক সেই ভাবে এই আন্দোলনের শরিকদের বিশ্বাস ছিল উদ্দেশ্যমূলক কার্যসৃষ্টিতে, অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে 'drama with a purpose'। অবশ্য এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা নাট্যসৃষ্টির তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন—Amusement বা প্রমোদ, Education বা শিক্ষা এবং Enlightment of Social Consciousness বা সমাজ-সচেতনতার বৃদ্ধি। এর মধ্যে অবশ্য তৃতীয়টির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি এবং এই আন্দোলনের শরিকরা সকলেই নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই নাট্যসৃষ্টি বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে বেশি মূল্য দিয়েছেন।

'গণনাট্য' কথাটি Peoples theatere-এর বাংলা প্রতিশব্দ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হল তখন নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় গঠিত হয় এই গণনাট্য—যার পুরো নাম Indian Peoples Theatre Association (IPTA) বা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে গণনাট্যের যাত্রা শুরু। গণনাট্যের ব্যানারে তোলা প্রথম চলচ্চিত্র 'ধরতি কে লাল।'

স্বাধীনতার পর নাটক থেকে রাজনীতিকে বাদ দেবার সচেতন প্রয়াস নিয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের একটি বিভাগ এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নবনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটি বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

ক. উপন্যাসের সাধারণ পরিচয় : বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব—মানুষের জীবনকথা শোনার প্রাথমিক আগ্রহ—উপন্যাসের জীবনদর্শন—ঔপন্যাসিকের বক্তব্য—সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের অভাব। খ. উপন্যাস ও নাটক : উপন্যাসকে 'পকেট থিয়েটার' বলা হয় কেন—উপন্যাসের বেশি জনপ্রিয়তার কারণ—নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ উপাদান—উপন্যাসের বিশেষ উপাদান। গ. উপন্যাসের বৃত্ত: সাধারণ পরিচয়—গল্প ও বৃত্তের পার্থক্য—এই পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য কিছু উপন্যাসের আলোচনা—বৃত্তের সাধারণ বিভাগ—সরল বৃত্ত—জটিল বৃত্ত—যৌগিক বৃত্ত। ঘ. উপন্যাসের চরিত্র : চরিত্রচিত্রণের গুরুত্ব—বৃত্ত ও চরিত্রের আপেক্ষিক প্রাধান্য—কিছু উপন্যাস অবলম্বনে বিচার। ঙ. উপন্যাসের উদ্ভব : প্রেক্ষিত ও পূর্বসূত্র : প্রেক্ষিতের বিচার—রোমান ও নভেল্লা—পিকারেস্ক নভেল। চ. নভেল ও রোমান্স : রোমান্স সম্বন্ধে ভুল ধারণার উৎস—রোমান্সের সঠিক লক্ষণ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক—রোম্যান্সের শ্রেণীবিভাগ ও তার পরিচয়—একটি কাব্যিক রোমান্স হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'র সার্থকতা বিচার। ছ. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ : সাধারণ আলোচনা—নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগ—নভেলের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের উপযোগিতা—বিষয়ভিত্তিক বিভাগের বৈশিষ্ট্য বিচার। জ. ঐতিহাসিক উপন্যাস : সাধারণ আলোচনা—একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচার—আর-একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ঝ. সামাজিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি সামাজিক উপন্যাসের বিচার। ঞ. রাজনৈতিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের তাৎপর্য নির্ণয়। ট. আঞ্চলিক উপন্যাস : সাধারণ আলোচনা—একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ—আর-একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ঠ. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : এর বিচার ও শ্রেণীভুক্তিকরণ সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর কেন—একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ—আর-একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ড. চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস-এর প্রধান লক্ষণ—একটি চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের ব্যাখ্যা। ঢ. বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসের পার্থক্য—এক। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস—দুই। সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। তিন। রাজনৈতিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস—চার। আঞ্চলিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস—পাঁচ। সামাজিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাস—ছয়। সামাজিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাস—সাত। রাজনৈতিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাস। ণ. অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাস এক। কাব্যধর্মী উপন্যাস—দুই। গোয়েন্দা উপন্যাস—তিন। বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস—চার। হাস্যরসাত্মক উপন্যাস—পাঁচ। সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক উপন্যাস—ছয়। কারা উপন্যাস—সাত। বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাস—আট। পারিবারিক উপন্যাস—নয়। মহাকাব্যিক উপন্যাস—একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস—দশ। নভেলেট—এগারো। গথিক উপন্যাস—বারো। পত্রোপন্যাস।

ক. উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য। এক তীব্র জীবনমুখিতা ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠতা এর উপজীব্য বলেই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব ঘটা সম্ভব ছিল না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তার উৎসমুখ নির্দেশ করলেও, আমরা মোটামুটি ভাবে নিঃসন্দিগ্ধ যে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত হবার আগে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। তিনি অবশ্য একটা কথা একেবারে ঠিক বলেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে-সব নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি

হয়েছে, তার প্রধানতম হল উপন্যাস। উপন্যাসের আবির্ভাবের জন্য আরো যে দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য ছিল তারা হল, বাস্তবতাবোধ এবং ব্যক্তিত্ববোধ। এই দুটি মানসিক গুণের বিকাশ ভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব, অন্তত প্রকৃত উপন্যাসের, সম্ভব নয়।

মানুষ জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং সেই জীবনকে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দেখবার আগ্রহ—এক কথায় বলা যায় মানুষের জীবনের গল্প শুনবার উৎসাহ থেকেই উপন্যাসের জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাসকে বলা হয়েছে 'truth teller', বলা হয়েছে 'narative realism', স্যামুয়েল রিচার্ডসনের রচনার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'A faithfull and chaste copy of real life and manners'। বাংলা সাহিত্যে প্রথম দিকের যে-সব ঔপন্যাসিক প্রয়াস গড়ে ওঠে সেখানেও আমরা সমকালীন জীবনাগ্রহই বেশি লক্ষ করেছি। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র দুটি খণ্ডে অবশ্য নক্সাই রচনা করেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন জীবনের বাস্তব রেখাচিত্র সেখানে ধরা পড়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে, যদিও এই রচনাটি প্রকৃতিতে উপন্যাসের খুবই কাছাকাছি। শ্রীমতী মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও জীবনাগ্রহ আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ করি।

বরং তুলনামূলক ভাবে যেন মনে হয় সমকালীন জীবন ও মানুষের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহই বুঝি কিছুটা কম ছিল, নইলে প্রথম উপন্যাসেই তিনি আশ্রয় করবেন কেন ইতিহাসের তুষারাবৃত অতীত, অথবা দ্বিতীয় উপন্যাসেই এমন এক কাব্যিক বা তাত্ত্বিক বিষয়, যার সঙ্গে অন্তত চোখে দেখা জীবনযাত্রার বিশেষ কিছু মিল নেই। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, শুধু এটুকু বলাই এখানে যথেষ্ট হবে যে, প্রথম পর্বে উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা গল্প শুনতে চেয়েছি—এমন আধুনিক স্বাদের গল্প যা ভগবদ্‌বিশ্বাসচর্চিত নয়, রূপকথার অপ্রাপ্ত-মনস্ক অবাস্তব কাহিনী নয়, আধুনিক মানুষকে তৃপ্ত করার মতো এক সাহিত্য-প্রকরণ, ইংরেজিতে প্রথম পর্বে যাকে বলা হতো story-teller। তবু কী গুণে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা story-teller নয়, উপন্যাস, তার দুটি প্রধান দিক হল তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শন, জীবনদর্শনের সমগ্রতা এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য—তবু এর সঙ্গে অবশ্যই অন্বিত হবে তাঁর সুগভীর বাস্তবতাবোধ এবং পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদনের ক্ষমতা। বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করেই উপন্যাসের এই বিশেষ গুণগুলিকে সংক্ষেপে চিনে নেওয়া যেতে পারে।

উপন্যাসের বিশিষ্ট জীবনদর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনকে দেখবার এক মৌলিক জীবনদৃষ্টি, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে attitude towards life। জীবনকে দেখবার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিভিন্ন সাহিত্যকৃতি বার বার পালটে যায়—পল্লীজীবনের কাহিনীতে কখনো পাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিস্ময়মুগ্ধতা, কখনো শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের কর্কশ বীভৎসতা, কখনো বা বিভূতিভূষণের রোম্যান্টিকতা—কিন্তু কখনোই বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ন না করে। এই ব্যাপারটাই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, বাস্তবকে আহত না করেও জীবনদৃষ্টির ভিন্নতার জন্য একই জিনিস আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারি এবং পালটে যেতে পারে, তার আস্বাদ, পালটেছেও তাই। বিধবার একমাত্র পুত্র—এই ব্যাপারটি দীর্ঘকাল বাংলা কথাসাহিত্যে আমাদের অশ্রু আকর্ষণ করে এসেছে, জগদীশ গুপ্তের গল্পে তা ব্যঙ্গের উপাদানে পরিণত হয়েছে; ধীবর শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসু, দুজনেরই রচনার বিষয় হয়েছে

এবং কঠোর ভাবে বাস্তবতা রক্ষা করা সত্ত্বেও তাঁদের রচনার স্বাদ পৃথক হয়েছে জীবন-দৃষ্টির ভিন্নতার জন্যই।

জীবনদর্শনের সমগ্রতা বা totality of life এমন একটি বস্তু যা উপন্যাসকে শুধু যে আংশিকতার দোষ থেকে মুক্ত করে তাই না, তাকে ঔপন্যাসিক মহত্ত্বে উন্নীত করে। একটি চরিত্রের বিচ্ছিন্ন আচরণের বিবৃতি যেমন তার খণ্ডিত পরিচয়মাত্র, সামগ্রিকভাবে এবং অখণ্ডভাবে চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণাই যেমন প্রকৃত চরিত্রকে বোঝাতে পারে, তেমনি একটি আধুনিককালের খণ্ডচিত্র থেকে লেখক জীবনদর্শনের অখণ্ডতা খুঁজে পেতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই পেয়েছিলেন, তাই 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে জীবনদর্শন আমরা খুঁজে পাই, 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামক সাময়িক জীবনচর্চাতেও তার ব্যত্যয় দেখি না।

জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজের একটা ব্যাখ্যা থাকে, থাকতেই হয়, উপন্যাসকে যদি সত্যিই উপন্যাস হয়ে উঠতে হয়। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'আত্মাহীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়।' এই বক্তব্য অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকবে, যেটা বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময়ই রাখতে পারেননি—'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে একটি গোটা পরিচ্ছেদই ব্যয় করেছেন জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি, তবু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় তাঁর বক্তব্য বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না, যেমন হয় না তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসের বক্তব্য বুঝতে বা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' পড়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বুঝে নিতে।

উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে ধারণা গঠন করতে হলে আর একটা কথা জেনে রাখা অত্যন্ত দরকার যে, উপন্যাসের কোনও সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ (art-form) বোধহয় এখনও নির্ণীত হয়নি। রিচার্ডসনের হাতে ইংরেজি উপন্যাসের যে সুচনা ঘটেছিল সেই 'পামেলা' রচিত হয়েছিল পত্রাকারে। এরপর সার্থক উপন্যাসের আরো কতো রূপান্তর আমরা লক্ষ করি, এবং তার প্রত্যেকটিকেই স্বীকার করে নিতে আমরা বাধ্য হই। অর্থাৎ নাটকের যেমন এক বিশেষ শিল্পরূপ আছে, কবিতা-বিচারের শুধু বিষয়গত নয়, আঙ্গিক মানদণ্ডও কিছু আছে—উপন্যাসের সম্বন্ধে ঠিক সে ধরনের স্পষ্ট নির্দেশ কিছু নেই। আসলে সে তো উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও নেই। সামারসেট মম দশটি বিখ্যাত উপন্যাসের যে সংকলন প্রকাশ করেন এবং তার যে ভূমিকা লেখেন সেই দুটিই বিখ্যাত হয়ে আছে এই কারণে যে, উপন্যাসগুলি প্রকৃতিতে এতোই পৃথক যে একটিকে উপন্যাস বললে অপরটিকে তা বলা শক্ত হয়ে পড়ে; সে কথা ভূমিকাতেই কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে বলেছেন সংকলক। শিল্পরূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আজও কোনও উপন্যাস সম্বন্ধে যখন তার উপন্যাস-প্রকৃতি বিষয়ে বিতর্ক ওঠে—যেমন বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', আমরা বুঝতে পারি তা মূলত উঠেছে তার বিচিত্র শিল্পরূপের জন্যই।

উপন্যাসের এই সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের অভাব ঘটেছে মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, অনেক ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পটে জীবনকে ধরার চেষ্টা করেছে উপন্যাস। জীবনের এই বৈচিত্র্যের জন্য বিষয়ের মতোই, তার শিল্পরূপে নানা রকম বৈচিত্র্য ঘটে গেছে যাদের কোনোটিকেই

অস্বীকার করা পাঠক বা সমালোচকদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো বিশেষ রূপজিজ্ঞাসার অতৃপ্তি থেকে উপন্যাস নামক প্রকরণটির সৃষ্টি হয়নি, যেমনটি কোনো কোনো সাহিত্যিক আন্দোলনে ঘটে থাকে বলে আমরা জানতে পেরেছি। মূলত আধুনিক মানুষের গল্প শোনা এবং গল্পের সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই উপন্যাসের জন্ম, তাই শিল্পরূপের ব্যাপারে কোনো অতৃপ্তি পাঠকের জাগেনি।

খ. উপন্যাস ও নাটক

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উপন্যাস ও নাটকের মৌলিক উপাদান একই—সেই কাহিনী, চরিত্র এবং মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি উৎসাহ। আসলে বোধহয় উপন্যাস তার উদ্ভবের জন্য অনেকটাই দায়ী নাটকের কাছে। উপন্যাস উদ্ভবের পর নাটকের চেয়ে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধিটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ নাটক প্রকৃতিগত ভাবেই একটি মিশ্র শিল্প। কেউ শুধু পড়বার জন্য নাটক কেনে না, কিনলেও সে নাটকের জাত আলাদা; নাটকের সাফল্য নির্ভর করে তার অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোক-সজ্জা ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর। খুবই স্বাভাবিক, নাটক শিল্প হিসাবেও বস্তুগত। কিন্তু উপন্যাস প্রকৃতিতেই আত্মগত এবং নাটকের মতো বাইরের অনেক কিছুর ওপরই নির্ভরশীল নয়। অথচ নাটকের অনেক কিছুই তার আছে। সম্ভবত সেই কারণেই মারিয়ন ক্রফোর্ড একে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পকেট থিয়েটার'। কথাটি উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক খুঁজতে গেলে মনে রাখাটা খুবই দরকারী। কারণ নাটকের মতো উপন্যাসের উপভোগ্যতার এতো প্রতিবন্ধকতা নেই—সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টি ছাড়াও অন্যান্য এতো কিছুর ওপর উপন্যাসকে নির্ভর করতে হয় না, তার একমাত্র অভাব প্রত্যক্ষ দর্শনের, কল্পনায় সেটা তাঁকে পুষিয়ে নিতে হয়।

নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এবং দ্রুত এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আর একটা কারণ হল, সাহিত্য-প্রকরণের মধ্যে নাটক সবচেয়ে বিধিবদ্ধ প্রকরণ, নিয়মকানুন একেবারে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা। অন্যদিকে উপন্যাস, অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে, সবচেয়ে শিথিল ধরনের প্রকরণ। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে নাটকের চেয়ে উপন্যাস লেখা সহজ, বরং এর উল্টোটাও হতে পারে—নাটকের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন আছে বলেই তার সুযোগ নিয়ে নাটকের চেহারা অন্তত কেউ খাড়া করতে পারে; আসল কথাটা হল এই যে উপন্যাস রচনায় কারো এগিয়ে আসাটা সহজ বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই, সাফল্যের প্রশ্ন পরে।

নাটক ও উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন-ভঙ্গি ইত্যাদিতে অনেক মিল আছে বলেই আমরা, সব সময় সঠিক চিন্তা ভাবনা না করেই অবশ্য, নাটকের সঙ্গে অন্বিত কিছু পরিভাষা বা বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের ওপর চাপিয়ে দিই বা সেই সূত্রেই তাদের বিচার করি। যেমন কোনো উপন্যাসকে আমরা ট্র্যাজেডি হয়েছে কিনা ভাবতে বসি, তার মধ্যে নাটকীয় বা অতিনাটকীয়তা খুঁজি, অথবা নাটকীয়তা কেমন আছে বিচার করি—যদিও একথা কখনো ভাবি না, যে উপন্যাসের মধ্যে 'নাটকীয়' লক্ষণ থাকাটা তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কিনা। এ প্রশ্নের মীমাংসা এই গ্রন্থে করার প্রয়োজন নেই, আমাদের বক্তব্য, দুটি প্রকরণের মধ্যে আঙ্গিক বাদ

দিয়ে প্রচুর সাদৃশ্য আছে বলেই এ হেন সমালোচনা এসে যায়। নাটকের ভাষায় বললে সেগুলিকে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

প্রথমত, কিছু বা কোনও একজন মানুষ কোনও মারাত্মক কাজকর্ম কিছু করে ফেলেছেন বা তার দ্বারা উদ্ভূত যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন—সেই সব ঘটনা এবং কাজকর্মের বর্ণনাই আমরা নাটকে পাই, যাকে এক কথায় বলা হয় নাটকের প্লট বা বৃত্ত। দ্বিতীয়ত, যাঁরা এই সব কাজকর্ম করেন বা এর প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত হন তাঁরাই হলেন নাটকীয় চরিত্র, বা শুধুই চরিত্র। তৃতীয়ত, চরিত্র যে বচনের দ্বারা তার আনন্দ-দুঃখ-বিস্ময় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে থাকে তাকেই আমরা বলি সংলাপ। চতুর্থত, যেসব কাজকর্ম সংঘটিত হয়, নাটকের চরিত্রগুলি যে আনন্দ-বেদনায় আলোড়িত হন তার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে; সে বিষয়ে সচেতনতাকে নাটকে বলা হয় কালগত ঐক্য—নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যের অন্যতম সে কালের মাত্রা, আধুনিক কালে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পঞ্চমত, রচনার বা উপস্থাপনার ভঙ্গি বা বাচনশৈলী, অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন 'ডিক্‌শান'। এই যে পাঁচটি নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল এখানে, তার প্রত্যেকটি উপন্যাসের অনিবার্য উপাদান এবং তারা প্রায় নাটকের মতো একই ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপন্যাসে। এর সঙ্গে অবশ্য আরো একটি বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে আছে যা থেকে নাটক বঞ্চিত এবং যা থাকা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। এটিকে বলা যেতে পারে, জীবনকে ঔপন্যাসিক ঠিক কীভাবে দেখছেন তার প্রকাশ, এক কথায় attitude towards life বা জীবনদৃষ্টি। এটি অবশ্য সোচ্চার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে তা স্পষ্ট ভাবেই বলে ফেলেছেন, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো সাহিত্যিকের সেই জীবনদৃষ্টি কম বেশি প্রচ্ছন্ন অথচ সুনিশ্চিত ভাবেই উপস্থিত। এই ব্যাপারটা সব শেষে উল্লেখ করা হলেও এটি উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কেবলমাত্র এই একটি গুণেই কোন উপন্যাস মহৎ উপন্যাস হয়, কোন উপন্যাস তা হয় না। অরণ্যজীবন বা নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আরণ্যক আশ্রয় অনেকেই খুঁজেছেন, কিন্তু হাডসনের 'গ্রীন ম্যানশন্‌স্' বা থোরু-র 'ওয়ালডেন' যে উপন্যাস হয় না, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' যে উপন্যাস হয়ে ওঠে, তার প্রধান কারণ জীবনকে দেখার এই সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। একই কারণে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা দুটি উপন্যাসের মধ্যে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'-য় বাস্তবতার পরিচয় অনেক দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকগণ মনে করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' মহত্তর উপন্যাস।

গ. উপন্যাসের বৃত্ত

নাটকের বৃত্তগঠনের যে স্পষ্ট নিয়ম আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধিনিষেধ নেই। এই কারণে কিছু দুর্বলতাকে উপন্যাস যেমন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটাও এই শিল্পপ্রকরণেই সম্ভব হয়েছে। একটা অসুবিধাই শুধু প্রধান হয়ে উঠেছে যে, উপন্যাসের বৃত্তের সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় তার আয়তনটাও আমাদের সহ্য করে নিতে হয়েছে এবং আয়তনভিত্তিক কোনও আপত্তি আমরা তুলতে পারছি না। বঙ্কিমচন্দ্র

তেমন দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস লেখেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস নিয়ে এ প্রশ্ন সেকালে এবং একালে অনেকেরই মনে জেগেছে। 'দেখতে হবে জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে', একথা বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষোভের প্রশমন করতে পারেন নি। এই কিছুদিন আগেও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসের শুধু দীর্ঘ কলেবরের জন্যই উল্লিখিত হতেন যদিও উপন্যাসটি অন্যান্য কারণেও মনে রাখবার মতো; পরে বিমল মিত্রের বিশাল উপন্যাসগুলি তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ হয়। উপন্যাসের কলেবরের জন্য সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রের দায়িত্বও কম নয়। রবীন্দ্রনাথকে মাসিক পত্রিকার দাবি মেটাবার জন্য কাহিনীকে দীর্ঘায়ত করতে হয়েছে, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। আজও আমরা দেখি, সাময়িক পত্রিকায় পূজা-সংখ্যায় একবারে প্রকাশযোগ্য উপন্যাসের আয়তন ছোট হয়, ধারবাহিকের আয়তন বড়ো হয়—সম্পাদকেরই অনুরোধে, উপন্যাসের নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক সময়ই নয়। এ ব্যাপারটা সম্ভব হয় উপন্যাসের বৃত্তগঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই বলেই।

তবে সুনির্দিষ্ট না হলেও নিয়ম কিন্তু আছে। গল্প বলাই উপন্যাসের একমাত্র কাজ নয়, তা আমরা দেখেছি, এবং সেই জন্যই উপন্যাসের গল্প বা story-র সঙ্গে তার বৃত্ত বা plot-এর একটা স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা সম্ভব। এই পার্থক্যের প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমাদের বুঝিয়েছেন E. M. Forster তাঁর অতিহ্রস্ব অথচ অতিখ্যাত গ্রন্থ Aspects of the Novel-এ। তিনি দেখিয়েছেন গল্প বলার সময় মানুষের কৌতূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করলেই চলে, কিন্তু বৃত্ত নির্মাণ করবার সময় তার যৌক্তিকতা বজায় রাখতে হয়, তাকে একটা কার্যকারণ-শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলতে হয়। গল্পের এই বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করাই বৃত্তের প্রধান কাজ বলে, গল্পে থাকে কেবলই গল্প বলে মানুষকে তৃপ্ত দেবার আগ্রহ, কিন্তু সেই গল্প যখন উপন্যাসের প্লটে পরিবর্তিত হবে তখন ঔপন্যাসিককে আরো পরিকল্পনা অনুযায়ী, সুচিন্তিত ছক অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। গল্পে গল্পকথকের এই ছক থাকে না, থাকে কেবল পরিবেষণ-নৈপুণ্য, কিন্তু উপন্যাসে থাকে সুচিন্তিত একটা পরিকল্পনা—বিশ্বাসযোগ্যতা ও যুক্তিনির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; এটাই এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য। একটা উদাহরণ না দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে না।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। একটি মেয়ের যদি আদর্শ স্বামী এবং দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে এই অস্থিরচিত্ততা তার এবং সংশ্লিষ্ট আরো কিছু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে—এই হতে পারে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মূল গল্প। অচলা নামক একটি মেয়ের জীবনে যখন এই অস্থিরচিত্ততা দেখা যায় সমালোচক তাকে দোলাচল বৃত্তি বলে আক্রমণ করতে পারেন, মহিমের সঙ্গে বিবাহ হবার পরও অচলার স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধেয় বচনকে হিন্দু রমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করতে পারেন, অথবা সুরেশের প্রতি অচলার মনোভাবে ধারবাহিকতার অভাব লক্ষ করে ঔপন্যাসিকের ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন—এবং এ সবই হতে পারে গঠনমূলক সমালোচনা বা Creative Criticism-এর অভাবে। কোনো কথাসাহিত্যিক, বিশেষ করে স্বীকৃত প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচক যখন আলোচনা করেন তখন তাত্ত্বিক বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে সাহিত্যিকের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যদি একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তাহলে একটি সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে তাঁর বিপুল প্রয়াস সমালোচকের নজর এড়াতে পারে না।

অচলার দোলাচল বৃত্তি আমাদের চোখে পড়ে, অথচ তার নামকরণই যে তার আচরণকে ব্যঙ্গ করে, এ কথা আমরা খেয়াল করি না; আমরা খেয়াল করি না তাঁর এই নায়িকা যে অস্থিরমতি, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কতোটা চেষ্টা শরৎচন্দ্র করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা একটি মেয়ে লাভ করে তার মায়ের কাছ থেকে, স্বামী সম্বন্ধে আচরণীয় কার্যকলাপ বিষয়েও সেই একই কথা বলা যায়। অচলার মাকে আমরা 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখি না। তিনি কখন প্রয়াতা হয়েছেন সঠিক ভাবে না জানলেও আমরা বুঝি, মেয়েকে সাংসারিক জ্ঞান দেবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি।

মাকে অকালে হারালে এ সব বিষয়ে সাধারণ ধারণা মেয়েরা বাবার কাছ থেকেও পেতে পারে, অন্তত আদর্শ পিতা এ বিষয়ে কন্যাকে কিছুটা অবগত করা প্রয়োজন বোধ করেন। শরৎচন্দ্র অচলার পিতা হিসাবে যে চরিত্রটি নির্বাচিত করেছেন তাঁর মতো স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অনুভূতিহীন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে কমই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দেনার দায়ে বাড়ি বন্ধক দিতে বাধ্য হন, অথচ বিকালের বরাদ্দ ওভালটিন খেতে তাঁর ভুল হয় না, ঘোড়ার গাড়ি চেপে সমাজে বা প্রমোদ-অনুষ্ঠানে যাবার ব্যাপারেও তাঁকে বিশেষ উদাসীন বলে কখনো মনে হয়নি। স্বার্থের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বিবাহের পাত্র পরিবর্তন করতে তাঁর তিলমাত্র বিলম্ব হয় না এবং এ ব্যাপারে কন্যার অভিমত গ্রহণ করা তিনি বাহুল্য বিবেচনা করেন। এমন একটি অমানুষ যে কন্যার পরিণয়োত্তর জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করবেন এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। অচলার এমন কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা দেখিনি যার সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। সুতরাং দাম্পত্যজীবনের আদর্শ কী হওয়া উচিত, মানুষ হিসাবে ঠিক কী ধরনের গুণাবলী থাকলে তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করা যায়, এ সব শিক্ষা বা আলোচনার সুযোগ অচলা বিশেষ পায়নি।

এসব কথা হয়তো আমরা তেমন করে ভাবি না, কিন্তু ভেবে দেখলে ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ একটু বেশি বাড়তো এবং গল্প ও বৃত্তগঠনের পার্থক্যও আমরা কিছুটা বুঝতে পারতাম। যে কোনও মেয়ের মধ্যে দোলাচলবৃত্তি দেখা যায় না, হিন্দুনারীর সাধারণ সংস্কারও বেশির ভাগ মেয়ের মনেই দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং অচলার মনে এই সংস্কারের প্রাবল্য ততোটা না থাকার এবং দোলাচলচিত্ততা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, বা তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য—এক কথায় বৃত্তনির্মাণের জন্যই এই চরিত্র-পরিকল্পনা লেখককে করতে হয়েছে। অচলার দোলাচলবৃত্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করবার জন্যই এমন দুটি চরিত্র শরৎচন্দ্রকে বেছে নিতে হয়েছে, প্রকৃতিতে যারা সম্পূর্ণ বিপরীত। মহিমকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত অচলা নিয়েছে তার শ্রেয়োবোধ থেকে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয় জন্মে দেবার জন্যই মৃণালকেন্দ্রিক উপকাহিনীর সৃষ্টি করতে হয়েছে লেখককে। অচলার মনের দোলাচলতাকে আশ্রয় করতে পারে, তাতে প্রলুব্ধ হতে পারে—ঠিক এই ভাবেই সরল, বলিষ্ঠ অথচ প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ একটি চরিত্র লেখককে সৃষ্টি করতে হয়েছে যার দ্বারা অচলা-অপহরণের মতো একটি কাজ সম্ভব। আবার এই বিপর্যয় সাঙ্গ হয়ে যাবার পর তাতে ভেসে না গিয়ে এই প্রথম সতীত্বের সংস্কার প্রবল হয়ে উঠতে দেখি আমরা অচলার মধ্যে, এবং তাকেও আমরা অস্বাভাবিক ভাবতে পারি না যখন মনে করি সাধারণ বাঙালী মেয়ে হিসাবে অন্তত বিপর্যয়ের দিনে এ সংস্কার তার মনে আসতেই পারে। এই সব চিন্তা-ভাবনা, কার্যকারণ-শৃঙ্খল এবং কার্য-পরম্পরার ভাবনাকেই আমরা বৃত্তনির্মিতি বলে থাকি।

বৃত্ত নির্মাণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে আলোচনার অনেক প্রসারণ ঘটলেও মৌলিক ধারণা হিসাবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, গঠনের দিক থেকে তিন ধরনের বৃত্তের কথাই সমালোচনাসূত্রে বলা হয়—সরল বা simple, জটিল বা complex এবং যৌগিক বা compound প্লট। সরল বৃত্তে একটিই কাহিনী থাকে, ঔপন্যাসিক সেই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে উপন্যাসটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। জটিল এবং যৌগিক বৃত্তে থাকে একাধিক কাহিনী। উপন্যাসের প্রথম যুগে তা ছিল এক ধরনের গল্পকথন বা story-teller, তখন কাহিনীর আকর্ষণ সৃষ্টি করবার জন্যই মূল কাহিনীর পাশাপাশি একাধিক ছোটখাট কাহিনী সৃষ্টি করার কথা ভাবা হতো, কিন্তু আধুনিককালের সচেতন পাঠক যখন বুঝতে পেরেছেন উপন্যাস মানে জীবনেরই ব্যাখ্যা, কিংবা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং তার বিচিত্র কাণ্ডকারখানাই উপন্যাসের আসল মজা, তখন একাধিক কাহিনীর আকর্ষণটা কমে এসেছে।

সরল বৃত্তে থাকে একটিই কাহিনী, এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু উদাহরণ দেওয়া হয়নি। উদাহরণ হিসাবে আমাদের মনে পড়বে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কথা, যেখানে গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর বৃত্তেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, অন্য কোনো ছোট কাহিনীর দরকার হয়নি। জটিল বৃত্ত এবং যৌগিক বৃত্তে একাধিক কাহিনী থাকে, এ কথা বলা হলেও শুধু কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধিই কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাদের অন্য উদ্দেশ্যও থাকে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা বুঝতে পারি তাদের প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। জটিল বৃত্তে মূল কাহিনী থাকে একটিই, এবং যখন উপন্যাস পাঠ করা হয় তখন আমরা বুঝি মূল কাহিনী কোনটি। অন্যান্য যে কাহিনী থাকে, তাদের ভূমিকা মূল কাহিনীর পরিপুষ্টি সাধনের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ মূল কাহিনীর ওপর তারা নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে যৌগিক বৃত্তের উপন্যাসে এই ধরনের কোন মূল কাহিনী থাকে না, থাকে আপাতবিচ্ছিন্ন এমন কিছু কাহিনী যাদের সবকটিকেই মূল কাহিনী ধরা যায়—আয়তনে তারা যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন। তবে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংহতি থাকে, সেটা বুঝতে পারা যায় লেখকের মানসিকতা এবং গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে।

আসলে বৃত্তের গঠন যেমনই হোক না কেন, উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব এক জীবনদর্শন এবং জীবনভাবনা থাকে, উপন্যাসে সেটাই তিনি প্রকাশ করতে চান। যখন মূল কাহিনী নির্বাচন করার পরও তাঁর মনে হয় তাঁর বক্তব্য সমান্তর কোনো উপকাহিনীর দ্বারা আরো শক্তিশালী করা যাবে তখন তিনি এই ধরনের উপকাহিনী সৃষ্টি করেন। আবার তিনি যখন ভাবেন, যে-বিশেষ জীবনচিত্র তিনি পরিবেষণ করেছেন তা স্পষ্টতর হবে বিপরীত কোনও চিত্র দেখালে, তখন মূল কাহিনীকে আরো স্পষ্ট করার জন্য তার বিপরীত প্রেক্ষিত হিসাবেই একটি উপকাহিনী সন্ধান করতে পারেন। আমাদের সৌভাগ্য, উপকাহিনী সৃষ্টির এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যর দৃষ্টান্তই ধরা পড়বে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসে, তার নাম 'বিষবৃক্ষ'। অসংযত প্রবৃত্তি মানুষের জীবন কেমন বিষময় করে তুলতে পারে সেটাই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং লেখকের জীবনদর্শনও বটে। নগেন্দ্রনাথের প্রবৃত্তির এই অসংযম তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসের মূল কাহিনী হিসাবে কুন্দর প্রতি তার আকর্ষণে। প্রবৃত্তির অসংযম দুটি জীবনকে কেমন ছারখার করে দিতে পারে তার সমান্তর অথচ তীব্রতর চিত্র ও বীভৎসতর পরিণাম আমরা দেখতে পাই দেবেন্দ্র-হীরার উপকাহিনীতে। আবার সেই একই সঙ্গে বিপরীত

প্রেক্ষিত আঁকার দৃষ্টান্ত রয়েছে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি-সতীশের উপকাহিনীতে। নগেন্দ্রের বিষাক্ত জীবন স্ফুটতর হয় শ্রীশ ও কমলের সুস্থ এবং সুন্দর দাম্পত্যজীবনের ছবিতে। অবশ্য আর একটি ইঙ্গিত এই উপকাহিনী থেকে আমরা পাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হলো সন্তান—শ্রীশ-কমলের উপকাহিনীতে সতীশচন্দ্রের বাড়াবাড়ি রকমের ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য, এটি ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যে, নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর জীবনে সন্তানহীনতাই তাদের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

যৌগিক বৃত্তে কাহিনীগুলির নায়ক একজন হতে পারেন, আবার অনেকেও হতে পারেন। একজন নায়ক হলেই যে সেগুলিকে স্বতন্ত্র কাহিনী মনে করা যাবে না এমন কোনো মানে নেই। যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী আছে—অন্নদাদির গল্প, অভয়ার গল্প, রাজলক্ষ্মীর গল্প, কমললতার গল্প, কিন্তু বেশির ভাগ কাহিনীর সঙ্গে শ্রীকান্ত জড়িয়ে আছে বলেই তাদের অবিচ্ছিন্ন মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেকটি কাহিনীধারার মধ্যে যে কেন্দ্রীয় ঐক্য আছে তা হল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অথচ সবচেয়ে রহস্যময় অনুভূতি প্রেমকে মানবিক ও সামাজিক অধিকারের পরিবর্তনশীল অনুপাতে দেখা। এই অধিকার কতোটা মানবিক এবং কতোটা সামাজিক, তার এক পরীক্ষাই যেন এই উপন্যাসে করতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য তার বিশ্লেষণ এখানে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক হবে না। আপাতবিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলির নায়ক একজন নন, এরকম উদাহরণও বাংলা কথাসাহিত্যে আছে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে তো আছেই। রমাপদ চৌধুরীর প্রথম দিককার উপন্যাস 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' এবং সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস 'আকাশপ্রদীপের' নাম আমরা এই সূত্রে উল্লেখ করতে পারি। দুটি উপন্যাসেই কাহিনীগুলি বিচ্ছিন্ন এবং আপাত-অসম্পূর্ণ, অথচ মনোযোগী ও অনুভবী পাঠক-পাঠিকার কাছে এর সংযোগসূত্র এবং লেখকের অনুচ্চারিত বক্তব্য বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

ঘ. উপন্যাসের চরিত্র

উপন্যাসে যেহেতু সুগঠিত একটা প্লট বা বৃত্ত থাকে, অন্তত সাধারণ পাঠক সেই বৃত্তায়িত কাহিনী পাঠ করতে আগ্রহী, আমাদের কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে—গল্পের প্রয়োজনেই কি চরিত্রেরা আসে, গল্পই কি নিয়ন্ত্রণ করে চরিত্রকে অথবা গল্পকে গতি দান করাই কি চরিত্রের প্রধান কাজ, নাকি চরিত্রকে পরিস্ফুট করতেই গল্পের উদ্ভাবনা করেন ঔপন্যাসিক এবং শেষ পর্যন্ত গল্পের পরিবর্তে কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখক বেঁচে থাকেন।

এসব প্রশ্ন একেবারে উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম যুগে আমাদের মনে আসেনি, কারণ তখন গল্প শোনার আগ্রহই আমাদের মধ্যে ছিল প্রবল এবং উপন্যাস এক ধরনের story-teller গোছের ব্যাপার হিসাবেই আমাদের ভালো লেগেছিল। কিন্তু উপন্যাসে আমাদের কাছের মানুষের গল্প শুনতে গিয়ে আমরা কখন যে সেই মানুষটাকেই ভালোবেসে ফেলেছি—মানুষের গভীরগোপন অনুভূতির রহস্য আমাদের আলোড়িত করেছে, বুঝতে পারি নি। তখন আমাদের মনে হয়েছে পরিচিতের ছদ্মবেশে এই অচেনা মানুষকে চেনাই প্রকৃত আনন্দ এবং উপন্যাস আমাদের গল্প

শোনায় বলে এতো প্রিয় নয়, চেনা মানুষের আড়ালে এই অচেনা মানুষকে আমরা খুঁজে পাই বলেই আমাদের এতো আনন্দ হয়। এই চেতনা থেকেই মানুষ ক্রমশ চরিত্রচিত্রণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে, এক সময় এই বিশ্বাসের আধিক্য থেকে মানুষ গড়ে তুলেছে Death of plot নামক সাহিত্যিক আন্দোলন, আজকের দিনেও ফরাসী Anti-novel-এর মূল রহস্যটা চরিত্রচিত্রণের স্বাধীন ও বেপরোয়া মনোভাবের ওপরই অনেকটা নিহিত।

যে-কোনও ব্যাপারেই চরমপন্থী হলে, সৃষ্টিধর্মের চেয়ে স্রষ্টার উৎকেন্দ্রিকতা বড় হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষের কাছে গল্প শোনার আকর্ষণ অনেকটা কম হবেই, অন্তত আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে। কিন্তু তাই বলে গল্পের চাহিদা যে একেবারেই নেই এমন কখনো নয়—কোনো কালেই তা হয় না এবং হয় না বলেই উপন্যাসে বৃত্তগঠনকে একেবারে উপেক্ষা করবার উপায় কখনোই থাকে না। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন তিনি প্রথমে কতকগুলি চরিত্র নির্বাচন করে নেন, পরে তাদের স্বাভাবিক আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে গল্পকে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হলেও শরৎচন্দ্রের কাহিনী-বৃত্ত আমাদের কাছে কখনোই কম আকর্ষণীয় মনে হয় না।

আসলে, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল যা বলেছিলেন—বৃত্ত এবং চরিত্র দুটিই ট্র্যাজেডির অপরিহার্য উপাদান কিন্তু চরিত্রই অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক দৃষ্টিতে উপন্যাস সম্পর্কেও সেটাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কাহিনীগ্রন্থনের দক্ষতা উপন্যাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং উপন্যাস রচনা করতে গেলে তার বৃত্ত সম্বন্ধে কিছুটা পরিকল্পনা ঔপন্যাসিককে করতেই হবে। কাহিনীভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যদি পুরোপুরি অসচেতন থাকেন তাহলে তা লেখকের প্রক্ষিপ্ত চিন্তা হতে পারে, চরিত্র সম্বন্ধে চমকিত উদ্ভাস হতে পারে, বিচ্ছিন্ন নক্সা বা sketch হিসাবে তাকে অত্যন্ত মূল্যবান আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু উপন্যাস নামক শিল্প-প্রকরণের শিল্পরূপ সম্বন্ধে যাবতীয় অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ভালো উপন্যাস হিসাবে তাকে স্বীকার করে নিতে আমরা পারবো না।

এই কারণেই আমরা দেখি আধুনিক উপন্যাসে প্লট রচনা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে, প্লট গ্রন্থনে কিছু শৈথিল্য হয়তো কেউ কেউ দেখিয়েছেন কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রবণতা বিশেষ নেই। 'বিষবৃক্ষের' মতো কাহিনী-ভারগ্রস্ত উপন্যাসের কথা হয়তো আমরা চিন্তা করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে বুদ্ধদেব বসুকেও লিখতে হয় 'তিথিডোর'-এর মতো উপন্যাস, বিমল করের 'অসময়' চরিত্র ও বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস হয়েও তাই গল্পও বলে মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

চরিত্র সম্বন্ধে আধুনিক লেখক বেশি আগ্রহী হবেন এটাই স্বাভাবিক, কারণ উপন্যাস যে গল্প শোনায় তা মানুষের গল্প বলেই বেশি আকর্ষণীয়, নিছক গল্প বলে নয়। লেখক যখন একটি নিটোল গল্প বেছে নেন তখনও কিন্তু মানুষের বিচিত্র জীবনচর্যাই তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্প, সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' বা 'টানাপোড়েন'-এর কথা ভাবলেই আমাদের এই উক্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। অথবা মনে করা চলে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলির কথা; সেখানে গল্প আছে, কিন্তু তা আছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উপস্থিত করার জন্যই। একই ঔপন্যাসিক কখনো গল্প শুনিয়েছেন, কখনো আবার গল্প বর্জন করেছেন,

এমন দৃষ্টান্তও আমরা অনেক পাই। শরৎচন্দ্র যতোই চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা বলুন, তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে আমরা মোটামুটি নিটোল গল্পের শরীরই পাই যা তৈরি হয় গূঢ় মনস্তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম সেন্টিমেন্টের মালমশলা দিয়ে। অথচ শরৎচন্দ্রও 'শেষ প্রশ্ন'-এর মতো উপন্যাস লিখেছেন যেখানে গল্প তৈরি করার ব্যাপারে তাঁকে শতকরা দশ ভাগও আগ্রহী মনে হয়নি। গল্প একেবারেই তৈরি করবো না, গল্প হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলে বরং তা ভেঙে দেবো—এই ধরনের মানসিকতা ছিল সে কালের জগদীশ গুপ্তের; এ কালে দেবেশ রায় বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে খানিকটা এই মনোভঙ্গির লেখক বলতে পারি। সেই জগদীশ গুপ্তও কিন্তু 'সুতিনী' উপন্যাসে গল্পগ্রন্থনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন—সে আগ্রহ যতোই কম বলে মনে হোক বিশুদ্ধ গল্পকথকদের তুলনায়, কিন্তু আগ্রহ তিনি নিঃসংশয়িত ভাবেই দেখিয়েছেন। গল্পপ্রধান উপন্যাসের জন্যই প্রধান খ্যাতি সমরেশ বসুর, এমনকি ছোটগল্পের আসরেও বিশুদ্ধ গল্পহীন ছোটগল্প তিনি লেখেননি বিশেষ। অথচ 'বিবর', 'পাতক', 'প্রজাপতি' —এই ধারার উপন্যাসে গল্পের সচলতা বা প্লটগ্রন্থন তিনি প্রায় বর্জন করেছেন। এ কালের দুই শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সুনীল জানেন তাঁর প্রিয় পাঠক গল্প শুনতে ভালবাসেন, তাই গল্প তিনি বর্জন করেন না, অথচ ছোট ছোট কিছু কথায়-বর্ণনায়-সূক্ষ্ম মন্তব্যে চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তুলনায় চরিত্রসৃষ্টিতেই আগ্রহ বেশি শীর্ষেন্দুর, কিন্তু প্লটগ্রন্থনের ঔপন্যাসিক বুদ্ধিও যে তাঁর কম নেই এবং এ বিষয়েও যে তিনি যথেষ্ট সজাগ, তাঁর দীর্ঘ উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ।

৬. উপন্যাসের উদ্ভব: প্রেক্ষিত ও পূর্বসূত্র

উপন্যাস নামক সাহিত্য-প্রকরণের উদ্ভব এবং এর পূর্বসূত্র সন্ধান করতে গিয়ে আলোচকগণ প্রায়ই সাহিত্যের মধ্যযুগে নিপুণ পর্যবেক্ষণ চালান। এর সম্ভাব্য কারণ, উপন্যাস বলতে ঠিক যে দু-ধরনের রচনা এখন বুঝে থাকি—নভেল ও রোমান্স, সে দুটিরই পূর্বসূরী মধ্যযুগে সন্ধান করা সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসের উদ্ভবের যে প্রেক্ষিত উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আমাদের এ কথা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই বিশ্বাস করা উচিত যে আধুনিক যুগের আগে, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আধুনিক মানসিকতা জন্ম নেবার আগে, উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। তিনি যে বিশিষ্ট মন্তব্যগুলি করেছেন তা এই যে, প্রথমত, 'সর্ব শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত'; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আত্মমর্যাদাবোধের জাগরণভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভও এর আবশ্যিক শর্ত। এই কারণেই তাঁর অভিমত—'পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।'

এই কারণেই উপন্যাসের স্বীকৃতি একটি পৃথক প্রকরণ হিসাবেই দিতে হবে এবং মধ্যযুগীয় কোনও সাহিত্য-প্রকরণের সঙ্গে যদি তার কোনো দূরাগত সম্পর্কসূত্র থাকেও তবে মধ্যযুগীয় সেই সাহিত্যলক্ষণের সঙ্গে উপন্যাসকে নির্বিচারে মেলানো মোটেই যুক্তিসংগত হবে না।

বাংলা উপন্যাস বলতে যেমন আমরা ইংরেজি নভেল ও রোমান্স উভয়কেই বুঝি, বেশির ভাগ ইউরোপীয় ভাষাতেও উপন্যাসের প্রতিশব্দ হল 'রোম্যান'। এতেও মনে হয় রোমান্স ও নভেল ব্যাপার দুটি খুব কাছাকাছি, কারণ রোম্যান শব্দটি নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় রোম্যান্স শব্দ থেকেই গঠিত হয়েছে। ইংরেজিতে নভেল শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'নভেলা' শব্দ থেকে যার সঠিক অর্থ হল ছোট্ট একটা নতুন জিনিস—অর্থাৎ গদ্যে লেখা ছোট নতুন ধরনের রচনা। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী দেশে এই ধরনের রচনা ছিল খুব জনপ্রিয়—এদের মধ্যে কিছু ছিল বেশ গুরুগম্ভীর রচনা, কিছু ছিল কুৎসামুলক। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোক্কাচ্চিও-র 'ডেকামেরন'।

নভেলের উৎস যদি একভাবে মনে করা যায় এই নভেল্লা-কে, তবে অন্যভাবে আর এক রকমের রচনাকেও এর পূর্বসূরী মনে করেন কেউ কেউ। এই ধরনের রচনা প্রথম উদ্ভূত হয় স্পেনে, ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে—এগুলি পিকারেস্ক আখ্যান বা পিকারেস্ক নভেল নামেই পরিচিত। অবশ্য স্পেনে এর উদ্ভব হলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় আখ্যান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং প্রায় সর্বত্রই তা লেখা হচ্ছিল। এই আখ্যান আসলে দস্যু ডাকাতদেরই গল্প, যারা অসামাজিক কাণ্ডকারখানা করলেও সাধারণ পাঠকের কাছে তারা বীরপূজা পেতো। পরবর্তী কালে এই ধরনের রচনা অনেক লেখা হয়েছে। ফরাসী ভাষার লেখা 'জিল ব্লাস' পিকারেস্ক আখ্যানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা ভাষায় লেখা 'রঘু ডাকাত' বা শশধর দত্তের 'দস্যুমোহন' এই জাতীয় রচনা। কোনো কোনো রচনায় নভেল্লা ও পিকারেস্কের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, যেমন সারভানতিসের লেখা 'ডন কুইকজোট'। একে আধুনিক উপন্যাসেরও পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

সাধারণভাবে দেখা গেল নভেল ও রোমান্স দুইই উৎসমুখে প্রায় অভিন্ন হয়ে ছিল, আধুনিক কালেও উপন্যাস বলতে আমরা এই দুটি শাখাকেই বুঝে থাকি। এদের মূলগত কোনো প্রভেদ আছে কিনা বুঝবার জন্য প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

চ. নভেল ও রোমান্স

বাংলায় যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি উপন্যাস, ইংরেজিতে তা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নভেল ও রোমান্স। মধ্যযুগে যে জাতীয় রচনা রোমান্স হিসাবে পরিচিত ছিল তা বীরত্বব্যঞ্জক এক ধরনের অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনী বলেই প্রচলিত ধারণা এই যে, নভেল বলতে বোঝায় আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত মানুষের জীবনকাহিনী এবং রোমান্স হল উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে লেখা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক ধরনের রচনা। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাদের কারো কারো মধ্যে এই ধারণা এখনো বর্তমান, অন্তত এ বিষয়ে তাদের আলোচনাগ্রন্থ পাঠ করলে তাই মনে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের আদিযুগের উপন্যাস আলোচনায় এই জাতীয় ধারণা আমরা দেখি। যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে লেখা Progress of Romance গ্রন্থে Clara Reeve লিখেছেন—"The Novel is a picture of real life and manners, and of the time in which it is written.

The Romance, in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen."

একথা যদি সত্যি হতো, অর্থাৎ রোম্যান্স যদি হতো উচ্ছ্বাসময় ও বর্ণাঢ্য ভাষায় এমন জিনিসেরই বর্ণনা যা কখনো ঘটেনি বা ঘটতে পারে না, তাহলে তাকে আর যাই বলা হোক উপন্যাস বলা চলতো না। কারণ, মধ্যযুগে কোন প্রকরণের কী ধর্ম ছিল তা জানার চেয়ে একথা জানা অনেক বেশি আবশ্যক যে বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান শর্ত। আধুনিককালের যে সাহিত্য-প্রকরণ বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে, তার একটি প্রধান বিভাগ অবাস্তব কল্পনাবিলাস কখনোই হতে পারে না। যদি তা হতো তাহলে তাকে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিভাগ হিসাবেই আমরা কখনোই মেনে নিতাম না। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম যে দুটি আখ্যান রচনা করেন—'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা', তারা বিশুদ্ধ রোমান্স হিসাবেই অভিহিত হতে পারে। এই দুটি রোমান্স রচনা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দিয়েছি বাংলা উপন্যাসে সার্থক পথিকৃতের সম্মান, অথচ সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে আখ্যান রচনা করা সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্র বা হুতোম প্যাঁচাকে সে সম্মান আমরা দিতে পারিনি—এই ঘটনাই প্রমাণ করে, রোমান্স জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কল্পনাবিলাস হতে পারে না।

কথাটা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন মধ্যযুগের রোমান্সের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত রোমান্সের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাঁর মতে, "আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই।"

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য সমালোচকও যে ব্যাপারটা স্বীকার করেন এ কথা বোঝাবার জন্য এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত Theory of Literature (লেখক Rene Welleck এবং Austin Warren) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করতে পারি—"the novel develops from the lineage of non-fictitious narrative forms– the letters, the journal, the memoir or biography, the chronicle, the history; ... The romance on the otherhand, the continuator of the epic and the medieval romance, may neglect verisimilitude of detail (the reproduction of individuated speech in dialogue, for example), addressing itself to a higher reality, a deeper psychology."

আসলে বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান শর্ত বলে তা নভেল ও রোমান্স উভয় প্রকার উপন্যাসেরই বিশিষ্ট লক্ষণ—রোমান্সকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ও কল্পনাচারী মনে করার কোনো কারণ নেই। উপন্যাস মানেই মানবিক অনুভূতি ও মানবিক দুর্বলতার কাহিনী। যখন এই কাহিনী লেখক সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, চেনা মানুষ ও পরিচিত জীবন-চর্চা থেকে, তখন সৃষ্টি হয় নভেলের; যখন এই ধরনের কোনও মানবিক কাহিনীর সন্ধান লেখক পেয়ে যান ইতিহাসের বৃত্ত থেকে এবং সেই কাহিনী অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেন তখন জন্ম হয় রোমান্সের। তবে রোমান্সের ক্ষেত্রে

'detail'-এর যে প্রয়োজন নেই বলা হয়েছে Theory of Literature গ্রন্থে, বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছেন 'সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে' সে কথার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেতে গেলে আমাদের অ্যারিস্টটলের শরণাপন্ন হতে হবে। এর উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি, এখন পুনর্বার তা স্মরণ করছি।

ইতিহাসের সত্য ও কাব্যের সত্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অ্যারিস্টটল দেখিয়েছিলেন ইতিহাস ঘটমান সত্য বা possibility-এর কথাই বলে, কাব্য আশ্রয় করে সম্ভাব্য ঘটনা বা probables-কে। অর্থাৎ ঘটেছে, এই ব্যাপারটাই যখন ইতিহাসের প্রধান বিবেচ্য, কাব্যের বিবেচনার বিষয় তখন তার সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এই সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাই নভেল ও রোমান্সের সম্বন্ধসূত্র, কারণ উপন্যাসেরও তা প্রধান শর্ত। নভেল ও রোমান্সের পার্থক্য এই যে, নভেল যখন সম্ভাব্য ঘটনা বা probable possibility-কে গ্রহণ করে, রোমান্স তখন সম্ভাব্য অঘটন বা probable impossibility-কেও গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু যে-কোন ক্ষেত্রেই probability বা সম্ভাব্যতাকে বজায় রাখতেই হবে, নতুবা তাকে আমরা উপন্যাস বলতে পারবো না।

রোমান্স বলতে অবশ্য তার দুটি বিভাগের কথা বোঝায়—ঐতিহাসিক রোমান্স এবং কাব্যিক রোমান্স। কোনও মানবিক আখ্যান যখন লেখক সংগ্রহ করেন ইতিহাসের পরিমণ্ডল থেকে তখন তাকে আমরা বলি ঐতিহাসিক রোমান্স কিন্তু লেখক যখন সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে তা উদ্ভাবন করেন তখন তাকে আমরা বলি কাব্যিক রোমান্স। অবশ্য ঐতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গে নভেলের পার্থক্যটা ততো স্পষ্ট এতে বোঝা যাচ্ছে না, সুতরাং সেই পার্থক্যটা আর একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

উপন্যাস রচনা ও কাব্যরচনার মধ্যে পদ্ধতিগত একটা বিরাট পার্থক্য আছে। উপন্যাসের লেখক তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে, চোখে দেখা মানুষ এবং তাদের জীবনযাপন থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী সুগ্রথিত প্লটবিন্যাসের সাহায্যে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের কাছে প্রথম আসে অভিজ্ঞতা, তারপর আসে সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে কবির মনে প্রথমেই আসে সিদ্ধান্ত বা একটি ধারণা, সেই সিদ্ধান্ত বা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কল্পিত কাহিনী রচনা বা সৃষ্টিকর্মে উৎসাহী হন। এই যে ঔপন্যাসিক ও কবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বৈপরীত্য দেখানো হল, এটা না মেনে যখন ঔপন্যাসিক কবির পদ্ধতিতে সৃষ্টিকার্যে আগ্রহ দেখান—অর্থাৎ আগে একটি ধারণা মনে লালন করেন ও পরে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কল্পিত পটভূমি, চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টি করেন, তখন কাব্যিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এই উপন্যাসকে বলে কাব্যিক রোমান্স। নভেলের পদ্ধতির চেয়ে এর সৃষ্টিপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ দেখিতে না পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেউ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে

পারে''—এই প্রশ্ন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র সে কথা এইভাবে তাঁর 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানিয়েছেন। এই চিন্তা এবং সে সম্বন্ধে প্রাক্-সিদ্ধান্ত নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এর দু-বছর পরে রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। একটি ধারণা থেকে এই উপন্যাসের জন্ম—তাকে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করবার জন্য তিনি পরিবেশ নির্বাচন করেছেন, বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভাবন করেছেন, কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ পদ্ধতির দিক থেকে কাব্যিক রীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও একটি উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। এই কারণেই একে বলা যায় কাব্যিক রোমান্স।

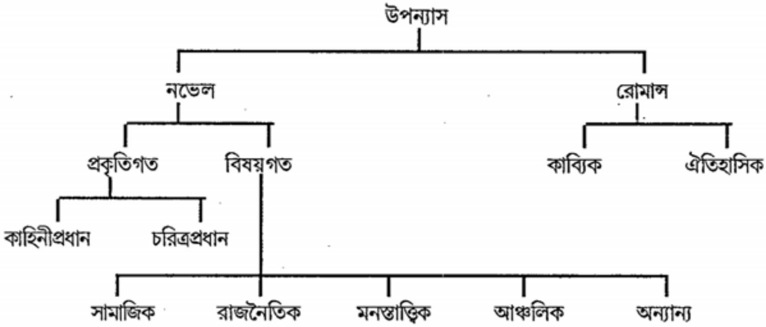
একটা কথা এই প্রসঙ্গেই অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাব্যময় ভাষায় লেখা হয়েছিল বলেই 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যিক রোমান্স নয়—যদিও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে 'কপালকুণ্ডলা'-র ভাষা কোনো প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন কারো পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কপালকুণ্ডলা কাব্যিক এই কারণেই যে পদ্ধতিগত ভাবে এই উপন্যাসে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা সচরাচর ঘটে না, অর্থাৎ তা Possible নয়। আমরা কেউই উপন্যাসে বর্ণিত নির্জন সমুদ্রতটে কাপালিক-প্রতিপালিতা ওরকম সুন্দরী নারীর কথাও খুব সহজে ভাবতে পারি না এবং সঙ্গীদল পরিত্যক্ত অবস্থায় বিভ্রান্ত ভাবে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ওই অপরূপ নারীর কণ্ঠে 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' শুনবো এ কথা ভাবতে পারি না—যদিও তার সম্ভাবনা থাকলে অনেকেই হয়তো হাজার বার পথ হারাতে রাজি থাকবে।

আবার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসও, কারণ রোমান্সও উপন্যাসেরই একটি বিভাগ মাত্র। তাই ঘটমানতা (possibility) না থাকলেও এর সম্ভাব্যতা (probability) এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে আদ্যন্ত কাল্পনিক এবং সাধারণভাবে কিছুটা অবিশ্বাস্য এই কাহিনী শুরু হয়েছে এইভাবে—''প্রায় দই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।'' অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্যই কাহিনীকে তিনি পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আড়াইশো বছর, যাকে তিনি বর্তমানের কাহিনীও বলতে পারতেন; অথচ মোটামুটি সঠিক সময়ের (''মাঘ মাসের রাত্রিশেষে'') উল্লেখ করেছেন ওই একই কারণে। এটি অবশ্য রোমান্স রচনায় তাঁর পরিচিত পদ্ধতি, প্রসঙ্গত প্রথম উপন্যাসটির সূচনা-বাক্যও স্মরণ করা যেতে পারে—''৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিল।''

উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির যে প্রয়াস সূচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই কারণেই ভিক্ষুক গয়না দেবার পর তার উদ্‌ভ্রান্ত পলায়ন এবং কপালকুণ্ডলার 'ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?' উপন্যাসে এসেছে, পতি-সোহাগবঞ্চিতা শ্যামাসুন্দরীর প্রসঙ্গ এসেছে এবং মতিবিবির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এইসব কারণেই এমন একটি অসাধারণ বিষয়ও সম্ভাব্যতার স্পষ্টতায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, কাব্যিক রোমান্স হিসাবেও তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে বলেই এর প্রচুর স্বীকৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় R. W. Fraser-এর অবিস্মরণীয় মন্তব্য—"Outside in 'Mariage de loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history of Western fiction."

ছ. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—নভেল ও রোমান্সই এর সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং অন্তরঙ্গ বিভাগ। অবশ্য আর একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে রোমান্সের উপবিভাগ সম্ভব, সেও আমরা দেখেছি। সেভাবে দেখতে গেলে নভেলেরও উপবিভাগ সম্ভব, এবং তার সংখ্যা অনেক বেশিই দাঁড়াবে, কারণ এর প্রকৃতিগত একটা উপবিভাগ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে বিষয়গত উপবিভাগ। বিষয়গত উপবিভাগের আলোচনা, অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তুভিত্তিক আলোচনা সাধারণভাবে প্রকরণগত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বলে মনে হতে পারে; তবে এরও কিছুটা সার্থকতা আছে। আগে উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগটি একটি ছকের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করা যাক—



নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগের কথা, ঠিক বিভাগ হিসাবে না হলেও, উল্লেখ করা হয়েছিল। উপন্যাস-সৃষ্টির আদিযুগে কাহিনীর ওপরই প্রাধান্য থাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই—কারণ গল্পের আকর্ষণই তখন পাঠকের কাছে প্রধান। এরপর যখন চরিত্রের আচরণ এবং তার অতলশায়ী মনস্তত্ত্ব আমাদের অভিভূত করে তখন গল্পের চেয়েও অনুভূতির এই দিক্-পরিবর্তন আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। যে-কোনও একটি ব্যাপারে আতিশয্য দেখা গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য দিকটি পরবর্তীকালে আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে এসে যায়। এই কারণেই উপন্যাসে কখনো গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, কখনো চরিত্রচিত্রণের।

নভেলের বিষয়বস্তু অনুসারে তার শ্রেণীগত নাম পরিবর্তিত হয়ে থাকে, যেমন সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি। বিষয় অনুযায়ী এই পরিবর্তন যেহেতু প্রকৃতিগত পরিবর্তন নয়, কোনো কোনো সমালোচক প্রকরণভিত্তিক আলোচনায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নাও হতে পারেন। এই মতকে অসম্মানিত না করেও বলা যায় বিষয়ের বিভাগ প্রকরণ হিসাবেও তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দান করে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতাও সাহিত্যালোচনার এই প্রবেশিকা-পুস্তকে ব্যাখ্যা করে রাখা ভালো; তাতে অনাবশ্যক অনেক বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ কিছুটা জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে এই কারণেই, যে ঔপন্যাসিক প্রকৃতি এবং উপন্যাসের লক্ষণও এর সঙ্গে মিশে থাকে। সামাজিক,

আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি লক্ষণ উপন্যাসমাত্রেই এমন নির্বিশেষ বা সাধারণ লক্ষণ যে প্রায় সব উপন্যাসেই এই লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই কোনো বিশেষ উপন্যাসে এদের মধ্যে একটি লক্ষণের ভিত্তিতে নামকরণ প্রাথমিকভাবে অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। যেমন, উপন্যাস আধুনিক জীবনের আলেখ্য বলেই যে সমস্যা সেখানে আলোচিত হয় প্রায়শই তা সামাজিক সমস্যা হবারই সম্ভাবনা থাকে এবং যে সব পাত্রপাত্রী উপন্যাসে সৃষ্ট হয় তারাও নিঃসন্দেহে সামাজিক মানুষই হয়ে থাকে। সুতরাং সামাজিক হওয়াকে উপন্যাসের সামান্য ধর্ম বলেই আমরা মনে করতে পারি। একই ভাবে বলতে পারি, আধুনিক মানুষ তার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন বলেই রাজনীতি এখন আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া একটি গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী হিসাবে যাকে রাজনৈতিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয়, নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে পরোক্ষ উপায়ে সাহায্য করতে হয়, রাজনীতি সম্বন্ধে অসচেতন হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। এই কারণেই আধুনিক মানুষের জীবনালেখ্যে রাজনীতিও একটি সামান্য ধর্ম হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নামকরণটিই আমাদের অস্বস্তিকর মনে হতে পারে এই কারণে যে উপন্যাস যেহেতু একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরই কাহিনী, সুতরাং আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে তো সেখানে থাকতেই পারে—সব উপন্যাসেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আমরা কেন চিন্তা করবো সে ব্যাপারটাই আমাদের বোধগম্য না হতে পারে, কারণ উপন্যাস যখন আধুনিক মানুষের কাহিনী তখন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও তো তার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য—মানুষের জটিল ও অনধিগম্য মনের রহস্যই যদি ধরার চেষ্টা না করা হল তাহলে তা আধুনিক মানুষের গল্প হল কেমন করে। সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক রহস্যকে বাদ দিয়ে উপন্যাস কেমন করে লেখা হয় সেটাই তো আমরা ভেবে পাই না।

ঠিক সেই কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীবিচার করবার সময় নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কেউ যাকে বলেছেন সামাজিক উপন্যাস অন্য কেউ তাকে বলেন রাজনৈতিক, কারণ সামাজিক উপন্যাসে রাজনীতি অবশ্যই থাকতে পারে—এবং সেক্ষেত্রে কাউকে ভুল প্রতিপন্ন করা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হয়ে পড়ে। আবার কোনো রাজনৈতিক উপন্যাসকে যখন কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক, কিংবা এর উল্টো ব্যাপারটাই যখন ঘটে তখনও আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, কারণ রাজনৈতিক উপন্যাসে যেমন মনস্তত্ত্ব থাকতেই পারে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও তেমনি রাজনীতি।

সুখের কথা, এই সব বিভ্রান্তি দূর করার সঠিক উপায় আছে, কারণ ব্যাপারটা সত্যিই এতোটা ভ্রান্তিমূলক নয় এবং সামান্য ধর্ম হিসাবে একটি উপন্যাসে উল্লিখিত সব কটি লক্ষণ থাকলেও শ্রেণীভিত্তিক নামকরণ অযৌক্তিক নয় এবং আমরা সুনির্দিষ্ট এবং নিঃসংশয়িত এক মাপকাঠিতেই এই ধরনের বিচার করে থাকি। সেই মাপকাঠি ও শ্রেণী-বিভক্তিকরণের ব্যাপারটাই আমাদের ভালো করে জেনে রাখতে হবে।

উপন্যাসের সামান্য ধর্ম হিসাবে অনেক লক্ষণই থাকতে পারে কিন্তু একটি বিশেষ উপন্যাসকে, কিংবা বলা যায় একটি বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাসকে, নিয়ন্ত্রণ করে একটি বিশেষ ধর্ম—একে বলা যায় তার কেন্দ্রীয় শক্তি, যে শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে। যেমন সামাজিক মানুষ নিয়ে উপন্যাস রচিত হবে, একে উপন্যাসের কোনো বিশেষ ধর্ম মনে করার

কোনো কারণ নেই, কিন্তু এক-একটি সময়ে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই যখন কোনো বিশেষ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে ওঠে তখনই উপন্যাসের শ্রেণী সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি—তা বিধবাবিবাহের সমস্যা হতে পারে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার গল্প হতে পারে, অথবা হতে পারে আরো সাম্প্রতিক কালের এক ইউনিটের পরিবার এবং সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। অবশ্য শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসকেই আমরা সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি না, আমাদের দেখতে হবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি সামাজিক ব্যক্তির মতো আচরণ করছে কিনা এবং সমাজের সেই সমস্যা লেখক যথার্থভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা—এক কথায় সামাজিক সমস্যা সেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা। উদাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, বিধবাবিবাহ এক সময় আমাদের সমাজে একটি প্রবল সমস্যা হিসাবেই উপস্থিত ছিল এবং এ নিয়ে প্রচুর নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সামাজিক নাটক ও উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর ওপর জোর করে বৈধব্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সমস্যাটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঘটিত। বরং তুলনামূলকভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে এই সমস্যা ঔপন্যাসিক জটিলতার অনেকটা কাছে এসেছে—রোহিনীর সমগ্র আচার-আচরণ এবং নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপ তার বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত মনে হতে পারে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'সমাজ' উপন্যাসে বিধবাবিবাহের সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-র মতই সচকিত ভাষণ দিয়েছেন প্রায় সর্বত্র, এই সমস্যা যে কতো গভীর তা বার বার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের মাধ্যমে একটি বিধবাবিবাহ সম্পাদন করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যাটিকেই তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। যে সমাজে সমান কুলমর্যাদার পাত্র না পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে সামাজিক কাজকর্মের অসুবিধা দেখা দেয়, সেখানে বিধবাকে বিবাহ করলে প্রকৃত সমস্যার উদ্ভব হয় বিবাহের পর থেকেই। অথচ বিবাহেই উপন্যাসের উপসংহার টেনে দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক দায়িত্ব শেষ করেছেন।

রাজনৈতিক উপন্যাস বিচার করতে গেলেও আমাদের এই অভিন্ন সূত্রেই তা করতে হবে। রাজনীতি অল্পবিস্তর সব উপন্যাসেই থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'-তে রাজনীতি আছে, 'চার অধ্যায়'-এ আছে—সাম্প্রতিককালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসেও আছে। কিন্তু যখন শ্রেণী হিসাবে তাদের রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায় কিনা বিচার করতে হবে তখন দেখতে হবে রাজনৈতিক সমস্যাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিনা এবং সমস্ত রকমের জটিলতা রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে কিনা; এক কথায় রাজনীতি সমগ্র উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। এইভাবে বিচার করতে গেলে অনেক সময়ই দেখা যাবে রাজনীতি উপন্যাসের সমসাময়িক প্রেক্ষিত পরিস্ফুট করবার জন্য বা আবহ রচনার জন্য যতোখানি ব্যবহৃত হয়েছে, উপন্যাসের প্রকৃত সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টির জন্য ততোখানি নয়। অবশ্য এর বিপরীত দৃষ্টান্তও থাকতে পারে। রাজনীতির স্রোত আপাতভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ তার অন্তঃসলিলা স্রোত সর্বদাই অনুভূত হচ্ছে, এরকম হতেই পারে।

বস্তুত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অভিধাটিও প্রায় এই কারণেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী বিশেষ কোনো অঞ্চলে ঘটবেই, কিন্তু সেই অঞ্চলের যদি নিজস্ব কোনো চরিত্র থাকে, যদি পাত্রপাত্রী সেই অঞ্চলসম্ভব মানুষ হয় এবং অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ যে অঞ্চলে উপন্যাসটি গ্রথিত হয়েছে সেই অঞ্চলটিই যদি হয়ে ওঠে

উপন্যাসের একটি অনির্দেশিত চরিত্র, তখন উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক অভিধায় চিহ্নিত করি আমরা। তবে বিচারের সূক্ষ্মতা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে, কারণ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নেই বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নেই এমন কোনও আধুনিক উপন্যাসের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তবু মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নামক শ্রেণীটি আমরা স্বীকার করে নিই উপন্যাসে যখন মনস্তত্ত্ব থাকে সেই কেন্দ্রীয় ভূমিকায়—নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে।

আমরা এই ধরনের শ্রেণী বিচারের জন্য আরো একটা পরোক্ষ প্রমাণের আশ্রয় নিতে পারি, এবং মনে হয় সেই প্রমাণটিও বিশেষ দুর্বল নয়। উপন্যাসে যার ভূমিকা আমাদের সাধারণ ভাবে বেশি মনে হবে, আমরা যার ভিত্তিতে তার শ্রেণীভুক্তি করতে মনস্থ করবো, মনে মনে সেই ব্যাপারটিকেই উপন্যাস থেকে সরিয়ে দিয়ে দেখতে পারি উপন্যাসের কী চেহারা হয়। দেখা যাবে অন্য সব লক্ষণ বাদ দিলে, দুর্বলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, কিন্তু এই কেন্দ্রীয় অবলম্বনচ্যুত হলে সেটি আর দাঁড়াতে পারে না, উপন্যাসটি লেখারই কোনো সার্থকতা থাকে না তাহলে। এই বিচারের পদ্ধতিও আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারি।

জ. ঐতিহাসিক উপন্যাস

খুব স্থূল অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি এমন উপন্যাস যার পটভূমি হচ্ছে ইতিহাস এবং বেশ কিছু চরিত্র গ্রহণ করা হয়েছে ইতিহাস থেকেই। উপন্যাসের মূল সমস্যাটি যেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে থাকে এবং ইতিহাসের ধারণাই যেন অব্যাহত থাকে, এটাও আমরা প্রত্যাশা করি। সেই জন্যই স্থূলভাবে দেখতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-ও যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লুৎফ-উল্লা'-ও তাই; আবার ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্ট্রাফের 'কুইনহো হল'-ও তাই। সূক্ষ্ম অর্থে অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্য তাৎপর্য আছে, তবে সে কথা বলার আগে এর যে দু-একটি প্রকারভেদের কথা সমালোচকগণ উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে কোনো কোনো সমালোচক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—বিশুদ্ধ ও মিশ্র ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসে যখন ইতিহাসই থাকে পুরোপুরি ভাবে এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস' সেই রসস্ফূর্তির দিকে যখন ঔপন্যাসিকের সম্পূর্ণ সচেতনতা থাকে, তখন তাকে বলে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেমন কেনেথ রবার্টস্-এর 'নর্দওয়েস্ট প্যাসেজ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি। মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসকে উপলক্ষ করে রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থাও প্রধানভাবে বর্ণিত হতে পারে। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা আনাটোল ফ্রান্সের 'থেইস', থ্যাকারের 'এসমন্ড', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করতে পারি।

প্রায় একই ধরনের আর-একটি বিভাগ কেউ কেউ করে থাকেন। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে—প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা রাখেন ঔপন্যাসিক, যেমন রমেশচন্দ্র দত্তর 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস আমরা বলি তাদের যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে ইতিহাসকে আশ্রয় করেন লেখক কিন্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য—ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠ থাকার চেয়ে কাল্পনিক কাহিনী পরিবেষণেই তাঁদের আগ্রহ থাকে বেশি। এর উদাহরণ হিসাবে স্কটের 'কেনিলওয়ার্থ', 'আইনভ্যান হো', জর্জ এলিয়টের 'রমলা', টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস্', রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' প্রভৃতির নাম করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঠিক লক্ষণ বুঝে নিতে হলে আমাদের আরো সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে। এর জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে অ্যারিস্টটলের ঐতিহাসিক সত্য ও কাব্যিক সত্যের প্রভেদবিষয়ক মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখা। সেগুলি ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সুতরাং পুনর্বার উল্লেখের বোধহয় কোনও প্রয়োজন নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলে তা বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এটি প্রাথমিক ভাবে উপন্যাস—'ঐতিহাসিক' তার বিশেষণমাত্র। সুতরাং প্রথমে তাকে উপন্যাস হতেই হবে, এবং উপন্যাস হতে গেলে তাকে এমন মানবিক অনুভূতির গল্প শোনাতেই হবে যা আধুনিক মানুষকে আকর্ষণ করে—যার মধ্যে তথ্য নয়, হৃদয়ের আকুলতাই প্রধান। যদি এইরকম কোনও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ কাহিনী ইতিহাস লেখক সন্ধান করতে পারেন তবেই তিনি ইতিহাসকে তাঁর কাহিনীসূত্র হিসাবে বেছে নেবেন। ইতিহাসে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার বিবরণ থাকে, বিলাসী রাজার কথা থাকে, বিলাসিনী নবাবজাদীর কথা থাকে—কাহিনীপ্রিয় অপ্রাপ্তমনস্ক পাঠকের আগ্রহ তা নিশ্চয়ই আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আধুনিক পাঠক সর্বদাই সন্ধান করবেন মানবিক কাহিনী—তা যেখান থেকেই আহরণ করা হোক না কেন। সম্ভবত এই কারণেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা এতো দুরূহ। একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ করলেই এই দুরূহতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

● একটি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি গ্রহণ করাই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি, কারণ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র কম লেখেননি—বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ইতিহাস অনুপ্রবেশ করেছে, অথচ তিনি নিজেই বলেছেন—"আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

অবশ্য এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়, তাই আলোচনার জন্য আমাদের এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণকেই গ্রহণ করা উচিত। এর আরো একটা কারণ এই যে, প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ এবং চতুর্থ সংস্করণের রাজসিংহের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। এই সর্বশেষ সংস্করণে এর আয়তনই যে পাঁচগুণ বেড়েছে তাই নয়, জেবউন্নিসা উপাখ্যান এবং ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার কাহিনী একেবারে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সর্বশেষ সংস্করণেরই সমালোচনা করেছিলেন এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেছন—এক, এর তীব্র গতি, এবং দুই, 'বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কে একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।' কিন্তু সম্ভবত একটি ত্রুটিপূর্ণ দিকও এই সমালোচনায় আছে, যেখানে তিনি ইতিহাস ও উপন্যাস অংশকে পৃথকভাবে গ্রহণ করে তার নায়ক-নায়িকা বিচার করেছেন। এই দুই অংশ যদি সত্যিই পৃথক হয়ে থাকে তবে তাকে কখনোই সার্থক ঐতিহাসিক বলা যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ আমরা উপস্থিত করছি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে মূল কাহিনী চঞ্চলকুমারীর, তিনি মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজপুত বীর রাজসিংহের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাজসিংহ তাঁর সাধ্যমত রণনৈপুণ্য প্রকাশ করে চঞ্চলকুমারীর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই মূলকাহিনীর সঙ্গে অন্তত দুটি উপকাহিনী আমরা পাই—প্রধান, দরিয়া-জেবউন্নিসা-মবারক প্রণয়বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয়, নির্মলকুমারী-মানিকলাল-ঔরঙ্গজীব কাহিনী। সমগ্র উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা নিতান্ত কম নেই, রাজপুত-মোগলের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ইতিহাসের একটি পর্যায়কেও লেখক বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন, তবু বলতে হবে তিনি নির্বাচন করেছেন কিছু মানবিক কাহিনী যার অন্তর্বাহিনী ঐক্যসূত্র প্রেম। চঞ্চলকুমারীর প্রেম বীরপূজা হিসাবে অভিহিত হতে পারে। রাজকুমারী কেবল নিজের রাজ্য উদ্ধার করবার জন্যই রাজসিংহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিনা, প্রবীণ রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করার ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ আছে কিনা, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েই এই রাজপুত বীর তাঁকে পত্নী হিসাবে বরণ করেছিলেন।

তবে এর সঙ্গে উপকাহিনী হিসাবে জেবউন্নিসার যে বিচিত্র প্রেমাকর্ষণের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে তেমন চিত্তাকর্ষক এবং রোমহর্ষক কাহিনী ইতিহাসের বৃত্ত ছাড়া সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না, অথচ এর মানবিক আবেদন আমাদের অভিভূত করে। জেবউন্নিসা আজন্ম রাজকীয় গর্বে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য এটাই বিশ্বাস করতেন যে নবাবজাদীর জন্য প্রেম নয়, কারণ প্রেমে অনেক দুঃখ আছে—তিনি ভোগ করবেন এবং তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধ মবারকের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করবেন, কিন্তু তার প্রতি প্রেমের আকর্ষণ কখনই বোধ করবেন না। এই অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও আঘাতের ছদ্মবেশে মবারকের প্রতি প্রেম যে কখন জাগ্রত হয়েছে হৃদয়ে, জেবউন্নিসা বুঝতেও পারেননি, পারলেন যখন তখন তাঁর নবজন্ম ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আলোচনার অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলি উদ্ধার করার প্রলোভন সামলানো শক্ত—"বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। ... তাহার পরে আর সুখ পাইল না। কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।"

ঔরঙ্গজীব ও নির্মলকুমারীর যে বিক্ষিপ্ত উপকাহিনী এই উপন্যাসে পরিবেষিত হয়েছে, সেখানেও ইতিহাসের ঔরঙ্গজীব মানবিক মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। সেই কারণেই আমরা বুঝতে পারি লেখক উপন্যাসের দাবি মিটিয়েছেন সবার আগে। অর্থাৎ ইতিহাস থেকে তিনি এমন আখ্যানই নির্বাচন করেছেন অথবা সেই কাহিনীকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যাতে

তার মানবিক আবেদনই প্রাধান্য পায়। তাই রাজসিংহ বড়ো যোদ্ধা ছিলেন অথবা ঔরঙ্গজীব —এই প্রশ্নের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে রাজসিংহ মানুষ হিসাবে কতো বড়ো ছিলেন এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীব ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব মানুষ হিসাবে কতোটা ধরা দিয়েছেন। হতে পারে উপকাহিনী, তবু জেবউন্নিসা-মবারকের আখ্যান, চতুর্থ সংস্করণেই যার প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি, তাই আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ জাগায়।

অথচ ইতিহাস এইসব চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রতীতি বা Impression তৈরি করে তা থেকে কোনো বড়ো রকমের বিচ্যুতিও যে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই না, একটি দীর্ঘ আলোচনায় যদুনাথ সরকার সে কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেইসব স্থানের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগ সাধন করতে হয়েছে এবং ইতিহাস যেখানে বিশেষ কোনো তথ্য দিতে পারে নি। যেমন, ইতিহাস আমাদের এই ধারণাই দেয় যে ঔরঙ্গজীব-দুহিতা জেবউন্নিসা সত্যই ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির নারী। পরবর্তী জীবনে তাঁর চরিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্ট করে কিছুই বলে না এবং তারই সুযোগ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অপূর্ব প্রেমের বৃত্তান্ত নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এতে ইতিহাসের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, অথচ উপন্যাসের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বিপুল ভাবে। লেখকের বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার যে এ ব্যাপারে তাঁকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে, এ কথাও সুনিশ্চিত ভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে।

ইতিহাসের বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে ত্রুটিকে বলা হয় কালানৌচিত্ত-দোষ বা Anachronism, এই উপন্যাসে সেই ধরনের কোনো ত্রুটিও আমরা দেখতে পাই না। যে যুগের কাহিনী লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই যুগের পরিবেশ ও বাস্তবতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। আসলে সব রকমের উপন্যাসেই সম্ভাব্যতার নিয়ম তিনি প্রখরভাবে মেনে চলেছেন, এই কারণেই তাঁর প্রথম রচিত তিনটি উপন্যাস রোমান্সজাতীয় হলেও আমরা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ ঔপন্যাসিকের সম্মান দান করেছি।

ফলত, সেই সম্ভাব্যতার (Probability) সচেতন বোধে, ঔপন্যাসিক বিষয় হিসাবে মানবিক কাহিনীর প্রতি প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপে, ঐতিহাসিক প্রতীতির সুরক্ষায় এবং সর্বোপরি ইতিহাস ও আন্তরিক অনুভূতির সুসমঞ্জস বিন্যাসে 'রাজসিংহ' যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

● আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শুরু এবং সমৃদ্ধি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এবং সামান্য কিছু পরবর্তী সময়ের ঔপন্যাসিকরাও ঐতিহাসিক উপন্যাসকে এমনভাবে আশ্রয় করেছিলেন যে এমন ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়ারই আশঙ্কা ছিল যে জমজমাট উপন্যাস মানেই ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং তাতেই ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশিত সিদ্ধি। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, দুটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস দিয়েই তিনি তাঁর

ঔপন্যাসিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, 'চোখের বালি' থেকেই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আধুনিক ধারায় ফিরে গিয়েছিলেন তিনি এবং শরৎচন্দ্র একটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেননি। পরে অবশ্য আমরা জানি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং এই আধুনিক পর্বের শ্রেষ্ঠ রূপকার অবশ্যই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যাঁদের হাতে এই ধরনের উপন্যাস উল্লেখযোগ্যভাবে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে, অথচ তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রমথনাথ বিশী। তাঁর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রমথনাথ বিশী আধুনিক সময়ের ইতিহাসকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন 'কেরী-সাহেবের মুন্সী' (১৯৬০)। উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার এবং বিশেষ আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছিল, চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছিল এটি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই উপন্যাসটির কথা পাঠক সম্ভবত এখন স্মরণ করতে পারবেন না। ঠিক এইভাবেই বিস্মৃত হয়ে এসেছে তাঁর একটি আশ্চর্য সৃষ্টি 'লালকেল্লা'। আমরা এই উপন্যাসটিরই বিশ্লেষণ করবো এখানে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসটি আয়তনে দীর্ঘ—তিনটি ভাগে এটি বিন্যস্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে আছে তিনটি করে খণ্ড এবং তৃতীয় ভাগে আছে দুটি খণ্ড। প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে ঘটনাগুলি সাধারণভাবে থাকে বিচ্ছিন্ন, সেই বিচ্ছিন্নতা পূর্ণ করে নিতে হয় পাঠককে তার কল্পনাশক্তি দিয়ে। এই কারণেই সমসময়ে সমালোচকদের নজর কাড়লেও পাঠকদের মনে অনেক উপন্যাসই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে 'জোড়াদীঘির চৌধুরি পরিবার'-এর নাম করা যেতে পারে—চলচ্চিত্রায়িত হওয়া সত্ত্বেও এই উপন্যাসের কথা আমাদের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছে। এক হিসাবে এটিও ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস।

নাম শুনেই বোঝা যাবে, লালকেল্লা উপন্যাসের পটভূমি দিল্লি। এর যে সময়বৃত্ত ধরা হয়েছে তা বাহাদুর শাহ জাফরের জীবৎকাল। সময়টি মোগল শাসনের দিক থেকে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের দিক থেকেও তাই। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতায় অশান্ত একটি কাল, ক্ষমতার লোভে বিভিন্ন প্রান্তে আগ্রাসী লোভের অনাবৃত চেহারা, সামাজিক জীবনে বিপর্যয়, মূল্যবোধ ও নীতিবোধের অবনমন—সব মিলিয়ে এমন একটা সময় যাকে ধরে রাখা খুব সহজ নয়। অথচ লেখক সে কাজ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের পটভূমি এবং কালবৃত্ত যে নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলতেন প্রমথনাথ বিশীর রচনাতে নৈপুণ্য তার তুলনায় কম নেই বলেই আমাদের ধারণা। যাকে বলা হয় কালানৌচিত্য দোষ বা anacronism, তাও এই উপন্যাসে কোথাও ঘটেনি। যদি কোনো মন্তব্য করার মতো জায়গা থাকে, সেটি হল লেখকের ভাষা-ব্যবহার। শাণিত ভাষা, মার্জিত শব্দচয়ন, কিন্তু তা প্রমথনাথ বিশীরই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত গদ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা যেমন অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাসের ভাষা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন, প্রমথনাথ বিশীর ক্ষেত্রে ঠিক তা হয়নি। এই প্রসঙ্গেই আর-একটা কথা বলা যেতে পারে। একটু বিশদ করেই বলব সেটা।

লালকেল্লা উপন্যাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়েরই একটি করে শীর্ষপংক্তি আছে, এগুলি সবই বিখ্যাত কবিতা বা নাটকের উদ্ধৃতি। এখানে অয়দিপাউস যেমন আছে, তেমনই আছে ফাউস্ট। ইংরেজ কবিদের অনেকের কবিতাই এখানে স্থান পেয়েছে, কবিতা বলতে অবশ্য কবিতার

পংক্তি। কবিদের মধ্যে আছেন ওয়ার্ডসওয়র্থ, ব্রাউনিং প্রভৃতি। বাঙালি কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছেন প্রত্যাশিত ভাবেই, রবীন্দ্রনাথ। প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের তৃতীয়, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে শীর্ষপংক্তি হয়েছে একই কবিতার তিনটি পংক্তি, যথাক্রমে 'এবার যে ওই এলো সর্বনেশে গো', 'বেদনায় যে বান ডেকেছে' এবং 'রোদনে যায় ভেসে গো'। এ সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই যে অধ্যায়ের শীর্ষে পংক্তিগুলি খারাপ লাগে না, অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তারা সংগতিও রক্ষা করেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অধ্যায়-শীর্ষ পংক্তিগুলি যেমন উপন্যাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, ততটা অবিচ্ছিন্নতা সম্ভবত এই উপন্যাসের সঙ্গে ব্যবহৃত পংক্তিগুলির নেই।

উপন্যাসটি প্রচুর চরিত্র আমাদের উপহার দিয়েছে। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন আছে, কাল্পনিক চরিত্রও আছে। কাল্পনিক চরিত্রগুলি যুগোপযোগী আচরণে ও সংলাপে জীবন্ত। উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র—নায়ক এবং নায়িকা যদি নাও বলি, জীবনলাল ও রুমালী, অত্যন্ত সজীব ও আকর্ষণীয়। যে ঐতিহাসিক প্রতীতি ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা আশা করি, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস', তা যে এখানে বজায় আছে এবং তা-ই যে উপন্যাসটিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ঝ. সামাজিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাসের স্বরূপ এক কথায় বোঝাতে গিয়ে অ্যাব্রাম্‌স্ তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, 'The sociological novel emphasizes the influence of social and economic conditions on characters and events.' অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে সমাজসংস্কারের বাসনা ঔপন্যাসিকের থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—বাসনা যদি বা থাকে তা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্টই থেকে যায়, সমস্যাটির প্রতিফলনই এই ধরনের বেশির ভাগ উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক পটভূমি এবং অর্থনীতির প্রসঙ্গ থাকলেই যে সে উপন্যাসকে আমরা সামাজিক উপন্যাসের শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারবো না, এ কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বিশেষ এক সমাজের কথা থাকে, থাকবেই, কিন্তু উপন্যাসের শ্রেণীবিচারে তা কোনো তাৎপর্যই বহন করে না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত দু ধরনের সমাজই দেখানো হয়েছে, নিম্নবিত্ত সমাজে বিবাহ যে এক প্রবল সমস্যা, এ কথা বলাও হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'রজনী'-কে আমরা ঠিক সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলতে পারবো না—এমন কী লবঙ্গলতা-অমরনাথের একটি তীব্র সামাজিক সমস্যা সত্ত্বেও। অর্থনীতির সঙ্গে যোগ থাকলেও, সেই কারণেই, কেবল এই সংযোগের কারণে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা যাবে না, উদাহরণ 'ঘরে বাইরে'। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল স্বদেশি জিনিস বেশি ব্যবহার এবং বিদেশি জিনিস বর্জন। স্বদেশি জিনিস বেশি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নিখিলেশ বহু অর্থ জলাঞ্জলি দিয়েছে,

বিদেশি বর্জনের আবেগে মানুষ বিদেশি দ্রব্য নষ্ট করেছে। এর ফলে অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে হয়, কিন্তু তাই বলে 'ঘরে বাইরে'কে সামাজিক উপন্যাস বলা যাবে না, অন্তত এই অর্থনৈতিক কারণে।

উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস হতে গেলে, বা অন্য ভাবে বলা যায় তাকে এই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে গেলে, তার সামাজিক পটভূমির চেয়েও. বেশি বিচার্য, ঔপন্যাসিক সমস্যার বিচার—যে সমস্যা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত তার প্রকৃতি সামাজিক কিনা। আমাদের সমাজে অনেক ধরনের সমস্যা আছে—জাতপাতের সমস্যা, অস্পৃশ্যতার সমস্যা, বেগার খাটার সমস্যা, বিধবাদের নিয়ে সমস্যা, অনেক কিছু। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার সমস্যা, সিংগ্‌ল্ ইউনিট পরিবারের সমস্যা, সামাজিক মূল্যবোধ দ্রুত পালটে যাবার সমস্যা এবং ইত্যাকার আরো কিছু সমস্যা। উপন্যাসে কম এসেছে, ছোটগল্পেই বেশি, তবু জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখা নিতান্ত কম হয় নি। বেগার খাটার সমস্যা নিয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদের গল্প অমর হয়ে আছে। আমেরিকার দাস-ব্যবসায়ও একটি প্রবল সামাজিক সমস্যা ছিল এবং তাকে উপজীব্য করে মেরি স্টো-র লেখা 'আঙ্কল টমস কেবিন' কালজয়ী উপন্যাস হয়ে আছে। আমাদের দেশে আড়কাঠিরা মেয়ে ধরে চা বাগানে চালান করে, এটা বিশেষত এখানকার সমস্যা। প্রসঙ্গত মূলক রাজ আনন্দের 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড' নামক অসাধারণ উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়বেই। একেবারে সাম্প্রতিক কালের সমস্যা—কলকাতা ও শহরতলিতে প্রোমোটারদের কল্যাণে গজিয়ে ওঠা মাল্‌টি-স্টোরিড বাড়িতে একটা ছোট ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন। ধন মান সব খুইয়ে এতটুকু বাসার স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা ছুটে আসেন নিজস্ব ফ্ল্যাট কিনে সুখে বসবাস করবেন বলে, তাঁরা সমাজবিচ্ছিন্ন, মানুষ বিচ্ছিন্ন এই সিমেন্টের বস্তিতে সুখ কি সত্যিই পান—এই বিষয়টি অনুপম বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' উপন্যাসে। শহরের মধ্যে রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করে জনজীবনকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে, এও একটি আধুনিক সামাজিক সমস্যা, যাকে আশ্রয় করে আবুল বাশার লিখেছেন 'শেষ রূপকথা'।

আসল কথা সামাজিক সমস্যাকে বিষয়বস্তু করে নেওয়াও নয়, তার প্রতিক্রিয়া, বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্য পরিস্ফুট করা। সে সব করা হয়েছে বলেই উল্লিখিত উপন্যাসগুলি সার্থক হতে পেরেছে। এ রকম সার্থক সামাজিক উপন্যাস বিদেশি ও বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক আছে। কিংসলের 'ঈস্ট', ডিকেন্সের 'হার্ড টাইমস', আপটন সিনক্লেয়ার 'দি জাঙ্গল', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলি' প্রভৃতি তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

সামাজিক উপন্যাসের কথা বলতে গেলে এর আর-একটি উপবিভাগের কথাও বলতে হয়, একে বলা যায় সমাজ-বাস্তবতাবাদী উপন্যাস। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাকসিম গর্কি। এর মূলকথা হল সমাজে যা ঘটেছে তাই একমাত্র সত্য নয় এবং যথাযথ ভাবে তাকে সাহিত্যে তুলে ধরাটাই সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ নয়, তাঁর একটি দায়বদ্ধতা আছে সমাজের উন্নতিসাধন এবং বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করার কাজে। এই কারণেই, সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁকে এমন সামাজিক উপন্যাস রচনা করতে হবে যা সমাজ-পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যদি সে জন্য বাস্তবের সামান্য বিকৃতি ঘটে বা

অনাগত বাস্তবকে কল্পনা করে নিতে হয়, তাও করতে হবে। ম্যাকসিম গর্কি তাঁর 'মা' উপন্যাসে তা করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'হারাণের নাত জামাই' গল্পে একই কারণে জিতিয়ে দিয়েছেন তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের।

কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করা যাক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করা যায় না, অথবা নিতান্ত দরিদ্র মানুষ সঙঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না—এই বাস্তব সত্যের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' গ্রন্থে এই নির্মম সত্যই সহনীয় ভাবে তুলে ধরেছিলেন। একদা নদী যে জমি গ্রাস করে নিয়েছে তা যখন সে আবার ফিরিয়ে দেয়, তখন পুরোন বাসিন্দাদেরই সেখানে স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু নতুন লোকেদের পত্তনী দিতে পারলে জমিদারের লাভ অনেক বেশি। সেই কাজটাই করতে এসেছিল সত্যচরণ এবং মনে মনে প্রচুর কষ্ট পেলেও কাজটা তাকে করতে হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর 'চরকাশেম' উপন্যাসে দরিদ্র মাঝি কাশেমের এমনই এক চর জেগে ওঠার স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন। চর জেগেছে কিন্তু একা কাশেম সেখানে কোনও জনবসতিই প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, অনিবার্য আত্মহননের পথে অগ্রসর হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কিন্তু আমরা তা দেখি না। বঙ্গোপসাগরের বুকে একটি কুমারী দ্বীপ জন-অধ্যুষিত করা, তার বুক চিরে ফসল ফলানো, সেখানে আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা একটি মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দেখি হোসেন মিয়া তার ময়না দ্বীপকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছে, অন্তত সে চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। একে আমরা সমাজ-বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিতে লেখা উপন্যাস মনে করতে পারি।

● একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ব্যাখ্যা করতে পারি। সমাজসচেতন লেখক হিসাবে খ্যাত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি আমাদের আলোচনার জন্য গৃহীত হতে পারে।

নরনারীর ব্যক্তিগত সমস্যা, এবং অধিকাংশ সময়েই প্রেমঘটিত সমস্যা, শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই থাকে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও একটি প্রেমঘটিত আখ্যান আছে, সেটি রমা ও রমেশের প্রেমাকর্ষণের ফল্গুধারা; কিন্তু সমাজেতিহাসের আলোড়িত ঘটনাধারায় তা প্রায়শই চাপা পড়ে যায়। গ্রাম থেকে বহুদিন নির্বাসিত এবং পশ্চিমের কোনো শহরে বড়ো হওয়া রমেশ গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয় পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে। গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যান্টিক অনেক ধারণা তার ছিল, তার ওপর আদর্শবাদী এই যুবকের মনেও গ্রামের উন্নতির অনেক পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রধানত জ্ঞাতিশত্রু বেণী ঘোষাল-সহ গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর অপদার্থ গ্রাম্য চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে জেলে যেতে হয় এবং যখন গ্রাম থেকে ফিরে যাওয়াই সে মনস্থ করেছে তখন গ্রামের লোকেরা তাকে স্বীকৃতি জানায়, রমেশ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসকে আমরা সামাজিক শ্রেণীতে ফেলতে পারি এই জন্য যে, সমস্যাটি

নিঃসন্দেহে পল্লীসমাজের। অর্থনৈতিক দিক থেকে হতশ্রী পল্লীর জীবনে যে গ্রাম্য দলাদলি এবং ঘৃণ্য স্বার্থপরতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রকৃতি এবং তা নিরসনের উপায় এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের লোকেরা এত শোষণের শিকার হয়েছে যে, কোনো মানুষের সৎ উদ্দেশ্যকে তারা বিশ্বাস করে না, বিবেক বর্জন দিয়ে নিজেদের সামান্যতম লাভও তারা উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রহ করে নেয়, ভালোমানুষিকে তারা মানুষের দুর্বলতা মনে করে। গ্রাম সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা যখন রমেশের ক-দিনেই চলে যায় এবং গ্রাম্যজীবনে সে হাঁফিয়ে ওঠে, তখন গ্রামেরই এক অসাধারণ মহিলা জ্যাঠাইমা তাকে বলেছিলেন সমস্যাটিকে আন্তরিকভাবে বিচার করতে হবে। বাইরে থেকে এবং অগভীরভাবে দেখলে গ্রামের মানুষের এই স্বার্থপরতা এবং নীচ দলাদলি অসহ্য বলেই মনে হবে, কিন্তু সমস্যাটিকে বিচার করতে চাইলে এদের একজন হিসাবেই সেটি তাকে দেখতে হবে। তখন বোঝা যাবে, এর জন্য দায়ী দুটি কারণ—এক।। অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন, এবং দুই।। শিক্ষার অভাব। অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরমে পৌঁছানোর ফলেই মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে এবং সামান্যতম স্বার্থের সন্ধান পেলে মানুষ তা গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। দীননাথের মতো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে আচরণ করেন তা ঘৃণ্য সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর এই আচরণের মূলে নিহিত আছে এই করুণ অর্থনৈতিক অবস্থাই। ব্যাপারটি প্রায় নৃশংসতার পর্যায়ে চলে গেলেও সুস্থ অনুভবী মন এই চরম সমস্যাটি উপলব্ধি করতে পারবে। কুঁয়াপুর গ্রামে প্রথম এসেই ধর্মদাস চাটুজ্যে এবং গোবিন্দ গাঙ্গুলির যে ঘৃণ্য কলহ রমেশ দেখেছে, তাতে পল্লীসমাজ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হওয়া তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জ্যাঠাইমা তাকে বুঝিয়েছেন—"এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে।"

দ্বিতীয় কারণ যে শিক্ষার অভাব, সে কথাও জ্যাঠাইমা রমেশকে বলেছিলেন। রমেশের সমস্ত অভিযোগ প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন এই ঘৃণ্য দলাদলি এবং জঘন্য স্বার্থপরতা কেবল যথার্থ জ্ঞানের অভাবের জন্যই। সেই জন্যই তাঁর অনুরোধ—"আলো জ্বেলে দেরে শুধু আলো জ্বেলে দে! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো।"

'পল্লীসমাজ'কে সামাজিক উপন্যাস বলে অভ্রান্ত স্বীকৃতি দেবার দ্বিতীয় কারণ, পল্লীসমাজের অন্তর্লীন সমস্যাই গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে উপন্যাসের প্রধান ঘটনাধারা ও চরিত্রের আচরণকে। বেণী ঘোষালের আচরণ অবশ্য এক তরফা, তার কারণ অনুমান করতে বিশেষ সাহিত্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না; কিন্তু রমেশের সমস্ত শুভ উদ্যোগ এবং মানবিকতা পল্লীসমাজের জটিলতা কীভাবে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে তা আমরা আমাদের সহিত্যবুদ্ধি দিয়েই বুঝি। এর চেয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ, কোমল এবং আকর্ষণীয় দিক এই উপন্যাসে আছে, সেটি হল রমা ও রমেশের আপাত বোঝাপড়ার অভাব সত্ত্বেও এক গভীর ও আন্তরিক প্রেম। এই প্রেম যে কখনোই প্রকাশ পায়নি তার একটা কারণ নিশ্চয়ই হিন্দু নারী হিসাবে রমার আজন্ম সংস্কারের বাধা—সে যে বিধবা, এই সত্য যে নিজেকে কখনোই ভোলাতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড়ো কারণ হল এই যে, সে ভুলতে পারে না তার গ্রাম্যসমাজকে, যাকে সে আজন্ম চেনে—যেখানেই সে এত বড় হয়েছে। রমার কোনরকম

দুর্বলতা যদি প্রকাশ পায় রমেশের প্রতি, তাহলে রমার বাড়ির যে-কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান সমাজপতিরা বয়কট করবেন, ভাই যতীনের ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হয়ে উঠবে, এ কথা রমা ভালো করেই জানে। এ ছাড়াও তার মনে আশঙ্কা, এ জন্য রমেশকে কথা শুনতে হতে পারে এবং সেরকমটা ঘটলে এক-একটি সামান্য আঘাতও তার মনে অসামান্য হয়ে বাজবে। সুতরাং তার সমস্ত আচার ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ। এই কারণেই এই উপন্যাসকে আমাদের সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দিতে সম্ভবত কোনও দ্বিধা থাকবে না।

ঞ. রাজনৈতিক উপন্যাস

অধিকাংশ সাহিত্য-প্রকরণ জাতীয় গ্রন্থে রাজনৈতিক উপন্যাস নামে কোনও পৃথক শ্রেণীর উপন্যাসকে স্বীকার করা হয়নি, অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাম্প্রতিককালে রাজনীতিমুখ্য উপন্যাসের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং উপন্যাসের আলোচনায় এই শ্রেণীটির উল্লেখ আমাদের বার বার করতে হয়। বিখ্যাত রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ইংরেজিতে কম নয়। বাংলার চাণক্য সেনের 'রাজপথ জনপথ', 'মুখ্যমন্ত্রী' আধুনিক কালে এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ।

অবশ্য শ্রেণীটি স্বীকার না করলেও, বাংলায় যে রাজনীতি বা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস আছে, একথা বাংলা সাহিত্য-প্রকরণের পথিকৃৎ-গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে। সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—"বাংলার বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকখানা উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', গোপাল হালদারের 'একদা', বনফুলের 'অগ্নি'; দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য"।

প্রকৃতিতে রাজনৈতিক হলেও এই শ্রেণীটিকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' নামে তিনি যে স্বীকৃতি দেননি তার কারণ অবশ্য খুব অস্পষ্ট নয়। সম্ভবত রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে নেওয়া হবে কী সূত্রে, এ ব্যাপারে অস্বস্তি থাকার জন্যই শ্রীশচন্দ্র দাশ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকগণ এই শ্রেণীটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। উপন্যাস যে-জীবনকে ধরে, রাজনীতি সেখানে থাকতে পারে কিনা, অথবা রাজনৈতিক জীবনকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ধরলে তা অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়ে কিনা এসব কথা উঠতেই পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রকৃতি কী হবে—নিকোলাই অস্ট্রোভ্স্কি-র 'How steel was tempered' জাতীয় উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা বা এরকম কোনও রাজনৈতিক আদর্শমূলক রচনা, অথবা ডস্টয়ভ্স্কি-র 'The Possessed' উপন্যাসের মতো কেবল একটি রাজনৈতিক বাতাবরণ। এই সমস্যার যে কোনও সঠিক সমাধান এখনও হয়নি, সমালোচক কার্লো কপোলা একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে তাই নিয়েই আক্ষেপ করেছেন—'The problem of defining the political novel has not dealt with in any definitive way; hence the very nature of this particular category of novel–its proper subject matter, its scope, its form remains open to question.

আমরা অবশ্য আমাদের সাধারণ সাহিত্যবুদ্ধিতে বুঝি যে, উপন্যাসকে যদি আগে উপন্যাস হতে হয় তবে মানবিক অনুভূতির কাহিনী, মানুষকে আলোড়িত করার কাহিনীই তাকে শোনাতে হবে। এরপর দেখতে হবে মানুষের যে জীবনের কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তার প্রকৃতি রাজনৈতিক কিনা, অর্থাৎ রাজনীতিই এই উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এটা বিচার করে দেখা, রাজনীতি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা—এর অর্থ, রাজনীতি এর সঙ্গে এমন অভ্রান্তভাবে জড়িয়ে আছে কিনা যাতে রাজনীতি বর্জন করলে উপন্যাসটি আর দাঁড়াতেই পারে না। আমাদের বিচারপদ্ধতি স্পষ্টতর হবে একটি বিশেষ উপন্যাসের পর্যালোচনা করলে।

● একটি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস

সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' এক সময়ের অত্যন্ত সাড়াজাগানো উপন্যাস। এই উপন্যাসটির শ্রেণী সম্বন্ধে বিভিন্ন সুধী সমালোচকের বিভিন্ন মত। কেউ মনে করেন রাজনীতির কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে বলেই একে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া উচিত; কারো মতে কারাগারের অভ্যন্তরে সমগ্র উপন্যাস রচিত বলে একে কারা-উপন্যাস বলাই বিধেয়; কেউ মনে করেন এটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, সেই জন্য এই ধরনের উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী যে উপস্থাপনরীতি (চরিত্রকথন মূলক) তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে; আবার কেউ কেউ মনে করেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুহূর্তের বর্ণনায় এবং অবিরত অতীতকথন পদ্ধতির (ফ্ল্যাশ ব্যাক) প্রয়োগে এটি চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসের সার্থক সূচনা করেছে। এইসব মতের কোনটিই সম্পূর্ণ ভুল আমরা বলতে পারব না, অন্তত ভুল করার যথেষ্ট কারণ যে রয়েছে সে কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে; কারণ প্রত্যেকটি ব্যাপারই উপন্যাসে উপস্থিত। কিন্তু শ্রেণীবিচারের যে বিশেষ পদ্ধতি আমরা নির্বাচন করেছি তার দ্বারা বিচার করলেই সম্ভবত আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

'জাগরী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশেষ জটিল নয়। পূর্ণিয়াপ্রবাসী এক বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের এক বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরিবারের কর্তা গান্ধীবাদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক স্কুলশিক্ষক। আদর্শের কারণেই স্কুলের চাকরি ছেড়ে বাড়িতে গান্ধী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ 'মা' চরিত্রটি স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। যদিও রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি বোঝেন না, কিন্তু যে-কোন ব্যাপারেই অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রমে তিনি কাতর নন। বিলু ও নীলু তাঁদের দুই ছেলে, এই দুই ছেলেকে নিয়ে আনন্দিত ও স্বপ্নসম্ভাবনাময় সংসার কেমন করে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কেমন করে পরিবারের তিন সদস্যের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে থাকে, সেটাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য এর কালসীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, একটি রাত্রিমাত্র—কিন্তু ভয়াবহ রাত্রি, চারটি চরিত্রকেই জেগে বসে থাকতে হয় কিছু বিক্ষত স্মৃতির মুখোমুখি হবার জন্য। রাষ্ট্র-দ্রোহিতার অপরাধে বন্দী বিলু ফাঁসির আসামী, রাত্রি প্রভাত হলেই সে আদেশ কার্যকর হবে। স্বামীর সঙ্গে যোগ দেবার অজুহাতে সেখানে 'আওরৎ কিতা'-য় মা ও বন্দী বাবা তো আছেনই। কারার বাইরে আছে শুধু নীলু, কিন্তু এ রাত্রে নিদ্রা

তার পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু রাজনৈতিক মতের অমিলে সে-ই ধরিয়ে দিয়েছে দাদাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়াবহ পরিণতি ঘটেনি, কিন্তু চারটি চরিত্রের অন্তঃসমীক্ষণে বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্য দিয়েও যে মোটামুটি অখণ্ড কাহিনী পাওয়া গেছে তাতে বৃত্ত গঠন বা চরিত্র নির্মাণ, কারো প্রতিই অবিচার করা হয়নি।

'জাগরী'-কে আমরা চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস বলবো কিনা সে প্রশ্ন এখানে সংগত নয়, কারণ এটি মূলত প্রয়োগগত একটি রীতি—যে রীতিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপন্যাসই লেখা সম্ভব, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যার সবচেয়ে ভালো ক্ষেত্র। ঠিক এই কথাই বলা যায় এর চরিত্রকথনমূলক উপস্থাপনরীতি সম্পর্কে। এই রীতিটিও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে কিন্তু অন্য শ্রেণীর উপন্যাসে এটি যে ব্যবহার করা যাবে না, এমন কোনও কথা নেই। কারা-উপন্যাস বলে উপন্যাসের একটি শ্রেণী সম্প্রতি স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে, কিন্তু সেই ধরনের উপন্যাসে আমরা সাধারণত অন্ধকারের জগৎ বা underworld-এর সংবাদই পেয়ে থাকি এবং চরিত্রগুলিও হয়ে থাকে ঘৃণ্য বা আপাতঘৃণ্য। জাগরী উপন্যাসের তিনটি চরিত্র কারাগারে আছে এই পর্যন্ত, কারাগারের সঙ্গে এই কাহিনীর অন্য কোনও সম্পর্ক নেই।

জাগরীকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর প্রধান কারণ চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতি এবং চরিত্রকথনমূলক উপস্থাপন রীতি। কাজেই এই বহিরঙ্গ উপকরণকে একবার সরিয়ে রেখে যদি চিন্তা করা যায়, এর শ্রেণীবিচারে তাতে কিছু সুরাহা হয়; সে ভাবে ভাবা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় না। এক রাত্রির কাহিনী করতে গিয়েই ঔপন্যাসিককে অতীতচারণ, বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণ এবং কার্যত চেতনাপ্রবাহ রীতির অনুসারী হতে হয়েছে। একই কারণে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে জবানী দিতে হয়েছে, অন্যভাবে তা আকর্ষণীয় করা যেতো না। কিন্তু যদি এইভাবে অতীতচারিতার মধ্যে না গিয়ে ঘটনা যেমন ঘটে চলেছে—পিতার সুখী সংসার, বিলু ও নীলুর অন্য রাজনৈতিক মতের প্রতি ক্ষীণ উৎসাহ, সেই উৎসাহের বৃদ্ধি ও অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান, বিলু ও নীলুর রাজনৈতিক মনান্তর, শেষে চরম অকৃতজ্ঞ ঘটনা—এইভাবে কাহিনী অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। এইরকম প্রত্যক্ষ রীতিতে উপন্যাস অগ্রসর হলে কিন্তু চেতনা প্রবাহমূলক রীতিও যেমন অনিবার্য মনে হতো না, চরিত্রকথন রীতির পরিবর্তে প্রথম পুরুষের উপন্যাসও আমরা খুব সহজেই মেনে নিতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ভাবার সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো। উপন্যাসটি এ ভাবে লিখলে এর রসসংবেদন কমে যেতো কিনা সে কথা কিন্তু আমরা ভাবছি না, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্যও করছি না, আমাদের বক্তব্য এ ভাবেও উপন্যাসটি রচিত হতে পারতো—উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা লেখককে বর্জন করতে হতো না।

কিন্তু সে চিন্তা সত্যিই বর্জন করতে হতো যদি লেখক রাজনীতি বাদ দিয়ে এই উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতেন। চারটি চরিত্রের গূঢ় মনস্তত্ত্ব এই উপন্যাসে নিশ্চয়ই ফুটেছে, কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উৎস তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যেই নিহিত আছে। দুই ছেলে নিয়ে বাবা-মার সুন্দর সংসারে ফাটল ধরার অন্য কোনো রাস্তাই ছিল না—এই ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির মধ্যে সংশয়, বিদ্বেষ ও অসহনীয়তার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতিই এই উপন্যাসের নিয়ন্ত্রা, তার কেন্দ্রীয় শক্তি, যাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি লেখা

সতীনাথ ভাদুড়ির পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই আমরা মনে করি, শ্রেণী বিচার করতে গিয়ে রাজনীতিকেই আমাদের এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। মনের কথা এ উপন্যাসে অনেক আছে, তার খুঁটিনাটি পরিচয় দেবার সামর্থ্যও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থাকলে সেই বিশ্লেষণ মনস্তাত্ত্বিক অভিধা পেতে পারে, এখানে সেই দ্বন্দ্ব ও আন্তরিক সংঘাত ছিল না। অতীত স্মৃতিরোমন্থন, আসন্ন সর্বনাশের কথা ভেবে সকলের কথা ও শৈশবের ঘটনা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এর সঙ্গে দুটি চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব বা একটি চরিত্রের দুটি প্রবণতার জটিল সংঘাতের তেমন কোনো মিল নেই। 'জাগরী' উপন্যাসের চালিকা শক্তি রাজনীতি, এর ফলেই চারটি চরিত্র কারাগারে এসেছে, এর জন্যই চরিত্রগুলির জাগর বিষাদ উপন্যাসের কল্পশরীর গঠন করতে পেরেছে, এবং একমাত্র এর অভাবেই উপন্যাসের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'জাগরী'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দিতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

ট. আঞ্চলিক উপন্যাস

উপন্যাসের শ্রেণী হিসাবে আঞ্চলিক উপন্যাস বা Regional novel স্বীকৃতি পেয়েছে মূলত টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেল্‌স্' প্রকাশিত হবার পর। একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস লেখা হলেই যে তা 'আঞ্চলিক' অভিধায় ভূষিত হতে পারে, এমন কিন্তু নয়। অ্যাব্রাম্‌স্ এই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাত্র একটি দীর্ঘ বাক্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তিনি বলেছেন—"The regional novel emphasizes the setting, speech, and customs of a particular locality, not merely as *local color,* but as important conditions affecting the temperament of characters, and their ways of thinking, feeling and acting."

অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নিয়ে তার বিশিষ্ট প্রবণতা বা উৎসব দিয়ে উপন্যাসে একটি আঞ্চলিক পটভূমি নির্মাণ করলেই তাকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি না। আমাদের দেখতে হবে সেই অঞ্চলেই কোনো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তার একটা জৈবিক চরিত্র আছে কিনা এবং সেই চরিত্র উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীকে প্রভাবিত করেছে কিনা—অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণে এ কথা বোঝা যায় কিনা যে তারা ওই অঞ্চলসম্ভব মানুষ। একটি বিশেষ অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য আছে তা যদি চরিত্রগুলি আত্মসাৎ করে এবং তারাই যদি উপন্যাসে বিচরণ করে, তাহলে ঔপন্যাসিক চরিত্র আসলে অঞ্চলটিরই প্রতিনিধিত্ব করে, অঞ্চলটিই বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসে। এইভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে হার্ডির উপন্যাসে এগ্‌ডন হীথের ঊষর প্রান্তর—এই অঞ্চলের সঙ্গে মানুষগুলিকে আর বিচ্ছিন্ন করে দেখাই সম্ভব হবে না। ঠিক এই ভাবেই একাত্ম হয়ে উঠেছে বীরভূমের রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতির সঙ্গে অন্বিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু চরিত্র—'বেদেনী' গল্পের রাধিকাকে যাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে আমাদের মনে পড়তে পারে, যার অকারণ নিষ্ঠুরতা আমাদের স্তম্ভিত করে। বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রসঙ্গেও তাই 'আঞ্চলিক উপন্যাসের' স্বীকৃতি প্রথম দেওয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে তাই সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি প্রকাশ পেয়েছে কিনা সে তো দেখতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রধান ভাবে দেখতে হবে প্রধান চরিত্রগুলি অঞ্চলসম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা। আমরা মনে করি এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ করার দরকার আছে, অন্তত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসাবে তার শ্রেণীবিভাগ সঠিক কিনা তা বুঝবার জন্য। একটি বিশেষ অঞ্চলই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা, বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রিত করছে কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য সেই অঞ্চলটিকে বর্জন করে এই বিশেষ উপন্যাস লেখা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন হতে পারে, যে-কোনো অঞ্চলেই এমন একটি ঔপন্যাসিক আখ্যান সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অঞ্চলটির অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিশেষণে ভূষিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের নাম করতে পারি। দোবরু পান্না, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, গনু মাহাতো, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে প্রভৃতি বিচিত্র উজ্জ্বল চরিত্র একেবারে নিষ্প্রভ এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এদের ভাগলপুরের সেই বিশেষ অঞ্চল থেকে বার করে আনলে। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই আরণ্য প্রকৃতিই এই উপন্যাসের নিয়ামক শক্তি।

● একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ মনে করা হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি নিজে এ কথা স্বীকার না করলেও বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি সমৃদ্ধ ধারা যে তিনি গড়ে তুলেছেন একথা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। আমরা তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-কে আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা বিচার করে দেখবো।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' স্পষ্টতই একটি অতিক্ষুদ্র অঞ্চল এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে লেখা উপন্যাস। সেই অঞ্চল এবং তার অধিবাসীদের পরিচয় দিয়েই উপন্যাস শুরু হয়েছে—"কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁধটার নাম হাঁসুলীবাঁক—অর্থাৎ যে বাঁধটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত।....নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোট-মাট আড়াইশো বিঘা জমি দিয়ে মৌজা বাঁশবাদি লাট্ জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধান চাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাদি ছোটগ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ—কুমার-সদ্গোপ, চাষী-সদ্গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়।"

জাঙল গ্রামের কথা বলা হলেও আসলে বাঁশবাদি গ্রামের কাহার, বাবুদের পালকি টানাই ছিল যাদের জাত-ব্যবসা, তাদের জীবনকথাই এখানে প্রধান। উপন্যাসে মুখ্য উদ্দেশ্য এই কাহার জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, তাদের অন্ধ বিশ্বাস, ফিউডাল জীবনযাত্রায় অবিচল আস্থা ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তোলা। তবে সেই একই সঙ্গে এসেছে যুদ্ধের অভিঘাত এবং সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে

অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এর ঢেউ যখন সুদূর ও প্রত্যন্ত গ্রামে এসে পৌঁছয় তখন দেখা দেয় ফিউডাল জীবনযাত্রার সঙ্গে নব্য বুর্জোয়া বা ধনিকতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিরোধ। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বার বার এই সংঘর্ষ আমরা দেখতে পেয়েছি। 'ধাত্রীদেবতায়' শিবনাথ জমিদারী প্রথার চেয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। 'গণদেবতা'য় গ্রামীণ সভ্যতা ও অর্থনীতি ভেঙে চুরমার করতে চেয়েছে অনিরুদ্ধ, অনি কামার। 'কালিন্দী' উপন্যাসে জমিদার ইন্দ্ররায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে শিল্পপতি বিমল মুখার্জির। এখানেও আমরা দেখি মিথ-নির্ভর প্রাচীন ফিউডাল সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বনওয়ারীসহ প্রায় সব চরিত্রের উৎসাহই যখন অতি প্রবল, তখন এই পাড়ারই ছেলে করালীচরণ প্রায় সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করতে চায়, নিজে সে অদূরে চন্দনপুরে রেল কারখানায় কাজ নিয়েছে। কাঁচা টাকা হাতে পায়, তাই জন্মসূত্রে শিকড়ের টান সে অগ্রাহ্য করে।

সুতরাং বলা যেতে পারে যুদ্ধের পটভূমিকা বাইরে থেকে উপন্যাসের সংঘর্ষকে জোরদার করলেও চরিত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এ উপন্যাসের প্রাণ এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে মুনিষখাটা কাহারদের মাতব্বর বনওয়ারীর সঙ্গে এ লড়াই বুর্জোয়া তন্ত্রের অন্তর্গত শ্রমিক যুবক করালীচরণের লড়াই। প্রথম থেকেই যাতে এ সংঘর্ষ জমে ওঠে সেই কারণে কাহারদের দেবস্থানের কাছে একটি রহস্যময় আওয়াজ দিয়েই উপন্যাসের সূচনা—"হাঁসুলীবাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না, সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা।' অনতিকাল পরেই অবশ্য করালীচরণ এই রহস্য ভেদ করে দেয় যখন প্রকাণ্ড এক চন্দ্রবোড়া সাপ সে হত্যা করে। প্রমাণ হয়ে যায় হাঁসুলী বাঁকের দেবতা 'কত্তাবাবা' নয়, তুচ্ছ একটি সাপই এই কাণ্ড ঘটাচ্ছিল। এটা অবশ্য সূত্রপাত, তারপর দীর্ঘদিন ধরে চলে দেবতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং তাকে উৎখাতের সংগ্রাম। দ্বিতীয় পক্ষই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বলতে হবে, কারণ যে জন্যই হোক, হাঁসুলীবাঁকের মিথ-আশ্রয়ী সেই সামন্ততান্ত্রিক জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। দেবভূমিও বিনষ্ট হয়।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আপাতবৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করতে হলে একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকে না যে একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বাদ এ উপন্যাসে অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে, লেখক স্বয়ং সচেতন ভাবে এ কথা বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এটি একটি বিশেষ অঞ্চলেরই উপন্যাস। প্রথম থেকেই অঞ্চলটির বর্ণনা দিয়েছেন। 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস'—এই বিশিষ্ট প্রবচনটি যে কেবল 'বাংলাদেশের এই অঞ্চলটাতেই খাটেনা' কেন, তার কারণ বুঝিয়ে বলেছেন। এও বলেছেন, "এ দেশের নদীর চেয়ে মানুষের লড়াই বেশি। খরা অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ ধূ করে বালি—এক পাশে মাত্র এক হাঁটু গভীর জল কোন মতে বয়ে যায়....মাটি গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়ো লোহার মত; কোদাল কি টামনায় কাটে না,....গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দীঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়। তখন নদীই রাখে মানুষকে বাঁচিয়ে; জল দেয় ওই নদী।"

এখানকার নদীতে মাঝে মাঝে কুমীর আসে, সেখানকার লোকে যাকে বলে 'ঘড়িয়াল', সে কথা লেখক বলেছেন, বাঘ বা ভাল্লুক এলে অথবা শুয়োরের উৎপাত হলে কী-ভাবে বীরত্বের

সঙ্গে তা প্রতিহত করে কাহাররা সে কথাও বলেছেন; আর বলেছেন এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে জড়িত ঠাকুর কালারুদ্দি বা কত্তা বাবার কথা। তিনি থাকেন বাঁশবনে, কাহারদের জীবনে যা ঘটে চলেছে, যা ঘটবে—ঝড়-জল-দাবানল-যুদ্ধ-মহামারী, সবই তিনি ঠিক করে দেন। তাঁর পূজায় কোনো বিঘ্ন ঘটলে তিনি তা সহ্য করেন না। এই বাবার আবির্ভাব নাকি গাঁয়ের বাবু চৌধুরীদের তিন পুরুষ আগে। কোপাইয়ে সেবার এসেছিল এক প্রলয় বান—সব ডুবে যেতে নীলকুঠির সাহেব-মেম চড়েছিল গাছে। রাত্রি তিন প্রহরে দেখা গেল 'আলোয় আলোকীন্নী' করে এক নৌকা আসছে। সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকা ধরতে, তখনই আবির্ভাব এই দেবতার—'এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম।' এই দেবতার নিষেধ না শুনেই সাহেব-মেম মারা যায় এবং চৌধুরীদের কত্তাবাবা দয়া করেন, এই লোকবিশ্বাস।

এই বিশেষ অঞ্চলের লোককথা শোনাবার জন্যই বস্তুত দুটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন লেখক—রহস্যময় পাগলবাবা এবং উভয়লিঙ্গ মানুষ নসুবালা। নসুবালা গেয়েছে—

'বেলতলায় বাবা ঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশতলাতে থাকতো বাহন অজগরো চিতা
পরাণ-ভ্রমরে সে থাকত আগুলি
(ও হায়) তারে দাহন করে মারল করালী!

পাগল শেষে গান ধরে:

'জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
বিধাতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই।'

আঞ্চলিক কিছু অনুষ্ঠান, যেমন কথায় কথায় মদ্যপানের মহোৎসব এবং চড়কের সময় বিশেষ উৎসব তো আছেই, তবু উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক আস্বাদ দিতে আরো সাহায্য করেছে লেখকের এই বিশেষ অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে সুচারু জ্ঞান এবং তার নিপুণ প্রয়োগ। এখানকার লোকের কথা বলার বৈশিষ্ট্য কী সেটা লেখক নিজে শুনিয়ে দিয়েছেন, তারপর প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখেই দিয়েছেন আঞ্চলিক ভাষা, যেমন—সুচাঁদ: "আর একটা পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবার থানে পূজো হোক একদিন। জাঙলের লোক যদি অবহেলা করে—আমরা আপনাদের কত্তব্য করি।"

পাখি: "হারামজাদী, আমার শরীলে লয় চৌধুরীদের অক্ত আছে। তাতেই না হয় আমার নেশা বেশি। কিন্তুক তোর প্যাটের মেয়ের নেশা কেনে আজও ছাড়লো না শুনি? বলি, তোর বসন্তের শরীরে কার অক্ত আছে তা বল?" (উক্তিটি তার শ্রদ্ধেয়া মাতামহীর প্রতি)

বনওয়ারী: "বোঝলাম, সব বোঝলাম। কিন্তু তবু অল্যায় হয়েছে। নিশ্চয় অল্যায় হয়েছে। ওগা মানুষটা যদি মরে যেত! মুখ একে বাক্য আর ঠাঁই একে মার—পিতিপুরুষে বলে যেয়েছেনই কথা।"

করালীচরণ: "এই দিকে—এই দিকে। আয়। আয়। আয়। ডাক্ সব পাড়ার নোককে। দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে। দেখে যা।"

লেখক এই বিশেষ অঞ্চলকে যে একটি প্রধান চরিত্র করে তুলেছেন তা বোঝা যায় লেখকের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এবং সমগ্র অঞ্চলটিকে জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস থেকে।

অঞ্চলের বর্ণনা লেখক যখনই করেছেন যেন অঞ্চল এবং অঞ্চলের বাসিন্দা এক হয়ে গেছে, যেমন—

> "নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভরে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজেদের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্তর করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে... তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে।"

অঞ্চলটি বিভিন্ন রকমের বর্ণনায় লেখক যে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন তা বোঝাবার মতো উদ্ধৃতি এখানে অনেক দেওয়া হয়েছে, এর বেশি এখানে বাহুল্য হবে বোধহয়।

চরিত্রের ওপর অঞ্চলের প্রভাব সম্বন্ধে নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই হাঁসুলীবাঁকের লোকসংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাসপুষ্ট। বনওয়ারী, সুচাঁদ, নসুবালা, পাগলবাবা, গোলাপীবালা, কালোশশী—কোনো চরিত্রই এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। একমাত্র করালীচরণ তার অঞ্চলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করেছে, ভিন্ন মনের মানুষ হয়ে উঠেছে, দেবদ্বিজে ভক্তি এবং ধর্মে মতি সে রাখতে পারে নি। কিন্তু এখানে তিনটি কথা বিচার্য। প্রথমত, দুটি জীবনাচরণ-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব দেখাবার জন্যই এই উপন্যাস লেখা, সুতরাং করালীকে 'গণদেবতা'-র অনি কামারের মতো একটি প্রতিবাদী চরিত্র করা ছাড়া লেখকের আর কোনো উপায় ছিল না। দ্বিতীয়ত, করালীচরণের অন্যান্য সব আচার আচরণ কিন্তু কাহারদের মতোই, কেবল ধর্ম সম্বন্ধে অলৌকিক বিশ্বাস তার নেই। নইলে পূজা উপলক্ষে মদে চুর হয়ে থাকা, গ্রামের আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, যৌবনবতী মেয়ের সঙ্গে 'অঙ' করা, আবার অন্য মেয়েকে মনে ধরলে সেই মেয়েকে অবজ্ঞা করা—এ সবই করালীচরণের মধ্যে আছে। তৃতীয়ত, এবং এইটেই সবচেয়ে লক্ষ্য করার মতো, করালীচরণ অর্থে ও ক্ষমতায় বনওয়ারীর চেয়ে হয়তো কিছু বড়ো হয়েও প্রথমদিকে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায়নি, এমনকি সাপের দেহ পোড়ানো সম্বন্ধে তার বিধান শুনে বলেছিল, 'এই না হলে মুরুব্বি বলবে কেন?"

পরে অবশ্য সে বনওয়ারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেই লিপ্ত হয়েছে এবং সেই সংঘর্ষের জেরেই বনওয়ারীকে দীর্ঘদিনের জন্য শয্যা নিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি করালীচরণ এতো 'ডাকাবুকো', এতো ধর্মজ্ঞানহীন বা সংস্কারহীন হয়েও নিজের শেকড় উচ্ছেদ করতে পারে নি। সে যে হাঁসুলীবাঁকেরই একজন, কাহারপাড়ারই মানুষ, সে কথা বোঝা যায় তার প্রত্যাবর্তন দেখে। ঝড়ে তার ভিটে উড়ে গেছে, করালী এর মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র থাকতে পারতো। বস্তুত তাই-ই ছিল করালীর কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু উপন্যাসের শেষ বাক্যগুলির কয়েকটি আমরা স্মরণ করতে পারি যেখান থেকে বোঝা যায় করালী হাঁসুলীবাঁকের সঙ্গেই গভীরভাবে যুক্ত—"হাঁসুলীবাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে।"

করালীচরণের এই নতুন করে মাটি খোঁজার দৃশ্য দেখে বোঝা যায়, এ উপন্যাস সেই মাটিরই উপন্যাস যে মাটিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের শিকড় প্রোথিত রয়েছে। সেই কারণেই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-কে আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে আমাদের সম্ভবত কোনো দ্বিধা থাকে না।

● আর একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

এক সময় হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস'-কে আশ্রয় করে যেমন ইংরেজি সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যেও স্পষ্টত আঞ্চলিক উপন্যাসের সূত্রপাত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। সেই কারণেই তারাশঙ্করের একটি উপন্যাস আমার বিশ্লেষণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেছিলাম। উত্তরকালে আঞ্চলিক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি বুঝবার জন্য আমরা বেছে নেব এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটিকে।

রমাপদ চৌধুরীর প্রধান পরিচিতি সাধারণ উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক হিসাবেই, কিন্তু 'লালবাই' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটিও তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

রমাপদ চৌধুরী সাধারণত পরিমিত মাপের উপন্যাস লিখতে ভালোবাসেন, শেষের দিকে সেগুলি বেশ ক্ষুদ্রায়তন হয়ে পড়েছে। 'শেষের দিকে' কথাটা একজন জীবিত সাহিত্যিক সম্বন্ধে প্রয়োগ করা অনুচিত, কিন্তু রমাপদবাবু লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, সুতরাং কথাটা সেই কারণেই বলা যায়। তাঁর উপন্যাসের আয়তন স্মরণ রাখলে 'বনপলাশির পদাবলী'-কে ব্যতিক্রম বলতে হবে, কারণ এটির আয়তন বেশ বড়ো। প্রচুর চরিত্র এবং প্রচুর ঘটনা এই উপন্যাসে ভিড় করে এসেছে। লেখকের শেষের দিকের উপন্যাস পড়ে ধারণা হতে পারে, প্লটগ্রন্থনে তাঁর ছিল প্রবল অনীহা, কিন্তু 'বনপলাশীর পদাবলী' সে ধারণা একেবারে ভেঙে দেয়। এত বিচিত্র চরিত্র এবং বিচিত্র ধরনের কাহিনীকে যিনি এতখানি সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, এবিষয়ে তাঁর দক্ষতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্রমাগত কাহিনীর পরিবর্তনে গল্পপ্রিয় পাঠককে তিনি সজাগ ও কুতূহলী করে রেখেছেন।

লেখকের মানসিকতার কথা এবার বলি। 'পথের পাঁচালী' যেমন পাঁচালী নয়, মানুষের গল্প, 'বনপলাশির পদাবলী'-ও তেমনি কোমলকান্ত পদাবলী নয়, মানুষেরই গল্প। বনপলাশি নামটা বেশ মিষ্টি বলেই মনে হতে পারে এখানকার মানুষগুলিও বোধহয় সেই রকমই মিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু উপন্যাসপাঠে অগ্রসর হলেই আমাদের সে ভুল ভেঙে যায়। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, উপন্যাসের চরিত্রগুলি আদ্যন্ত মানুষ—তারা কেউ পুরোপুরি শয়তানও নয়, পুরোপুরি ভালোমানুষও নয়। গ্রামের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ'-এ একটু বাড়াবাড়ি করেছেন, হয়তো বিশেষ প্রয়োজনেই তা তাঁকে করতে হয়েছে, কারণ পল্লীসমাজে অকারণ ঘোঁট পাকানো, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, উপকারকে সন্দেহের চোখে দেখা ইত্যাদি প্রবণতাকে বিবর্ধক কাচের মধ্য দিয়ে না দেখালে গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যান্টিক এক অন্ধ প্রেম হয়তো আমাদের মন থেকে দূর করা সম্ভব হত না। প্রসঙ্গত জগদীশ গুপ্তের 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে যেখানে পল্লীগ্রামের কেবল বীভৎস ব্যাপারগুলিই তিনি দেখিয়েছেন। রমাপদ চৌধুরী সেই ভুল করেননি। এখানে কোনো মোহাঞ্জনও নেই, বিবর্ধক কাচও নেই। অবিনাশ ডাক্তার এখানে যে উন্নত আদর্শ নিয়ে গ্রাম-উন্নয়নের কাজে নেমেছে তাকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখে না, তাকে ডাক্তারের স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলেও কেউ সন্দেহ করে না, কিন্তু সে কাজকে সমষ্টিগত কাজ বলেও কেউ মনে করে না—বনপলাশি গ্রামের এতে উন্নতি হলে খুবই ভালো কথা, কিন্তু এ কাজ অবিনাশ ডাক্তারের নিজেরই কাজ,

তাতে অনুপ্রেরণা পেয়ে কেউ এটাকে নিজের কাজ মনে করেই এগিয়ে আসবে—গ্রামে এরকম ব্যাপার ঘটে না, বনপলাশি গ্রামেও ঘটেনি। হয়তো লেখকের পর্যবেক্ষণ এই রকমই যে, এই উদাসীন নিস্পৃহতাই আজকের গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য। নানা রকমের পরস্পরবিরোধী আদর্শ, বিপরীত চরিত্রের মানুষ, বিভিন্ন ভাবধারাও যে গ্রামে সহাবস্থিত হতে পারে, তার কারণ সম্ভবত এই নিস্পৃহ ঔদাস্য। সেই জন্যই এখানে থাকে সমস্ত কিছু মেনে নেওয়ার মতো মানুষ, থাকে পদ্মর মতো চরিত্রের বিদ্রোহী মেজাজ; এখানে থাকে শাক্তপ্রথার বাড়াবাড়ি, আবার বৈষ্ণব রসচর্চার ব্যাপক অনুশীলন—সেখানে থাকে বংশীর মতো চরিত্র যে মুখে মুখে বৈষ্ণব গান বাঁধে, থাকে গোঁসাই দিদির অক্লান্ত রসকীর্তন এবং ক্ষণে ক্ষণে ভাব-বিভোরতা।

আসলে বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের আচার-আচরণ যত্নের সঙ্গে আঁকা হলেও এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে লেখক কী করতে চাইছেন, তাও আমাদের অগোচর থাকে না, সেইজন্যই একে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে অভিহিত করেছি। এখানে প্রধান চরিত্র বনপলাশি গ্রামটাই—তাকে পরিস্ফুট করবার জন্যই এসেছে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র। চরিত্রগুলির মধ্যে আলাদা করে বেছে নেব একটিকে। কারণটা এই নয় যে অন্য সব চরিত্র তার কাছে ম্লান, কেবলমাত্র এই কারণেই যে, বনপলাশি গ্রামের সঙ্গে চরিত্রটি অভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সমস্ত সংলাপ এবং আচরণে বনপলাশি গ্রামটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি হল অট্টামা।

তুলনাটা অনেকের পছন্দ না হতে পারে, তবু বলবো 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের অট্টামার সঙ্গে উপমিত হতে পারে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি মাত্র চরিত্র—না, 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ নয়, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সুচাঁদ। হাঁসুলী বাঁকের সমস্ত সংস্কার, লোকাচার, লোকজীবনের বিভিন্ন বিশ্বাস-অবিশ্বাস যেমন ফুটে উঠেছে সুচাঁদের মধ্যে, বনপলাশিরও একেবারে নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব করেছে অট্টামা। বনপলাশির পুরুষরা বাউন্ডুলে, উদাসীন, কখনো বা নৈতিক চরিত্রের প্রতিও যত্নবান নয়, কিন্তু এই গ্রামের বধূদের একটা ঐতিহ্য আছে, কুলমর্যাদা, ঐতিহ্য ও বংশমর্যাদা রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব তাদেরই—এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অট্টামা। নিজের খ্রিষ্টান স্বামীকে অট্টামা গ্রহণ করতে পারেনি এই কুলগৌরবের দিকে তাকিয়েই। নিজের সোনালি কৈশোর ও মধুর যৌবনের দিনগুলি যে কেবল অপচয়িত হয়েছে, তাতেও তার কোনো আক্ষেপ নেই। অতি প্রৌঢ়া এবং প্রায়-অথর্ব এই নারীটি তার জীবনের বেশির ভাগ দিনগুলি নিঃসীম নৈরাশ্যের অন্ধকারে কাটিয়ে এসেও গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের হাসিকান্নার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। সে তাদের দুঃখের সঙ্গী, সুখেরও সঙ্গী; এখনও। সুচাঁদ যেমন কথায় কথায় ছড়া কেটে হাঁসুলী বাঁকের গুণকীর্তন করে, অট্টামাও তেমনি অজস্র ছড়া, লোককথা, টীকা-টিপ্পনী কেটে বনপলাশীকে জীবন্ত করে তোলে। ফলে, সামাজিক সমস্যা থাকলেও 'বনপলাশীর পদাবলী'কে আমরা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে করি।

ঠ. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

বিস্ময়ের কথা হলেও এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস নামে স্বতন্ত্র

কোনো উপন্যাসের শ্রেণী সাহিত্যের প্রকরণবিদরা স্বীকার করেন নি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে মনস্তত্ত্বকে তাঁরা উপন্যাসের বাস্তবতার মতোই এমন এক অপরিহার্য সামান্য ধর্ম বলে মনে করেছেন যা বাদ দিয়ে উপন্যাসের মতো আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণ দাঁড়াতেই পারে না। কথাটা এক অর্থে সঠিকও বটে, কারণ উপন্যাস শুধু আধুনিক মানুষের কাহিনী এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক মানুষকে বোঝানো শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব ব্যাপার। প্রকরণ-বিদ্দের এই শ্রেণীকে স্বীকার না করার দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস বা Novel of character নামক শ্রেণীকে স্বীকার করে নেওয়া বা চেতনাপ্রবাহমূলক রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া মানেই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হল—এই বোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। আমাদের আবার বলতে হবে, তাঁদের এই বোধও সম্ভবত ঠিক।

তবে সবটা ঠিক নয়। প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলা যায়, মনস্তত্ত্ব অবশ্যই উপন্যাসের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে জড়িত, কিন্তু মনস্তত্ত্বই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং তার সমস্ত জটিলতা ও ঘটনাবিবর্তনের নেপথ্য উৎস—ঠিক এই ভূমিকায় মনস্তত্ত্ব সব উপন্যাসে নাও থাকতে পারে। উপন্যাসের প্রধান সমস্যাটিই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা কিনা, সে কথা আমাদের বিচার করতে হবে এবং এটি বিচার করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল মনস্তত্ত্ব বর্জন করে উপন্যাসটি রচনা করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা। মনস্তত্ত্ব বর্জন করলে যে-কোনো উপন্যাসই দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু দুর্বল হওয়া আর তা অবলম্বনহীন হওয়া এক কথা নয়। কোনো উপন্যাসের শ্রেণী যদি প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক হয় তবে মনস্তত্ত্ব বর্জন করলে সেই উপন্যাসটি রচনা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অর্থাৎ সেটি রচনা করারই কোন সার্থকতা থাকে না। এ বিষয়ে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে অবশ্যই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পায়, কিন্তু একই উপন্যাস একই সঙ্গে চরিত্রপ্রধান ও মনস্তত্ত্বমূলক হতে পারে—এই দুই বিভাগের মধ্যে কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই। চেতনা-প্রবাহমূলক রীতি আসলে এক ধরনের উপস্থাপন-রীতি, এর সঙ্গে খুব সাধারণ কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ঠিক কী শ্রেণীর উপন্যাস এবং ঠিক কী তা নয়, সে কথা ভালভাবে বুঝতে গেলে একটি বিশেষ উপন্যাসকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা দরকার। সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে।

● একটি বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির শ্রেণী নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়, এর মধ্যে অবশ্য রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই প্রকৃত মতদ্বৈত আমরা দেখি। সুতরাং সেইভাবে এর বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

রাজনীতি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার এক অতি উত্তাল ও অগ্নিগর্ভ সময় এই উপন্যাসের প্রেক্ষিত। উপন্যাসের প্রধান যে তিনটি চরিত্র আমরা দেখি, তারা তিনজনেই সাধারণভাবে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়ে পড়েছে। নিখিলেশ ও সন্দীপ একই রাজনৈতিক আন্দোলনসূত্রে পরস্পরের বন্ধু হয়েছে ও সেই

বন্ধুত্বের সূত্রেই সন্দীপ নিখিলেশের বাড়িতে এসে উঠেছে। নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা এই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরোক্ষ অংশগ্রহণের জন্যই সন্দীপের কর্মযজ্ঞে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছে।

অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও এই উপন্যাসে বিশেষ কম নয়। নিখিলেশ একেবারেই রাবীন্দ্রিক নায়ক, আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে যার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত উদার। রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' ও উত্তরকালের গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ সম্বন্ধে যে মনোভাব আমরা দেখি, এখানে সেই মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। একটি পুরুষ এবং একটি নারী সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নিজেদের একটা অধিকারের স্বীকৃতি পায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সামাজিক সেই অনুষ্ঠান পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না—তাদের কাছাকাছি এনে দেয় মাত্র। এবার মানবিক ব্যবহারের দ্বারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এবং তা করতে পারলেই তাদের মধ্যে আদর্শ দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ বিবাহসূত্রে বিমলাকে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে লাভ করেছিল, কিন্তু সামাজিক সূত্রে এই পাওয়াকে সে খুব বেশি মনে করেনি বলেই সে বিমলার মানসিক উচ্চতা নিজের মতো করবার চেষ্টা করেছিল এবং বাইরের জগতে নিয়ে এসে সে সন্দীপের মতো মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিঃসঙ্কোচে; যাতে ঘরে বিমলা যাকে পেয়েছে, বাইরের জগতের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে পারে, সে-ই নিখিলেশই তার জীবনের পুরুষোত্তম। নিখিলেশ এইভাবেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সামাজিক এবং মানবিক সূত্রে, ঘরে এবং বাইরে।

রাজনীতি এবং মনস্তত্ত্ব যখন কোনো উপন্যাসে এইভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে, তখন উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের সঠিক উপায় আমাদের জানা আছে। কোন্ বিশেষ ব্যাপারটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি, কাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না, আমরা চিন্তা করতে পারি সে কথা।

রাজনীতি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আছে এবং অত্যন্ত প্রবল ভাবেই আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনায় যতোটা, ঔপন্যাসিক সমস্যা রচনায় যে ততোটা নয়, সে কথা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে একাধিক প্রধান ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দেয় রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য, যেমনটি আমরা দেখেছি 'জাগরী' উপন্যাসে। এখানে কিন্তু নিখিলেশ এবং সন্দীপ একই মতাদর্শের পোষক এবং সেই সূত্রেই একদা তাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ব্রত নিয়েই নিখিলেশ সমবায় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিল, স্বদেশী সাবান প্রস্তুত করার নামে অনর্গল অর্থের অপচয় করেছিল। নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা রাজনৈতিক মতের নয়, কোন্ পথে সেই মত প্রতিষ্ঠিত হবে—সেই পথের। সন্দীপ যখন ভেবেছে হিংসার পথে, ধ্বংসের পথে গেলেই স্বদেশী আন্দোলন দ্রুত জয়যুক্ত হবে, নিখিলেশ তখন ভেবেছে এভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে, কেবল উত্তেজনার আগুন পুইয়ে মহৎ কিছু করা যায় না—সত্যিকারের মহৎ কিছু করতে গেলে সমস্ত মানুষকে তা বুঝবার সুযোগ দিতে হবে, জনচেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, স্বদেশী মদের নেশায় মানুষকে উত্তেজিত করে হঠাৎ কিছু করে ফেললে তার ফল ভালো হতে পারে না।

তবে এর চেয়েও বড় প্রমাণ রয়ে গেছে নিখিলেশ এবং সন্দীপের চরিত্রেই—তারা মানুষ হিসাবে এখানে যতোটা চিত্রিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে মোটেই তা নয়। নিখিলেশের তবু একটা ভণিতাহীন রাজনৈতিক মত পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক মতে সে একই আদর্শে বিশ্বাসী—মানুষটার মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। কিন্তু সন্দীপের মধ্যে বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। সে রাজনৈতিক নেতা হয়ে নিজে প্রচুর ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে, যদিও নিজে কোনরকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হয় না; মুখে স্বদেশি জিনিস ব্যবহার ও বিদেশি জিনিস বর্জনের কথা বলে, অথচ বিদেশি জিনিস ব্যবহারে তার কোনো অরুচি নেই। সন্দীপের আসল অস্ত্র তার বাগ্‌বিস্তারের ক্ষমতা এবং নারী চিত্তজয়ের স্বাভাবিক ও অনায়াস দক্ষতা—এটা সে অত্যন্ত ভালভাবে জানে ও তার নিপুণ ব্যবহার করে। এইভাবেই সে রাজনৈতিক নেতা হয়েছে, রাজনৈতিক মতের প্রতি নিষ্ঠা না থাকা সত্ত্বেও। এই ভাবেই সে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে এবং বিমলার সর্বস্ব অপহরণে এগিয়ে এসেছে। চরিত্রটির কথা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, রাজনীতি তার লক্ষ্যে উপনীত হবার, উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ারমাত্র, জীবনের নীতি নয়—সে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়ে অন্য যে-কোনো পেশা বেছে নিলেও নিজের বাগ্‌বিস্তারের স্বভাবপটুত্ব দিয়ে ঠিক এই জীবনটাই সে যাপন করতে পারতো, এবং হয়তো তাই করতো।

রাজনীতিকে সরিয়ে নিলে উপন্যাসটি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার অস্তিত্ব রক্ষার কোনো সমস্যা হয় কি! বোধহয় না। রাজনৈতিক সংগ্রাম এই উপন্যাসে আমরা দেখি নি, তার আবহ অবশ্যই দেখেছি, তার উত্তাপও পেয়েছি। কিন্তু উপন্যাসের যে মূল সমস্যা সেখানে রাজনীতি বর্জিত হলে কী এমন অসুবিধা ছিল। নিখিলেশ এবং সন্দীপ অন্য কোনো সূত্রেও পরস্পর বন্ধু হতে পারতো, ব্যবসায়িক সূত্রে বা অন্য যে-কোনো ভাবে। নিখিলেশ তার আদর্শ নিয়ে এই ভাবেই বিমলাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতো, সন্দীপ তার নারীচিত্তজয়ী বাণ এভাবেই নিক্ষেপ করতো, এর জন্য রাজনৈতিক নেতা হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। জটিলতার বৃদ্ধি অনায়াসেই হতে পারতো এভাবে।

উপন্যাসের আবহ যাই হোক আমাদের মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের নাম 'ঘরে বাইরে' এবং নিখিলেশের দাম্পত্য-আদর্শের পরীক্ষা ও ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা। নিখিলেশ আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্ক বলতে বোঝে স্ত্রীকে ঘরে ও বাইরে সমানভাবে পাওয়া, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য সে এমন একটি নারীকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছে যে অত্যন্ত সাধারণ—যার মানসিক উচ্চতা নিখিলেশের ধারে কাছে আসে না। বিমলা মায়ের কাছে পেয়েছে সতীত্বের তেজ, নারীত্বের তিলমাত্র বলিষ্ঠতা সে চরিত্রে বহন করে না; সে চায় এমন একজন বলদৃপ্ত স্বামী যার শাসনে যার অত্যাচারে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করা যায় এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানো যায়। দুর্ভাগ্য দুজনেরই—যে সুন্দরী নয় তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে নিখিলেশ তাকে ভুল ধারণার সুযোগ দিয়েছে, যে উচ্চ মানসিকতার যোগ্য নয় তাকে বিদ্যায়, আচরণে অনেক বড়ো করে তুলতে চেয়েছে নিখিলেশ। ফলে সন্দীপ তার Lady Killer প্রবৃত্তির আশ্চর্য যাদু দেখাবার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছে—স্বদেশী মন্ত্রের উত্তেজক বাগ্‌জাল বিস্তার করে তাকে মক্ষীরাণী বানিয়ে অনায়াসে সে নিখিলেশের কাছ থেকে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে।

সুতরাং দাম্পত্যসম্পর্কের এই জটিলতা বর্জন করে, এই নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বর্জন করে যদি আমরা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা ভাবি তাহলে তাতে রাজনীতি থাকে বটে কিন্তু 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি থাকে না। পক্ষান্তরে রাজনীতি একেবারে বর্জন করলে উপন্যাসটি হয়তো কিছু দুর্বল হয়ে যায়। (যাঁরা মনে করেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অবিচার করেছেন, তাঁদের কাছে এমন কি এটি ইঙ্গিতও মনে হতে পারে) কিন্তু উপন্যাসটি নিরালম্ব হয় না। সেই কারণেই আমরা মনে করি মনস্তত্ত্বই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি, প্রধান চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এ উপন্যাসে যতোটা আকর্ষণীয়, রাজনৈতিক জটিলতা ততোটা নয়; এবং সেইসব কারণে সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না যে উপন্যাসটির শ্রেণী মনস্তাত্ত্বিক।

● আর-একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে খুব বেশি, এমন কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এর সত্যতাও অনস্বীকার্য, কারণ বিশেষত নারী-মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার হিসাবেই তিনি আজ পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকার কাছে সজীব হয়ে আছেন। তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় জ্ঞান কতটা প্রকাশিত, এবং সেই সূত্রে তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা সংগত কিনা আমরা বিচার করে দেখবো।

সাধারণভাবে 'শ্রীকান্ত'-এর বিশাল ব্যাপ্তির জন্যই সম্ভবত তার শ্রেণীনির্ণয়ে আমরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এটি শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস হিসেবে কেউ কেউ শ্রেণীচিহ্নিত করতে চান। আমরা এই ধরনের শ্রেণীভুক্তি সমর্থন করি না, কারণ লেখকের নিজের জীবনের প্রক্ষেপ তাঁর উপন্যাসে পড়তেই পারে—শরৎচন্দ্রের আগেও পড়েছে, পরেও পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টনের প্রসঙ্গে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এর মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তী কতটা আছে', একথা তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীতে আমরা পাই। আবার বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসেও লেখক নিজেকে ধরা দিয়েছেন, এমন কথা শোনা যায়। দিয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবেই বিচার করা উচিত, আত্মজীবনের প্রক্ষেপ হিসাবে নয়।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে টুকরো টুকরো কিছু কাহিনী আছে, তাদের একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা এবং সেই সূত্রেই উপন্যাসটিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়, এটিই আমাদের বক্তব্য। সেটি বিশদ করার চেষ্টা করা হবে।

শরৎচন্দ্র নরনারীর জীবনে প্রেমের ভূমিকা, তীব্রতা এবং অধিকারবোধের ব্যাপারটা এই উপন্যাসে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন—এমন কথা চিন্তা করা যায়। দুটি নরনারীকে সামাজিক সূত্রে এক করার চেষ্টা করা হয় দাম্পত্য বন্ধনের দ্বারা। সেই বন্ধনের তীব্রতার সঙ্গে প্রেমের বন্ধনের তীব্রতার একটি তুলনামূলক সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টাই এখানে আছে বলে আমরা মনে করি। এই উপন্যাসে নরনারীর বন্ধনের কয়েকটি একক আমরা দেখতে পাই—অন্নদাদি-শাহ্‌জী, অভয়া-রোহিণী, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত এবং কমললতা-শ্রীকান্ত। প্রত্যেকের জীবনেই, যদি নারী মনস্তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিই, সামাজিক বন্ধন এবং প্রেমের বন্ধনের

টানাপোড়েন রয়েছে। আমাদের মনে হতে পারে এই পরীক্ষায় সামাজিক বন্ধনের ওপর প্রেমবন্ধনের, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিক জোরের ওপর মানবিক জোরের জয়লাভের ঘটনা ক্রমান্বয়ে দেখানো হয়েছে।

অপর্ণা শাহ্‌জীকে পতিত্বে বরণ করেছিল। শাহ্‌জী-যে কী ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষ, শ্রীকান্ত অত্যন্ত ছোটবেলাতেও সে কথা বুঝতে পেরেছে। ইন্দ্রনাথ তার অন্নদাদিদির জন্য প্রাণভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শাহ্‌জীকে সে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না। সতীত্বের পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই অন্নদাদির মধ্যে। যাকে সে নিজে পতিত্বে বরণ করেছে, সে নেশাখোর হোক অত্যাচারী হোক, মুসলমান হোক, তাকে পতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া, চিরকাল তার পাশে থাকাটাই যে পাতিব্রত্য, এই ধর্ম সে পালন করে গিয়েছে প্রাণপণ। অর্থাৎ সতীত্বের জোরটাই এখানে আমরা দেখি প্রবলভাবে।

সতীত্বের জোর অভয়ার মধ্যেও যে ছিল না এমন নয়। সতীত্বের জোরেই সে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে সুদূর বর্মা মুলুক পর্যন্ত ছুটেছে। অথচ ছুটেছে কিন্তু নিজের প্রেমিক রোহিণীর সঙ্গে। অর্থাৎ এখানে কেমন একটা তুল্যমূল্য ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। ভালোবাসার জোর অভয়ার মনে নিশ্চয়ই আছে, না থাকলে রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে সে অচেনা দেশে পাড়ি দেবার সাহস সঞ্চয় করতে পারত না। অথচ এই পাড়ি দেবার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ এবং সামাজিক। সতীত্বের তেজ না থাকলে স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য কোনো নারী এভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে না।

প্রেমের অধিকার নিঃসন্দিগ্ধ প্রাধান্য লাভ করে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে, কারণ সামাজিক বন্ধনে শ্রীকান্তকে বাঁধবার কোনো অধিকার তার নেই। শ্রীকান্তের সঙ্গে কোনো সামাজিক সম্পর্ক তার নেই। প্রথম পরিচয় ছিল তার বাইজী, দ্বিতীয় পরিচয় সে 'বঙ্কুর মা'। তা সত্ত্বেও দেখি শ্রীকান্তের ওপর তার প্রবল অধিকারবোধ—শ্রীকান্তের অসুখের সময় সে তার সেবাযত্ন করতে পারে, এমনকী বঙ্কুর সামনেও তাকে অস্বস্তিতে পড়তে হয় না, বার্মা চলে যাবে শ্রীকান্ত, একথা শুনে সে তাকে একবার দেখা করে যাবার কথাও বলতে পারে। এই যে শ্রীকান্তর ওপর তার প্রবল অধিকারবোধ, এই বোধ তার জন্মেছে ভালোবাসার ফলে। সুতরাং রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ভালোবাসার অধিকার সামাজিক অধিকারের চেয়ে অনেক বড়ো। সামান্যতম সামাজিক অধিকার ছাড়াই শুধু ভালোবাসার অধিকারেই সে শ্রীকান্তের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ—তার দৃঢ়তা এতই বেশি যে সে বলতে পারে, শ্রীকান্ত তার 'নিজের জিনিস'।

তবু হয়তো রাজলক্ষ্মীর মনেও সামাজিক অধিকারহীনতার জন্য সামান্য কিছু দ্বিধা ছিল, যেজন্য শ্রীকান্ত একটু সুস্থ হওয়ার পরই সে তাকে চলে যেতে বলে। দীর্ঘদিন শ্রীকান্তকে নিজের কাছে রাখতে চায় না। কিন্তু কমললতার যে অধিকার তার 'শ্রীকান্ত গোঁসাই'-এর ওপর, সে একান্তভাবেই ভালোবাসার অধিকার এবং মানবিক অধিকার। বৈষ্ণবশাস্ত্রেই 'অহৈতুকী প্রেমভক্তি' বলে একটা কথা আছে, কমললতার অধিকারবোধ সেই অহৈতুকী প্রেমভক্তির জোরেই। কজেই সমাজবন্ধন যারা মানে না, তাদের ভালোবাসার বন্ধনের নির্দ্বিধ প্রকাশেই শরৎচন্দ্রের এই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হয়। সুতরাং আপাতবিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমন্বয়ে গড়া একটি উপন্যাসকে যদি পূর্ণ উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয় তবে তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের স্বীকৃতি না দিয়ে কোনো উপায় নেই।

ড. চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

চেতনাপ্রবাহ বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Stream of consciousness, সেটি অবলম্বন করে লেখা উপন্যাসকে একটি বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাস বলা হবে, না একটি বিশেষ রীতির উপন্যাস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে। কারণ এই আন্দোলনটি দানা বেঁধে ওঠে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকদের রচনারীতি বা রচনা-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু যাঁরা লিখছেন তাঁরাও একে বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলতে চেয়েছেন, অন্য কোনো ধরনের উপন্যাস নয়। ফলে একে বিশেষ এক ধরনের উপস্থাপন-কৌশল বা রচনারীতি মনে করাই সম্ভবত অধিকতর সংগত হবে।

The Stream of Consciousness কথাটা প্রথম শোনা যায় এক দার্শনিকের মুখে, ১৮৪৪ সালে। দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The Principles of Psychology-তে একথা বলেন যে মানুষের চেতনা বা consciousness-কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তার কিছুই দেখা হয়না, তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে গেলে তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে জানতে হবে। তাঁর কথা হল, "It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'Stream' are the metaphor by which it is most naturally described. In talking of it, let us call it the stream of thought, of consciousness, of subjective life.'

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের কথাই বলেছেন যে গঙ্গার শোভা বিশ্লেষণ করবার জন্য যদি কেউ গামছা দিয়ে কিছুটা গঙ্গার জল ধরে আনার চেষ্টা করে তবে সেই জলে দু-চারটে কুচো চিংড়ি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গঙ্গার বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গের কোনো শোভাই সেখানে পাওয়া যাবেনা।

প্রায় এই ধরনের আক্রমণই সমালোচক হেনরি জেমস করেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু এইচ. জি. ওয়েলসকে। তাঁরা সমালোচনাটা অবশ্য ছিল ওয়েলস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাস্তবতাবাদী কথাসাহিত্যিকরা যে জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে সেইসব 'dullest details দিয়ে মানবচরিত্র আঁকবার চেষ্টা করেন, তাতে লাভ কিছুই হয় না, ঔপন্যাসিককে প্রকৃত মানুষের চিত্র আঁকতে গেলে দৃষ্টিকে বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে অন্তরমুখী করে তুলতে হবে। হেনরি জেম্স্-এর আলোচনাটির নাম ছিল The Young Generation এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের The Times Literary Supplement-এর পৃষ্ঠায়। কাজেই 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটি প্রথম উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যদি উইলিয়ম জেমসকে দিতে হয়, একে সাহিত্যজগতে এক নতুন প্রয়োগকৌশল বা উপস্থাপন-রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব হেনরি জেমসকেই দিতে হবে। তিনি অবশ্য কিছু সুবিধাও পেয়েছিলেন, কারণ ওই সময়ে, এবং তার দু-এক বছরের মধ্যেই নতুন এই প্রয়োগকৌশলে বা শিল্পাদর্শে তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল—একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসি ভাষায়, Marcel Proust-এর লেখা একটি সুবৃহৎ উপন্যাস A la Recherche Du Temps Perdu-এর প্রথম দুটি খণ্ড Dorothy Richardson-এর বৃহদায়তন উপন্যাস Pointed Roofs (Pilgrimage উপন্যাসের প্রথম খণ্ড) এবং James Joyce-এর A Portrait of the Artist as a young man।

চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উদ্ভাবক বলতে সাধারণভাবে জেমস জয়েসের নামই মনে পড়ে আমাদের, কিন্তু এই ধরনের উপন্যাসের প্রথম সচেতন শিল্পী যে হেনরি জেমস, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনিই এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করেন এবং এর স্বপক্ষে যাবতীয় যুক্তি বিস্তার করে একে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

এই রীতি উপন্যাস রচনায় সম্পূর্ণ নতুন, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, চেতনাকে প্রবাহের মতো অনুসরণ করার আংশিক প্রয়াস এই সাহিত্যিক আন্দোলনের পূর্বেও আমাদের চোখে পড়েছে— বিদেশি সাহিত্যে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও। ইংরেজি সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Richardson, Fielding, Jane Austen প্রভৃতি; বাংলা কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও আমরা এর আংশিক ব্যবহার দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা করতে যাওয়া এবং গবাক্ষে নগেন্দ্রনাথের ছায়ামূর্তি দেখে তার স্বগতকথনকে স্মরণ করতে পারি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণীর কুমতি এবং সুমতি তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল, সেটিও এখানে মনে করা যায়। তবে এই রীতির পূর্বাভাগের সব চেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে, 'রজনী' উপন্যাস থেকে। সন্ন্যাসীর মন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভবত শচীনের মনে রজনীর জন্য যে অনুরাগ সঞ্চিত হতে শুরু করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে তা দেখিয়েছেন তাকে চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির সমতুল্য মনে হতে পারে।

চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির প্রধান লক্ষণগুলি আমরা এবার এখানে উল্লেখ করতে পারি :

ক) তাৎক্ষণিক বর্ণনায় মনের প্রতিফলন,

খ) অসংলগ্ন মানসিক চিন্তা,

গ) স্বগত কথন,

ঘ) তির্যক বর্ণনা, এবং

ঙ) অনুচ্চারিত একক সংলাপ।

প্রথম লক্ষণটির কথা লিখেছিলেন অনেক আগে Rechardson তাঁর Clarissa Harlose উপন্যাসের ভূমিকায়। চিঠিপত্রের আকারে লিখিত এই উপন্যাসের রীতি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে চিঠিগুলি 'abound not only with critical situation, but with what may be called **instantaneous** description and reflections, as also with affecting conversation; many of them written in the dialogue or dramatic way.'

অসংলগ্ন মানসিক চিন্তা কাকে বলে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই সময়ের শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর মানিক স্মৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'নক্ষত্রের রাত' থেকে :

'চোখের পাতা চটচট করছে। জড়িয়ে যাচ্ছে। আঙুলগুলো তখন থেকে বাঁকানোই আছে। বইয়ে কি সব অক্ষর লেখা। এটা কি বই? পাঁজি। আজ কি বার। বেস্পতি। তেরস্পর্শ কাকে বলে। শুক্রপুষ্ট বটিকার বিজ্ঞাপন পাঁজিতে কেন। ধার্মিক লোকেরা এগুলো পড়ে?'

স্বগত কথন মানে মনে মনে একটা আলোচনার পর্ব সেরে নেওয়া কারো সঙ্গে, উক্তি-প্রত্যুক্তি ভঙ্গিতে, যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'নীলাঞ্জনের খাতা'র একটু অংশ—''নীলাঞ্জন দে

বললেন, 'হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ফেলেছি; এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। স্বপ্নের কি কোন মানে হয়?' নীলু জবাব দিলে, 'কিন্তু তুমি তাকে ভালবাসতে, একথা কি সত্য নয়?' কিন্তু তাই বলে তাকেই তো জীবনের ধ্রুবতারা করে রাখিনি। অন্য নারীর সংসর্গ আমি জেনেছি—যাকে বলে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ, বিদেশে প্রণয়িনীর অভাব হয়নি আমার, তা জান তো?"

তির্যক বর্ণনা অবশ্য অন্য যে-কোনো ধরনের উপন্যাসেই থাকতে পারে, কিন্তু এই রীতির উপন্যাসে তার ক্ষেত্র যে অনেক অব্যর্থ, বনফুলের 'রাত্রি' উপন্যাস থেকে তার পরিচয় দেওয়া যায়—'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব করে রাত্রি মুঞ্জুরিত হয়ে ওঠে নি, নির্ঝরে চপলতা লাভ করেনি, নদীর মত দুকূল প্লাবিনী হয়নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল।'

অনুচ্চারিত একক সংলাপ এই জাতীয় উপন্যাসে থাকবেই, যেমন আমরা দেখি বুদ্ধদেব বসুর 'লাল মেঘ' উপন্যাসে :

'তার সমস্ত চুল যখন সাদা হয়ে যাবে কেমন দেখাবে তাকে? শুভ্র কেশের মহিমা। সে কি তখন বাবরি রাখবে আর গরদের ধুতি পরতে আরম্ভ করবে?'

● একটি চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

বাংলায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের প্রথম সচেতন প্রয়াস বলে কেউ কেউ মনে করেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' কে, কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ' উপন্যাসকে। এরকম সচেতন প্রয়াস না হয়েও যে প্রায় বিশুদ্ধ চেতনাপ্রবাহমূলক রীতিতে উপন্যাস লেখা সম্ভব, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমরা মনে করি সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা 'জাগরী'। শ্রেণীগত বিচারে একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বললে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু রচনাকৌশলের দিক থেকে একে চেতনাপ্রবাহমূলক বলতেই হবে। কী ভাবে লেখা তার সংক্ষিপ্ত আভাস দিলেই কথাটা বোঝা যাবে।

'জাগরী' উপন্যাসটি এক রাত্রির কাহিনী,এক ভয়ংকর রাত্রির কাহিনী। পরিবারের বড়ো ছেলে বিলুর ফাঁসি হবে পরের দিন সকালে, জেলখানায় তার বাবা এবং মা দুজনেই বন্দী। বাবা প্রবীণ কংগ্রেসী কর্মী, জেলে বসে চরকা বুনছেন, মা রয়েছে 'আওরৎ কিতা'-য়। বিলুর ভাই নীলু, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যহেতু যে নিজেই ধরিয়ে দিয়েছে দাদাকে, রয়েছে জেলের বাইরে। চারজনেই বিনিদ্র রাত্রিযাপন করছে, এবং চারজনেই একই কথা ভাবছে—তাদের ভাবনার অনুষঙ্গে এই পরিবারটির সমগ্র পরিচয় ফুটে উঠছে।

চেতনাপ্রবাহমূলক রীতি পরীক্ষার এত ভালো ক্ষেত্র অন্যান্য অনেক উপন্যাসেই পাওয়া যাবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী সে সুযোগ পেয়েছেন এবং অত্যন্ত ভালোভাবে তা ব্যবহার করেছেন। মানুষগুলির অনুপুঙ্খ পরিচয় আমরা পাইনি, তাদের কাহিনী নিটোল ভঙ্গিতে প্রথম থেকে বলাও হয়নি। ফ্ল্যাশ ব্যাক বা অতীত প্রেক্ষণের মতো করে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই তথ্যও পর্যায়ক্রমে আসেনি, এসেছে মানুষগুলির প্রত্যেকের জবানীতে তাদের চেতনাপ্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন খানিকটা সময়ের মধ্য দিয়ে। উপস্থাপন রীতি হিসাবে এখানে যে চরিত্রকথনমূলক রীতি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ চারটি চরিত্রই পৃথকভাবে তাদের

চেতনাপ্রবাহ তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে, এতেও এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ সার্থক হতে পেরেছে। এবারে আমরা এই বিশেষ ধরনের প্রয়োগপদ্ধতির যে লক্ষণগুলি উল্লেখ করেছি, সেই সব লক্ষণের ভিত্তিতে উপন্যাসের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি :

ক) প্রত্যেকটি চরিত্রের মানসিকতা যে ঠিক ঠিক ফুটে উঠতে পেরেছে সেটা কিন্তু তাদের তাৎক্ষণিক বর্ণনার মধ্য দিয়েই। যেমন বিলুর মনোভঙ্গি অত্যন্ত ভালোভাবে ফুটে ওঠে তার এই জবানীতে—'কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারা রাত নিঝুমের পালা—তাই বোধহয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব—যতটুকু আনন্দ সময়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সত্যই কি পাখিগুলি এই জন্য সন্ধ্যার সময় এত চঞ্চল হয়?'

আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বাবার জবানবন্দীর সামান্য অংশ এবার খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে—'এক সঙ্গে এতগুলি চরখার নানারকম শব্দ শুনিতে ভারি ভালো লাগে। অনেক উঁচু দিয়া যেন এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। মনে পড়াইয়া দেয় যে সোনার ভারত গড়িয়া তুলিবার পথে আমি একলা পথিক নই। ইহা তো কেবল এত গজ এত হাত সুতা কাটা মাত্র নয়। এখন যে চরখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।'

মায়ের জবানীটাই পুরো চলিত ভাষায় লিখেছেন লেখক, অত্যন্ত ভালো করেছেন—মায়ের চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে ভাষাও অনেক সাহায্য করেছে। দৃষ্টান্ত—'আমার ছেলের বিয়ে আমি যেখানে ইচ্ছে দেবো... আমি রাজি হইনি, দুজনকে মানায় না ভালো বলে। হিন্দুস্থানী আর বাঙালীতে কি মানায়? যেখানকার যা সেখানকার তা। এক গাছের বাকল আর এক গাছে এঁটে দিলে তা কি কখনও জোড়া লাগে। আমি বলবো সরস্বতী, তো ওরা বলবে সরসোয়াতী! সরস্বতী কি শুকতো রাঁধতে জানে? গোকুল পিঠের নাম শুনেছে?'

নীলুর নিজস্ব জবানীতেও তার চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। দাদা প্রসঙ্গে তার মন্তব্য—'যে কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, হয়তো মৃদু হাসির সহিত ছোট্টো একটি উত্তর দিয়া, উহা সহ্য করিয়া গেল। একেবারে নীলকণ্ঠ। সাহসের অভাব তাহার নাই, ভয় পাইয়া কোন উচিত কাজ ছাড়িয়া দিতে আজ পর্যন্ত তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু তাহার রক্ত যেন গরমই হয় না।'

খ) 'জাগরী' উপন্যাসে সমস্ত বর্ণনাই অসংলগ্ন। সামান্য এক-একটা সূত্র ধরে কীভাবে মানসিক চিন্তা অগ্রসর হয় তার উদাহরণ—'কী গাছ জানিনা, তামাটে রঙ-এর পাতা। ...গাছটির দিকে তাকাইলেই মনে হইতেছে উহার ডাঁটা ভাঙিলেই সাদা ঘন দুধের মতো রস বাহির হইবে। ক্ষেপ পাঁপড়া, তাহাকে আমরা বলি ক্ষীরুই, তাহার রসও ঠিক এইরূপ দেখিতে। ...আমি আর নীলু তাহাকে আশ্রমের কাছে গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং রোডের উপর বরারগাছের নিচেয় লইয়া গিয়াছিলাম, কেমন করিয়া রবারের রস জমাইয়া রবার তৈয়ারি করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য।'

গ) স্বগত কথনের অনেক দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে আছে, একটি উদ্ধৃতি করি : "নীলু বলিতেছে মার ডানকোলটি তাহার; বাঁ কোল আমার লইতে ইচ্ছা হইলে আমি লইতে পারি। ...মা ঠাস ঠাস করিয়া আমার পিঠে দুই চড় বসাইয়া বলিলেন, 'বুড়ো ছেলে, লজ্জা করেনা, যত বয়স হচ্ছে তত গুণ বাড়ছে!' আমি জবাব দিলাম, 'আমি সুপারি ফেলেছি নাকি?' 'ফের কথা! ছোট ভাই ডান কোল চাচ্ছে, তা ওনার, ডান কোল নিতে হবে। ডান কোল নীলুর।"

ঘ) তির্যক বর্ণনার একটু দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি—'আমার বুকের উপর দিয়াই যেন লরিখানা চলিয়া গেল—টানিয়া যদি ধরিয়া রাখিতাম—গায়ের জোরে, যত শক্তি আছে আমার শরীরে—কাঁকরভরা রাস্তার উপর দিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লরীর চাকা থামাই, এত জোর কি আমার আছে—'

ঙ) একক সংলাপ, অবশ্যই অনুচ্চারিত, এই উপন্যাসে অনেক পাওয়া যায়। একটু অংশ উদ্ধার করা যায় : সেই নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষী! এতো আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারিনা। নীলু গোঁয়ার, নীলু অবুঝ, নীলু খামখেয়ালী, সব ঠিক—কিন্তু সে যে দাদা অন্ত প্রাণ। নীলু কি কখনো এমন করতে পারে? সেই দিন থেকে যখনই কথাটা ভাবি আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। যদি খবরটা সত্যি হয়!'

কাজেই 'জাগরী' উপন্যাসে যে চেতনাপ্রবাহমূলক কৌশলের সার্থক ব্যবহার আছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঢ. বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসের পার্থক্য

একটি উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই থাকতে পারে, সে কথা আমরা ইতোপূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে সামান্য ধর্ম হিসাবে এ সব কিছু থাকলেও তার বিশেষ ধর্মটি কী, সে কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ যে-ধরনের সমস্যা উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় অবলম্বন বলে আমাদের মনে হবে, যে-প্রসঙ্গ বর্জন করলে উপন্যাসটি লেখার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, উপন্যাসের শ্রেণী নির্বাচনে তাকেই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়টি বোঝাবার জন্য আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছি। এবার বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য সেই উপন্যাসগুলিকেই গ্রহণ করছি যাতে এ সম্পর্কে ধারণা আমাদের আরো স্বচ্ছ হয়।

এক।। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

ইতিহাসের পটভূমি, ইতিহাসের তথ্য ও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে লেখা উপন্যাসকে বলা চলে ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং মানুষের মনস্তত্ত্বকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাসকে বলে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস—খুব সাধারণভাবে দুই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্যের সূত্রের কথা আমরা জানি। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমরা জানি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব ঐতিহাসিক উপন্যাসে আলোচিত হতেই পারে, এবং হওয়াটাও স্বাভাবিক; কারণ উপন্যাসমাত্রই আধুনিক সময়ের সৃষ্টি, ঐতিহাসিক উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়, আর আধুনিক পাঠককে সন্তুষ্ট করতে হলে মনস্তত্ত্ব-বীক্ষণ অত্যাবশ্যক, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ এবং সালতামামির জন্য আধুনিক পাঠক, সাহিত্যের পাঠক, ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েন না।

তাহলে ঐতিহাসিক উপাদান এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সহাবস্থান থেকে কীভাবে আমরা

অগ্রসর হবো এর শ্রেণী-নির্ধারণে! তার সহজ সূত্র অবশ্য একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রন্থে, বলা হয়েছে উপন্যাসের সামান্য ধর্মের মধ্যে একটি ধর্ম বিশেষ ভাবে উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে, সেটিই তার কেন্দ্রীয় শক্তি, সুতরাং সেই ধর্ম অনুসারেই উপন্যাসের শ্রেণীবিচার হয়ে থাকে। এই বিশেষ ধর্মের ব্যাপারটা সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক জটিলতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে যতো সহজে নির্ণয় করা যায়, ঐতিহাসিক ধর্মের ক্ষেত্রে ততো সহজে নির্ণয় করা সম্ভব নয় বলেই, অন্তত সেরকম করে আমরা কিছু বলি নি বলেই, জটিলতা বাড়তে পারে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকেই পুনর্বিবেচনা করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করি।

কোনো সন্দেহ নেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপজীব্য। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে রাজসিংহ এবং ঔরঙ্গজীব চরিত্রে মানবিক অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাঁদের ঔপন্যাসিক চরিত্রে পরিণত করা হলেও রাজপুত-মোগল সংঘর্ষই এই উপন্যাসের সূত্রপাত ও পরিণতি। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, উপন্যাসের একটি দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে মবারক-জেবউন্নিসার অপ্রেম থেকে প্রেমে উত্তরণের গল্প, যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক এবং উপন্যাসের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ভেবেই বঙ্কিমচন্দ্র এর চতুর্থ সংস্করণে এই দীর্ঘ অংশ সংযোজন করেছেন। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠতেই পারে, আদ্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক এই সংযোজিত অংশটুকুই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি নয় কেন! যদি তা নাই হতো তবে এই অংশ ব্যতিরেকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন তাঁর অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের মতো 'রাজসিংহ'এর প্রথম সংস্করণকেও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে খারিজ করবেন এবং এই অংশ সংযোজনের পরেই তাকে বলবেন 'সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস'! আমরা কি এরকমও ভাবতে পারি না যে, ইতিহাস এর বহিরঙ্গ উপকরণ মাত্র, আসলে এব কেন্দ্রীয় শক্তি প্রেম, মনস্তত্ত্বের আলোকে যাকে তিনি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন— রাজসিংহের ক্ষেত্রে যা লঙঘন করতে পেরেছে প্রৌঢ়ত্বের বাধা, ঔরঙ্গজীবের ক্ষেত্রে যাকে দেখা গেছে একাকিত্বের যন্ত্রণায়, জেবউন্নিসার জীবনে যা ঘটিয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন, বাদশাহজাদী থেকে প্রেমিকায় রূপান্তর সাধন।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের আশ্রয় করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে তিনি সেই বিশেষ ধর্মটির কথা বলেছেন যার জন্য ইতিহাসই একটি উপন্যাসে কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই বিশেষ ধর্মটি দেখা যায় উপন্যাসে একটি বিশেষ রসের স্ফূরণ ঘটলে, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'ঐতিহাসিক রস'। সংস্কৃত আলংকারিকদের নবরসের মধ্যে এটি পড়ে না বলে তিনি বলেছেন, 'অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় না।' এই রস তাদেরই অন্যতম।

এই রস এবং কার্যত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষ ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক রকম করেই তাঁর ধারণা বিশদ করেছেন। দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছাড়া তা বোঝান অসম্ভব বলেই আমাদের উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদ্‌সম্পদ্ হর্ষবিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি; কারণ সে-সমস্ত সুখদুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। ...

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থান পতন মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান্ কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।...

এই-যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখ হইতে দূরত্ব—আমরা যখন চাকরি করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন-যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ— ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ। ...

শেক্‌সপীয়রের 'অ্যান্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা' নাটকের যে মূল-ব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। ... আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে এক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ... আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফোরক দূরত্ব এবং বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়েছে—আমরা ঐতিহাসিক রসের প্রকৃতিও বুঝতে পেরেছি, এবং সম্ভবত এটাও বুঝতে পেরেছি, উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব থাকলেও কী কারণে তা ঐতিহাসিক উপাদানেরই একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ঐতিহাসিক রস বলতে রবীন্দ্রনাথ বোঝেন দুটি ব্যাপার—কালের ব্যবধান সৃষ্টি করে আমাদের খণ্ডিত ও সাধারণ পারিবারিক জীবনচর্যা থেকে উত্তরিত হওয়া এবং একটি জাতির কালের যাত্রার ধ্বনি গোচরীভূত করা, পরিচিত, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মকে জাতির ভালোমন্দের অঙ্গীভূত করে তাতে 'চিত্তবিস্ফোরক দূরত্ব ও বৃহত্ব' সৃষ্টি করা। আরো সহজ করে বলতে গেলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সৃষ্টি হয় ইতিহাসের এক ব্যাপ্ত প্রেক্ষিত এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মনস্তত্ত্বকে একটি জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত করে আরো বিরাট করে তোলা হয়। পদার্থবিদ্যায় Resonance বা মহানাদ বলে একটি ব্যাপারের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। একটি টিউনিং ফর্ক বাইরের আঘাতে যখন কাঁপে তখন তার শব্দ প্রায় শোনাই যায় না, কিন্তু একটি চোঙাভর্তি বাতাসের ওপর যখন তা ধরা হয় তখন টিউনিং ফর্কের কম্পনাঙ্ক এবং বায়ুস্তম্ভের কম্পনাঙ্ক অভিন্ন হয়ে যায় বলেই এক মহানাদ শোনা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও ব্যক্তিগত আচরণের সঙ্গে জাতির ভালমন্দ জড়িত থাকায় আচরণের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

রাজসিংহ উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহকে রাখী পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন পেরিয়ে এর কোনো প্রতিক্রিয়া থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই রাখী গ্রহণের অর্থ রূপনগরের সঙ্গে রাজসিংহের সখ্য এবং মুঘলের সঙ্গে শত্রুতা। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, জেবউন্নিসা এবং মবারকের কাহিনীতে মনস্তত্ত্বের একটি বিরাট ভূমিকা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও

আমাদের ভেবে দেখতে হবে, জেবউন্নিসা কোনো সাধারণ সুন্দরী নন, তিনি ঔরঙ্গজীব-দুহিতা। কাজেই তাঁর পূর্ব মানসিকতা এবং প্রেমে উত্তরণ সেই ধরনেরই একটি মহানাদ উৎপন্ন করে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের যা সম্পদ। সে কারণেই মনস্তত্ত্ব প্রাধ্যান্য পেলেও, তাকে পারিবারিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখতে পারি না বলে 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবেই স্বীকৃতি জানাতে হবে, তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখানে তার কেন্দ্রীয় ধর্ম নয়।

দুই।। সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

সংজ্ঞা অনুযায়ী বিচার করতে গেলে সামাজিক উপন্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য বোঝা এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। সামাজিক সমস্যা যে উপন্যাসের প্রাণ তাকে আমরা বলতে পারি সামাজিক উপন্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই যে উপন্যাসের ভিত্তি তাকে আমরা আখ্যা দিতে পারি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। কিন্তু সমস্যা এই যে, সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত করার জন্য কিছু আধুনিক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতেই এই সমস্যা পরিস্ফুট হয়। অথবা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা করতে গেলেও একটি সামাজিক সমস্যার আধারে তাকে স্থাপন করবার প্রয়োজন ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমস্যা সামাজিক অথবা মনস্তত্ত্ব, সে বিচার অনেক সময়ই জটিল হয়ে পড়তে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেইভাবেই একে বিচার করা মোটেই অসংগত নয়। এমন কথা নয় যে একটি বিধবার সমস্যাকে এখানে বড়ো করে দেখানো হয়েছে এবং এ সমস্যা তখন একটি প্রধান সামাজিক সমস্যাই ছিল। হয়তো এটাও বড়ো কথা নয় যে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে যেমন কুন্দনন্দিনীকে প্রায় জোর করে বৈধব্য দান করা হয়েছিল, এখানে তেমনটা ঘটে নি। এখানে নায়িকা রোহিনীকে আবাল্য বিধবাই দেখানো হয়েছে—আসলে সেসব ছাড়াও এ কথা বলা যায় যে এখানে সেই বৈধব্যকে নিজের প্রতি সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অবিচার মনে করেই রোহিণী যাবতীয় কর্মে লিপ্ত হয়েছিল যা এই উপন্যাসের জটিলতা তৈরি করেছে।

তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও তো আমরা ভাবতে পারি, রোহিণী এবং গোবিন্দলাল তো কেবল সামাজিক জীবই নয়, তারা তো ব্যক্তিমানুষও বটে, কাজেই তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা বা পারিবারিক সমস্যা হিসাবে একে অভিহিত করলেই বা অসংগতি হয় কোথায়। একটি পূর্ণ-যৌবনা নারী তার কামনা-বাসনার নিবৃত্তি চাইছে এবং একটি পরিণতযৌবন মানুষ কুরূপা একটি স্ত্রী পেয়ে অন্তরে অতৃপ্ত বলে, সন্তানহীনতার ব্যবধানও যার জন্য আংশিক দায়ী, সৌন্দর্যের সেবা করতে চাইছে—এই ঘটনাকে আমরা একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে অভিহিত করবো না কেন! মনস্তত্ত্ব তো নিরালম্ব নয়, তারও তো একটা ভূমি চাই, সে ভূমি সামাজিক হলেই বা ক্ষতি কী।

না, ক্ষতি কিছু নেই, নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু সমস্যাটা যখন তীব্র সামাজিক সমস্যা হিসাবেও গণ্য হতে পারে, তখন আমাদের দেখতে হবে এখানে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জোর কতোখানি—তা কি এমন গভীর ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সামাজিক প্রসঙ্গ বাদ দিলেও উপন্যাসটিকে ধরে রাখতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দেবার এটাই কিন্তু বড়ো

প্রশ্ন। এর উত্তর, আমাদের স্বীকার করতেই হবে, সদর্থক হওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। প্রথমত, রোহিণীর যে আচার-আচরণ, তাকে কামতাড়িত নারীর প্রবৃত্তির অসংযম আমরা ভাবতেই পারি না। তা যদি হতো তাহলে হরলালের জন্য উইল চুরি করতেও যেতো না এবং বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধও হতো না। হরলালকে সে সাহায্য করতে গিয়েছিল কেবল বিপত্নীক হরলাল তাকে বিবাহের লোভ দেখিয়েছিল বলে, তার সঙ্গ কামনা করলে হরলাল যে তাকে প্রত্যাখ্যান করতো না, সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি রোহিণীর নিশ্চয়ই ছিল। রোহিণীর অসহিষ্ণুতাকে ও 'অন্যায়' আচরণকে আমরা এক ধরনের সুপ্ত সামাজিক প্রতিবাদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছে সে এবং করে ক্ষুব্ধ হয়েছে এই কারণে যে, নিজের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও সমাজ তার ওপর এমন একটা অন্যায় অনুশাসন চাপিয়ে দিয়েছে যাতে সম্পূর্ণ যোগ্য হয়েও তাকে বিড়ম্বিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এই ক্ষোভ সম্পূর্ণ সামাজিক কারণে জাগ্রত বলে সমস্যার প্রকৃতি হিসাবে সামাজিক অনুশাসনকে আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণাজনিত সমস্যা করে তুলতে হলে উপন্যাসকে সেই ভাবেই অগ্রসর হতে হতো। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের যে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রথমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে গোবিন্দলালের এই ক্ষোভের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় নি। সন্তানহীনতা বিষয়েও কোনো ইঙ্গিত কখনো করা হয় নি। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখা হলে সমস্যার বীজ সম্বন্ধে একটু পূর্বাভাস দিতেই হয়, নতুবা গোটা ব্যাপারটাকেই আমাদের আকস্মিক মনে হতে পারে।

তৃতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এবং আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেতো রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের সংসার পত্তনের পর। রোহিণী যে সুস্থ দাম্পত্যজীবন আশা করেছিল তা এখানে সম্ভব নয়, গোবিন্দলালের চোখে যে সে উপপত্নীর বেশি আর কিছু নয় এবং তার বেশি সম্ভ্রম ও মূল্যও যে সে পেতে পারে না এটা রোহিণী বুঝতে পারতো। তার সেই ধীর অথচ নিশ্চিত আশাভঙ্গের নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই হতে পারতো এই উপন্যাসের আকর্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন নি, এমন কী করতে হতে পারে এই আশঙ্কায় উপন্যাসের কেন্দ্র পরিবর্তন করে দ্বিতীয় খণ্ডে তা ভ্রমরকেন্দ্রিক করে দিয়েছেন। এর কারণটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অধঃপতন বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেই কারণেই একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়াও যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই সত্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

তিন।। রাজনৈতিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

রাজনৈতিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও একটি উপন্যাসের মধ্যে রাজনীতি ও মনস্তত্ত্ব—উভয় প্রসঙ্গই বর্তমান থাকতে পারে, এবং এমনও হতে পারে যে এই দুটি প্রসঙ্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে আমরা অন্য কোনো শ্রেণীতে বিন্যস্ত করছি, যেমন কিনা সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। রাজনীতি এই উপন্যাসে অবশ্যই আছে, এবং আছে ঢোঁড়াইয়ের অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে উঠে আসবার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন একটি অঞ্চলে চরিত্র ও কাহিনী লালিত হয়েছে যাতে অঞ্চলটিকেই আমাদের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ও শক্তি বলে মনে হয়।

আসলে, রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের মিশ্রণ থাকলেও কেমন করে আমরা এদের শ্রেণী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবো, সে বিচার সূক্ষ্ম হতে পারে, জটিল বা বিভ্রান্তিকর নয়। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উদাহরণ দিতে গিয়ে যে দুটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সত্য আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তাদের পুনর্বার স্মরণ করলেই এ কথা বোঝা যাবে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অনেক তীব্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বুঝতে পারি তা পটভূমি হিসাবে উপন্যাসকে বাড়তি গুরুত্ব দান করেছে মাত্র, এর কেন্দ্রীয় সত্য রয়েছে বিবাহ সম্বন্ধে নিখিলেশের একটি সযত্নলালিত ধারণার মধ্যেই এবং তাকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাস-দেহ গঠন করেছেন।

পক্ষান্তরে সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসে কেবল চারটি চরিত্রের মনঃসমীক্ষণই দেখানো হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্য সবচেয়ে উপযোগী উপস্থাপন-রীতি চরিত্রকথন-মূলক রীতিই গ্রহণ করা হয়েছে, এমনকী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রাবল্যে একে চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতির উপন্যাস হিসাবেও কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। এঁদের সকলের আবিষ্কারই আংশিকভাবে সত্য কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই বিশেষ ভঙ্গি, অতীতচারিতা, বিশেষ উপস্থাপন রীতি বা পদ্ধতি, সবই প্রতিস্থাপন করা সম্ভব—উপন্যাস তার পরেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বর্জন করলে এ উপন্যাস লেখাই সম্ভব হয় না। এরপর আর এর শ্রেণীবিচারে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

চার।। আঞ্চলিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আমরা জানি, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যও আমাদের অজানা নয়, সুতরাং এ দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অন্তত সংজ্ঞার্থের দিক থেকে খুবই সহজ। সমস্যা হয় যখন উভয় বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান চোখে পড়ে। উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব থাকবেই, মনস্তত্ত্ববর্জিত সাহিত্যকে শুধু উপন্যাস কেন, আধুনিক কালের কোনো সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবেই আমরা মেনে নিতে পারি না। শ্রেণী নিয়ে সমস্যা হয় আসলে সেই উপন্যাস একটি বিশেষ অঞ্চলে রচিত হলে যে অঞ্চলের একটি বিশেষ চরিত্র আছে। তখন উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-ব্যাখ্যান থাকলেও সেই অঞ্চলটির কথা আমরা বার বার বিবেচনা করে আমাদের সিদ্ধান্তকে জটিল করে ফেলি। এরকম করার কিন্তু বিশেষ কারণ নেই। উপন্যাসের শ্রেণীবিচারে এ জাতীয় জটিলতার আশঙ্কা দেখা দিলেই আমাদের ভেবে দেখা দরকার অঞ্চলটির যে বিশেষ চরিত্র আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে, তা প্রধান চরিত্রগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে কিনা, ঔপন্যাসিক ঘটনা অন্য কোনো অঞ্চলে ঘটলে চরিত্রগুলির আকর্ষণ আমাদের কাছে অব্যাহত থাকতো কিনা। যেমন ধরা যাক, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসটির কথা। উপন্যাসটিকে বিচিত্র চরিত্রের ভাণ্ডার বলা যায়—রাজু পাঁড়ে, গনু মাহাতো, ধাওতাল সাহু, ধাতুরিয়া, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী, মঞ্চী, কুন্তা, আরো কতো। কিন্তু সত্যচরণ যেখানে গিয়ে এইসব চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছে সেই অঞ্চল থেকে ভ্রষ্ট হলে চরিত্রগুলির সমস্ত আকর্ষণই যে নষ্ট হয়ে যেতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার একটা কল্পিত চিত্র লেখক নিজেই দিয়েছেন রাজকুমারী ভানুমতী সম্বন্ধে— 'কলের বাঁশীতে তিনটার সিটি বাজিল। ভানুমতী

মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই —চার পয়সা ঝুড়ি।'

একই কথা বলা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্বন্ধে। পদ্মার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের ভীরুতা, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, হীনম্মন্যতা ইত্যাদি যেন একধরনের শ্রেণীচরিত্র নির্মাণ করেছে, একটি অঞ্চল যেন সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তবে একটি অঞ্চল থাকলেই যে তা চরিত্রকে আচ্ছন্ন করবে এমন কথা বলা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের পটভূমি একটি বিশিষ্ট গ্রাম গাওদিয়া, কিন্তু এই গ্রাম শশী ডাক্তারের চরিত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি; প্রভাব কিছু থাকতেই পারে, কিন্তু সে বিচার স্বতন্ত্র।

পাঁচ।। সামাজিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দুটি শ্রেণীর মধ্যে বিচার-বিভ্রমের কোনো আশঙ্কা নেই বলেই মনে হয়। কারণ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি আলাদা, রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃতিও আলাদা। রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থাও অবশ্য পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন বঙ্গভঙ্গ নামক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে বাংলার সামাজিক জীবনেও তীব্র আলোড়ন ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দেশ বিভাগের এই সমস্যা নিয়ে প্রচুর ছোটগল্পও রচিত হয়েছে, উপন্যাসও লেখা হয়েছে কিছু। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আমাদের মনে পড়বেই। কিন্তু এ নিয়ে প্রায়শই কোনো সমস্যা থাকে না এ জন্য যে, এটির প্রকৃতি কী হবে তা লেখক পূর্বাহ্নেই স্থির করে নেন।

তা সত্ত্বেও যদি এ বিষয়ে কোনো জটিলতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন আমাদের ভাবতেই হবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা কোন্‌টা—রাজনীতি না সামাজিক সমস্যা! ঠিক প্রত্যক্ষভাবে এই উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করেছে কোন্ দিকটা! কী ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতে লেখক বেশি আগ্রহী, রাজনৈতিক না সামাজিক! এ বিচারে সাহায্য করতে পারে আমাদের গ্রহণ-বর্জনের সেই কৌশল—আমরা রাজনৈতিক জটিলতা এবং সামাজিক সমস্যা, দুটিকেই একের পর এক সরিয়ে রেখে দেখতে পারি উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য কোন্ প্রসঙ্গ। এই জটিল বিভ্রান্তির খুব ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে। উপন্যাস শুরু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের এক পলাতক সৈনিককে নিয়ে, উপন্যাসের প্রধান পুরুষও সে—জলে ভাসতে ভাসতে এসেছিল দেবতার আশীর্বাদের মতো, তাই তার নাম দিয়েছিল জগদ্দল অঞ্চলের মানুষ লখীন্দর, লখাই। সেই নামেই তাকে আমরা সারা উপন্যাসে অভিহিত হতে দেখি। উপন্যাসের প্রথমে উত্তর ভারতের এই সৈনিক বার বার বিচ্ছিন্ন ভাবে রোমন্থন করেছে, অথবা বলা ভালো রোমন্থন করতে বাধ্য হয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি। ইংরেজের প্রতি তার জাতক্রোধ দিয়েই শেষ হয়েছে উপন্যাস। সুতরাং সমগ্র উপন্যাসেই রয়েছে রাজনৈতিক সমস্যার এক বাতাবরণ। কিন্তু আরো খুঁটিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো এই উপন্যাসে সমাজ-বিবর্তনের এক অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ইংরেজ বেনিয়ার হাতে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে যে এক ব্যবসাক্ষেত্র হয়ে উঠবে, ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো যে

ভেঙে পড়বে, একে সমাজেতিহাসেরই এক অনিবার্য গতি বলা চলে। সেইটাই আমরা হতে দেখেছি। যে সমাজ লখীন্দর মনে করে উত্তরঙ্গের নায়ককে আশ্রয় দিয়েছিল, তার প্রকৃতি অবশ্যই ফিউডাল। এই কৃষকসমাজ, জমিদার এবং সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের চিত্রই ফুটে উঠেছে উপন্যাসে—চাষবাসের অবস্থা সঙ্গীন হচ্ছে, আর মাঠঘাট নিশ্চিহ্ন করে গড়ে উঠছে চটকল। এটা মেনে নিতে পারে না সাত পুরুষের কৃষক-সমাজ, চোখ ফোটে জল আসে তাদের, কিন্তু উপায়ও কিছু নেই—একে আটকানো যাবে না, এ কথাও তারা বোঝে। শেষ চেষ্টা করেছিল লখাই, ঘোড়ার গাড়িতে ধাবমান দুই সাহেবকে আটকে দিয়ে। কিন্তু উপন্যাস শেষ হয় ইতিহাসের অমোঘ সংকেতকে সত্য করে নেবার মতো ছোট্ট একটি রূপকের মধ্য দিয়ে, যেখানে আমরা দেখি লখাইয়ের শিশুপুত্র একটা 'ছিলিন্ডারকে' (সিলিন্ডার) 'খালা' (খাড়া) করে দেবার চেষ্টা করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কলকারখানাকেই মেনে নেবে, এই সিলিন্ডারই খাড়া করবে তারা, লাঙল ফেলে দেবে—এরকম ইঙ্গিত এখানে থাকতে পারে। তাই উপন্যাসটি রাজনৈতিক না সামাজিক, এ বিচারও বোধহয় সেখানেই হয়ে যায়।

ছয়।। সামাজিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাস এবং আঞ্চলিক উপন্যাসের পার্থক্য অতি স্পষ্ট—তীব্র কোনো সামাজিক সমস্যাই সামাজিক উপন্যাসের প্রাণ, পক্ষান্তরে আঞ্চলিক উপন্যাস তৈরি হয় বিশেষ এক অঞ্চল সজীবতায় বিশিষ্ট এক চারিত্র লাভ করলে, কারণ উপন্যাসে তাকেই তখন আমাদের চরিত্রসমূহ ও ঘটনাদির নিয়ামক, এবং এক কথায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি বলে মনে হয়।

এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসের শ্রেণী-চরিত্র নির্ধারণে বিশেষ কোনো সমস্যা হওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ বিশেষ অঞ্চলে থাকে বিশেষ জনগোষ্ঠী, তাদের একটা আলাদা সমাজ থাকে, সেই সমাজের সমস্যা অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা থাকে বলেই তাকে আমরা একটা আঞ্চলিক সমস্যা বলে গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং সমস্ত দেশের মানুষের তা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা হিসাবে গৃহীত হবার সম্ভাবনা কম। কাজেই এদের পৃথকীকরণ দুঃসাধ্য নয়।

সাত।। রাজনৈতিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাস

রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসকে বলে রাজনৈতিক উপন্যাস এবং বিশেষ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা উপন্যাসকে বলে আঞ্চলিক উপন্যাস, অবশ্যই অঞ্চলটি চরিত্রবিশেষে পরিণত হলে—এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসকে পৃথক করে বেছে নেওয়া খুব শক্ত নয়, এমন কথা মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসের গোত্র-নির্ধারণই বহুক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কারণটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

বেশ কিছু রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস এক-একটা বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলির এক-একটা আলাদা চরিত্রও আছে, ফলে এই বিশেষ অঞ্চলকে আশ্রয় করে উপন্যাস লিখলে—প্রধান

ঘটনা হিসাবে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব অবশ্যই থাকবে, তা আঞ্চলিক স্বাদে পুষ্ট হয়ে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবেই অভিহিত হতে পারে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক আন্দোলন যদি কেবল সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থাকে, যদি বৃহত্তর আকার নিয়ে সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানলের সৃষ্টি করে, তখন আঞ্চলিক সীমা পেরিয়ে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই উপন্যাস-পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং শ্রেণীবিচার করতে গিয়ে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে আর আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি না—তারা আঞ্চলিক হওয়া সত্ত্বেও। এ কথা বলবার সময় অনিবার্যভাবেই আমাদের মহাশ্বেতা দেবীর কিছু উপন্যাসের নাম মনে পড়বে যারা একই সঙ্গে আঞ্চলিক এবং রাজনৈতিক। সেক্ষেত্রে তীব্রতার মাত্রাই হবে আমাদের বিচার্য বিষয়। সেই সঙ্গে দুটি ব্যাপার আমরা চিন্তা করতে পারি—লেখিকাকে কোন্ দিকটি উপন্যাস রচনায় প্রণোদিত করেছে, রাজনৈতিক চিন্তা অথবা আঞ্চলিক জীবন! এ প্রশ্ন করলেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তির সন্ধানও আমরা পেয়ে যাবো।

ণ. অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাস

উপন্যাসের বিষয় ও প্রকৃতিভিত্তিক প্রধান শ্রেণীগুলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এছাড়াও অন্য অনেক বিভাগের কথা বিভিন্ন সাহিত্য-প্রকরণমূলক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে, কোনো না কোনো ভাবে আমাদের উল্লিখিত বিভাগগুলির মধ্যেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবু সেগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিয়ে রাখছি। প্রথমে 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে উল্লেখিত শ্রীশচন্দ্র দাশের কয়েকটি বিভাগের কথা বলি।

এক॥ কাব্যধর্মী উপন্যাস

এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—''আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা বা চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা গ্রন্থকারের কবিদৃষ্টি যে উপন্যাসের জীবনদর্শনকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তোলে, তাহাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে।'' আসলে story-teller বা Novel of Character-এই দুই ধরনের উপন্যাসের বাইরে কবিত্বময় অনুভূতি নিয়ে লেখা উপন্যাসকে বোধহয় এই পর্যায়ে ফেলা যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই জাতীয় উপন্যাসকে খাঁটি উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন, কারণ কবি ও ঔপন্যাসিকের রচনা পদ্ধতিগত ভাবেই পৃথক, এখানে সেই পার্থক্য বজায় রাখা হয় না। এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'The Waves', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', আমরা এর সঙ্গে যোগ করতে পারি থোরুর 'Walden' বা বুদ্ধদেব বসুর 'প্রভাত ও সন্ধ্যা'।

দুই॥ গোয়েন্দা উপন্যাস

এই শ্রেণীটি অবশ্য ইংরেজি বাংলা উভয় সাহিত্যেই বেশ জনপ্রিয় এবং সাধারণ ভাবে মহৎ

সাহিত্যের স্বীকৃতি না পেলেও বহু শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও যে অবসর বিনোদনের জন্য এই ধরনের উপন্যাস বেছে নেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গোয়েন্দা উপন্যাস বা Detective Novel-এ কাহিনীই মুখ্য। অপরাধী তার দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি এমন অপরাধ সংঘটিত করে যার কোনো সূত্র পাওয়া যায় না এবং তাকে ধরা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। গোয়েন্দা সেই অপরাধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে অপরাধের কারণ, উপায় এবং সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধীকে ধরে ফেলবেন, এটাই এই ধরনের উপন্যাসের সাধারণ ছক। সাধারণভাবে ঘটনার অভিনবত্ব, শেষ পর্যন্ত জাগ্রত কৌতূহল, গোয়েন্দার মতো পাঠককেও পদে পদে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাই এই সব কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভবত সেই কারণেই মহৎ সাহিত্য হিসাবে একে স্বীকৃতি জানাতে সমালোচকগণ দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু আমরা মনে করি মহৎ সাহিত্যিকের হাতে এই শ্রেণীর উপন্যাসও অতিমাত্রায় সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে একে ঠিক গোয়েন্দা উপন্যাস না বলে বলা উচিত অপরাধমুখ্য সাহিত্য। মানুষের মনের একটি অন্ধকারময় দিক থাকেই—সভ্যতার অগ্রগতি তাকে অবদমিত করে রাখতে পারে, নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের সেই পঙ্কিল প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের সেই অন্ধকারময় জটিল মনস্তত্ত্ব যখন এই ধরনের কাহিনীর আশ্রয় হয়, তখন তা আমাদের উপভোগ্য হতে বাধ্য।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত কবি-সমালোচক এড্‌গার অ্যালান পো-র হাতে; তাঁর মসিয়ঁ দুপঁকেই প্রথম গোয়েন্দা বলা চলতে পারে। অবশ্য ইংরেজিতে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সার আর্থার কোনান ডয়েল এবং তাঁর গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স্‌। হোম্‌সের জনপ্রিয়তা এতোই বেশি ছিল যে 'Final Problem' নামক একটি গল্পে তাকে মেরে ফেলার পরও পাঠকের অনুরোধে ও চাপে ডয়েল তাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আগাথা ক্রিস্টি এবং তাঁর ফরাসী গোয়েন্দা এরকুইল পয়রো (Hercule Poirot) অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। অবশ্য অন্য এক মহিলা-লেখিকা ডরোথী এল্‌-সেয়ার্স-ও অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর গোয়েন্দা-উপন্যাস রচনা করেছেন।

বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা যায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি সিরিজ বার করেছিলেন, যার প্রথম বই 'বনমালী দাসের হত্যা'। অবশ্য তারও অনেক আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। এরপর কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (বাঁকাউল্লার দপ্তর), গিরিশচন্দ্র বসু (সেকালের দারোগা কাহিনী), দীনেন্দ্রেকুমার রায় প্রভৃতি গোয়েন্দা কাহিনী রচনায় এগিয়ে এলেও সে যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর 'মায়াবিনী', 'মনোরমা', 'নীলবসনা সুন্দরী'—বিশেষ করে 'হত্যাকারী কে?' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসকে সাহিত্য-পদবাচ্য করে তোলেন প্রথম হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু কাহিনী কেবল মনোরঞ্জনই করে না, সাহিত্যিক আস্বাদও দেয় যথেষ্ট। অতঃপর অনেকেই গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন এবং আজও লিখে চলেছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং তাঁর গোয়েন্দা কিরীটী রায় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা এবং জটায়ুও কিছু কম জনপ্রিয়তা পায় নি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রসগুণসম্পন্ন গোয়েন্দালেখক হিসাবে শরদিন্দু

বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নাম করতে হবে। তাঁর গোয়েন্দা ব্যোমকেশ একেবারে খাঁটি বাঙালী চরিত্র—ছুরি নয় রিভলবার নয়, বুদ্ধিই তার প্রধান অস্ত্র। শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশ করার জন্যই বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে, যথা 'রহস্য রোমাঞ্চ' (সম্পাদক বিমল কর ও অরুণ ভট্টাচার্য), 'রহস্যচক্র' (শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী), 'ডিটেকটিভ' (শ্রীধ্রুব সরকার) প্রভৃতি। তবে সবচেয়ে বেশি স্থায়িত্ব পেয়েছিল প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক 'রোমাঞ্চ' (প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

তিন॥ বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস

ইংরেজি The Name of Adventure অবলম্বনে এই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে পুরনো পিকারেস্ক নভেলের বিষয়বস্তুও ছিল এই ধরনের বীরত্বের কাহিনী, যেখানে বীরের প্রধান কাজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। উদাহরণ হিসাবে স্টিভেনসন-এর Kidnapped এবং ম্যারিয়াট-এর Mr. Midshipman Easy-র উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় আমরা শশধর দত্তর দস্যু মোহন সিরিজ বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের রঘু ডাকাতের কথা বলতে পারি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাস হলেও অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

চার॥ হাস্যরসাত্মক উপন্যাস

নাটকের কমেডির আদর্শে উপন্যাসের এই ধরনের একটি বিভাগ শ্রীশচন্দ্র দাশ করতে চান। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে Humourous Novel, তারই আদলে এই বিভাগ। কিন্তু মুশকিল এই যে হাস্যরসাত্মক উপন্যাসে হাসির উৎস নানাদিক থেকে আসতে পারে—চরিত্রের অসঙ্গতি, সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক মতের অসঙ্গতি অথবা অন্য ধরনের কিছু। কোনো প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ, মতবাদ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করেও উপন্যাস লেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য হয় পৃথক শ্রেণীনির্বাচন করতে হয়, অথবা আমাদের উল্লিখিত কোনো শ্রেণীতেই তাকে ফেলতে হয়। সেরকম সূক্ষ্ম উপবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রবেশ না করাটাই আপাতত সমীচীন বিবেচনা করি। বাংলা উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস 'মডেল ভগিনী', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু', পরশুরামের রাবীন্দ্রিক আচার-আচরণের প্যারডি 'কচিসংসদ', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক রসিকতা 'কঙ্কাবতী' বা 'ডমরুধর চরিত', শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পাঁচ॥ সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক উপন্যাস

সমালোচক অ্যাব্রাম্‌স্ উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে এই ধরনের একটি বিভাগের পক্ষপাতী। এদের উৎস যথাক্রমে জার্মান প্রতিশব্দ Bildungsroman এবং Erziehungsroman। সাধারণত শৈশব থেকে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত এখানে নায়কের মন ও চরিত্র কেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা

গঠিত হয় তা দেখানো হয়ে থাকে—অনেক সময় কোনো আধ্যাত্মিক সংকটও তার অঙ্গীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত সংকট কাটিয়ে চরিত্রটি তার নিজস্ব পরিচয় বুঝতে পারে এবং তার করণীয় কর্তব্যগুলির সন্ধান পায়। এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে গ্যেটের 'Wilhelm Meisters' Apprenticeship', টমাস মানের 'The Magic Mountain' বা সামারসেট মমের 'Of Human Bondage'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

ছয়॥ কারা উপন্যাস

সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসটি রচিত হবার পর উপন্যাসের এই ধরনের একটি শ্রেণীবিভাগের কথা সমালোচকগণ আগ্রহের সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন এবং এ নিয়ে গবেষণাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। কারাগারে যেসব মানুষ আসেন তাঁদের অতীতজীবনে বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কাহিনী থাকতে পারে। সে সব কাহিনীর একশোভাগই অপরাধমূলক না হতে পারে, মানুষের প্রবঞ্চনা, আত্মরক্ষার অধিকার, অন্যায় ষড়যন্ত্র—সব কিছুই জড়িয়ে থাকতে পারে সেখানে। তবে কারা উপন্যাসে আমরা সাধারণভাবে বোধহয় প্রত্যাশা করি অন্ধকারময় জগৎ বা Under world-এর কথাই। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে)—"আমি কারাসাহিত্য অর্থে কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি না—কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহাকেই উক্ত নামে অভিহিত করিতেছি।"

ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক কারা উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যাবে কোয়েস্টলারের 'ডার্কনেস অ্যাট নুন' সল্‌ঝোনিৎসিনের 'আইভ্যান ডেনিসোভিচ' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং গলস্‌ওয়ার্দির 'জাস্টিস' নাটকে। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কারা উপন্যাসের মধ্যে নাম করা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী', সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শৃঙ্খল', জরাসন্ধের 'লৌহকপাট', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' বা 'স্বীকারোক্তি' প্রভৃতির।

সাত॥ বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাস

বিজ্ঞানের কোনো সত্যকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্পর্কে কল্পনামূলক উপন্যাসকেই বলা যেতে পারে বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাস বা কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস। অবশ্য এর সূক্ষ্ম ভাগ করতে গেলে আমরা বলতে পারি এই ধরনের উপন্যাসের তিনটি বিভাগ থাকতে পারে—বিজ্ঞানমুখ্য উপন্যাস বা Science-based novel, কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস বা Science fiction এবং বিজ্ঞানসুবাসিত খেয়ালি কল্পনামূলক উপন্যাস বা Fantasy। বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার বা সেই আবিষ্কারের সময়কার চাঞ্চল্যকর কাহিনী উপন্যাসের মতো শোনালে পাই বিজ্ঞানমুখ্য উপন্যাস। বাংলায় নারায়ণ সান্যালের 'বিশ্বাসঘাতক' এর উদাহরণ। কল্পবিজ্ঞানের ভালো উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কুর গল্পগুলি বেশির ভাগই ফ্যান্টাসির পর্যায়ে পড়ে, তবে দুটি একটি উপন্যাসে আদর্শ কল্পবিজ্ঞানের স্বাদ পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান অধিকাংশই ফ্যান্টাসি জাতীয়। সেইজন্যই গ্রহান্তর, অন্য সৌরজগৎ ইত্যাদি অঞ্চলেই সেগুলির বিচরণ। বিজ্ঞান আমাদের জীবনে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সুতরাং ভালো কল্পবিজ্ঞান লিখতে গেলেই মাহাকাশ যাত্রার কোনো কারণ নেই।

আট ॥ পারিবারিক উপন্যাস

পারিবারিক উপন্যাস নামে উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কেউ কেউ স্বীকার করেন। এর পক্ষেও যেমন কিছু যুক্তি আছে, বিপক্ষেও কিছু যুক্তি আছে। সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সমালোচক অ্যাব্রামসের এই মন্তব্যের ওপর জোর দিয়েছিলাম যে এই ধরনের উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থাকে খুব বেশি। অর্থাৎ সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা নিরাপত্তার অভাব চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে বেশি। কিন্তু এমন সামাজিক উপন্যাস যদি দেখা যায়, বিষয়বস্তু এবং রচনাকৌশল থেকে যাকে সামাজিক বলেই মনে হয়, অথচ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া যার মধ্যে বিশেষ নেই—তাকে আমরা সামাজিক না বলে পারিবারিক উপন্যাস হিসাবেই চিহ্নিত করতে পারি বোধহয়।

আর একটু বুঝিয়ে বললে বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক সমস্যা মনে হলেও এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে, যাকে পারিবারিক সমস্যা বলাই ভালো। যেমন ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন, কিন্তু বাড়ি ফিরে ক্লান্ত স্বামী আশা করেন তাঁর স্ত্রী (যিনি নিজেও প্রায় একই রকম ক্লান্ত) প্রত্যহই চা করে মুখের সামনে ধরবেন। একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই সংসারে অশান্তি দেখা দেবে। এই সমস্যাটা অনেকটা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে (অবতরণিকা) রক্ষণশীল পরিবারের কর্তা যে বৌমার বাইরে চাকরি করতে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারবেন না, এটা একটা সামাজিক সমস্যা—বিশেষ পরিবারের সমস্যা নয়; কারণ একটি বিশেষ সামাজিক স্তরের মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে এ সমস্যা জড়িয়ে আছে।

অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, হয়তো এইরকম একটি সামাজিক সমস্যাকে অবলম্বন করেই উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে, কিন্তু যদি দেখা যায় তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সীমাবদ্ধ আছে একটি পরিবারের মধ্যেই, তাহলেও তাকে সামাজিক না বলে পারিবারিক উপন্যাস আখ্যা দেবার কথা আমরা ভাবতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কথাই ধরা যাক। তুলনায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটিকে আমরা সার্থক সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি, কারণ প্রবৃত্তির অসংযমের কথা বললেও কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ দেবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বৈধব্য দান করেছিলেন, ফলে সমস্যাটি প্রকারান্তরে বিধবাবিষয়ক সমস্যায় রূপান্তরিত হয় এবং এ বিষয়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়—হরদেব ঘোষাল তাঁর চিঠিপত্রে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সূর্যমুখী কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্খ পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী বালবিধবা, অথচ সমস্যাটা সেখানে প্রবৃত্তি অসংযমেরই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলীন বংশে দ্বিতীয় বিবাহ মারাত্মক অপরাধ না হলেও রোহিণীর ক্ষেত্রে বৈধব্যের ব্যাপারটাই সমাজের চোখে বড় হয়ে দাঁড়াতে পারতো, কিন্তু তা দাঁড়ায়নি। গোবিন্দলালের সমস্যা তাদের পরিবার পেরিয়ে বাইরে কোথাও ছড়িয়ে যায়নি, বিশেষ কোনো সামাজিক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেনি,

এমনকি সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার, গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিবাহও করেননি। সুতরাং এই সমস্যাকে একটি পারিবারিক সমস্যা আখ্যা দিলেও খুব বিরূপ সমালোচনা করা শক্ত।

পরিবারিক উপন্যাস নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কল্পনার বিপক্ষে যুক্তিটা এবার বলা যাক। পরিবারের এমন কোনো সমস্যা নিয়ে যদি উপন্যাস রচনা করা যায় যাকে সঠিকভাবে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না, বা ঔপন্যাসিক তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার প্রতিই বেশি উৎসাহী, তবে সেই উপন্যাসকে আমরা পারিবারিকই বা বলবো কেন, তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসই তো আখ্যা দিতে পারি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। সেখানে সামাজিক দুর্নীতির চেয়ে অনেক প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিগত স্খলন, গোবিন্দলালের আত্মসমীক্ষা ও আত্মশাসনের ব্যর্থ প্রয়াস। সুতরাং মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য এখানে অবশ্যই আছে এবং যেসব ঘটনা সেখানে ঘটেছে, তার চেয়ে নিজের সঙ্গে অবিরত নিজের লড়াইও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুতরাং সঠিক শ্রেণীনির্ণয় করতে গেলে তাকে তো মনস্তত্ত্বমূলক আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়, পারিবারিক কেন।

অনেকে এরকম ধারণাও পোষণ করেন যে, খাঁটি ট্র্যাজিক নাটক রচনা করার পরিকল্পনা সার্থক না হলে যেমন মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়, সামাজিক উপন্যাস রচনার পরিকল্পন সেইভাবেই সার্থক হতে না পারলে তা পর্যবসিত হয় পারিবারিক উপন্যাসে। এ মত অবশ্য আমরা সমর্থন করতে পারি না। ব্যর্থ ও স্বল্পক্ষম ঔপন্যাসিকের হাতে কোনো শ্রেণীর উপন্যাসই সার্থক হতে পারে না।

আসলে আমরা মনে করি, পারিবারিক উপন্যাস সৃষ্টিক্ষমতার তারতম্যজনিত কোনো ব্যাপার নয়, ঔপন্যাসিকের বিচ্যুতিও তাকে বলা যায় না। সামাজিক উপন্যাসের মতো যে-কোনো সামাজিক বিষয় নিয়েই তা লেখার পরিকল্পনা করেন লেখক, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাকে ব্যাপ্ত করে দেখান না, সমাজের প্রতিক্রিয়াও তিনি দেখান না। আধুনিক উপন্যাসেই ব্যাপারটা বেশি হয়, কারণ সমাজ নামক ব্যাপারটাই এখন নিতান্ত অস্পষ্ট ও অল্পশক্তি হয়ে এসেছে। ফলে সমস্যাটা সেই সময়ের একটি সামাজিক সমস্যা হয়েও শেষ পর্যন্ত পারিবারিক সীমানার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে রমাপদ চৌধুরীর 'সাদা দেয়াল' উপন্যাসটির নাম করতে পারি আমরা। ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাবা-মা জীবনপাত করেছেন এবং বাইরে যাবার সুযোগ থাকায় ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে চলে গিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে অসহায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে—এটি একটি জ্বলন্ত আধুনিক সমস্যা। এই সমস্যাই উপন্যাসটির উপজীব্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিবদ্ধ থাকে কালীসাধনের পরিবারেই, কারণ বাইরের লোকের এ নিয়ে ভাববার সময় কোথায়! কেবল কালীসাধন যেদিন বেশি মাছ কেনেন সেদিন পরিচিত কেউ বোঝেন, বাড়িতে ছেলেমেয়ে কেউ আসছে। শূন্যদিনের রিক্ত এইসব রক্তহীন দিনরাতের মধ্যে কালীসাধনের কাছে সত্য হয়ে থাকে শুধু ঘরের একটি দেয়াল যা চারবছরের নাতনি মিঙ্কু একদিন রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সামাজিক উপন্যাসের অক্ষম প্রচেষ্টা নয়, এটি একটি রসোত্তীর্ণ পারিবারিক উপন্যাস।

নয়॥ মহাকাব্যিক উপন্যাস

উপন্যাসের একটি শ্রেণীবিভাগের কথা সাম্প্রতিক কালে শোনা যায়, সেটিকে ইংরেজিতে বলে

Epic novel, বাংলায় পরিভাষা হিসাবে মহাকাব্যিক উপন্যাসই বেশি প্রচলিত, কেউ কেউ এই ধরনের উপন্যাসকে মহাকাব্যোপম উপন্যাস বলার পক্ষপাতি। এই ধরনের উপন্যাসের প্রকৃতি বুঝে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

খুব সাধারণভাবে মহাকাব্যিক উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ এই রকমই হওয়া উচিত যে, যে-উপন্যাসের মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ স্পষ্টরূপে সন্ধান করা সম্ভব এবং মহাকাব্যিক বিশালতা যার মধ্যে বর্তমান, তাকেই আমরা বলতে পারি মহাকাব্যিক উপন্যাস। মহাকাব্যের লক্ষণ কী, মোটামুটি ভাবে আমরা জানি, উপন্যাসের লক্ষণ কী, তাও আমাদের অজানা নয়—এই দুইয়ের সমন্বয় মহাকাব্যিক উপন্যাসে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। অথবা অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাসের মতো এরকমও আমরা ভাবতে পারি যে তাকে আগে হতে হবে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত, তারপর দেখতে হবে 'মহাকাব্যিক' বিশেষণ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কীনা। তবে যে ভুল ধারণার মীমাংসা প্রথমেই করে নেওয়া দরকার সেটা হল, মহাকাব্যিক বিশালতা বলতে বোঝায় একটা মাত্রাগত বিশালতা, আয়তনগত বিশালতা নয়। অর্থাৎ আয়তনে কোনো উপন্যাস অত্যন্ত বিশাল হলেই—যেমন হয়েছে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' বা বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'—তাকে আমরা কেবল তার আয়তনের সৌজন্যে মহাকাব্যিক আখ্যায় ভূষিত করতে পারি না।

অখণ্ডতা এবং অসম্পূর্ণতা উপন্যাসমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য কিন্তু মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের যেখানে পার্থক্য সেটা হল এই যে, উপন্যাস একটি ব্যক্তিমানুষের অখণ্ড জীবন-উপাখ্যান হতে পারে, অথবা হতে পারে একটি পরিবারের সম্পূর্ণ আখ্যান, কিন্তু মহাকাব্যিক আখ্যা পেতে গেলে তাকে হতে হবে একটি জাতির আশা-আকাঙক্ষার কাহিনী বা একটি বিশেষ সময়ের নির্ভরযোগ্য দলিল—কারণ একমাত্র তখনই এই উপন্যাসের একটি মহাকাব্যিক চরিত্র আমাদের চোখে পড়তে পারে। বোধহয় এই কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাকাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে, সন্দেহ নেই রসিকতার ছলেই, এর একটা লক্ষণের কথা বলেছিলেন, 'যাহা পড়িতে হয়না তাহাই মহাকাব্য।' এর অর্থ, একটি জাতি বা সময়ের চিত্র মুদ্রিত হওয়ায় ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য তাতে কম গুরুত্ব পায়, অন্তত তুলনামূলক ভাবে, এবং সেই কারণেই নিপুণ জীবনচিত্রের অনুপুঙ্খ বিবরণের চেয়ে প্রাধান্য পায় অখণ্ড গোষ্ঠীচিত্র। কাজেই প্রত্যক্ষ পাঠ ভিন্ন অন্যভাবে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেও হয়তো তার রস সমানভাবেই উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য একথা মহাকাব্য সম্বন্ধে আংশিক সত্য হলেও মহাকাব্যিক উপন্যাস সম্বন্ধে নয়, পাঠ না করলে তার সম্যক্ রস-উপলব্ধি সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে লিও টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পিস'কে অনেকেই মহাকাব্যিক উপন্যাস আখ্যা দেন, এ আখ্যা ডিকেন্সের কয়েকটি উপন্যাস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে আমাদের মনে হয়—যেমন 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' বা 'এ টেল অব টু সিটিজ' এ জাতীয় উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলায় এ জাতীয় উপন্যাস হিসাবে বোধহয় প্রথম উল্লেখ করা হয় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'কে। যদি 'গোরা'র বিশাল আয়তন এর জন্য দায়ী না হয়, যেটা হওয়া একেবারে অসম্ভবও নয়, তাহলে বলতে হবে ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির একটা বিরাট বড়ো প্রেক্ষিত এখানে আঁকা হয়েছে; যুক্তি দিয়ে সমস্ত ধর্মসংস্কারকে উড়িয়ে দেওয়া নয়—তাকে মেনে নিয়েই, কোন্ কার্যকারণ সূত্রে ও প্রেক্ষিতে এই ধরনের আচার-বিচারের জন্ম

হয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করার কথা বলা হয়েছে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে—সেটাও এর মহাকাব্যিক চরিত্র গড়ে দিতে পারে। একটা বিশেষ সময়ের কথাও এখানে বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে রচিত উপন্যাসের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' উল্লেখযোগ্য, কারণ মহাকাব্যিক লক্ষণ এই উপন্যাসেও আছে।

● একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস

সাধারণভাবে বলা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে মহাকাব্যোচিত প্রসারতা ও যুগপ্রকাশক ক্ষমতা আছে। সমালোচকগণ প্রায়শই এমন মত পোষণ করে থাকেন যে, তারাশঙ্করের উপন্যাসে ভাষা ও আঙ্গিকের পরীক্ষা, চরিত্র-বিচারে বিশ্লেষণী ভঙ্গি অথবা সূক্ষ্ম কারিগরি কম দেখা যায়, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিত অনেক বড়ো এবং যুগের ক্রান্তিকালকে বোঝার জন্য যেমন দূরত্ব দরকার, তাঁর উপন্যাসও যেন একটু ব্যাপ্ত পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখেই পড়া দরকার—সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর উপন্যাসের সৌন্দর্য তেমন বোঝা যাবে না। এই ধারণার সঙ্গে 'যাহা পড়িতে হয় না তাহাই মহাকাব্য', এই প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি মিলিয়ে দেখলেই তারাশঙ্করের প্রথম দিকের উপন্যাসে মহাকাব্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে একটা আভাস আমরা পেতে পারি।

যে-কোনো একটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনে যদি আমরা তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিকে গ্রহণ করি তাহলেও দেখবো, সূচনায় আমরা তাঁর উপন্যাসে মহাকাব্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সাধারণ মন্তব্য করেছি তা এই উপন্যাস সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিমানুষ নয়, একটি যুগকে প্রকাশ করবার জন্যই যেন এই উপন্যাস তারাশঙ্কর রচনা করেছেন। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত জমিদারী প্রথা ক্রমশ বিলীন হতে বসেছে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সামাজিক স্তরের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং শিবনাথের পিসিমার তীব্র আস্ফালন 'জমি বাপের নয়, দাপের'—বার বার শোনার পরও আমরা বুঝি এই দর্প প্রকাশের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। যে শিবনাথ নেকড়ের বাচ্চা ধরে আনন্দ পেতো, সে-ই যখন কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করে শহরে পড়তে গিয়েছে, সুশীল ও পূর্ণের সাহচর্যে সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনের দীক্ষা লাভ করেছে, তখন যেন শিবনাথের লড়াই শুরু হয়েছে 'রক্তকরবী' নাটকের রাজার মতো—নিজের বিরুদ্ধেই নিজের লড়াই।

সমাজতত্ত্বের নিয়ম সঠিকভাবে মানা হয়েছে কীনা, সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক বিপ্লব অপেক্ষা ধনতন্ত্রেরই সম্পর্ক বেশি কীনা, এ সব বিষয় প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি যুগের অবসানকেই আমরা সামগ্রিক ও অখণ্ড এক পটে ধৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, ব্যক্তিগত কাহিনী সে তুলনায় গৌণ হয়ে গিয়েছে। শিবনাথ ও গৌরীকে নিয়ে একটা ব্যক্তিগত কাহিনী লেখক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং বিরাট ক্যানভাসের কথা বিস্মৃত হতে পারলে তার সাহায্যে একটি সুমিষ্ট আখ্যান তারাশঙ্কর গড়ে তুলতে পারতেন, কিন্তু সে ব্যাপারটা এ উপন্যাসে হয়নি।

চরিত্রসৃষ্টির দিকে তাকালেও আমরা এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করি। উগ্র ব্যক্তিত্ব, প্রখর

মর্যাদাবোধ এবং জমিদারী আভিজাত্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন পিসিমা এবং তিনি এই জমিদারী আভিজাত্যেরই প্রায় প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তার পাশে শিবনাথের উদারহৃদয়া ও আদর্শপরায়ণা মা যেন আর এক প্রতীকী চরিত্র—যিনি বোঝেন, জমিদারী দাপটের দিন শেষ হয়ে এসেছে, মানুষকে মানবিক মর্যাদা দান করেই নতুন যুগকে স্বাগত জানাতে হবে। বালক শিবনাথের মনে পিসিমার প্রভাব কার্যকর হলেও পরিণত বয়সে মায়ের আদর্শই সে গ্রহণ করেছে। অন্যান্য চরিত্রও প্রায় শ্রেণীচরিত্র—নায়েব রাখাল সিংহ, মাস্টার রামরতন বাবু, বিপ্লবী সুশীল, পূর্ণ সকলের সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। কাজেই সব দিক থেকে চিন্তা করলে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিকে সম্ভবত আমরা মহাকাব্যিক বা এপিকধর্মী উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি।

দশ ॥ নভেলেট

সাধারণত ছোট নভেল বা ক্ষুদ্র উপন্যাসকেই আমরা এখন নভেলেট বলে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সঙ্গে যে তিনটি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস রচনা করেছিলেন—'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' এবং 'ইন্দিরা', তাদেরও তিনি ক্ষুদ্র উপন্যাসই আখ্যা দিয়েছিলেন; সম্ভবত এই কারণেই যে নভেলেট কথাটা তখনও চালু হয়নি।

The Penguin Dictionary of Literary Terms-এ কিন্তু কাডন জানিয়েছেন, যেসব উপন্যাসের তেমন কোনো সাহিত্যগুণ নেই, তাদেরই সাধারণভাবে মনে করা হয় নভেলেট। একটা সস্তা ধরনের লঘু উপন্যাস বা হৃদয়াবেগের বাহুল্যযুক্ত উপন্যাস অথবা সাময়িক বিনোদনের জন্য রচিত রোমাঞ্চ-উপন্যাসকে স্থূল অর্থে নভেলেট বলা হয়।

এটা যদি প্রকৃতিগত বিচারে কাডনের বক্তব্য হয়, তবে আকৃতি বিচারে তাঁর বক্তব্য হল, নভেলেট হচ্ছে 'A work of fiction shorter than a novel but longer than a short story.' আমেরিকার 'দীর্ঘ ছোটগল্প'-কেই বলা হয় নভেলেট এও তিনি জানিয়েছেন।

এসব লক্ষণ থেকে নভেলেটের সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা একটু শক্ত। ছোটগল্প বড়ো হলেই যদি তা নভেলেট আখ্যা পায় বা নভেল ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি আকারের সৃষ্টিকে যদি আমরা নভেলেট বলি, তাহলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, বড়োগল্প আমরা কাকে বলবো। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বা 'বিন্দুর ছেলে' যে জাতীয় রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' (অন্তত প্রথম সংস্করণ) বা 'যুগলাঙ্গুরীয়ও সেই একই ধরনের রচনা। তখন শরৎচন্দ্র তাঁর ওই দুটি রচনাকে আখ্যা দিয়েছেন ছোটগল্প, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'ক্ষুদ্র উপন্যাস'।

আমরা মনে করি, অনুগল্প যেমন এক ধরনের ছোটগল্প, নভেলেটও এক ধরনের উপন্যাস, কিন্তু আয়তনে ছোট উপন্যাস ছোটগল্পের প্রধান লক্ষ এক মুখিনতা, উপন্যাসের লক্ষ্য সামগ্রিকতা। সামগ্রিকভাবেই এটি জীবনবৃত্তের ছক করা হবে বা একটি সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার চেষ্টা করা হবে—কিন্তু তা বিস্তারিত হবেনা, বিশদ হবেনা; পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস যে ধরনের বিশ্লেষণ দাবি করে, চরিত্র-পরিস্ফুটনের যতখানি পরিসর তার অবশ্যক, সমস্যাকে সুপরিস্ফুট করার জন্য ঘটনাবলি যত ছড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক তা যদি তিনি না দেন, তবেই তাকে বলতে পারি আমরা নভেলেট। এক কথায় তাকে আমরা বলতে পারি একটি উপন্যাসের

খসড়া, কোনো মতেই সম্প্রসারিত ছোটগল্প নয়। সেই কারণে একটি নভেলেটকে, যদি সত্যিই তা নভেলেট হয়, ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করলেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের চেহারা দিতে পারেন—সম্প্রসারিত ছোটগল্প হলে যেটা সম্ভব হতনা।

নভেলেটের উত্থানের জন্য যুগরুচি এবং সাময়িকপত্রেও কিছু ভূমিকা আছে বলে মনে করা চলে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ঊনবিংশ বা বিশ শতকের গোড়ায় যে ধ্রুপদী বা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের জোয়ার এসেছিল, বিশ শতকের পরবর্তীকালে সেই জাতীয় উপন্যাস রচনার প্রবণতা অনেক কমে গিয়েছে। একথা শুধু যে বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধেই সত্য এমন নয়, ইংরেজি উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য। রিচার্ডসন বা সঙ্কটের কথা ছেড়ে দিলেও চার্লস ডিকেন্সের ধ্রুপদী উপন্যাস, থ্যাকারের ভ্যানিটি কেয়ার', অ্যান্টনি ট্রলোপ বা জর্জ মেরেডিথের কিম্বা টমাস হার্ডির উপন্যাস এমনকী সামারসেট মমের 'অব ম্যান বন্ডেজ' বা 'দ্য অরওয়েন, সাম্প্রতিকদের মধ্যে লরেন্স ডারেল বা আইরিশ মার্ডক ইত্যাদির লেখা উপন্যাসকে আয়তন দেখালেই বোঝা যাবে জনরুচি কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উপন্যাসের আয়তন। এই সময়ের বিখ্যাত দুই কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিক আলবের কামু এবং জাঁ পল সার্ত্রর উপন্যাসগুলি দেখলেও একথা বোঝা যাবে।

বাংলা সাহিত্যে এক সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ উপন্যাস, ট্রিলজি ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর', বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস' বা 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি প্রকাশিত হয়েছে। এখনও দীর্ঘ উপন্যাস কেউ লিখছেন না এমন নয়, যে অতি স্বল্প সংখ্যক ঔপন্যাসিক এখনও বড়ো উপন্যাসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতীন বন্দ্যোপাধায়। তবে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' ধরনের উপন্যাসের আবেদন জনরুচিতে কমে আসছে, বদলে দেখা দিচ্ছে ছোট উপন্যাস পাঠের আগ্রহ।

বর্তমান সময়ের অতিব্যাস্ততা যদি এর একটা কারণ হয় তবে, আর একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই সাময়িকপত্র। প্রধান সাময়িক পত্রগুলি পূজা সংখ্যায় আগে একটিই দীর্ঘ উপন্যাস প্রকাশ করতেন। এখন সংখ্যায় অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশ করতে না পারলে তাঁরা স্বস্তি বোধ করেন না। ফলে নামে সম্পূর্ণ উপন্যাস হলেও প্রকৃতিতে বেশিরভাগ রচনাই নভেলেটে পর্যবসিত হয়েছে। পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত অনেক লেখাই যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাদের আকার দেখলেই (হার্ড কভার বা পেপার ব্যাক) এ-কথা বোঝা যাবে। সম্ভবত এই কারণেই প্রকাশকদের 'দশটি উপন্যাস' একসঙ্গে প্রকাশের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় অধিকাংশ উপন্যাসকে নভেলেট আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়।

এগারো ॥ গথিক উপন্যাস

সাধারণভাবে 'গথিক' বলতে আমরা মধ্যযুগীয় সৃষ্টিই বুঝি, যেমন গথিক স্থাপত্য বলতে বোঝায় মধ্যযুগীয় একধরনের স্থাপত্য—মোটা সোটা স্তম্ভ, কারুকাজ করা খিলান, ভেতরের ছাদে নানারকম নক্‌শা ইত্যাদি। গথিক বলতে অবশ্য মধ্যযুগীয় না বুঝিয়ে বোঝানো উচিত বোধহয় জার্মানীয়, কারণ গথ ছিল জার্মানীরই একটি বিশেষ উপজাতি।

গথিক উপন্যাস বলতে অবশ্য আমরা ঠিক মধ্যযুগীয় উপন্যাস বুঝিনা, কারণ মধ্যযুগে উপন্যাস নামক শিল্পকৃতিরই জন্ম হয়নি। উপন্যাসের সঠিক জন্মের আগেও যে রোমান্স জাতীয় রচনা ছিল, যাকে রোমান্স বলাই ভালো, সেগুলিকে অবশ্য আমরা গথিক উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি। তবে এই শ্রেণীটি বিভিন্ন দেশের সাহিত্যেই যে শুধু পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাই নয়, উপন্যাস সৃষ্টি হবার পর, এমনকি আধুনিককালেও এই জাতীয় উপন্যাস কিছু সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাজেই এর প্রকৃতি একটু জেনে রাখা ভালো।

গথিক উপন্যাসের জগৎ একটু রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, ফেলে আসা অভিজাত পরিমণ্ডল—কখনো মৃত্যুর আগ্রাসী ছায়া, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, আতঙ্কের পরিবেশ। এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগতের সীমারেখার ব্যবহারই যে গথিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, সেই সময়কার এবং এখনকার কিছু গথিক উপন্যাসের নাম করলেই সে কথা বোঝা যাবে। 'গথিক কাহিনী' কথাটা নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেছেন আর্থার হোরেস ওয়ালপোল, ১৭৬৪ সালে প্রকাশিত নিজের উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন, 'Castle of Otranto, A Gothic Story'। অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকেই এই ধরনের উপন্যাস লিখেছিলেন উইলিয়াম বেকফোর্ড (Vathek),অ্যান র‍্যাডক্লিফ (The Mysteries of Udolphs), ম্যাথু গ্রেগ লুইস (The Monk), অ্যান ইয়ার্সলি (The Royal Captives) প্রভৃতি। পরবর্তী শতকে এই জাতীয় উপন্যাসের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছে। এই জাতীয় কাহিনী আমেরিকা এবং জার্মানীতেও প্রচুর দেখা দিয়েছে। আমেরিকান সাহিত্যে নাথানিয়েল হথর্ন, মেরি শেলি (ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন), এডগার অ্যালান পো প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকও এই জাতীয় কাহিনী লিখেছেন। অ্যালান পো অবশ্য এই ধরনের গল্পই লিখেছেন বেশি।

এখনও পর্যন্ত গথিক উপন্যাসের চাহিদা কম নয়। চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীর মধ্যে রয়েছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছাড়াও ড্রাকুলা সিরিজ, অ্যানাকোন্ডা, দা বাউস (দাফনে দ্য মরিয়ার) প্রভৃতি।

বাংলায় সঠিক গথিক উপন্যাস কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না, তবে এই ধরনের গল্প লেখা হয়েছে বেশ কিছু। হেমেন্দ্রকুমার রায় এরকম গল্পে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাম্প্রতিককালে সত্যজিৎ রায়ের 'বিচিত্র' কল্পনা সমৃদ্ধ এই জাতীয় গল্প অনেক দেখা যায়।

বারো ॥ পত্রোপন্যাস

পত্রোপন্যাস বা Epistolary Novels-কে বিশেষ ধরনের উপন্যাস না বলে বিশেষ উপস্থাপন-রীতির উপন্যাস বলাই ভালো। যেমন উপন্যাস রচনার সাধারণরীতি প্রথম পুরুষের জবানীতে লেখা উপন্যাস বা Third Person novels, এখানে উপন্যাসের কাহিনী বিবৃত করা হয় নির্বাচিত কিছু পত্রের মাধ্যমে।

এই ধরনের উপন্যাস ইংরেজি এবং বাংলাসাহিত্যে মোটেই অপরিচিত নয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস, স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' এই রীতিতেই রচিত। পরে 'ক্লারিসা হার্লো' নামে আর-একটি উপন্যাসও তিনি এই রীতিতেই রচনা করেন। এই ধরনের আরো কিছু ইংরেজি উপন্যাস হল স্মলেটের লেখা 'হামফ্রি ক্লিঙ্কার', হ্যারিয়েট লী-র 'এরর্স অব

ইনোসেন্স', সুইনবার্নের 'লাভস ক্রস-কারেন্ট্স্', প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে রচিত এই রীতির উপন্যাসের মধ্যে জন বার্থের 'লেটার্স'-এর নাম করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে পত্রোপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তার উল্লেখ করার অগে একটি কথা মনে রাখা ভালো যে উপন্যাসের বিশিষ্ট আঙ্গিক হিসাবে কিছু পত্রের ব্যবহার—যেমনটি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হরদেব ঘোষাল-নগেন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময়ে পাই, বা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর লিখে দেওয়া (আশার নামে) পত্রে পাই—তার সঙ্গে পত্রোপন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই। পত্রোপন্যাসের ক্ষেত্রে কলেবরই সঠিক হবে পত্রের দ্বারা।'

বাংলায় এ ধরনের প্রথম উপন্যাসের নাম 'বসন্তকুমারের পত্র', লেখক নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাহিনী খুব অসাধারণ কিছু নয়, প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের পটভূমিতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ, অর্থাৎ সেই চিরকালীন ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। কিন্তু উপস্থাপনার গুণে উপন্যাসটি সে সময় (১৮৮২) জনপ্রিয় হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য যে পত্রোপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি হল—কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', বনফুলের 'কষ্টিপাথর', তরুণকুমার ভাদুড়ীর, 'সন্ধ্যাদীপের শিখা', নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব', সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার / 'শ্রীচরণেষু মাকে' প্রভৃতি।

বিশেষভাবে একজন সাহিত্যিকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে, তিনি হলেন বুদ্ধদেব গুহ। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পত্রোপন্যাস আছে, যথা—'মহুয়ার চিঠি', 'মহুলসুখার চিঠি', 'চান ঘরে গান' প্রভৃতি।

সপ্তম অধ্যায় ‖ ছোটগল্প

ক. ছোটগল্পের কথা—উনিশ শতকের বিস্ময় কেন—উদ্ভবের কারণ। খ. ছোটগল্পের উৎস-সন্ধান—মধ্যযুগের সাহিত্য—আধুনিক সাহিত্য। গ. ছোটগল্প ও উপন্যাস—আকার—সামগ্রিক জীবন ও জীবনের খণ্ডাংশ—বর্ণনার রম্যতা ও সংযম—অন্যান্য রচনা ও চরিত্রসৃষ্টি—বহির্মুখী সৃষ্টি ও অন্তর্মুখী প্রতিভা—চরিত্র সৃষ্টির পার্থক্য—দুটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সূত্রগুলির ব্যাখ্যা। ঘ. ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়—বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা বিচার—সংজ্ঞা গঠন। ঙ. ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ—ছোটগল্পের একমুখিনতার সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা—ছোটগল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন কীভাবে ঘটে থাকে—ছোটগল্পের বিষয়বস্তু—আধুনিক ছোটগল্পে গল্পহীনতা এবং তার সমালোচনা—ছোটগল্পের সূচনা—ছোটগল্পের উপসংহার—উপসংহারের প্রকারভেদ—কিছু দৃষ্টান্ত। চ. ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন—বিষয়ভিত্তিক বিভাগ—প্রকৃতিমূলক বিভাগ—প্রত্যেকটি বিভাগের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। ছ. ছোটগল্পের বৃত্তগঠন—বিভিন্ন প্রকার বৃত্তের দৃষ্টান্ত—এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে আসার অসুবিধা। জ. ছোটগল্পের ভাষারীতি—স্টাইল কীভাবে গল্পকারের মানসিকতা নির্ণয় করে—বিভিন্ন ভাষারীতি—যথোচিত দৃষ্টান্ত—ছোটগল্পের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ক. ছোটগল্পের কথা

ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করতে সমালোচকগণ যত অতীতমুখেই যাত্রা করুন, একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে আধুনিক জীবন এবং আধুনিক সমস্যার জটিলতা ছাড়া ছোটগল্প নামক সাহিত্য-প্রকরণটির জন্মলাভ সম্ভব ছিল না। 'ছোটগল্প' বা 'short story' কথাটি শুনে মনে হতে পারে এটি বোধহয় গল্পেরই একটি পরিমাপগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। আয়তন এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয় এবং 'ছোট যে গল্প'—এই ভাবেও শব্দটি নিষ্পন্ন হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শিল্পপ্রকরণ। সেই কারণেই ব্রান্ডার ম্যাথিউজ 'short' এবং 'story' শব্দ দুটির মধ্যে হাইফেন যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই ছোটগল্পকে বলা হয়েছে—"Peculiar product of the nineteenth century।"

'Peculiar product' কেন, তার উত্তর দিয়েছেন ছোটগল্পের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—"এ নভেলও নয়—রোমান্স্‌ও নয়। এ কবিতার মতো ঐকভাবাশ্রয়ী—অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন নির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই অভিনব।"

অবশ্য ঊনবিংশ শতকের আগে কেন ছোটগল্পের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না, এই প্রশ্নের উত্তর এতো সহজে দেওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতকের সূচনাকে সব দিক থেকেই বলা যায় যুগসন্ধির কাল—সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানপতনকে স্মরণ রেখেই এ কথা বলা সম্ভব। জীবনের পুরনো মূল্যবোধগুলিকে যখন আর সারবান মনে হয় না, ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সামঞ্জস্য করা শক্ত হয়ে পড়ে, তখন সর্বত্র দুঃখ-যন্ত্রণা-অনিশ্চয়তা একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে চোখের সামনে; এবং ছোটগল্পের প্রথম নিষ্ঠ সমালোচকের মতে 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব।'

তাই উদ্ভবের অব্যবহিত পরে ছোটগল্পের আনন্দ উল্লাস বিস্ময় যাই আসুক, এক আন্তরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই যে ছোটগল্প নামক শিল্পপ্রকরণের জন্ম, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

গোটা ঊনবিংশ শতকেই বুদ্ধিজীবীদের মানসিক আস্থিরতা লক্ষ করবার মতো। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ঘটে গুস্তাভ ফ্লবেয়ার ও তাঁর অনুবর্তীদের হাতে। একদিকে সমাজ-সমালোচনা ছিল এঁদের সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, অন্যদিকে রাজশক্তিকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাও ছিল প্রায় একই ধরনের। তা নইলে তলস্তয়ের মতো ঋষিপ্রতিম মানুষকে লিখতে হয় না 'দি ডেভিল'-এর মতো উপন্যাস। আমেরিকায় এই ধরনের কোনো রাষ্ট্রিক সঙ্কট না থাকলেও একটা কসমোপলিটান সমাজ সেখানেও কম সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

আমরা যা বলতে চাই তাকে আরো সরলভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে জীবনের একটা যে-স্থির বিশ্বাসের আশ্রয় থাকলে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ এবং অন্ত্যপর্বে তা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে আসছিল। এর মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসকে অবিচল রাখতে পেরেছেন তাঁরা মহৎ উপন্যাসও লিখেছেন। রাশিয়ার তুর্গেনেভ এই বিশ্বাসে ভর করেই লিখেছেন 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স্', তলস্তয় যখন তাতে আস্থা রাখতে পেরেছেন তখন তাঁর হাতে আমরা পেয়েছি 'ওয়র অ্যান্ড পিস্'-এর মতো উপন্যাস। চেকভ সে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি—এই বিশ্বাস সযত্নে আঁকড়ে ধরার নিদারুণ প্রয়াস সত্ত্বেও, তাই ছোটগল্পই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান অবলম্বন। আমেরিকাতেও এই অনিকেত যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে ন্যাথানিয়েল হথর্নের গল্প বা এডগার অ্যালান পো-র অসাধারণ ছোটগল্প।

এই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, হয়তো একটু মিষ্টি করে; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পথিকৃতের এই উক্তি আমাদের একবার মনে করা উচিত। মহাকাব্যের বিশাল আয়োজন না করে খণ্ডকবিতা কেন লিখলেন সেই প্রসঙ্গেই তাঁর বক্তব্য 'কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।' বিশ্বাসের ভূমি না পেলে উপন্যাসের ভাস্কর্যও তেমনি ভাবেই সম্ভব হয় না, আধুনিক জীবনের 'সোয়ান সং' ছোটগল্প হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসী সাহিত্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রাজভক্ত প্রস্‌পার মেরিমে অকালে মৃত্যু বরণ করলেন; ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' ঐতিহাসিক কারণে যতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, সাহিত্যিক কারণে ততোটা নয়, 'স্যালাম্বো'-র পর তিনি আর অগ্রসর হতেও পারেন নি; এমিল জোলা চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ন্যাচারালিজমকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হতে, সিদ্ধি খুব বড় মাপের নয়—অথচ ছোটগল্পের যন্ত্রণাময় বৃত্তে মোপাসাঁ স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে ছোটগল্পের প্রকৃতিবিচারে কেবল এই অনিকেত যন্ত্রণা এবং ব্যক্তি ও সমাজসম্পর্কের সামঞ্জস্যহীনতার প্রতিবাদই একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করাটা ঠিক হবে না। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, তাঁর জীবনে বিশ্বাসের ভূমি কখনো বিচলিত হয়নি—অন্তত তাঁর ছোটগল্পের সোনার ফসলের দিনে। ছোটগল্পে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা এবং সহজ জীবনের আনন্দও আমরা পরে অনেক দেখেছি। এর আন্তরিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আমাদের আরো গভীর আলোচনায় স্থির করতে হবে, তবে তার আগে একটা কথা মনে রাখা ভালো, ছোটগল্প আবির্ভাবের একটা অন্য কারণও ছিল, এবং সেটা হল সংবাদপত্রের আনুকূল্য। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ট্যাটলার-স্পেকটেটর-র‍্যাম্ব্লারের কথা মনে পড়তে পারে আমাদের। মনে পড়তে পারে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার কথা যার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্প লিখে যেতে হয়েছিল। মনে পড়বেই হর্থন, পো এবং হেনরি

জেমসের কথা—সাময়িক পত্রিকাই ছিল যাঁদের প্রধান আশ্রয়। এ কথাও ভোলা শক্ত যে মোপাসাঁ তাঁর প্রায় সব কটি গল্পই লিখেছেন সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনেই।

খ. ছোটগল্পের উৎসসন্ধান

ছোটগল্প একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণ। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কেউ কেউ এর উৎস সন্ধান করেছেন। আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, রূপকথার গল্প, পরবর্তীকালের জাতক সাহিত্য, বাইবেলের প্যারাবল্‌স্, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প ইত্যাদি নানা ধরনের কাহিনীর মধ্যেই ছোটগল্পের বীজের সন্ধান করা হয়েছে। সেভাবে দেখলে সংস্কৃত সাহিত্যের 'বৃহৎ কথা', 'কথাসরিৎসাগর' বা দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত'কেও আমরা ছোটগল্পের পূর্বসূত্র বলতে পারি।

ঠিক এই ভাবেই ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন মধ্যযুগীয় রচনার মধ্যে ইংরেজি ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। অনেকের মতে গিয়োভানি বোক্কাচ্চিও-র 'দেকামেরন'-এর গল্পগুলিই ইংরেজি ছোটগল্পের আদি উৎস। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন ইংরেজি গল্পের উৎস সন্ধান করতে অতো দূরে যাওয়াটা ঠিক নয়। তাঁদের মতে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের লেখক বোক্কাচ্চিও নন, ষোড়শ শতকের ইংরেজ কবি চসারের 'কান্টারবেরি টেল্‌স্'-কেই আদিসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবশ্য বোক্কাচ্চিওকেই বেশি সমর্থন করেছে বলে মনে হয়—"It is the stories that matter. In Chaucer's Canterbury tales the tales, often weary us but the tellers never do : in Boccaccio the tales never weary us but the tellers always do."

আধুনিক কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নতুন সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে ছোটগল্পের প্রাচীনতম সূচনা সন্ধান করতে গেলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দকে আমাদের স্মরণীয় মনে হবে, কারণ এই বছরই ন্যাথানিয়েল হথর্ন তাঁর 'টোয়াইস টোল্ড্ টেল্‌স্'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয় এডগার অ্যালান পো-র সমালোচনা। এর তিন বছর পর পো নিজেই তাঁর বিখ্যাত সংকলন 'টেল্‌স্ অব দি গ্রোটেস্ক অ্যান্ড অ্যারাবেস্ক' প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকাররা অনেকেই এই দুই লেখকের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়েছেন।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ার ছোটগল্পকারদের কথা। অ্যালান পো-র সমকালেই সৃষ্টিশীল ছিলেন নিকোলাই গোগোল। তাঁর 'দি ওভারকোট'গল্পটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়। তুর্গেনেভ মূলত ঔপন্যাসিক হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্পে একটি সংকলন প্রকাশ করেন—'হান্টিং স্কেচেস'। রাশিয়ার ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেন তলস্তয়, চেকভ এবং আরো পরবর্তীকালের ম্যাক্‌সিম গোর্কি।

ছোটগল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্যই ফরাসী সাহিত্যিকদের; সেরা দুটি নাম বালজাক এবং মোপাসাঁ। মোপাসাঁ যখন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর অসামান্য ছোটগল্পগুলি প্রকাশ করতে থাকেন তখন ফরাসী সাহিত্যে ন্যাচারলিস্ট আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে। এই

আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এমিল জোলা সৃষ্টিকার্যে ছিলেন অক্লান্ত শিল্পী। আলফাঁস দোদে ছিলেন জোলার সার্থক শিষ্য। পরবর্তী কালে আনাতোল ফ্রাঁসও ছোটগল্পের বড় শিল্পী ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দুটি ছোটগল্প লিখলেও তাঁর নিয়মিত ছোটগল্প লেখা আরম্ভ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত অল্প ও বেশি ছোটগল্পের চর্চা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরেই কথাসাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেই সময় ছোটগল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও খ্যাতিমান ছিলেন। অতঃপর বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন ঘটে কল্লোল যুগে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটগল্পের সমর্থ শিল্পী ছিলেন কিন্তু সে গল্পের স্বাদ ছিল পৃথক। উত্তর-কল্লোলীয় পর্বে শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের সম্পদে পূর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল যেমন শক্তিশালী গল্পকার ছিলেন, উত্তরকালের সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি ছোটগল্পের বড় শিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের মানও বিশেষ উন্নত।

গ. ছোটগল্প ও উপন্যাস

সাম্প্রতিককালে ছোটগল্পই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সাহিত্য-প্রকরণ। সমালোচকগণ এরকম কথাও মনে করতে শুরু করেছেন যে উপন্যাস পাঠের দিন শেষ হয়ে গিয়াছে—এখন বিরাট বিরাট উপন্যাস, টেনিসন যাকে বলেছেন 'great still books, তার দিন ফুরিয়েছে; এর জায়গা এখন নেবে ছোটগল্প। একথা অবশ্য কখনই মেনে নেওয়া যায় না, কারণ, কথাসাহিত্যের এই দুটি প্রকরণের স্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। সেই পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এক॥ আকারের পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে, যদিও সে পার্থক্য মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ ছোট ছোট নক্‌সা বা anecdotes-কে বড় করলে যেমন তা ছোটগল্প হয় না, তেমনি উপন্যাসকে ছোট করে লিখলে তা ছোটগল্প হয় না। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই উপন্যাস ও ছোটগল্প পৃথক, নতুবা আকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'মালঞ্চ' এবং ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'-এর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। আমরা 'নষ্টনীড়' বা 'মেঘ ও রৌদ্র'-কে যেমন ছোটগল্প বলি, তেমনি বনফুলের অতিহ্রস্ব গল্প, যাকে বলা যেতে পারে 'post-card stories'-সেগুলিও ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন ছোটগল্পকে আগে হতে হবে ছোট এবং তার পরে গল্প, সে কথার ভিন্ন তাৎপর্য আছে, আকার ছোটগল্প ও উপন্যাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নয়।

দুই॥ উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে প্রধান পার্থক্য, উপন্যাস জীবনের এক সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেয়। জীবনের যে সমস্যাই উপন্যাসে রূপায়িত হোক, কারণ জীবনসমস্যা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই উপন্যাসের প্রধান কথা—সেই সমস্যাকে অখণ্ডভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে এ সম্পর্কে কোনো সংশয় বা অতৃপ্তি পাঠকের না থাকে। এই অখণ্ডতার অর্থ, জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব যেন সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, সেখানে যেন প্রশ্নচিহ্ন থেকে না যায়। সমালোচক Walter Allen সেই কথাই বলেছেন—"A novel is a totality, made up of all the words in it and must be judged as a totality." পক্ষান্তরে ছোটগল্পের কাছে সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত কেউ আশা করে না, একে বলা হয়েছে 'moment's monument' বা 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন'। জীবনের এক খণ্ডাংশ উজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরে ছোটগল্প যার কোনো আরম্ভও নেই, স্পষ্ট শেষও নেই—কিন্তু সেই অতি সীমিত খণ্ডাংশেও জীবনের সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে John Courons সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন—"The parable is indeed a fragment, but is a complete fragment, and if it is cumulation of truth, it is still better the essence of all truth and it is not less than the whole of which it is a fragment." ছোটগল্পের সমাপ্তি আসলে সেই জীবনের প্রকৃত সমাপ্তি নয় বলেই ছোটগল্প পাঠ করার পর এক ধরনের অতৃপ্তিও মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

তিন ॥ উপন্যাসের স্বাদ যদি হয় জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায়, তার জটিল সমস্যা ধীরে ধীরে বুনে তুলবার আমেজে, ছোটগল্পের স্বাদ তাহলে লেখকের নিপুণ সংযমে। বিস্তারই উপন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে, অবশ্যই যদি তা অপ্রাসঙ্গিক না হয়। ছোটগল্পের লেখক একটি অপ্রয়োজনীয় পংক্তিও রচনা করতে পারেন না—সংযমই ছোটগল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

চার ॥ উপন্যাস যদিও ঘটনাপ্রধান এবং চরিত্র প্রধান—উভয় প্রকারেরই হতে পারে, তবু উপন্যাস রচনার জন্য আখ্যান রচনার বিষয়বুদ্ধি কিছু প্রয়োজন হয় কারণ আধুনিক পাঠক চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে যতোই উৎসাহী হোন, গল্পের আকর্ষণ অল্প হলেও তাঁদের থাকে। অন্তত আখ্যানহীন বা আখ্যাননিরপেক্ষ উপন্যাস প্রায় আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু ছোটগল্পের লেখক বরং অন্তর্মুখী হলেই ভালো। গল্পের একটা আয়োজন ছোটগল্পেও যে থাকে না তা নয়। তবু চরিত্রই সেখানে বেশি আকর্ষণীয়। 'ঘটনার ঘনঘটা' সেখানে সর্বদা বর্জন করা উচিত।

পাঁচ॥ চরিত্রসৃষ্টি ছোটগল্পে বেশি আকর্ষণীয় হলেও উপন্যাসে চরিত্রের বিবর্তন দেখাবার যে সুযোগ থাকে, ছোটগল্পে সে সুযোগ একেবারে নেই। আভাসে-ইঙ্গিতে, সুনির্বাচিত ঘটনার মাধ্যমে খুব অল্প কথায় চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই নির্বাচন ব্যঞ্জনায় যিনি যতো বেশি দক্ষ, তাঁর হাতে ছোটগল্প ততো বেশি শিল্পসফল হয়ে ওঠে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে সূত্রগুলি আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এমন একটি উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রহণ করা যাক যাদের মধ্যে বক্তব্যের কিছুটা অভিন্নতা আছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আমরা পাশাপাশি বিচার করতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতা যদি এক-রকমের না হয়, স্বামী নিজের কাজ কর্ম ও পড়াশুনা নিয়ে যদি ব্যস্ত থাকেন—স্ত্রীকে যেটুকু সময় দেবার তা যদি না দেন তবে প্রকৃতির নিয়মেই স্ত্রীর মনের শূন্যস্থান অপর একজন অধিকার করে নেবে, এটাই স্বাভাবিক। চন্দ্রশেখর

তাঁর অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে এতো নিবিষ্ট ছিলেন যে শৈবলিনীকে দেওয়ার মতো সময় তাঁর বিশেষ ছিল না। বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপ এই কারণেই শৈবলিনীর হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছিল। 'নষ্টনীড়' গল্পের চারুলতার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল। সমাজের উন্নতি ও সংবাদপত্র প্রকাশের উন্মাদনায় স্ত্রী চারুলতার কোমল হৃদয়ের শূন্যতার প্রতি মনোযোগী হবার সময় ভূপতি পায়নি। যখন পেল তার আগেই কিন্তু সম্পর্কিত-ভাই অমল চারুতলার শূন্য হৃদয় অধিকার করেছে। এবার সূত্রানুযায়ী এই উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে।

এক॥ আকারে 'চন্দ্রশেখর' এবং 'নষ্টনীড়ের' মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে, কিন্তু উপন্যাসের যে আয়তন স্বচ্ছন্দতায় বৃদ্ধি পেতে পারে—পৃথিবীর বিভিন্ন ধ্রুপদী উপন্যাসের যে আয়তন আমরা দেখেছি, তার তুলনায় 'চন্দ্রশেখর'-কে বিশাল-কলেবর বলা চলে না। পক্ষান্তরে, 'নষ্টনীড়' আখ্যানের যে কলেবর আমরা দেখি, তা সাধারণভাবে ছোটগল্পের তুলনায় কিছুটা বড়োই বলতে হবে। অথচ প্রকৃতিগত লক্ষণ বিচারে 'নষ্টনীড়'-কে যে সার্থক ছোটগল্প আখ্যা দিতেই হবে তা বিভিন্ন সূত্র বিচার করলেই বোঝা যাবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আকার এই দুই সাহিত্য-প্রকরণের পার্থক্য বিচারে খুব বড় কথা নয়।

দুই॥ দাম্পত্যজীবনের মধুরকোমল দিক অস্বীকার করে প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যার চর্চা করলে জীবনে কী ধরনের অশান্তি নেমে আসতে পারে, জীবন কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তার এক সামগ্রিক ও অখণ্ড চিত্র আমরা 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পাই। শৈবলিনী ও প্রতাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার পরিণাম, চন্দ্রশেখরের বোধোদয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত—সবই এমন সম্পূর্ণতায় দেখানো হয়েছে যে জীবনের এই সমস্যাটি অখণ্ড ভাবে ফুটে উঠেছে, এ কথা আমাদের বলতেই হবে। উপন্যাসটি শেষ করার পর আমাদের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু কোনো অতৃপ্তি বা অজানা রহস্য আমাদের আলোড়িত করে না। এর পাশে যদি তুলনা করা হয় 'নষ্টনীড়'-কে তাহলে আমরা দেখতে পাবো একেবারে আকস্মিক ভাবে চারুলতার নৈঃসঙ্গ্য এবং ভূপতির অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততাতেই গল্পের শুরু এবং অচিরেই সেই নিঃসঙ্গ হৃদয়ের উপযুক্ত সঙ্গী অমলের আবির্ভাবে গল্পের জটিলতা দানা বাঁধে। সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যেমন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস শেষ হয়েছে, 'নষ্টনীড়'-এ কিন্তু তা হয়নি। অমল বিবাহ করে অন্যত্র বসবাস করলেও চারুলতা তাকে ভুলতে পারে না, ভূপতির এখন নিরন্তর কাছে আসার চেষ্টাও প্রবলভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়—এই অতৃপ্তি একদিকে যেমন পাঠককে আলোড়িত করে; অন্যদিকে চারুলতার দাম্পত্য জীবন আবার স্বাভাবিক হবে কিনা, ভূপতি ভালোবাসার দ্বারা চারুলতার হৃদয় জয় করতে পারবে কিনা, এই অন্তহীন প্রশ্ন নিয়েই গল্পটি সমাপ্ত হয়।

তিন॥ বিস্তারিত বর্ণনা 'নষ্টনীড়' গল্পে পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছে, যতটুকু আবশ্যক এবং একেবারে অপরিহার্য, সেটুকুই শুধু রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিপর্যয়ের অনুভূতি জাগার পর যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও ভূপতির প্রতিক্রিয়া আমরা স্মরণ করতে পারি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কিন্তু এমন অনেক বর্ণনা আছে, উপন্যাসের আস্বাদ দেবার জন্যই যা লেখক রচনা করেছেন, কাহিনীর পক্ষে যার অনিবার্যতা ছিল না, অন্তত তা বর্জিত হলে গল্পপ্রিয় পাঠকের কোনো ক্ষতি হতো না। 'নষ্টনীড়' সেক্ষেত্রে আবশ্যককেও বর্জন করেছে। গল্প এমন

লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় যে গল্পের প্রিয় পাঠক মধ্যের ফাঁকগুলি ভরাট করবার সময় অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন।

চার॥ ছোটগল্প রচনায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এবং গল্পের লেখক সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে যা অপরিহার্য তাই রচনা করেন। পক্ষান্তরে গল্পের আয়োজনটা উপন্যাসের অন্যতম শর্ত বলেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে লেখককে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করে পাঠককে অভিভূত করে ফেলতে হয়। চন্দ্রশেখর তার জীবনের প্রধান অপূর্ণতার অনুভূতি পাবার পর এতো সব রোমহর্ষক ঘটনার সমাহার আজকের পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে গল্পপ্রিয় পাঠকদের অভিভূত করার মতো সুযোগও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত 'নষ্টনীড়' গল্পে আছে। অমলের স্ত্রীর সঙ্গে চারুলতার সম্পর্ক পাঠকদের অত্যন্ত রুচিকর হতে পারতো, কারণ অমল অত্যন্ত প্রিয় বলেই একদিকে যেমন তার স্ত্রী চারুলতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হওয়ার কথা, অন্যদিকে যে-অমলের হৃদয় একদিন চারুলতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই অমলের স্ত্রী ও চারুলতার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো, কোনো সন্দেহ নেই। অমলের পক্ষে স্ত্রী নিয়ে একটা সৌজন্য-সাক্ষাৎকারে আসা স্বাভাবিকও ছিল। অথচ গল্পের উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য নয় বলেই এই সুন্দর সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছেন।

পাঁচ॥ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের মূল বিবর্ধন এবং পরিণতি আমরা জানি—তাদের বিবর্তনের ইতিহাসটাই আমাদের কাছে উপভোগ্য। 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের তিনটি চরিত্র একেবারে হঠাৎ এসেছে, প্রয়োজন বুঝে মন্দা চরিত্রটি আনা হয়েছে এবং যখনই প্রয়োজন ফুরিয়েছে গল্পের মতো চরিত্র তিনটিও কোনো স্পষ্ট কথা না বলেই বিদায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। চারুলতা ও ভূপতির বিবাহিত জীবনের সূচনা আমরা দেখি নি, অমলের সঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক ভূপতির আমরা জানি না, চরিত্রগুলির পরিণতি কী, সে বিষয়েও আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা জানি, এই গল্পের জন্য দরকার চারুলতার নৈঃসঙ্গ্য দেখানো, সেখানে অমলের অনুপ্রবেশ এবং এটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়বার পর ভূপতি-চারুলতার দাম্পত্য সম্পর্কের যন্ত্রণা। এই উদ্দেশ্য কঠোরভাবে মনে রেখে অমল-চারুলতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন লেখক, সাহায্য নিয়েছেন মন্দা বৌঠানের, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে নয়, কলমের দু-একটি আঁচড়েই ব্যাপারটা এগিয়েছে।

ঘ. ছোটগল্পের সংজ্ঞানির্ণয়

ছোটগল্পের কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এখনও গড়ে ওঠেনি, কাজেই সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করলেই ছোটগল্পের মূল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সহজ হবে। সেই কারণেই আমরা সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই আগে করবো। এ বিষয়ে সংজ্ঞা যাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মন্তব্য উদ্ধার করা সমীচীন বিবেচনা করছি এই কারণে যে, তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তত আমরা ধরতে পারবো এবং সেই ভাবেই এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারবো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ছোটগল্প সম্পর্কে প্রথম সুচিন্তিত ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন কবি

ও কথাসাহিত্যিক এড্‌গার অ্যালান পো। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিক এর সংজ্ঞা না দিলেও আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। আকার সম্বন্ধে তার মন্তব্য, এটা এমন এক ধরনের গদ্যসাহিত্য "requiring from half an hour to one or two hours in its persual".

এই ধরনের একটি মন্তব্য H.G. Wells-ও করেছিলেন, তাঁর মতে ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। Hudson এর সীমা আর-একটু স্থিতিস্থাপক ও যুক্তিগ্রাহ্য করে বলেছেন—"A short story is a story that can be easily read at a single siting".

ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে পো-র মন্তব্য—"In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design....undue brevity is just as exceptionable here as in the poem; but undue length is yet more to be avoided."

এখানে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত একটি বৈশিষ্ট্য আমরা পাচ্ছি, কঠিন সংযম। এ বিষয়ে একটা নতুন কথা এবং কার্যত নতুন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন Brander Mathews তাঁর The Philosophy of the short story গ্রন্থে—

"The short story by its effect, a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction....A short story deals with a single character, a single event, a single emotion or the series of emotion called forth by a single situation."

অর্থাৎ ছোটগল্পের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে ঐক্য বা একক ব্যাপারটির ওপর জোর দিলেন, বললেন তাতে থাকবে হয় প্রতীতির ঐক্য অথবা একটিই চরিত্র, একটিই ঘটনা, একটিই আবেগ অথবা একটি পরিস্থিতিবোধক কিছু ভাবাবেগ।

এই একটি বা এককত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ওয়েবস্টার ডিক্‌শনারি এবং এনসাইক্লোপিডিয়াতেও, সেখানে বলা হয়েছে—"A short story usually representing the crisis of a single problem."

কথাটিকে সমর্থন করা হয়েছে Hudson-এর সাহিত্য-প্রবেশিকা গ্রন্থ An Introduction to the study of literature এ, তিনি লিখেছেন—"A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method."

একই কথা পাই Fred Lewis Pattey-এর সংজ্ঞায় : "Impressionist prose tale....short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a glimpse of a climatic incident—"

ম্যাথিউজ যে প্রতীতির কথা বলেছিলেন সেই প্রতীতির উল্লেখ এখানে আমরা পাচ্ছি। এ ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিয়ে কথা বলেছেন Sean O' Faolain তাঁর The short story প্রবন্ধে। তিনি বলতে চেয়েছেন লেখকের একান্ত নিজস্ব প্রতীতিই ছোটগল্পের সম্পদ এবং মহৎ ছোটগল্পে তাই পাঠক আশা করেন—"The short story is an emphatically personal exposition.

What one searches for an what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that above all other subject, is of value to the writers temperament and to his alone—his counterpart, his perfect opportunity to project himself."

ছোটগল্পের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতার সেই অংশটুকু এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে :

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

দেখা যাবে, একেবারে খাঁটি কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ এখানে ধরেছেন, সেগুলি হল—ছোটগল্প সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখের গল্প, সংযম এর প্রধান লক্ষণ বলেই বর্ণনার বাহুল্য থাকবে না, এখানে আমরা চাই চরিত্রের দীপ্তি—গল্পের চমৎকারিত্ব নয়, তত্ত্ব বা উপদেশের কোনো স্থানই এর সংযত পরিসরে নেই। আর একটি প্রায়-নতুন কথা তিনি শোনালেন, এর উপসংহার হবে অত্যন্ত অতৃপ্তি-জনক। আমরা এর প্রত্যেকটি লক্ষণ নিয়েই আলোচনা করবো, কিন্তু আপাতত একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাক। আমরা সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সংজ্ঞাই ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলতে পারি :

ছোটগল্প লেখকের মানস প্রতীতি-জাত একটি সংহত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ অবলম্বন করে ঐক্য-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

এবার ছোটগল্পের এইসব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৬. ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ

যে সংজ্ঞার্থগুলি আমরা পরীক্ষা করলাম তার ভিত্তিতে ছোটগল্পের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ আমরা নির্ণয় করতে পারি। আসলে সাহিত্য-সংসারের কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে বাংলা ছোটগল্প যতোটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তা বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত গ্রন্থাদির সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সেই কারণেই গল্পগুলির সৌন্দর্য এবং তা মূল্যায়নের কিছু আদর্শ আমাদের জেনে রাখাটা খুবই দরকার।

● ছোটগল্পের একমুখিনতা

ছোটগল্পের বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে বহু মতভেদ আমরা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এই একটি লক্ষণ সম্বন্ধে

এক্সপেরিমেঁতাল' অর্থাৎ পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে রচিত উপন্যাস। জোলার পরে স্বদেশে এবং অন্যত্র এই মতবাদের ধারক ও বাহক কিছু দেখা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ফ্রাঙ্ক নরিস, স্টিফেন, থিওডোর ড্রেইজার প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যে যথাস্থিতবাদী লেখক হিসাবে সবচেয়ে সমর্থ দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে যেমন মানুষের একেবারে জৈবিক স্তরের দুটি বৃত্তিই অনাবৃত ও বীভৎস ভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসেও প্রকৃতির হাতে অসহায় মানুষের জীবনচিত্র দেখানো হয়েছে। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কথাসাহিত্যেই যথাস্থিতবাদী লক্ষণ প্রকট, পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী।

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য যেসব লেখকের মধ্যে সমজাতীয় মানসিকতা দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখের।

ঙ. সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদ

সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদী আন্দোলন হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে যা পরিচিত তার প্রথম উদ্ভব ঘটে ফরাসী কাব্যসাহিত্যে বদলেয়ারের হাতে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Fleurs du mal কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই এর সূচনা ঘটে। অবশ্য তার পরেই বেশ কিছু সমর্থ কবি এই মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিতে এই কাব্য-আন্দোলন রীতিমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এঁরা হলেন র‍্যাঁবো, ভার্লেন, মালার্মে এবং পল ভালেরি।

প্রতীকবাদী কবিরা কবিতায় অহেতুক বর্ণনা, প্রাঞ্জলতার জন্য অনুভূতির গভীরতা হ্রাস, সংযমের অভাব ইত্যাদিকে একেবারে বর্জন করে কবিতার প্রকাশকে করতে চেয়েছেন প্রতীকী, এবং এই ভাবেই কবিতার অনুভব ও প্রকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কবিতা সম্পর্কে এই বোধ এবং এর ইত্যাকার প্রকাশ-সৌকর্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এবং ইংরেজ কবিদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান কবিদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ভাবে কাব্যসৃষ্টি করেন তাদের মধ্যে আর্থার সিমন্‌স্, আর্নেস্ট ডসন, ইয়েট্‌স্, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, ডিলান টিমাস, হার্ট ক্রেন, কামিংস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য প্রতীক বা সিম্বল ব্যবহার করা হলেই যে প্রতীকবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ থাকবে, এমন নয়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

প্রতীক, সংকেত বা সিম্বল সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যার একটা আলাদা ব্যঞ্জনা আছে, এক হিসাবে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিও প্রতীক, কারণ প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক ভাষায় অবশ্য কিছু বহুব্যবহৃত প্রতীক আছে, পুরনো আমলের কবিরাই তাদের বহুব্যবহারে রীতিসিদ্ধ ও মলিন করেছেন। প্রচলিত কবিরা কখনো কখনো এই রীতি পালটান ফলে তারা ভিন্ন অনুষঙ্গ বহন করে। প্রচলিত রীতির প্রতীকের উদাহরণ হিসাবে যেমন আমরা উল্লেখ করতে পারি উদিত সূর্য, ময়ূর বা ঈগল পাখির। এরা যথাক্রমে নবজাতক, গর্বিত ভঙ্গি এবং বিজয়ীর ঔদ্ধত্য বোঝাতে প্রতীকায়িত হয়। কবি ভিন্নভাবে ব্যবহার করেই প্রতীকের ব্যঞ্জনা পালটাতে পারেন,

সমালোচকগণ এখনও পর্যন্ত একমত—একটি এবং কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই ছোটগল্প রচিত হবে। ছোটগল্পের সঙ্গে উপমা দিতে গিয়ে কবি কিপলিঙের সার্থকভাবেই মনে পড়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের 'Bull's eye Lantern'-এর কথা—যে আলো বেশি জায়গায় পড়ে না, পড়ে সামান্য কিছুটা জায়গায়, কিন্তু সেই জায়গাটিকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। ছোটগল্পও ঠিক তাই। জীবন অনেক বড়ো, অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপ্ত—সেই ব্যাপ্ত জীবন-ভূমি আলোকিত করার দায় নেই ছোটগল্পকারের। তিনি বুল্‌স্ আই লণ্ঠনের মতো চকিত তীব্র আলো ফেলেন মানুষের হৃদয়ের যে কোনো একস্থানে। বাকি সব অন্ধকার থাক কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই স্বল্প স্থানের তীব্র উদ্ভাস সমস্ত মানুষটাকে স্পষ্ট করে তোলে, এটাই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

একটা এবং যে কোনো একটা—এই এক উদ্দেশ্যই ছোটগল্পের সাফল্যের মূলমন্ত্র। কোথাও আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা জনপ্রিয়তার প্রলোভনে এই একমুখিনতা থেকে বিচ্যুত হলেই ছোটগল্পের শিল্প মহিমা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। একমুখী উদ্দেশ্য মানে একটি বিচিত্র চরিত্রকে দেখানো হতে পারে যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেক গল্পেই দেখিয়েছেন; চরিত্রের একটি অদ্ভুত প্রবণতা হতে পারে—যেমন আমরা দেখেছি জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম্' গল্পে কিংবা বিমল মিত্রের 'লজ্জাহর' গল্পে। একটি বিশেষ ধারণা বা প্রতীতি নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, যেমন মানুষ সারাজীবন ধরে বাঁচে না, বাঁচে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে—এই রকম একটা ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'একরাত্রি' নামে একটি অসাধারণ ছোটগল্প লিখেছেন। এক ধরনের মেজাজ বা mood নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, সেখানেও পটভূমি বা অন্য কিছু বর্ণনায় সেই মেজাজ ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়, যেমন সামারসেট মমের 'দি রেন' অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার'। একটি বিশেষ ভাবাবেগ বা সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, যেমন জগদীশ গুপ্তের 'অপহৃত আকাশ-কুসুম', বিমল করের 'তুচ্ছ'। কোনো বিষয়ে এক রোমাঞ্চকর উদ্বেগ ও উত্তেজনা বা সাসপেন্স নিয়েও ছোটগল্প লেখা হতে পারে—তা অ্যালান পো-এর 'দি পিট অ্যান্ড দি পেন্ডুলাম'-এর মতো গা হিম করা অনুভূতি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মতো রোমাঞ্চমধুর উত্তেজনা হতে পারে, অথবা হতে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ইকেবানা'-র মতো ত্রিভুজ প্রেমের টানটান উত্তেজনা। আসলে লেখক কী উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটগল্প লিখছেন সেটা বড় কথা নয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছেন তা কখনই বিস্তৃত হবে না, এটাই কাম্য এবং এতেই ছোটগল্পের সিদ্ধি।

● ছোটগল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন

লেখক তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত ও প্রতিফলিত করার সুযোগ সাধারণভাবে কথাসাহিত্যে নিশ্চয়ই পান, কারণ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনার প্রধান প্রেরণা, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এ কথা আরো গভীরভাবে সত্য। কারণ ছোটগল্প মূলত অনুভূতিমূলক। কবি তাঁর যে অনুভূতি ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসাবে প্রকাশ করেন, ছোটগল্পকার তা সম্প্রসারিত করেন তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্ব-চরিত্রের মধ্যে, এইটুকুই পার্থক্য। অনুভূতির ওপর মহৎ ছোটগল্পকার এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেন বলেই

ক্রোচের মতো দার্শনিক মোপাসাঁর গল্পে গীতিকবিতার স্পন্দন শুনতে পেয়েছেন। Poetry and Non-Poetry প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"The lyric is really intrinsic to the fomm of the narrative, and shapes each part of it, without mixture and without having any residue."

একটি মানুষ আসলে প্রতিদিনের ব্যবহারে হাজারটা মানুষ হয়ে যায়, নিজের মধ্যে সে অজস্র সত্তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে—বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা বোঝা যায়। কখনো নিজেকে সেই ভাবে জানা বা চেনা ব্যক্তির মধ্যে অচেতন সত্তার আবিষ্কার লেখক করতে পারেন তাঁর ছোটগল্পে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তাছাড়াও কিন্তু লেখকের এই আত্মপ্রক্ষেপ ঘটতেই থাকে আত্মনিষ্ঠ ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষে লেখেন মানুষের হৃদয় মানুষকে ভালবেসে যতোই ব্যথা পাক, পুনর্বার সুযোগ পেলে সে আবার মানুষকে ভালবাসবে এবং যন্ত্রণা পাবে; অথবা 'হৈমন্তী' গল্পে যখন প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্য করেন, তখন তিনি নিজের বিশ্বাসকেই গল্পে প্রতিফলিত করেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন বলেই যে ব্যাপারটা ঘটেছে তা নয়—নিজের জ্ঞানবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব অনুসারে পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে বলেই একই বিষয় বিভিন্ন লেখকের গল্পে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে। পশু নিয়ে গল্প অনেকেই লেখেন, তবু শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাতকুমারের 'আদরিণী', পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' ও তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' যে ভিন্ন স্বাদের হয় শেষপর্যন্ত, তার কারণ এই ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য প্রভাব। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী তার চটুল বাগ্‌ব্যবহার সত্ত্বেও মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়, জগদীশ গুপ্তের 'ঠিকানায় বুধবার' গল্পের নায়িকা বাস্তব সংসারের average গণিকা হয়েই থাকে। ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ যে ঘটে এবং তাতে যে গল্পের কোনো ক্ষতি হয় না, এ বিষয়ে ইংরেজ সমালোচকের একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস—"No man ought to embark upon a career of short story writing who is not aware that he himself lives a hundred short stories a day, and that he is not unlike anybody else in the world in this."

● ছোটগল্পের বিষয়

ছোটগল্পের বিষয় কী হতে পারে, এ আলোচনা না করে বরং আলোচনা করা উচিত ছোটগল্পের বিষয় কী হতে পারে না। প্রশ্নের উত্তরে এই রকম একটি কথাই বলেছিলেন চেকভ, কোরোলেঙ্কোকে। যে-কোনো বিষয়, এমনকি অ্যাশ-ট্রে নিয়েও ছোটগল্প লেখা যায়, এই ছিল তাঁর ধারণা এবং বিশ্বসাহিত্যের সামান্য কিছু মহৎ ছোটগল্পের সন্ধান রাখলে বোঝা যাবে চেকভের ধারণা অসংগতও ছিল না। তাঁকে সমর্থন করেছেন হুইটম্যান এই বলে যে, Reject nothing, আবার হুইটম্যানকে সমালোচনাও করেছেন লরেন্স। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, ছোটগল্পকার নিজে যদি মনে করেন এই বিষয়টি নিয়ে গল্প লেখা যায়—তাঁর অনুভূতি এবং মানসিকতা এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে তাকে বিষয় হিসাবে নির্বাচন না করার কোনো কারণ নেই।

ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি নির্দেশ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন—ছোটপ্রাণের ছোটখাট দুঃখ কথা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা নিয়েই লেখা হবে ছোটগল্প, বিরাট মানুষ বা বিরাট ঘটনার সন্ধান করবার কোনো দরকার নেই। ছোটগল্পে বৈচিত্র্যসন্ধানী লেখকদের ব্যঙ্গ করে চেকভ একটি চিঠিতে প্রায় এই ধরনের কথাই লিখেছিলেন—"People do not go to the North Pole and fall of icebergs; they go to office, qurrel with their wives and eat cabbage soup." অর্থাৎ সাধারণ মানুষের এইসব সাধারণ ঘটনাই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত।

অবশ্য এই মনোভাবের বাড়াবাড়ি ঘটলে—অর্থাৎ আমি যাকে গল্পের বিষয় ভাববো তাই হবে গল্প, মনোভাব চূড়ান্ত আধিপত্য করলে গল্প ব্যাপারটাই ধীরে ধীরে ছোটগল্প থেকে চলে যেতে পারে। এই লক্ষণ যে আধুনিককালে দেখা দেয়নি, এমনও নয়। ঠিক আন্দোলনের আকারে না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই আধুনিককালে এমন ধরনের গল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি যা থেকে মনে হতে পারে ছোটগল্পে আদৌ কোন গল্প থাকবার প্রয়োজন নেই। কয়েক মুহূর্তের আন্দোলিত মানসিকতা, একটি বিষণ্ণ বা ভোঁতা মেজাজ, কিছুটা 'জাগর-স্বপ্ন' বা surrealism-এ সবই ছোটগল্পের অবলম্বন হতে পারে, এমনকি অলীক কিছু চিন্তাও। এসব নিয়ে ছোটগল্প লেখাও হয়েছে, যেখানে গল্প ব্যাপারটাই প্রায় অনুপস্থিত। আমেরিকার বিশিষ্ট লেখক জন ও-হারা সংবাদপত্রের বিবৃতির মতো গল্প লিখেছেন, আমাদের সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তও তাই। গল্পহীন গল্প লিখেছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক পার লাগের্কভিস্ট্। এই ধরনের গল্প নিয়ে 'ছোটগল্প নব নিরীক্ষা' নামে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন বাংলা ছোটগল্পে বিমল কর।

ছোটগল্পের বিষয়ভিত্তিক এক স্বেচ্ছাচারকে তীব্র সমালোচনা করেছেন সামারসেট মম। তিনি এই ধরনের গল্পকে বলেছেন 'drab stories'—একেবারে বর্ণহীন নীরক্ত গল্প। যাঁরা ভেবেচিন্তে একটি সুসংহত বৃত্ত রচনা করে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করতেন তাঁদের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে তাঁর ধারণা এবং এই বর্ণহীন গল্প একটা হুজুকমাত্র। এজন্য চেকভকেই মূলত দায়ী করে 'Creature of Circumstances' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"Nor is a story any the worse for being neatly built with a beginning, a middle and an end. All good story writers have done their best to achieve this. It is the fashion of today for writers, under the influence of an inadequate acquaintance with Chekov, to begin anywhere and end inconclusively....The result is a spate of drab stories in which nothing happens."

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, গল্প মোটেই নিন্দনীয় নয়, যারা গল্পকে বা গল্পাংশকে ভিত্তি করেই ছোটগল্প লিখেছেন তাঁদের প্রতিভাকে আমরা স্বীকার করি। বিষয় হিসাবেও শুধু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীতেই তাকে আবদ্ধ করে লাভ নেই। জীবনের বৈচিত্র্য অনেক, যে মানুষ প্রথম একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করল—চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই, তার পায়ের কাছে বরফের আন্দোলিত সমুদ্র, এই নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, অবশ্যই পারে। কিন্তু মানুষের আফ্রিকার গহন অরণ্যে অভিযান যদি গল্পের বিষয় হয় তবে তার চেয়েও দুর্ভেদ্য যে মন, সেই মনের অরণ্যভ্রমণ গল্পের বিষয়

হবে না কেন! গভীর অনুভূতি অনেক সময়ই সঙ্কেতের চেহারা নিয়ে আসে—গল্পের শরীর সেখানে খুব বড় হয়ে ওঠে না, সেগুলিকে আমরা গল্প বলবো না কেন! বাংলা ছোটগল্পেও এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনা-পোতা আবিষ্কার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতের গাড়ি', বিমল করের 'শীতের মাঠ' প্রভৃতি এর উদাহরণ। এর পরেও থাকে আধুনিক রূপক গল্প। মনে করতে পারি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ', বিমল করের 'বাঘ', রমাপদ চৌধুরীর 'বড়বাজার' প্রভৃতি অসাধারণ গল্পের কথা। রূপকধর্মী ছোটগল্পের যে বিচিত্র পরীক্ষা আমরা সাম্প্রতিককালে বিমল করের পাঁচটি গল্পে দেখেছি তাও স্মরণযোগ্য। ছোটগল্পকে তার কথাবস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ না দিলে তার স্বাস্থ্যকর বিকাশ ঘটবে কী করে!

তবে এই সঙ্গে আর একটা কথাও আছে। একদিকে যেমন দেখতে হবে, ছোটগল্প যেন গল্পসর্বস্ব না হয়, অর্থাৎ গল্পকারের অনুভূতি এবং গল্পের বিশেষ প্রতীতি যেন সেখানে ধরা পড়ে; আবার অন্যদিকে দেখতে হবে একেবারে নির্বস্তুক প্রতীতিসর্বস্ব হয়ে উঠে যেন তা কবিতা না হয়ে যায়—কারণ সেক্ষেত্রে বর্তমানকালের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকরণের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে।

● ছোটগল্পের সূচনা

চলমান জীবনের সমগ্রতা বা অখণ্ডতা দেখাবার কোনো সুযোগ ছোটগল্পের নেই, বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো জীবনের একটি অংশকেই সে তীব্রভাবে আলোকিত করে তোলে। আগে-পরে বিশাল অন্ধকার, কিন্তু ওই একটি অংশে চকিত আলোর দীপ্তি গোটা চরিত্রকেই আলোকিত করে তোলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে মনে করা যায় তারাশঙ্করের 'সমুদ্র-মন্থন' গল্প, যেখানে যখন-তখন চুরি করা ঘৃণ্য একটি খোনা মেয়ে অসাধারণ দীপ্তি পেয়ে যায়, যখন শুনতে পাই সে চুরি করে তার অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাবার জন্য।

এই কারণেই ছোটগল্পের আরম্ভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের যে খণ্ডাংশ তা ধরতে চায় তা জীবনের আরম্ভ নয় বলেই সুস্পষ্ট সূচনা দিয়ে গল্প আরম্ভ হতে পারে না, তা শুরু হয় ওই মাঝখান থেকেই। মনে করা যাক রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সূচনা—"কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে"।

অথবা ভাবা যাক সাম্প্রতিক কালের গল্পকার আবুল-বাশারের 'নিগ্রহান্তর' গল্পের সূচনা—"আমির হালদারের বড় জামাই সুফল বদ্যি পাট্যা গুঁচোর ঠান্ডা ঝোলসর দিয়ে শুকনো কড়কড়ে আমন ভাত মেখে মুখে সোয়াগ করে খাবে বলে তৈরি, তা এমন সময় পেট-ফেলানী সুমুরুদ্দির বউ মালেকা চৈত-পবনী আউড়ী এসে উঠোনে দাঁড়াল।"

কোনো ভূমিকা নেই, আড়ম্বর নেই—একেবারে গল্পের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অবশ্য এর একটা অন্য কারণও আছে। সংযমই ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কতো অল্প কথায় কতো বেশি কথা বলা যায়, এটাই ছোটগল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং উপন্যাসের মন্থর সূচনা তার জন্য নয়—তাকে সোজাসুজি ঢুকে পড়তে হবে গল্পের মধ্যে। এই কারণেই

গল্পলেখকদের সম্বন্ধে এড্‌গার এ্যালান পো-র নির্দেশ ছিল—"If his very initial sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step."

যে গল্পের যা উদ্দেশ্য সেইভাবেই তার সূচনা হয়, একথাও পো-এর এই নির্দেশ থেকে আমরা জানতে পারি। গল্পের মোটামুটি একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় এই সূচনা থেকেই, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের প্রারম্ভ বাক্যটি এই—'মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল'।

অথচ গল্পের মেজাজ সম্বন্ধে প্রারম্ভ বাক্যেই আমাদের ধারণা জন্মে যায় যখন আমরা শুরু করি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প 'চোর'—"আমি যেদিন পেঁপে চারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়ীতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।"

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ছোটগল্পের সূচনাকে ভিত্তি করে এর দু-ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—Initial Incident বা চমকিত সূচনার গল্প এবং Preliminary Situation বা পূর্ব ঘটনা সূচক আরম্ভ। বিমল করের দুটি বিখ্যাত গল্প থেকে এই পার্থক্যের উদাহরণ দেওয়া যায়।

এক॥ চমকিত সূচনা : "নদীর চরায় শিবাণীর চিতা জ্বলছিল।" (আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন)

দুই॥ পূর্বসূচনামূলক : "আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল।" (জননী)

আসল কথা, গল্প সম্বন্ধে একটা আভাস দেওয়া এবং প্রথম থেকেই একেবারে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া—স্বল্প উপকরণে বিরাট প্রতিক্রিয়া তৈরি করার দিকেই লক্ষ রাখা উচিত গল্পলেখকের।

● ছোটগল্পের উপসংহার

'শেষ হয়ে হইল না শেষ'—এই মধুর অতৃপ্তিতেই ছোটগল্প সমাপ্ত হওয়া উচিত, এ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্পের প্রকৃতি বিচার করলে এর একটা যৌক্তিকতাও আছে। ছোটগল্প জীবনের যে অংশ আমাদের দেখায় তা তার যেমন আরম্ভ নয়, তেমনি যেখানে সে জীবনের চিত্র দেখানো বন্ধ করে সেটাও তার পরিসমাপ্তি নয়। মাঝখান থেকে শেষ হয় বলে একটা মধুর অতৃপ্তি থেকে যাওয়াটা বোধহয় উচিত। স্মরণ করে দেখা যেতে পারে 'বিষবৃক্ষ' এবং 'মধ্যবর্তিনী' এই দুটি কথাসাহিত্যের উপসংহার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'এ নগেন্দ্র দত্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিল কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর নগেন্দ্রর স্ত্রী "সূর্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্যাবলম্বন-পূর্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া আসিলেন"। এর পরেও অবশ্য একটি পরিচ্ছেদ আছে এবং তার পর লেখক 'গৃহে গৃহে অমৃত' ফলাবার আকাঙক্ষায় গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। এটি উপন্যাস বলেই আমরা ধরে নিতে পারি, 'ইহার পর সূর্যমুখী ও নগেন্দ্র দত্ত মহাসুখে ঘরসংসার করিতে লাগিলেন'—এই বাক্যটি উহ্য আছে।

"মধ্যবর্তিনী' রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য ছোটগল্প বলেই এর উপসংহার দৃশ্যত একরকম হয়েও এতো মধুর তৃপ্তিতে শেষ হয়নি। সেখানেও অসুস্থ হরসুন্দরী উপযাচিকা হয়ে নিবারণের

বিবাহ দিয়েছিল শৈলবালার সঙ্গে। শৈলবালার মৃত্যুর পর দুজন পুনর্মিলিত হল, কিন্তু কী ভাবে! তার বর্ণনাতেই গল্পটির সমাপ্তি—"উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙঘন করিতে পারিল না।"

ছোটগল্প-লেখক এবং তার সমালোচকদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়—

এক॥ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই মধুর অতৃপ্তিকেই ছোটগল্পের আদর্শ উপসংহার বলে মনে করেন, দুই॥ যাঁরা মনে করেন এরকম কোনো অতৃপ্তি দিয়ে শেষ করা মানে পাঠকের প্রতি অবিচার করা। তাই অতৃপ্তির পরিবর্তে ধীর স্বাভাবিক পরিণতিই এঁদের কাম্য। ছোটগল্পকার চেকভ এবং সমালোচক হেনরি জেম্‌স্ এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পারেন। অবশ্য যতো সহজে আমরা এই শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করলাম, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। এই দুটি শ্রেণীর জটিলতর উপবিভাগ আছে। অতৃপ্তি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে একদল আছেন চরমপন্থী যাঁদের পছন্দ আরো চমকজাগানো উপসংহার—যাকে বলে whip-crack ending বা চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি। এড্‌গার অ্যালান পো, মোপাসাঁ, ও হেনরি প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্প লেখক এই ধরনের উপসংহারের পক্ষপাতী। এঁদের জনপ্রিয় গল্পগুলি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে এই চাবুক হাঁকড়ানোর স্বরূপটি কী। বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের চমকিত বা জ্বালা ধরানো উপসংহার অল্প আছে সত্য কথা কিন্তু একেবারে নেই এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের শেষ বাক্যটি স্মরণ করা যাক—"এবারে বিশ হাজার টাকা পণ, এবং হাতে হাতে আদায়।" মনে পড়তে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পের শেষ বাক্যাংশটিকেও—"খাও হে চক্কোত্তি।"

সামারসেট মম এই জাতীয় উপসংহারকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন—"There is nothing to be condemned in a surprise ending if it is the natural end of a short story, on the contrary it is an excellence."

যাঁরা অতৃপ্তি ও চমক-জাগানো উপসংহার পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে দু-ধরনের গল্পলেখক দেখা যায়—একদল পছন্দ করেন শান্ত স্বচ্ছন্দ উপসংহার, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের সমাপ্তি "অনেক দিনের একটি হাস্যধারার অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।'

আর একধরনের ছোটগল্পে উপসংহার গল্পকে এক বিরাট ব্যাপ্তি দান করে একটি বিশেষ সত্য শাশ্বত সত্যে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সমাপ্তি মনে করা যায়—"যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচু পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই—পাইবেও না।"

অবশ্য এইসব উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার কোনো অর্থ হয় না। একই লেখক যে একাধিক উপায়ে ছোটগল্প সমাপ্ত করেছেন তার উদাহরণও অনেক আছে। আসলে বোধহয় বিষয় ও উদ্দিষ্ট প্রতীতিসৃষ্টি অনুযায়ী যে উপসংহার লেখক উপযোগী মনে করেন সেই ধরনের সমাপ্তিই তিনি বেছে নেন।

চ. ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন

ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে খুব স্থূল দুটি বিভাগ হতে পারে—এক॥ ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যার বিশ্লেষণ, এবং দুই॥ ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সমস্যা বা সমাজ-সমস্যার বিশ্লেষণ। মূলত এই দুটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বহু ধরনের ছোটগল্প রচিত হতে পারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মোট বারোটি উপবিভাগ করেছেন—দার্শনিক, সমাজ-সমস্যামূলক, নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক, মনস্তাত্ত্বিক, রোমান্টিক, চরিত্রাত্মক, রূপক, ব্যঙ্গ মূলক, কাব্যধর্মী, আদর্শাত্মক ও রাজনৈতিক, অতিলৌকিক এবং বিচিত্র।

সাহিত্য-প্রকরণ গ্রন্থগুলির পথিকৃৎ 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাশ এই পনেরোটি বিভাগের কথা বলেছেন—

এক॥ প্রেমবিষয়ক: প্রেমই এই গল্পে প্রধান অবলম্বন, যথা তুর্গেনেভের The District Doctor, রবীন্দ্রনাথের 'শেষরাত্রি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভস্মশেষ' প্রভৃতি।

দুই॥ প্রকৃতি ও মানুষ: এই শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"এই শ্রেণীর গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকায় চরিত্রাঙ্কন করা হয় এবং প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের পশ্চাৎ-পট রূপে ব্যবহৃত হয়।" এই সংজ্ঞা থেকে মনে হয় Wordsworth লুসি গ্রে-র যে গল্প কবিতায় শুনিয়েছেন সেরকম গল্পই এই শ্রেণীতে পড়তে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', 'শুভা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্প, মনোজ বসুর 'বনমর্মর' এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ বলা যায়।

তিন॥ অতি প্রাকৃত: ভৌতিক বা অলৌকিক জগতের অবতারণা না করে কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃতের রহস্যে পাঠককে অভিভূত করে রাখাই প্রকৃত অতিপ্রাকৃত গল্পের লক্ষ্য। গোগোলের 'ক্রিসমাস ইভ', এডগার অ্যালান পো-র 'ব্লাক ক্যাট', বা 'দি ফল অব দি হাউস অব আশার', রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'মণিহারা', সুবোধ ঘোষের 'ন তস্থৌ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মর্কট', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসি', সত্যজিৎ রায়ের 'নীল আতঙ্ক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চার॥ হাস্যরসাত্মক: নামেই এই শ্রেণীর পরিচয়, তবে হাসির উদ্ভব ঘটতে পারে বিভিন্ন ভাবে—সামাজিক অসংগতি থেকে, চরিত্রগত অতিরঞ্জন থেকে, অথবা ঘটনাগত সজ্জা থেকে। উডহাউসের 'দি কাস্টডি অব অব দি পাম্পকিন', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা' বা 'মাস্টারমশাই', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুধর-চরিত', পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠ', বা 'গড্ডলিকা', শিবরাম চক্রবর্তীর 'শুঁড়ওয়ালা বাবা' অথবা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সোফা-কাম বেড' এই জাতীয় গল্পের উদাহরণ।

ছয়॥ উদ্ভট: ইংরেজিতে যাকে বলে Fantasy, বাংলায় তাকেই উদ্ভট গল্প বলা চলে। অসম্ভব কল্পনার মধ্যে কৌতুকই সাধারণত প্রধান হয়ে ওঠে। এইচ.জি. ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান', পরশুরামের 'গগনচটি', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবতীর পলায়ন', সত্যজিৎ রায়ের 'অঙ্কস্যার ও গোলাপি বাবু' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়।

সাত॥ সাঙ্কেতিক গল্প: সাধারণভাবে আপাতবর্ণিত বিষয় বা ঘটনা যেখানে একটি

রহস্যময় সঙ্কেতকে আশ্রয় করে থাকে সেখানে এই শ্রেণীর গল্পের উদ্ভব ঘটে। রূপকধর্মী বা Allegorical গল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, symbolic বা সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনাই এসব গল্পের প্রাণ। উদাহরণ হিসাবে সামারসেট মমের 'দি রেন', রবীন্দ্রনাথের 'একটি অসম্ভব গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতের গাড়ি', বিমল করের 'বাঘ' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যেতে পারে।

আট॥ ঐতিহাসিক: ইতিহাসের পটভূমিকায় কথাসাহিত্যিকগণ উপন্যাস লেখার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হন, তবে ছোটগল্পেও ঐতিহাসিক আখ্যানকে অবলম্বন করা হতে পারে। এই ধরনের গল্পের দৃষ্টান্ত— রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎপ্রদীপ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি।

নয়॥ বিজ্ঞাননির্ভর: এই জাতীয় গল্পকে ইংরেজিতে বলে সায়েন্স-ফিকশন। বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করে সুস্থ কল্পনার দ্বারা এরকম গল্প লেখা হয়। উদ্ভট গল্পেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি কোনরকম আনুগত্য সেসব গল্পে থাকে না। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ ও জুলে ভার্নের গল্প এই জাতীয় গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুগের লেখকদের মধ্যে আইজ্যাক অ্যাসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্কের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞাননির্ভর গল্প খুব কম, যা আছে তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য শুধু বিজ্ঞাননির্ভর গল্পই রচনা করেছেন।

দশ॥ গার্হস্থ্য: পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করে লেখা গল্পকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের গল্পে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এগারো॥ মনস্তাত্ত্বিক: পৃথক শ্রেণীতে মনস্তাত্ত্বিক গল্পকে বিন্যস্ত করা শক্ত, কারণ মনস্তত্ত্ব নির্ভর না হলে ছোটগল্পের আকর্ষণ অনেক কমে যায়। তবু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অত্যধিক প্রাধান্য পেলে তাকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি, যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি', 'শাস্তি', শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', বিমল মিত্রের 'লজ্জাহর', আবুল বাশারের 'হবা' প্রভৃতি।

বারো॥ মনুষ্যেতর: মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু নিয়েও অনেক গল্প লেখা হয়েছে। এমনকি একটি গাড়ি নিয়ে লেখা সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে স্বীকৃত। এই জাতীয় গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালজাকের 'Passion in the desert', জন স্টেইনবেকের 'The snake', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধির বাড়ী ফেরা' প্রভৃতি।

তেরো॥ বাস্তবনিষ্ঠ গল্প: ছোটগল্পমাত্রই বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে থাকে, অন্তত তাই হওয়াই উচিত। তবু সাধারণভাবে ন্যাচারালিস্ট আন্দোলনে উদ্ভূত গল্পগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা হয়। বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির গল্প', জগদীশ গুপ্তের 'রামের টাকা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', সমরেশ বসুর 'পাড়ি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

চৌদ্দ॥ গোয়েন্দা গল্প: অপরাধ এবং অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পুলিশ বা গোয়েন্দার তৎপরতা যে সব গল্পের মুখ্য অবলম্বন তাদের বলা যেতে পারে গোয়েন্দা গল্প। ইংরেজিতে

এই ধরনের গল্পে দক্ষতা দেখিয়েছেন এডগার অ্যালান পো, আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, চেস্টারটন। বাংলায় এই শ্রেণীর গল্পে দক্ষতা দেখতে পাই পাঁচকড়ি দে, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকের।

পনেরো॥ বিদেশী পটভূমিকাযুক্ত গল্প : বিদেশের পটভূমিকায় কিছু অনবদ্য বাংলা ছোটগল্প রচিত হয়েছে, তাদের আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি। এই সব গল্পের মধ্যে প্রধান অবিনাশচন্দ্র বসুর 'বম্বের মোহ', রাখাল সেনের 'সহযাত্রী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মুল্য', 'ভিখারী সাহেব', মণীন্দ্রলাল বসুর 'হোটেলওয়ালা' প্রভৃতি।

● ছোটগল্পের ভিন্নতর বিভাগ

বিষয়ভিত্তিক এই বিভাগে ছোটগল্পের প্রকৃতি প্রায় উপেক্ষিতই থাকে। এর প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী—

(ক) Story of Incident বা ঘটনামুখ্য গল্প।

(খ) Story of Character বা চরিত্রমুখ্য গল্প।

(গ) Story of Impression বা প্রতীতিমুখ্য গল্প।

উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের সময় যে কথাগুলি বলা হয়েছিল, তা এখানেও একবার স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসের শ্রেণীবিচার অত্যন্ত দুরূহ এই কারণেই যে সেখানে যে বিশেষ ধর্মের উপস্থিতিতে তাকে বিশেষ ধরনের উপন্যাস বলা হয় তা উপন্যাসমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। এখানেও আমরা বলতে পারি, ছোটগল্পে ঘটনা কিছু ঘটবেই, তার তীব্রতা ও তাৎপর্য যতোই কম হোক না কেন, এমন কি তা প্রায় 'গল্পহীন' ছোটগল্প হলেও। আর গল্প যেখানে আছে অর্থাৎ ঘটনা, সেখানে ঘটনা সংঘটনের উপযোগী চরিত্রকেও থাকতে হবে, কারণ কেবলমাত্র বর্ণনায় কোনো গল্প তৈরি হয় না। প্রতীতি প্রসঙ্গে বলা যায়, এটি যে ছোটগল্পের অপরিহার্য গুণ সে তো ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়েই আমরা বলেছি, সুতরাং প্রত্যেকটি ছোটগল্পের ঘটনা, চরিত্র এবং প্রতীতি থাকবেই, এবং সেই কারণেই শ্রেণী নির্ণয়ে একজন সমালোচকের সঙ্গে অন্যজনের বিরোধ দেখা দিতেই পারে। উপন্যাসের মতোই এখানে এদের যে-কোন একটির প্রাধান্য ও অনিবার্যতা বিচারের চেষ্টা না করলে তার শ্রেণীনির্ণয়ও করা সম্ভব হবে না।

কোন গল্পকে ঘটনামুখ্য আমরা তখনই বলতে পারি যখন ঘটনাই গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোচড় থেকেই পাঠকের মনে প্রতীতির সৃষ্টি হয়। মোপাসাঁ বা ও-হেনরির বেশ কিছু গল্প এই শ্রেণীতে পড়তে পারে। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের এই শ্রেণীর গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত এই ধরনের গল্প লেখেন নি, তবে তাঁর 'মুক্তির উপায়'-কে এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। গোয়েন্দা গল্প বা ভৌতিক গল্পে ঘটনা প্রাধান্য পায় বলে সাধারণভাবে তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

চরিত্রমুখ্য গল্প বিদেশি সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখা হয়েছে। একটি বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করেই এরকম গল্প লেখা হয় বলে এই গল্পের শ্রেণীভুক্তি বিশেষ

সমস্যার ব্যাপার হয় না। শুধু একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, ছোটগল্প বলেই চরিত্রকে সামগ্রিক ভাবে দেখবার সুযোগ সেখানে থাকে না, চরিত্রের একটি বিশেষ প্রবণতাই তুলে ধরেন ছোটগল্পকার। অথবা এমনও হতে পারে যে একটি বিশেষ প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য বা উৎকেন্দ্রিকতাযুক্ত চরিত্রই লেখক নির্বাচন করেন। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে রামকানাইয়ের নিপাট সারল্য ছোটগল্পের বিষয় করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আলোবাবু' গল্পে পশুপ্রীতির আন্তরিক ও গভীর উৎসাহসম্পন্ন মানুষকে ধরেছেন বনফুল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অর্ধেক গল্প চরিত্রপ্রধান। রূপোকাকার মতো সরল মানুষ, হাজুর মতো মেয়ে, যাত্রাজগতের মানুষ, এই রকম অনেক চরিত্রই তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন হয়েছে।

প্রতীতিমুখ্য গল্পে শেষ পর্যন্ত একটি প্রতীতি বা Impression বড় হয়ে ওঠে। গল্পে চরিত্র ও ঘটনাকে অতিক্রম করে যদি এই ধারণাটিই মনে গেঁথে যায়, বলা যাবে গল্পটি এই শ্রেণীর। এই বিচার অনেক সময় জটিল হতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে এমন মনে হওয়া সম্ভব যে ফটিকই সেখানে মুখ্য অবলম্বন। সত্যিই যে তাই একথা ঠিক হলেও গল্পের শেষে কিন্তু এমন একটা প্রতীতিই বড় হয়ে ওঠে যে নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে—সে মানসিক শান্তি তো পায়ই না, তার চূড়ান্ত পরিণতিও ঘটে যেতে পারে। প্রতীতিমূলক গল্পই আধুনিক সাহিত্যে বেশি লেখা হয়। তারাশঙ্করের 'চোখের ভুল', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুচ্ছ', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'টিকিট', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড', বিমল করের 'নিষাদ', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া', আবুল বাশারের 'তেলেগ দাসরি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ।

ছ. ছোটগল্পের বৃত্তগঠন

উপন্যাস রচনায় Plot Construction বা বৃত্তগঠনের যেমন ভূমিকা আছে, ছোটগল্পেরও সুচিন্তিত বৃত্তগঠন অপরিহার্য—এর গুরুত্ব অন্তত উপন্যাসের বৃত্তগঠনের চেয়ে কম নয়। কারণ একটি প্রতীতি যেহেতু ছোটগল্পকারের প্রধান অবলম্বন, সেই প্রতীতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে বৃত্ত গঠন করতে হয়। এই জন্যই করতে হয় যে উপন্যাসের মতো অপচয়ের বিলাসিতা করবার উপায় তাঁর নেই, একেবারে প্রথম বাক্য থেকেই তাঁকে নিশ্চিত লক্ষ্যে এগুতে হবে। এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়তে পারে এড্‌গার অ্যালান পো-র সেই কথা—"If his very intial sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step."

তবে উপন্যাসের প্রথাগত বৃত্তগঠনে আমরা কাহিনী ও উপকাহিনীর বিন্যাস হিসাবে যেমন সরল, জটিল ও যৌগিক বৃত্তের নির্মিতি পাই, ছোটগল্পের বৃত্ত-গঠনে তা পাওয়া যায় না, কারণ কাহিনীর জটিলতা অপেক্ষা তার উপস্থাপনের সমস্যাই এখানে প্রধান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাস বিশ্লেষণ করে সমালোচকগণ মোটামুটি ভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ছোটগল্পের বৃত্ত গঠন সাধারণত তিন রকমের হয়ে থাকে—

(ক) Stair-step Construction বা সোপানারোহ গঠন

(খ) Rocket Construction বা চকিতোন্নত গঠন, এবং

(গ) Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন।

সোপানারোহ গঠন বলতে বোঝায় ঘটনাক্রমের উন্নতি, চূড়ান্ত পর্যায়ে তার আরোহন এবং দ্রুত অবনমন। নাটকের প্রথাগত পিরামিড-আকৃতির পঞ্চাঙ্ক গঠনের সঙ্গে এর পার্থক্য, ঘটনাগুলি ক্রমশ একটি তুঙ্গ অবস্থা বা Crisis-এ পৌঁছয়, কিন্তু তার পরই দ্রুত সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। এর চকিতোন্নত গঠনের পার্থক্য এই যে এই ধরনের বৃত্তে প্রায় প্রথমেই Crisis দেখতে পাওয়া অর্থাৎ ঘটনা তুঙ্গে পৌঁছয় প্রথমেই, এরপর লেখক সুকৌশলে ধীরে ধীরে কাহিনীকে রসসিদ্ধ পরিণতি দেবার চেষ্টা করেন। তৃতীয় যে বৃত্তগঠনকে বলা হয়েছে ঘূর্ণরেখ সেখানে বর্তমান কাহিনীকে উপলক্ষ করে একটি ঘূর্ণায়মান অতীত কাহিনী থাকে। দুটি কাহিনীই বৃত্তাকারে বেষ্টন করে থাকে একে অপরকে, অথচ তারা প্রত্যেকেই থাকে গতিশীল।

উদাহরণ ব্যতীত এই তিন রকম বৃত্তগঠনের পার্থক্য সঠিক ভাবে বোঝা শক্ত হতে পারে। তবে তার আগে বলা দরকার, গল্প বলার কৌশলকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—ঘটনাশ্রয়ী সূচনা এবং বর্ণনাশ্রয়ী সূচনা। একটি প্রারম্ভিক ঘটনা বা Intial incident দিয়ে গল্পের সূচনা হতে পারে, অথবা কোনো মন্তব্য বা সঠিক পরিস্থিতি অর্থাৎ Preliminary Situation দিয়েও সূচনা হতে পারে গল্পের। এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এক বিশেষ ধরনের বৃত্তগঠনের গল্প বলার বিশেষ এক কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ ঘটনাশ্রয়ী সূচনা হলেই যে তার বৃত্ত হবে চকিতোন্নত এবং বর্ণনাশ্রয়ী সূচনা হলেই সোপানোরোহ বৃত্ত নির্মাণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে উদাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'পোষ্টমাস্টার',—দুটি ছোটগল্পেরই বৃত্তগঠন করা হয়েছে সোপানারোহ পদ্ধতিতে, কিন্তু 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সূচনাতেই আমরা একটি ঘটনা পাই অর্থাৎ মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার সাক্ষাতের ঘটনা যা শেষ পর্যন্ত একটি আলোড়ক পরিসমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'পোষ্টমাস্টার' গল্পে শহরের মানুষ গ্রামে আসার দুঃসহ পরিস্থিতিই বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আর দুটি ছোটগল্পের কথা এখানে স্মরণ করতে পারি—'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' এবং 'শাস্তি'। দুটি ছোটগল্পেরই বৃত্ত চকিতোন্নত গঠনের উদাহরণ, অথচ প্রথম গল্পটির সূচনা যখন স্পষ্টত ঘটনাশ্রয়ী, দ্বিতীয় গল্পটি তখন পরিস্থিতির বর্ণনার পরই একটি Crisis তৈরি করেছে। ঘূর্ণরেখ বৃত্ত গঠিত হয় সাধারণত একটি ঘটনাকে আশ্রয় করেই যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

জ. ছোটগল্পের ভাষারীতি

ছোটগল্পের প্রধান গুণ সংযম, একথা বার বার বলা হয়েছে, সুতরাং ভাষার আলোচনায় সেই কথাটিই পুনর্বার স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটবে, এটাই প্রত্যাশিত। উপন্যাসের আলোচনায় আমরা যা বলেছিলাম, এখানেও ভাষারীতির সেই বিভাগগুলিরই উল্লেখ করতে পারি—Narrative বা বর্ণনাত্মক রীতি, Dramatic বা নাটকীয় রীতি এবং Lyrical বা কাব্যিক রীতি। ছোটগল্পের বিষয় এবং প্রতীতি অনুযায়ী তার রীতির

পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় একই লেখক গল্পের মেজাজ অনুযায়ী তাঁর ভাষারীতি পালটে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দিয়েই বলা যায়, প্রথম দিকের গল্প 'দেনাপাওনা' বা 'পোস্টমাস্টার'-এ তিনি যে বর্ণনাত্মক রীতি ব্যবহার করেছেন, পরে তা পরিবর্তিত হয়েছে। 'একরাত্রি' কিংবা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ভাষারীতি রীতিমতো কাব্যিক; অথচ শেষ পর্যায়ের গল্পে, ধরা যাক 'ল্যাবরেটরি', তিনি ব্যবহার করেছেন নাটকীয় রীতি।

অবশ্য এমনও হতে পারে, কোনো কোনো ছোটগল্পকার তাঁদের বিশেষ মানস-গঠনের জন্য একটি বিশেষ রীতি বেছে নেন। যেমন জগদীশ গুপ্ত এ কথা বিশ্বাস করেন যে জীবনে নাটক খুবই অল্প, তাই চমকিত ঘটনা থাকলেও তার তিনি বিবরণ দেন একেবারে অনুত্তেজক ভাষায়। তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই ভাষারীতি বর্ণনাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে তাঁর 'সবার শেষে গয়া' ছোটগল্প থেকে—"গয়ামণি ও রামের পুত্র লব যখন মাত্র তিন বৎসর শিশু তখন লবের বাবা রাম মারা গেল। রাম ছিল দিন-মজুর। মজুরের কাজে খাটিতে খাইয়া রাম একদিন উঠিয়া গেল সুউচ্চ এক আমবৃক্ষে, তাহার শাখা ছেদন করিতে।"

কাব্যিক রীতি অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় গল্পেরই স্বার্থে, যদিও এক-একটি পর্বে এক-একটি ভাষারীতি প্রধান ভাবে আশ্রয় করেছেন এমন লেখকও আছেন। তারাশঙ্কর প্রথম পর্বে সাধারণত কাব্যিক রীতিই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তা ব্যবহার করেছেন কখনো সখনো, তাঁর 'কান্না' ছোটগল্পটি কাব্যিক রীতির একটি সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' থেকে এই ভাষারীতির দৃষ্টান্ত সন্ধান করছি, কারণ এই প্রলোভন সামলানো খুব কঠিন :

> "হঠাৎ গুমট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। ... যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া সুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কাষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিল গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।"

নাটকীয় রীতির উদাহরণও রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প থেকেই নেওয়া যাক। আমরা 'বদনাম' গল্পের সূচনা স্মরণ করতে পারি—

> "ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্সপেক্টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমর-বন্ধ, হাফপ্যান্ট-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নী এসে খুলে দিলেন। ইন্সপেক্টার ঘরে ঢুকতেই না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন—'এমন করে তো আর পারিনে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি, তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সজ্জনও বাদ গেল না, আর একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই।"

● ছোটগল্পের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বর্তমানে ছোটগল্প সবচেয়ে সজীব শাখা। সেই কারণে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়েই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এর মধ্যে আঙ্গিক পরীক্ষাও যেমন আছে, তেমনি আছে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা। একেবারে রিপোর্টের মতো করে লেখা গল্প, যেমন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'যথাক্রমে' উপন্যাসে করেছেন, আমরা লক্ষ্য করেছি কারো কারো লেখায়। ছোটগল্পকে উপন্যাসের মতো বিভিন্ন অধ্যায় ভাগ করেছেন কোন কোন লেখক—এই মুহূর্তে আবুল বাশারের 'ভোর-পোয়াতী তারা' গল্পের কথা মনে পড়ছে। সতীনাথ ভাদুড়ি চিন্তার ভাষা হিসাবে ভাষার এক রকম পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে এরকম চিন্তাও কারো কারো মাথায় আছে—ফলে ঘটমান বাস্তব এবং চিন্তার জগতের সত্যের মধ্যে ভাষাগত একটা বৈপরীত্য সৃষ্টির কথা তাঁরা ভাবছেন।

গল্পের বিষয়হীনতা বা না-গল্প নিয়ে বর্তমানে কেউ কেউ খুবই চিন্তিত। এটাকে চিন্তার বিষয় বলে আমরা মনে করি না। গল্পের আকর্ষণ চিরকালই বজায় থাকবে—আজও আছে, পরেও থাকবে, তাই না-গল্পের সময়েও গল্প বলা ছোটগল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে না। কিন্তু পাঠক হিসাবে যতোই পরিণতি আসবে আমাদের, ততোই আমরা ছোটগল্পের মধ্যে খুঁজতে চাইবো তার স্রষ্টাকে। তাঁকে সঠিকভাবে অনুভব করার আনন্দ কিন্তু গল্পপাঠের আনন্দের চেয়ে কম নয়। কাজেই এমন হতে পারে, ছোটগল্প এতে কবিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে, কিংবা একাঙ্ক নাটকের যা গতিপ্রকৃতি তাতে ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকও তাদের আস্বাদে কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে—কিন্তু পরিণত-মনস্ক পাঠকের কাছে ছোটগল্প এর পরেও ক্রমশই আরো বেশি আকর্ষণীয় হতে থাকবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছোটগল্পের আর-একটি পরীক্ষা, অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে আর-একটি শ্রেণীর কথাই আমাদের বলে নিতে হবে—সর্বশেষ প্রসঙ্গ হলেও গুরুত্ব কোনক্রমেই কম নয় এবং যাকে ঠিক সাম্প্রতিকও আমরা বলতে পারি না। দৃশ্যত, এটি ছোটগল্পের অতি সংহত এক রূপ যাকে দেখে মনে হতে পারে ছোট্ট ছোটগল্প। এই পরীক্ষামূলক ধারাটির সচেতন প্রয়োগ লক্ষণীয় ভাবে করেছেন বনফুল এবং সাধারণভাবে তাঁর এই জাতীয় অতি হ্রস্ব গল্পের নামকরণ আমরা করেছি 'পোস্টকার্ড স্টোরি'। অবশ্য এর মূলে বনফুলের নিজেরও কিছু ভূমিকা থাকতে পারে, তিনি নিজে এই রকম একটি গল্পের নামকরণ করেছিলেন 'পোস্টকার্ডের গল্প'। তাঁর এ জাতীয় গল্প একটি পোস্টকার্ডের আয়তনেই লিখে ফেলা সম্ভব বলে এই নাম আমাদের খুব অযৌক্তিকও মনে হয় নি।

তবে এই ধরনের গল্প বনফুলই প্রথম লিখলেন একথা সম্ভবত ঠিক না—বাংলা সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই রীতিতে গল্প আগেও লেখা হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লিপিকা' গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা এরকম হ্রস্ব গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন—সমালোচকগণ তার শ্রেণীবিচারে কিছু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে এই জাতীয় গল্প আমরা দেখতে পাই, সেখানে তার নামকরণ করা হয়েছে 'Five minute-story'। আমেরিকান গ্রাম্য সাহিত্যে এই জাতীয় গল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেগুলি পরিচিত short-short-story হিসাবে। বাংলায় এর সর্বজনগ্রাহ্য নাম এখনও পাওয়া যায় নি। 'অণুগল্প'

নামটি কিছুটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, গল্পাণু বলেছেন কেউ কেউ, একজন সমালোচক একে 'ছোট্ট ছোটগল্প' হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। এর প্রকৃতি বিচার করে অন্য কোনো যুক্তিগ্রাহ্য নাম আমরা প্রস্তাব করতে পারি কিনা বিবেচনা করা যেতে পারে।

একেবারে প্রথমেই দেখা উচিত, ছোটগল্পের একটি ধারা হিসাবে একে গ্রহণ করা উচিত, অথবা কথাসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ হিসাবে। এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেওয়া যায়, একে আমরা ছোটগল্পই বলবো, কারণ ছোটগল্পের প্রধান এবং সর্বজনস্বীকৃত লক্ষণটি হল একমুখিনতা বা singleness of purpose যেটা এ জাতীয় গল্পের সবচেয়ে প্রকট লক্ষণ। প্রশ্নটা আসলে অন্য জায়গায়, ছোটগল্পকেই তো আমরা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে সংহত শিল্পরূপ বলে জানি—তাহলে তাকে আরো বেশি সংহত বা সংক্ষিপ্ত করার সার্থকতা কোথায় এবং যদি তা করাই হয় তাহলে পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের স্বাদ কি তাতে পাওয়া সম্ভব!

এখানেই ছোটগল্পের এই ধারাটি স্বীকার করে নেওয়ার সঠিক উত্তর লুকিয়ে আছে বলে আমাদের মনে হয়। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ছোট্ট ছোটগল্পেরও একটা আলাদা উপভোগ্যতা এবং আস্বাদ আছে যেটা ঠিক ছোটগল্প আস্বাদনের সঙ্গে অভিন্ন নয়। আধুনিক পাঠক. যাঁরা অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের দীপ্তিও আশা করেন গল্পে, তাঁদের কাছে এ গল্প অনেক বেশি উপভোগ্য, কারণ এখানে শিল্পীর একটা কঠিন পরীক্ষা হয়। অনেকটা সনেট রূপকৃতির কবিতা লিখবার মতো—'শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।' আসলে, ছোটগল্পের সঙ্গে এই গল্পের পার্থক্য হল ছোটগল্প এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ, এই রকম গল্প তার বীজমাত্র—একটা পরিকল্পনা, নক্‌সা বা ছক; ঠিক যেমন মনে হয়, যে বিষয় নিয়ে সুন্দর একটা ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, লেখক এখানে সংক্ষেপে তার ছকটা করে রেখেছেন। তা ছাড়া এতে এমন অনেক আভাস বা ইঙ্গিত থাকে যা পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পে স্ফুটতর হতে পারতো—বীজাকারে লেখা হয়েছে বলেই শুধু ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই রকম গল্প পাঠকের মনোযোগ ও সচেতনতাও যেন অনেক বেশি দাবি করে। বনফুলের 'মুহূর্তের মহিমা', 'নিমগাছ', 'মানুষ', 'তর্ক ও স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পের কথা মনে করলেই তা বোঝা যাবে। এই ধরনের গল্পের এই প্রকৃতির জন্য একে আমরা বীজগল্প বা গল্প-বীজ আখ্যা দেবার কথাও ভাবতে পারি।

ক. প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃতি—প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ—বাংলা প্রবন্ধের উদ্ভব। খ. বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ—এই জাতীয় প্রবন্ধের একটি দৃষ্টান্ত। গ. আত্মগৌরবী প্রবন্ধ—এই জাতীয় প্রবন্ধের একটি দৃষ্টান্ত।

ক. প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃতি ও এর উদ্ভবকাল

সাহিত্যকে আমরা স্থূলভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করে থাকি—ভাবের সাহিত্য বা রস সাহিত্য (Literature of Power) এবং জ্ঞানের সাহিত্য (Literature of knowledge)। খুব সাধারণ ভাবে বলা যায় রসসাহিত্য সৃষ্টি মূলক, সেখানে মন্ময় সাহিত্য ও তন্ময় সাহিত্যের বিভাগ থাকলেও মূলত স্রষ্টাই সেখানে প্রাধান্য পান, জ্ঞানের সাহিত্যে প্রাধান্য পায় রচনার বিষয়। এ যাবৎ যে সব সাহিত্য-প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি সবই ভাবের সাহিত্য। প্রবন্ধকে আমরা জ্ঞানের সাহিত্য বলেই প্রাথমিকভাবে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য একেবারেই যদি বিষয়ের মূল্যেই প্রবন্ধের মূল্য হতো তবে, একদিকে যেমন, একে সাহিত্য হিসাবে স্বীকার করাই শক্ত হতো, অন্যদিকে যিনি লিখছেন তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা না থাকলে প্রবন্ধের বৈচিত্র্যও যেমন বৃদ্ধি পেতো না, তেমনি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের স্বীকৃতি দেওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো।

খুব কাজচলা গোছের একটা সংজ্ঞা দিতে চাইলে আমরা বলতে পারি, প্রবন্ধ এমন এক ধরনের গদ্যরচনা যা কোনো বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করে, অথবা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ে পাঠককে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

এই সংজ্ঞা অবশ্য সম্পূর্ণ ঘাতসহ নয়, কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মতো নিগূঢ় তত্ত্ব কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকাশ করেছিলেন পদ্যে, গদ্য মাধ্যমে নয় এবং কেবল বিষয়ের মূল্যেই প্রবন্ধের মূল্য নির্ধারিত হলে বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন না—'রচনাগুলির যদি কোন মূল্য থাকে তবে তা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভোগে।'

বস্তুত প্রবন্ধের 'রচনারসসম্ভোগ' একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেই একটি প্রবন্ধগ্রন্থের সংকলনের ভূমিকায় রবার্ট লিন্ড লিখেছেন—'It is strange that the essay, which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence. Yet it is an indisputable fact that the greatest essayist like the greatest letter-writer is rare even them the great poet.'

আসলে বাংলায় প্রবন্ধই বলি আর ইংরেজিতে Essay-ই বলি, এই প্রকরণের দ্বারা গদ্য সাহিত্যের এমন এক বিস্তীর্ণ সীমাকে আমরা ধরতে চাই যাকে ঠিক এই একটি নামে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। তবু ইংরেজিতে গুরুগম্ভীর ও বিধিবদ্ধ যে একধরনের জ্ঞানগর্ভ রচনাকে Treatise, Discourse বা Dissertation এবং Monograph বলা হয়, তার থেকে কিছুটা স্বাধীন রচনা হিসাবে Essay-কে পৃথক করা হয়েছে, বাংলায় আমরা এই ধরনের কোনো

পার্থক্যও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিনি। ফলে গদ্যরচনার সঙ্গে প্রবন্ধের পার্থক্যও খুব স্পষ্ট হয় নি। সেরকম কোনো বিভাগ আমরা করতে পারি কিনা তা বিবেচনা করার আগে এই ধরনের রচনা ও তাদের নামকরণের প্রাচীন উৎস আমরা সন্ধান করতে পারি।

Essay-র প্রাচীন উৎস খুঁজতে গেলে আমরা প্লেটোর Dialogues পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারি। উত্তরকালে সেনেকার পত্রাবলী, প্লুটার্কের নৈতিক রচনাবলী এবং পরবর্তী কালে ড্রাইডেনের রচনা বা অস্কার ওয়াইল্ডের The Critic as an Artist, সব কিছুই প্রবন্ধ পদবাচ্য। Essay নামক সাহিত্য-প্রকরণ ইংরেজিতে খুবই সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সঠিক ভাবে সাহিত্যিক অর্থে Essay শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় মঁতেনের লেখায়। Essay শব্দটি মূলত একটি ফরাসী শব্দ। স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেমস শব্দটি ইংরেজিতে প্রথম ব্যবহার করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিক থেকেই শব্দটি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করেছে।

'প্রবন্ধ' শব্দটি 'সাহিত্যদর্পণ'-কার আচার্য বিশ্বনাথ ব্যবহার করেছিলেন কাব্যাদির বিভিন্ন উপাদানগত আবশ্যিক সংগতি বোঝাতে। যেমন নাটকের ভাষা, পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত গঠনরীতি ইত্যাদি সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে যে সংগতি, তার নাম দিতে পারি নাট্যপ্রবন্ধ। সংস্কৃত আলংকারিকেরা ঔচিত্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাকে অর্থাৎ এই সংগতিকে আমরা বলতে পারি প্রবন্ধৌচিত্য।

'নিবন্ধ' এর প্রায় সমজাতীয় একটি শব্দ, কিন্তু সংস্কৃত অলংকার-গ্রন্থে এটি বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। 'সন্দর্ভ' নামে একটি কথাও পাওয়া যায় প্রকৃত অর্থ সম্যকরূপে গ্রন্থনা বা রচনা। প্রসঙ্গত বলা যায় 'রচনা' শব্দের ব্যাপ্তি আরো বেশি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে-কোন রকমের প্রকৃষ্ট বন্ধন বোঝাতেই 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যথা **লাচারী-প্রবন্ধ, পয়ার-প্রবন্ধ, পাঁচালী-প্রবন্ধ** প্রভৃতি। গদ্যমাধ্যমের ব্যবহারের পর ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির হাতে এই ধরনের রচনার যখন সূত্রপাত ঘটে তখন তাঁরা প্রায়শই 'প্রস্তাব' শব্দটি ব্যবহার করতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের বড় বড় রচনা 'প্রস্তাব' নামেই প্রকাশিত হয়েছে, অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠে' ক্ষুদ্র রচনাগুলিও 'প্রস্তাব' আখ্যা পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ 'প্রবন্ধ' শব্দটিই গৃহীত হতে থাকে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং প্রবন্ধ বলতে আমরা সাধারণভাবে এই প্রকৃষ্ট বন্ধনকেই বুঝে নেবো। এই বন্ধন বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের হতে পারে, চিন্তারাশির সুসজ্জাজনিত হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে তাতে সংযম, যুক্তিশৃঙ্খলা, সুসজ্জা এবং অবশ্যই রচনাসৌন্দর্য আমরা আশা করবো।

ইংরেজিতে Essay-র দুটি স্পষ্ট বিভাগ আছে—Formal essay এবং Informal বা Familiar essay। শেষোক্ত বিভাগটিকে Intimate essay-ও বলা হয়। বাংলা প্রবন্ধের ঠিক এই ধরনের কোনো বিভাগ না থাকলেও এই উভয় শ্রেণীর প্রবন্ধই আছে। Formal essay-কে বলা চলতে পারে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ, Informal essay-কে বলা যায় বিষয়ীগৌরবী বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধ। প্রথম ধরনের প্রবন্ধে বিষয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় ধরনের প্রবন্ধে এর লেখকই প্রাধান্য পান। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আমরা প্রথম বিভাগটি তন্ময় প্রবন্ধ ও দ্বিতীয় বিভাগটিকে মন্ময় প্রবন্ধ আখ্যা দিতে পারি। তবে প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেখা যায়

প্রথম বিভাগের রচনাগুলিকেই আমরা সাধারণত প্রবন্ধ আখ্যা দিই, দ্বিতীয় বিভাগের রচনাগুলিকে রস রচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আখ্যা দিয়ে থাকি। প্রবন্ধের আলোচনায় রবার্ট লীডকে একবার আমরা স্মরণ করেছি, সুতরাং Intimate essay-র স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাঁকেই পুনর্বার স্মরণ করা যাক। তিনি বলেছেন—

> 'Sometimes it is nearly sermon, sometimes it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography, or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the day of Judgement to a pair of scissors.'

ইংরেজিতে Formal Essayist-দের নাম আগেই বলা হয়েছে, Intimate essay রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন চার্লস ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, ডি-কুইন্‌সি, মাক্স হিয়ারবম, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রভৃতি এবং অবশ্যই রবার্ট লীড যাঁর দুটি উদ্ধৃতি এই আলোচনায় ব্যবহার করেছি। বাংলায় যাঁদের প্রাবন্ধিক বলা হয় তাঁরা কেউই একক ভাবে মন্ময় প্রবন্ধ লেখার জন্য বিখ্যাত নন, এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছেন যেমন প্রমথ চৌধুরী। তবে প্রথাগত প্রবন্ধ রচনার মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' গ্রন্থের হালকা প্রবন্ধগুলির মতো কিছু রচনা লিখেছেন, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মতো অসাধারণ এবং কালজয়ী রচনা সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধকেই এই ধরনের রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা চলে। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতি অনেকেই এই ধরনের রচনায় বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

বাংলা প্রবন্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস এবর সংক্ষেপে একটু জেনে রাখা যেতে পারে। বাংলা গদ্যের যাঁরা সূচনা করেন, সেই ইংরেজ মিশনারীদের হাতেই বাংলা প্রবন্ধের সূচনা, অবশ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নিদর্শন তার মধ্যে বিশেষ পাওয়া যাবে না। তবু অন্তত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের রচনায় প্রবন্ধের দৃঢ়তা এবং সংযম অনেকখানিই লক্ষ করা গিয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'দিগ্‌দর্শন' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাতেও প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। তার বিষয়বৈচিত্র্য কীরকম ছিল, নাম থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে, যেমন—'মিশরদেশের স্ফিংক্স', 'ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ', 'খ্রীষ্টের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ', 'উভয় দিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা বিষয়ে', 'অয়স্কান্ত মণি', 'বেলুনের বিবরণ' ইত্যাদি। শুধু বিষয় নয়, এইসব রচনায় ভাষাব্যবহারেও বেশ বৈচিত্র্য ছিল।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, সর্বাগ্রে তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নামই করতে হবে। তবে তিনি যে পরিমাণে বেদান্তপন্থী ও সমাজসংস্কারক ছিলেন সে পরিমাণে সাহিত্য-রসিক ছিলেন না. তবে তাঁর রচনায় প্রবন্ধের উপযুক্ত সংহতি আমরা লক্ষ করি, ভাষার সৌন্দর্য বিশেষ না থাকলেও দৃঢ়তা ছিল। তাঁর পরবর্তী লেখকদের মধ্যে সমস্তদিক দিয়ে প্রাক্-বঙ্কিম যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন শ্রেষ্ঠ, যদিও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে বৈচিত্র্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, ভাষাও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে: যতিচিহ্নের ব্যবহার তিনি প্রথম প্রচলন করেন, এটি নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার—বাংলা গদ্যের

অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই যতিচিহ্নের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণের কথা তাঁর মনে হয়েছিল। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী হিসাবে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বাংলা গদ্যের এই শৈল্পিক চেহারা তাঁর প্রবন্ধের চেয়ে বেশি পাওয়া যায় ভাবানুসরণে লেখা গদ্য আখ্যানগুলিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ, তেমনি তাঁকে আধুনিক প্রবন্ধেরও পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর দুখণ্ড 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং রসরচনাতে তাঁর সমপর্যায়ের লেখক সে সময় কেউ ছিলেন না। সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র এবং রামধন পোদ একই লেখকের প্রবন্ধজাতীয় রচনা—এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যেটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সেটি হল, ভাব অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার। ভাব যখন সংবদ্ধ ও গাঢ়, ভাষাও তখন তার অনুগামী। আবার ভাব যখন লঘু, তাঁর ভাষাও তখন চটুল ও তরল হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।' একথা বলার উদ্দেশ্য তিনি যে মহাকবি তা তাঁর রচনার কোনো শাখাতেই ভোলা যায় নি, প্রবন্ধেও না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভাব অনুযায়ী ভাষার পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। তন্ময় ও মন্ময়—উভয় প্রকারের প্রবন্ধই তিনি রচনা করেছিলেন, তবে ভাষার পার্থক্য কোথাও রাখতে পারেননি। তাঁর প্রবন্ধ 'মহাকবির হাতের' বলার আর একটি কারণ হতে পারে প্রবন্ধে কবিতার মতো বাগ্‌বিস্তার। প্রবন্ধে সাধারণ যুক্তি এবং কার্যকারণ শৃঙ্খলাকেই মেনে চলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোথাও যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করতে চাননি—কবির মতো একের পর এক উপমা সৃষ্টি করে তার বক্তব্য অপরের মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। উপমাকে এভাবে যুক্তির মতো প্রয়োগ করতে আর কাউকে দেখা যায়নি।

রবীন্দ্রযুগের লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যায়। তবে সকলের মধ্যে স্বতন্ত্র ছিলেন লিরিক্যাল গদ্য রচনায় বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং সরস প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিশেষত শেষোক্ত প্রাবন্ধিক বিজ্ঞানসেবক হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিকে যে সরসতায় ও সহজতায় আমাদের কাছে বিবৃত করেছেন, বিষয় সম্বন্ধে ও ভাষায় প্রচণ্ড দখল না থাকলে তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে দুটি নাম অপরিহার্য ভাবে এসে পড়ে, দুজনেই বিজ্ঞানসাধক—একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, অপরজন বেঙ্গল কেমিক্যালের রসায়নবিদ্ রাজশেখর বসু বা পরশুরাম। জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' একটি অত্যন্ত সুপাঠ্য গ্রন্থ। রাজশেখর বসু সরস গল্প নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, পরে প্রবন্ধমূলক অনুবাদেও বেশ দক্ষতা দেখান।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের আধুনিক পর্যায়টি বিভিন্ন সমর্থ লেখকদের হাতে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বলা যেতে পারে।

খ. বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ : একটি দৃষ্টান্ত

বিষয় গৌরবী প্রবন্ধ বা Formal essay-র প্রধান মূল্য বিষয়েরই গৌরবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে লেখকের লেখার নিজস্ব ভঙ্গি বা style এবং মানসিকতা সেখানে ফুটে ওঠেনা। যেমন বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ধ্রুপদী ভঙ্গির কবি এবং রোম্যান্টিক প্রকৃতির কবির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই দুটি পৃথক প্রবন্ধ লিখেছেলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের নাম 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি', রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নাম 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস'। দুটি প্রবন্ধেই লেখকদের নিজস্ব রচনারীতির স্পষ্ট ছাপ আছে—বঙ্কিমচন্দ্র সংযত, সংগত প্রায় সূত্রাকারে বক্তব্য বলেন বলে প্রবন্ধটির আয়তন অনেক কম। রবীন্দ্রনাথ বিশদ, পুনরাবৃত্ত এবং উপমাকে যুক্তির মতো ব্যবহার করেন বলে প্রবন্ধটির আয়তন অনেক বড়ো। কিন্তু বিষয়বস্তু প্রায় একই।

তা সত্ত্বেও মূলত বিষয়ের মূল্যেই এই জাতীয় প্রবন্ধের গুরুত্ব ঠিক করা হয়। সে জন্য সেভাবেই আমরা একটি প্রবন্ধ দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করবো। এটি প্রমথ চৌধুরী রচিত 'বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ'। প্রমথ চৌধুরী নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং সেই পত্রিকা 'সবুজ পত্র'কে বলা হয় আধুনিক সাহিত্যের পথিকৃৎ। কারণ বাংলা সাহিত্যে তিন প্রধানের শ্রেষ্ঠ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আধুনিক বুদ্ধিবাদী সাহিত্যের সূচনা এখানেই হয় এবং পরে কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, সংহতি পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ কী, বাংলা সাহিত্যে এই নবযুগের বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করার উপযুক্ত মানুষই যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনটি সংখ্যাচিহ্নিত প্রসঙ্গান্তরের দ্বারা অনতিবিস্তারিত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রথমাংশে নবযুগের সমস্ত লক্ষণ সংহত আকারে ব্যক্ত করেছেন, দ্বিতীয়াংশে লেখার পারিশ্রমিক বিষয়ে অতি-উৎসাহের ব্যাপারে সাবধান হয়েছেন এবং তৃতীয়াংশে লেখার অলংকরণ বিষয়ে সুবিধা ও অসুবিধার কথা বলেছেন।

অত্যন্ত অল্প অবকাশে নবযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রাবন্ধিকের নজরে এসেছে। সেগুলি সূত্রাকারে এইভাবে পরপর দেখানো যেতে পারে :

এক ॥ নবযুগে প্রচুর লেখক-লেখিকা এবং লেখার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তার ফলে প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে সাহিত্যপত্র জন্ম নেয়। এইসব লেখা কতদিন স্থায়ী হবে, বা সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হবে কিনা, সে কথা লেখক বলতে পারেন না।

দুই ॥ প্রাবন্ধিক মনে করেন 'নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।' অর্থাৎ আগে স্বল্পসংখ্যক কিছু বিরাট শক্তিমান সাহিত্যিকের দখলে ছিল সাহিত্যজগৎ, এমন বহুসংখ্যক অল্পশক্তিমান লেখকের হাতে এর অধিকার গিয়ে পড়েছে। ফলে প্রাচীন সাহিত্যকীর্তিগুলি তাজমহল এবং অজন্তা-ইলোরার গুহার মতো দূর থেকে দেখতেই ভালো, এখনকার সাহিত্যে তেমন স্থায়ী কীর্তি নেই— পড়ে তার উৎকর্ষ বিচার করতে হবে।

তিন ॥ প্রচুর মাসিকপত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রচুর লেখক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন। অথরিটির দিন যে হয়ে গিয়েছে, এখন সবাই ভার্সেটাইল।

প্রাবন্ধিকের ভাষায়—'নীতির জুতোসেলাই থেকে ধর্মের চন্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ শ্রমবিভাগ নেই—তার কারণ, যে ক্ষেত্রে শ্রম নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সে স্থলে তার বিভাগ আর কি করে হতে পারে?'

চার॥ এখনকার সাহিত্য ক্ষুদ্রকলেবর হয়ে এসেছে—'আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।' তবে এর জন্য প্রাবন্ধিক মোটেই দুঃখিত নন। তিনি বলেছেন, 'একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়।' কারণ তিনি নিজেই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, 'বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই।' ছোট হলেও তাতে যেন একটুও ফাঁকি না থাকে। এ কথাই তিনি বলতে চান।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ লিখে অর্থোপার্জন নিয়ে। 'গণধর্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্মের দিকে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে বলেছেন প্রাবন্ধিক, কারণ যেন-তেন উপায়েন বিকিয়ে দেবার প্রবৃত্তি যদি লেখকের হয় তবে লেখার মান কিছুই থাকবে না। দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সৎ সাহিত্যসাধনা অসম্ভব।

তৃতীয় প্রসঙ্গ লেখার সঙ্গে ইলাসট্রেশান নিয়ে, অর্থাৎ লেখা সচিত্র হয়ে ওঠা নিয়ে। রথী-মহারথীদের সাহিত্যে ছবির বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা, কিন্তু এখনকার সাহিত্যে ছবি আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এর ভালো ও মন্দ দুদিকই আছে বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে। কারণ অনেক বাজে লেখাও ভালো ছবির গুণে উতরে দেওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনটি মূল্যবান বক্তব্য আছে। দ্বিতীয় বক্তব্যটি চিত্রকলা সম্বন্ধে। এ ব্যাপারে একটা স্ববিরোধিতা আছে, সেটি লেখক অত্যন্ত ভালো ধরেছেন। বর্তমান বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ, তাঁরা বাস্তব অসুন্দরও কুৎসিত বর্তমান চর্চা করেছেন, অর্থাৎ সত্য-সুন্দর-শিবের আদর্শ ভুলে গিয়ে বড়ো বেশি বাস্তবপন্থী হয়ে পড়েছেন। অথচ চিত্রকলা সম্বন্ধে অভিযোগ ঠিক উল্টো—ছবিতে বস্তুজ্ঞানের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যচ্ছে না, শিল্পীর যেমন খুশি মন থেকে আঁকছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন, দুটিই যখন শিল্পকলা, তখন দুটির ক্ষেত্রে দুরকম বিচারের মানদণ্ড হওয়া অনুচিত।

সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তিনি তৃতীয় যে বক্তব্য অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিজস্ব বক্তব্য ও সমাধানসূত্র দিয়েছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছেন বস্তুর এবং প্রকৃতির যথাযথ চিত্রণ সাহিত্য নয়, চিত্রকলা নয়, কোনো শিল্পই না—শিল্পীর চোখে তা কেমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সেটাই শিল্প। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। সেটা বাহ্যবস্তুকে অবজ্ঞা করে অন্তর্দৃষ্টির ওপর অহেতুক বিশ্বাস থাকলেও হবেনা, অন্তর্দৃষ্টি বর্জন করে বস্তুজগতের প্রতি নিবিষ্ট করলেও হবেনা। সাহিত্যসৃষ্টি একটা সাধনার ব্যাপার, সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা! যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যার মন নেই, তিনিই মনস্বতা লাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।'

এক কথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বিষয় মুখ্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে এটি এবং সেই সঙ্গে লেখকের মনস্বিতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির প্রভাবে এটি আধুনিক সাহিত্যের একটি সুষ্ঠু পরিচালক হয়ে উঠতে পেরেছে।

গ. আত্মগৌরবী প্রবন্ধ : একটি দৃষ্টান্ত

আত্মগৌরবী প্রবন্ধে একটি বিশেষ বিষয় নয়, যে মানুষ বিষয়টি নিয়ে লিখছেন, সেই মানুষটি সম্বন্ধেই জানা যায় বেশি। এ জাতীয় রচনার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র এবং চন্দ্রনাথ বসু, কিন্তু শ্রেষ্ঠ লেখক সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বাজে কথা' প্রবন্ধেই এ ব্যাপারটি বিশদ করে বলেছেন তিনি। বস্তুত 'প্রাচীন সাহিত্যে' যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন—যেমন 'কাব্যে উপেক্ষিতা' তাতে রামায়ণের কথা তত নেই, যত আছে তাঁর নিজের মনের পরিচয়। সেই কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের পরিচয় দিতে চাই। প্রবন্ধটির নাম 'কেকাধ্বনি', অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বিচিত্রপ্রবন্ধ'! গ্রন্থেই।

কবি-সাহিত্যিকদের কাছে 'কেকারব' বা ময়ূরের ডাক অত্যন্ত রোম্যান্টিক বলে মনে হয়, অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষের কণ্ঠস্বর প্রকৃতপক্ষে ততটা রোম্যাণ্টিক নয়; বরং উল্টোটাই সত্য—ময়ূরের চিৎকার শুনলে মানুষেব মনে বিরক্তি উৎপাদনই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কবিরা কেকারবের প্রতি মুগ্ধ কেন, এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের মাথায় এসেছে এবং সেই সূত্রেই যত কথা তিনি বলতে চেয়েছেন বলে গিয়েছেন এবং তার ফলে ময়ূরের ডাককে কতটা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়েছেন বলা শক্ত, কিন্তু নিজের মানসিকতাকে উন্মুক্ত করতে পেরেছেন সম্পূর্ণ ভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন এমন এক ধরনের মিষ্টতা আছে যা সকলের কাছেই মিষ্ট, নিজের মিষ্টত্ব তাকে প্রমাণ করতে হয়না। এগুলিকে সামান্য নীচু স্তরের মিষ্টত্ব বলে তাঁর মনে হয় কারণ এই মিষ্টত্বের প্রমাণে কেবল ইন্দ্রিয় লাগে, মন লাগেনা। এই কারণেই কোনো বিশেষ শিল্প যে শিক্ষা করেছে—সে চিত্রই হোক, সংগীতই হোক, সাহিত্যই হোক, সে কোনো জিনিসের আপাতলালিত অংশটিকে খুব মূল্য দেয় না, কারণ তার সীমা সে জানে। অশিক্ষিত মানুষ শুধু সেইটুকু জানে বলেই তাদের কাছে সেটুকুর মূল্যই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শিল্পে বিশেষভাবে শিক্ষিত মানুষের আনন্দ কেবল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির আনন্দ নয়, মানসিক আনন্দ। সেটা কী জিনিস! রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন—'একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ।'

আসলে যে সৌন্দর্য কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয় সে মানুষের মনকে কিছু সৃজনের অবকাশ দেয়না। সেই কারণেই মন তাকে খুব গভীর ও আলোড়ক সৌন্দর্যরূপে মনে করতে পারেনা।

এতক্ষণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা করেছিলেন আসল কথাটি বলার জন্য। সেটি হল এই যে, কেকারব এমন কোনো মধুর রব না যা কানে শুনলেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত তাকে সাধারণভাবে বর্ণনা বলতেই ভালো হয়। কিন্তু কেকারব শুনতে গেলে তাকে সম্পূর্ণ করে শুনতে হবে। বন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কেকার হঠাৎ স্বরক্ষেপণ শ্রুতিকটু হতে পারে, কিন্তু শোনবার সময় যদি স্থান ও কালের অসম্পূর্ণতা মনে মনে দূর করে নেওয়া যায় তাহলেই তার প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝতে পারা যাবে। মনে করতে হবে অরণ্যসঙ্কুল সেই পুরাকালের কথা যখন মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, যখন অরণ্যের অধিকার খর্ব করেনি নগর। সেই বন্য প্রকৃতির বুকে যখন আদিম বর্ষা মাতামাতি করতো, সেই প্রলয় মুহূর্তে সত্যিকারের ভয়ংকর

সুন্দর কোনো রব যদি থাকে যা সমগ্র পরিবেশ এবং আদিম বর্ষণকে পূর্ণতা দান করে, তবে তা সেই কেকারব। যে-কথাটি আমরা অক্ষম ভাবে বোঝবার চেষ্টা করলাম, রবীন্দ্রনাথের কলমে সেটি এইরকম—'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান।'

এইভাবে পরিবেশ, কাল ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিস্থাপক সুন্দরকেই অনুভূতিশীল মানুষ প্রকৃত সুন্দর বলে মনে করেন। ব্যাঙের ডাক বা ডহুকির ডাকও যে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু ঘন বর্ষার নিবিড়ভাবের সঙ্গে তার এমন একটি যোগ আছে যে কবিদের সেই 'আওয়াজগুলিই মনে পড়ে' বর্ষার আবহে। বর্ষাকে ব্যাঙের ডাক কী-ভাবে সম্পূর্ণতা দান করে, তার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে কেন আমরা বলেছি এই ধরনের প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী অর্থাৎ রচয়িতাকে ভালোভাবে জানা যায়। অংশটি এইরকম : 'এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর এই বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরও ঘন করিয়া চারি দিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতা অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল।'

নবম অধ্যায় ‖ গদ্যসাহিত্য

ক. গদ্যসাহিত্য কাকে বলে—পত্রপত্রিকা। খ. জীবনীসাহিত্য—সাধারণ জীবনী ও সন্তজীবনী—জীবনচরিত রচনায় বিবিধ সতর্কতা—জীবনীসাহিত্যের পরিচয়—আত্মজীবনী—আত্মজীবনী রচনায় বিবিধ অসুবিধা—একটি আত্মজীবনীর পরিচয়। গ. দিনপঞ্জী—একটি সাহিত্যিক দিনপঞ্জী। ঘ. পত্র বা লিপি সাহিত্য—পত্র ও পত্রসাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য—ঐতিহাসিক মূল্য—সাহিত্যিক মূল্য—লিপি সাহিত্যের পরিচয়—একটি পত্রসাহিত্য : ছিন্নপত্র। ঙ. ভ্রমণ সাহিত্য—একটি ভ্রমণ সাহিত্যের পরিচয়। চ. রম্যরচনা—রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

ক. গদ্যসাহিত্য কাকে বলে

খুব স্থূল অর্থে—গদ্যসাহিত্য বলতে প্রবন্ধ সাহিত্যই বোঝায়, কিন্তু বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পর আরও অনেকগুলি সাহিত্য-প্রকরণের জন্ম হয়েছে যাদের প্রবন্ধ বলা সমীচীন নয়, এগুলিকে গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন রূপবন্ধ বা প্রশাখা হিসাবে ধরে নেওয়াই সংগত। এগুলি হল—জীবনী সাহিত্য-দিনপঞ্জী-কড়চা-স্মৃতিকথা, পত্র বা লিপি সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য এবং রম্যরচনা। অবশ্য এগুলি আলোচনার আগে আমরা সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি দান করবো কারণ এগুলোর আশ্রয়েই গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ উদ্ভূত ও প্রাণবন্ত হতে পারে।

সাধারণভাবে গদ্যমাধ্যমকে আশ্রয় করে লেখা যে-কোন সাহিত্য-পদবাচ্য রচনাকেই আমরা গদ্যসাহিত্য বলতে পারি। তবে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটু অবহিত থাকা প্রয়োজন যে তাকে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে, কেবলমাত্র গদ্য মাধ্যমে রচিত হলেই তা গদ্যসাহিত্য আখ্যা পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে না। আমরা উল্লিখিত বিভাগগুলির পরিচয় একে একে দেবার চেষ্টা করবো।

● পত্রপত্রিকা

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং লিটল ম্যাগাজিনের এক অনিবার্য ও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে গদ্যসাহিত্যের বিবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে। কারণ গদ্য রচনা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে এবং এইসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই তা বিকাশ লাভ করে। গদ্যসাহিত্যের প্রত্যেক পর্বেই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকগণ পত্র-পত্রিকাকেই প্রধান ভাবে আশ্রয় করেছেন। এমনকি পরবর্তী কালে একটি বিশেষ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই পত্রিকার লেখকদের পরিচয় দিতে গিয়েও পত্রিকার নামই হয়েছে আমাদের প্রধান অবলম্বন, যেমন—বঙ্গদর্শনের লেখক, ভারতীগোষ্ঠীর কবি, সবুজপত্রের যুগ, কল্লোলযুগ প্রভৃতি। ঔপন্যাসিকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ের পত্রপত্রিকাতেই, এই রীতি এখনও আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পত্রস্থ করে হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকা রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে আছে।

সাধারণভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত যেকোন পত্রিকাকেই আমরা সাময়িক পত্র বলে থাকি বটে, কিন্তু এদের মধ্যে খুব স্পষ্ট কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমত, সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু সংবাদ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ এমন কি গল্প-কবিতাও সেখানে প্রকাশিত হতে পারে। সাময়িক পত্র যদি সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশে প্রকাশিত হয় তবে গল্প-কবিতা ইত্যাদির প্রকাশই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য থাকে। সংবাদ সাধারণত সাহিত্যপত্রে প্রকাশ করা হয় না, তবে সাহিত্য-বিষয়ক সংবাদ বা বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ সেখানে প্রকাশিত হতে পারে।

একক প্রয়াসে বা কয়েকজনের মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত অবাণিজ্যিক পত্রিকাকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিন। অর্থ বিনিয়োগ এবং তার সাহায্যে সাহিত্যপত্রকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কোনো উদ্দেশ্যই লিটল ম্যাগাজিনের থাকে না। এই ধরনের পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলে, এমন কি সম্পাদক পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী, কোনো কাজের জন্যই কেউ বেতন গ্রহণ করেন না। সাহিত্য প্রীতি এবং সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। বাণিজ্যিক যেসব পত্রিকা একসময় বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্য সাধনার অবলম্বন হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির নাম করা যায়। এই সময়ে এরকম পত্রিকা সম্ভবত একটিই আছে, 'দেশ'।

শুনতে হয়তো অবাক লাগবে, যেসব পত্রিকা গত শতকে বা এই শতকে প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই ছিল অবাণিজ্যিক পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন, যেমন—'সংবাদ প্রভাকর', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি।

খ. জীবনীসাহিত্য

জীবনীসাহিত্যের কথা মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্য প্রসঙ্গে একবার আমরা উল্লেখ করেছি, তবে প্রথমত তা ছিল পদ্যমাধ্যমে রচিত, দ্বিতীয়ত, তাদের আমরা বলেছি সন্তজীবনী, ফলে প্রকৃত জীবনীসাহিত্যের মূল্য তাদের আমরা দিতে চাইনি। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদদের নিয়ে এরকম জীবনীকাব্য বা চরিতসাহিত্য লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কড়চাও আছে। কড়চা বলতে সাধারণত ছোট জীবনীগ্রন্থই বোঝায় যাতে জীবনের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনীচিত্র তুলে ধরা হয়।

অবশ্য আরো কিছু কিছু উদ্দেশ্যে কড়চা লিখিত হতো। সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ দুভাগে বিভক্ত থাকতো—কারিকা ও বৃত্তি। কারিকায় সংক্ষেপে সূত্রের মতো কোনো কথা বলে বৃত্তি অংশে তা ব্যাখ্যা করা হতো। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত 'কারিকা' থেকেই কড়চা শব্দটি এসেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—'জীবন বৃত্তান্ত বা ঐতিহাসিক ঘটনাদির বিষয় যাতে রক্ষিত হয় বা ঐ সকল বিবরণ ধ্বংস হতে রক্ষা করিবার জন্য যাতে লিখিত হয়।' সংস্কৃতে শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চা বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের জীবনচরিত Hagiography-র অন্তর্ভুক্ত মনে করাই স্বাভাবিক, প্রকৃত Biography বা জীবনীসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিক কালেই। মনে হতে পারে জীবনী রচনা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মতো জটিল সাহিত্যকৃতি কমই আছে। কারণ প্রথমত, জীবনী ইতিহাসেরই একটি শাখা। ব্যক্তিবিশেষের জীবনকাহিনী অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একটি দলিল হয়ে থাকে সেটি।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকৃতি হিসাবে গণ্য হতে গেলে তার মধ্যে সাহিত্যরস থাকতে হবে, নিছক জীবনীপঞ্জী হলে চলবে না। আলোচ্য চরিত্রটিকে নায়ক ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে চরিত্রটির বিবর্তন দেখানো উচিত, কথাসাহিত্যের মতোই। তথ্যের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক জীবনচরিতকে নষ্ট করে ফেলে। এ বিষয়ে স্ট্র্যাচি-র মত স্মরণযোগ্য—'A mass of notes and documents is no more biography than a mountain of eggs is an omelette.'

বোধহয় এই কারণেই কেউ কেউ মূর্তি-অঙ্কনশিল্পী বা Portrait-painter-এর সঙ্গে জীবনচরিতকারের তুলনা করেন। মূর্তিতে যেমন লোকটির প্রকৃত চেহারা আঁকবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে শিল্পের প্রতিও সুবিচার করতে হয়, জীবনী লেখককেও আলোচ্য চরিত্রটি এমন ভাবেই আঁকতে হয় যাতে আর পাঁচজন সেই চরিত পাঠে উৎসাহ পান অথচ তথ্যের বিকৃতি কোথাও না ঘটে।

তৃতীয়ত, জীবিত মানুষ অথবা মৃত মানুষের জীবনী রচনা করা হবে, এবিষয়ে রচনাকারের মনে সংশয় থাকতে পারে। আলোচ্য ব্যক্তি জীবিত থাকলে তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সন্ধান দুরূহ হয়ে পড়ে। তথ্যের স্বল্পতা নিয়েই সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হয়। কারো মৃত্যুর পর প্রকাশিতব্য জীবনীর ব্যাপারে আরো একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তখন সব গৃহীত তথ্যই ঠিক প্রকাশ্য থাকে না। সাধারণভাবে মৃত মানুষের ত্রুটিগুলি গোপন করে তাঁর গুণকীর্তনই প্রচলিত রীতি; যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে ত্রুটিগুলির সাধ্যানুসারে অনুল্লেখই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া অনেক সময় একটি মানুষের এমন ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারে যাতে কিছু তথ্য তাঁর ভাবমূর্তির ব্যাপারে ক্ষতিকারক বিবেচিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের ধারণা যদি এতে প্রচণ্ড আহত হবার আশঙ্কা থাকে তবে সে তথ্য প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়। অথচ একটি ব্যক্তির পরিচয় দিতে গেলে তথ্যের বিকৃতি ঘটানোও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। সেই কারণে এসব ক্ষেত্রে অতি সাবধানে অগ্রসর হতে হয়।

চতুর্থত, জীবনচরিত সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হয় সেটি মনে রাখতে হবে, জীবনীরচনায় যেন 'Perfect Pattern of well-told life' বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি জীবন পরিস্ফুট হয় অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণে এবং সেইসব চরিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপচারিতায় বা সংঘর্ষে। এইসব অন্য চরিত্রের চিত্র যদি একেবারে অস্পষ্ট থেকে যায় তাহলে একদিকে যেমন জীবনীরচনায় 'perfect pattern' নষ্ট হয়, অন্য দিকে মূল জীবনও সুপরিস্ফুট হতে পারে না—তাকে অনেকটা আকর্ষণহীন মনে হয়। এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন সমালোচক Andre Maurois– 'Secondary character must be delineated with the same care and love as the central figure. No man or woman was ever left to fight alone in the battle of life.'

পঞ্চমত, জীবনীচরিতের মাধ্যমে যদি কোনো নীতি বা আদর্শ প্রচার লেখকের উদ্দেশ্য হয় তবে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে তা করতে হবে। সবেচেয়ে ভালো হয় যদি এই নৈতিক আদর্শ বা মঙ্গলের কথা তিনি একবারও না বলে চরিত্রটিই নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সাহিত্যিক রসবোধের সঙ্গে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হলেই নৈতিক আদর্শ বা মঙ্গলের প্রচারাদর্শ সফল হবে। সমালোচক Maurois এ কথাটিও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন—

> 'A Bethoven Symphony is highly moral; so is a great biography, not because the author lays down moral principles but because a great life is a thing of beauty.'

● জীবনী সাহিত্যের পরিচয়

সঠিক জীবনীসাহিত্য আধুনিক যুগেই দেখা গিয়েছে, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলায় এখনও সার্থক জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়নি, এমন কথা কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। ঊনবিংশ শতকে প্রতিভার এক উজ্জ্বল সমাবেশ দেখা গিয়েছিল, অথচ রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কারো জীবন নিয়েই ঠিক তেমন কোনো জীবনীসাহিত্য লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। এই প্রচেষ্টা অনেক আগে আমরা দেখেছি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে, বেশ কয়েক বছর আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান'-এ যেখানে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনকে তিনি উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন, সাম্প্রতিক কালে দেখেছি কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি'-তে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণে এবং একেবারে এই সময়েই রচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসকল্প দীর্ঘ রচনায়—'সেইসময়' ও 'প্রথম আলো'-তে।

একটু কালানুক্রমিক বিচার করতে গেলে বলতে হবে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী রামরাম বসুই প্রথম আধুনিক জীবনচরিতের লেখক যিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। এরপর রাজা প্রতাপাদিত্যকে অনেকেই সাহিত্যের বিষয় করে নিয়েছেন —প্রতাপচন্দ্র ঘোষের দুখণ্ডে সমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরানীর হাট' পর্যন্ত তার প্রমাণ।

এর পরেই বোধহয় নাম করতে হবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, যিনি বাংলার বহু কবিওয়ালার জীবন এবং কবিতা অনুসন্ধান ও উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনী রচনা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে স্থান পেতে পারে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', নগেন্দ্রনাথ সেনের 'মধু-স্মৃতি', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভূদেব চরিত' প্রভৃতি। লেখার গুণে যে সন্তজীবনীও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয়নিমাই চরিত'। আধুনিক কালে 'এ ধরনের' জীবনচরিত রচনা করে সাফল্য ও প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ', 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি' ও

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' এ কালের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। জীবনীসাহিত্য না হলেও লুপ্ত জীবনী উদ্ধারের কাজে পূর্বে অসাধারণ নিষ্ঠা দেখিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'সাহিত্য সাধন চরিতমালা'র প্রত্যেকটি গ্রন্থ আজকের সম্পদ। এ কালে মণি বাগচীও জীবনীসাহিত্যের একজন সার্থক রূপকার।

আমাদের দেশে সার্থক জীবনীগ্রন্থ রচনার একটি প্রতিবন্ধকতা সাধারণ পাঠকের মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ দেশ কর্তাভজার দেশ। এখানে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ পেলেই অল্পদিনের মধ্যেই তাকে আমরা অতিমানব বা ঋষি বানিয়ে তুলি, ফলে বিবিধ ত্রুটি ও যেসব মানবিক দুর্বলতার পরিচয়ে একটি মানুষ রক্তমাংসের সজীব মানুষ হয়ে উঠতে পারেন সেই দুর্বলতা বা ত্রুটির পরিচয় জীবনীলেখক দিতে পারেন না। ও দেশের জীবনীর সঙ্গে এদেশের জীবনীগ্রন্থের পার্থক্যই সেইখানে। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ-এর জীবনী রচনা করেছিলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। তিনি শ-এর দুর্বল স্থানগুলি ঢেকে রাখবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। বিখ্যাত মহিলা অ্যানি বেসান্ত শ-এর প্রণয়কাঙ্ক্ষিনী-ছিলেন। সে কথা হ্যারিস সবিস্তারেই লিখেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের চোখে শ নিন্দনীয় হয়ে যাননি। বিবাহের পরও অনেক নারী এই বিখ্যাত নাট্যকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, হ্যারিস সেই কাহিনীও অত্যন্ত উপভোগ্য ভাবে পরিবেশন করেছেন। এতে তাঁর চরিত্রের হীনায়ন ঘটানো হল বলে নাট্যকার স্বয়ং অভিযোগ করেননি, তাঁর কোনো অনুরাগীও আক্ষেপ করেননি। অথচ এই একই ব্যাপার আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি করা হলে বেশ কিছু রবীন্দ্রানুরাগী যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেতকী কুশারীর একটি গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতই অনেকে ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের নামে অলীক কল্পনা প্রকাশ করা গর্হিত কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাশালী হওয়া সত্ত্বেও একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর অনুভূতি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল। এরকম একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ তাঁর সম্বন্ধে একটা নারীর দুর্বলতা ও তার পরম নিবেদনকে উপলব্ধি করবেন এটা যেমন প্রত্যাশিত, একটি নারী এমন একটি যুগোত্তর পুরুষের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভব করবেন এটাও অপ্রত্যাশিত নয়। সুতরাং এ থেকে কোনো গভীর গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। তাকে আমরা অশ্রদ্ধেয়ই বা কেন বলবো এবং এরকম ঘটা অসম্ভবই বা কেন মনে করবো তার কোনো সংগত ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু এই মানসিকতা এখনো এখানে অব্যাহত আছে। যতদিন তা থাকবে ততদিন সঠিক জীবনী রচনার প্রতিবন্ধকতাও থাকবে।

● আত্মজীবনী

আত্মজীবনীকেও জীবনচরিতেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু সাধারণ জীবনী বা Biography-র সঙ্গে আত্মজীবনী বা Auto-biography-র পার্থক্য এই যে, আত্মজীবনীতে স্বয়ং লেখকই নিজের জীবনী রচনা করেন। জীবনচরিত একেবারে সঠিক হতে পারে সেটি আত্মজীবনী হলেই, কারণ লেখকের অজানা তখন আর কিছুই থাকে না। সেইজন্যই ডঃ জনসন মনে করেছিলেন জীবনীগ্রন্থ স্বকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা মনে করি এতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার

পরিমাণই বেশি। কারণ প্রথমত, জীবনী যখন একটি সাহিত্যকর্ম তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। অথচ নিজেকে বস্তুগত ভাবে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার—চরিত্রের সেই সংযম ও উদারতা অনেকের চরিত্রেই দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে আব্রাহাম কলির একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যার বাংলা রূপান্তর এইরকম—

> 'কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকদের কাছে কর্ণপীড়াদায়ক।'

এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা খুবই শক্ত। নিজের প্রশংসা করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুণ্ঠা হয়, কিন্তু সেটা না করলে সত্যরক্ষা করা যায় না। নিজের নিন্দা নিজের কলমে করা খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু নিরপেক্ষ হতে গেলে তাও করতে হবে। অবশ্য এর বিপরীত ঘটনাই ঘটা স্বাভাবিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নিজের প্রশংসার সময় যে-কোনো কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে, সেটা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এবং বিরক্ত হবেন। নিজের যে নিন্দা লোকসমাজে প্রচলিত সে বিষয়ে কথা বলতেও হয়তো তিনি সঙ্কোচ বোধ করবেন। ফলে আত্মজীবনীতে আমরা সঠিক তথ্য পাবো না।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অসুবিধা আরো গভীর। সকলেই নিজের কথা অপরের সামনে তুলে ধরতে পারেন না, সঠিক আত্মজীবনীর নিয়মও জানেন না। তিনি যে আত্মজীবনী লিখবেন তা অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এমন এমন কথা থাকতে পারে যা তাঁর নিজের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হলেও অপরের কাছে তার বিশেষ মূল্য নেই। ফলে তাঁর জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি বা 'dullest details' অন্যের কাছে তুলে ধরা অর্থহীন। কতটুকু লিখবেন এবং কতোটুকু লিখবেন না, কোন্ ঘটনাকে বড় করে তুলবেন, কাকে ছোট, কোন্ ঘটনা পাঠককে কতোটা আনন্দিত করতে পারবে—এসব চিন্তা ভাবনা করেই আত্মজীবনী লেখা উচিত।

তৃতীয়ত, কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী জীবনচরিতের পক্ষে আবশ্যক হতে পারে, আত্মজীবনীর পক্ষে নয়। আত্মজীবনীতে জীবনের কোনও একটা আপাত-ক্ষুদ্র ঘটনা লেখকের কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠতে পারে, বাইরে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখক একেবারেই অনুল্লেখ্য মনে করতে পারেন। পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে—এইধরনের কালানুক্রম-ভঙ্গ প্রায়ই ঘটতে পারে এবং তা ঘটে বলেই আত্মজীবনী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি আত্মজীবনী। এর লেখক এই কথাটাই বলে নেবার চেষ্টা করেছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"

ইংরেজি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আত্মজীবনীর মধ্যে নাম করা যায় St. Augustine-এর Confessions, Rousseau-র Confissions, Gibbon-র Autobiography, Davies-এর Autobiography of a Super-Tramp, M.K. Gandhi-র My Experiments with Truth, Nirode C. Chaudhuri-র Autobiography of an Unknown Indian প্রভৃতি।

বাংলায় বেশ কিছু ভাল আত্মচরিত বা আত্মজীবনী আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ছাড়াও 'আত্মপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' প্রভৃতি।

● একটি আত্মজীবনীর পরিচয়

সজনীকান্ত দাস রচিত 'আত্মস্মৃতি' আসলে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য আত্মজীবনী। একদিকে এর বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক-কলহের আলোড়ক ঘটনার পরিচয়; অন্যদিকে সরস ও সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি গল্পের মতোই পড়ে ফেলা যায়। প্রথম প্রকাশের সময় এটি তিনটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে অবশ্য এক অখণ্ড সংস্করণও পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে ছিল 'ঊনবিংশ তরঙ্গ' অর্থাৎ ১৯টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডেও তাই, তৃতীয় খণ্ডে ছিল 'একাদশ তরঙ্গ'।

নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন প্রথম তরঙ্গে। ঠিক বংশ পরিচয় নয়, নিজের জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। বর্ধমানের মানুষ, মালদহে ও বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, রাজনীতিতে দীক্ষা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএসসি পড়তে এলেন এবং 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর পড়াশুনার পাট একেবারে চুকে গেল—এই দিয়ে প্রথম তরঙ্গ শেষ হয়েছে, তার মধ্যে সুধারাণীর সঙ্গে বিবাহও অবশ্য যুক্ত আছে। এরপর একাদশ তরঙ্গ পর্যন্ত সজনীকান্ত নিজের জীবনেরই বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই কীভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের গ্রন্থ পাঠ করতে শিখলেন, গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন সেসব, ছোটবেলাতেই রাজনীতির রাহুগ্রাসে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, সাহিত্য সাধনা ছিল জীবনের ব্রত, বিজ্ঞান সাধনা ছিল মর্মের ব্রত। ভালো ছাত্র ছিলেন, দু-নৌকায় পা দিয়ে অনেকদিন চলেছেন, শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হল বিজ্ঞান সাধনা। শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধনা—এখানে-ওখানে প্রুফ দেখা, ছেলে পড়ানো ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মেসে থাকা, পড়াশুনা না চালানোর অপরাধে বাড়ির অর্থসাহায্য বন্ধ। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রখর, ফলে উপার্জনক্ষেত্রে দুর্গতি বেড়েই চলেছিল। একটা উদাহরণ দিই। শাঁসালো একটি টিউশনি ছিল, ছাত্রের বাবা কর্কশ কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ম্যাস্টার, ছেলে কেমন পড়ছে? পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার এইধারা বচন, কিন্তু আমার চট্ করিয়া রাগ হইয়া গেল। তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না।'

লেখক জীবনের সূচনা বেশ দীর্ঘায়িত ভঙ্গিতে লিখেছেন দ্বাদশ তরঙ্গে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এসেছেন দেশে, বার করেছেন 'শনিবারের চিঠি'। সম্পাদক যোগানন্দ দাসের পেছন পেছন ঘুরেও লাভ হয়নি, লাভ হল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। শান্তাদেবীর সম্পাদনায় 'প্রবাসী'তে দেওয়া হল কবিতা, শনিবারের চিঠিতেও তাই। মনোনীত, কিন্তু ছাপা হয় না। এদিকে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে চাকরি হয়ে গেল। মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আলাপ

হয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামকেও দেখেছেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্ররচনার প্রুফ দেখে আশ্রয় পেলেন। প্রথম মুদ্রিত হল কবিতা শনিবারের চিঠিতে, 'আবাহন'—

'ওরে ভাই গাজি রে,
কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।'

এর পরেই শারদীয় সংখ্যায় 'কামস্কাটকীয় ছন্দ'। পরিচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু বিখ্যাত হলেন নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে এবং তা যে সজনীকান্তের, তা জানতে না পেরে নজরুল-মোহিতলালের ধুন্দুমার মসীযুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে থাকল। এই মসীযুদ্ধের প্রধান ইন্ধন ছিল বেনামে লেখা সজীনকান্তের—

"আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই। ...
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরুসাহারার আঁধি।"

'শনিবারের চিঠি' অবলম্বন করে কতরকম কাণ্ডকারখানা যে সজনীকান্ত করেছেন তার শেষ নেই। উদাহরণ হিসেবে Applied Literature Society-র কথা বলা যায়। এর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এই ভাবে:

আর ভাবনা নাই

কবিতার ঝরণা আপনার দ্বারে প্রবহমান। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সম্বর্ধনা, বিদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের গভীর ভাবযুক্ত কবিতা আপনার জন্য সকল সময় ফরমাসমাফিক তৈয়ার থাকিবে। দক্ষিণার হার—বিদায় ও সম্বর্ধনা কবিতা ১০, বিবাহ কবিতা ৮, শ্রাদ্ধাদি কবিতা ৪, অন্যান্য উৎসব ও পর্বাদি বিষয়ক গাথা ৫। প্রত্যেক কবিতার স্বত্বক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং হার স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণের জন্য নাটাধ্যক্ষকে পত্র লিখুন। অর্ধমূল্য অগ্রিম দেয়।

ফলিত সাহিত্য কার্যালয়
১০৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

পাতায় পাতায় সরস ও সব্যঙ্গ উক্তি, অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা, সজনীকান্ত তাঁদের বিরোধিতা করে, পরে অনুতপ্ত হয়েছেন এমন অনেক ঘটনার সঞ্চয়ে, এই আত্মজীবনী এক সাহিত্যিক মূল্য লাভ করেছে। ভাষা এত স্বাদু এবং আকর্ষণীয় যে এটি যে জীবনীগ্রন্থ সে কথা আমাদের মনে থাকে না। লেখক নিজের জীবন ও 'সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ' ঘটনাবলীকে তুল্যমূল্য করে, পরিবেশণ করতে পেরেছেন বলেই গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয়।

গ. দিনপঞ্জী বা ডায়ারি

দিনপঞ্জী বা ডায়ারি বলতে বোঝায় একটি দিন কীভাবে অতিবাহিত হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিখ্যাত মানুষদের, তিনি যে ক্ষেত্রের লোকই হোক না কেন, দিনপঞ্জী রাখা দরকার আগাম সাক্ষাৎকার বা করণীয় বিষয় তাতে লিখে রাখবার জন্য। সাধারণ মানুষও দিনপঞ্জী লিখতে পারেন, কেউ কেউ লিখেও থাকেন, কারণ অন্য কেউ হয়তো তাতে উৎসাহ বোধ করবেন না কিন্তু তিনি নিজে সেটা উপভোগ করতে পারবেন যদি তা বেশ অনেক দিন পরে পড়েন।

দিনপঞ্জী রচনা একটি ভালো অভ্যাস, কারণ এর দ্বারা আরো দুটি উপকার হতে পারে। প্রথমত, লেখালেখির কোনো প্রবণতা থাকলেও মানুষ স্বাভাবিক সঙ্কোচবশত হয়তো তা লিখে উঠতে পারেন না—ডায়ারি লেখা অভ্যাস করলে, যেহেতু অন্য কেউ তা দেখবেন না, অসঙ্কোচে লিখতে শুরু করেন এবং দিনের পর দিন অভ্যাস করে মানুষ তাঁর লেখার সঙ্কোচ কাটাতে পারেন, লিখতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে অনেক রকমের আবেগ থাকে, মানুষ সারাদিনে এমন অনেক কাজ করে ফেলেন, বস্তুত যা তিনি করতে চাননি। মানুষ নিজের মনের সেই সব অবরুদ্ধ আবেগ এবং মনের এই অস্বস্তির কথা ডায়ারিতে লিখে ফেলতে পারেন। তাতে তিনি মানসিকভাবে অনেকটা ভারমুক্ত হন, শান্তি পান।

সাধারণ মানুষের ডায়ারি তাঁর নিজের কাছেই মূল্যবান, তাঁর নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবও তাতে উৎসাহিত বোধ করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক যখন দিনপঞ্জী রচনা করেন তখন তা সাহিত্যের আস্বাদই নিয়ে আসতে পারে। বিখ্যাত মানুষের ডায়ারি কখনও কখনও প্রকাশিত হয় এবং তা আমাদের আনন্দ দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ রকম একটি ডায়ারি প্রকাশিত হয়েছে 'স্মৃতির রেখা' নাম দিয়ে। এ থেকে আমরা লেখকের অন্তরঙ্গ জীবনের অনেক কথা জানতে পারি, আগামী দিনে যে ধরনের সাহিত্য রচনা করবেন তার পূর্বাভাস পেতে পারি, অনেক কল্পিত চরিত্রের উৎসের কথাও জানতে পারি। সেদিক থেকে এই রকম ডায়ারি খুব মূল্যবান। কথিত আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর ডায়ারি পরবর্তীকালে একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের উৎস ছিল।

প্রসঙ্গত একটি ডায়ারির উল্লেখ করতে হবে যেটি মোটেই কোনো বিখ্যাত মানুষের নয়, অথচ একটি ডায়ারিই তাকে বিখ্যাত করেছে। জার্মানীর এই বাচ্চা মেয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্ক হিটলারের নাজি বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল মাত্র পনেরো বছর বয়সে। নেদারল্যান্ডে আবর্জনার স্তূপে ভর্তি একটা ঘরে অ্যানারা আত্মগোপন করে ছিল পুরো দুটি বছর। তারপর ধরা পড়া এবং মৃত্যু। এই দু-বছরে অ্যানা যে ডায়ারি লিখেছিল তা পরে আবিষ্কার করা হয় এবং তা ছাপা হয় 'অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়ারি' নাম দিয়ে। এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় এই বই অনূদিত হয়েছে উনিশটি ভাষায়, বিক্রি হয়েছে কুড়ি লক্ষেরও বেশি বই। এই দিনপঞ্জী অবলম্বন করে ফ্রান্সেস গুডরিখ এবং অ্যালবার্ট হ্যাকেট যে নাটক লিখেছেন তা নাট্যসাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে। নাটকটিও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের কাছে অভিনীত হয়েছে। শুধু লন্ডন শহরের ফোনিক্স থিয়েটারেই সেটি অভিনীত হয়েছে একাদিক্রমে ছ মাস। বিখ্যাত চিত্রনির্মাণ-সংস্থা 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স' অ্যানার জীবন নিয়ে ছবি তৈরি করেছেন।

দিনপঞ্জী থেকে আত্মজীবনী রচনার বা দিনপঞ্জীর আকারেই আত্মজীবনী রচনার একটা প্রচলিত রীতি আছে। কারণ দিনপঞ্জীতে জীবনের বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ থাকে, তাকে একটু সাজিয়ে নিলেই আত্মজীবনীতে পরিণত করা যায়। সাজাবার প্রশ্ন ওঠে এই কারণে যে, ডায়ারি মানুষ লেখেন নিজের আনন্দের জন্যই; তা প্রকাশিত হতে পারে, এ কথা ভেবে কেউ ডায়ারি লেখেন না। এই ভাবে ডায়ারির আকারে লেখা আত্মজীবনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি সাহিত্যে Samuel Pepy এবং John Evelyn-এর লেখা Diaries বা James Boswell-এর লেখা Journals। বাংলায় এই ধরনের আত্মজীবনী খুব বেশি নেই, যা আছে তার মধ্যে নাম করা যায় চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা', চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা' প্রভৃতির। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতও খানিকটা এই ভাবেই লেখা বলা যেতে পারে। আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে কথা বলতে পারতেন না, তখন ডায়ারিতে তিনি তাঁর মনের কথা জানাতেন, দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীও লিখতেন। মৃত্যুর পর সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত রসিকতা করার মতো যে মনের জোর তাঁর ছিল, তা আমাদের বিস্মিত করে।

দিনপঞ্জী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। সাহিত্যসৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ কেউ সচেতন ভাবে দিনপঞ্জীর আকার গ্রহণ করেছেন। দিনপঞ্জীর বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু বর্ণিত হয় না, একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কোনো যোগ থাকে না, একটি চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষ তার সম্বন্ধে ডায়ারিতে লিখতে পারেন—ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানোর কোনো দায় ডায়ারি লেখকের থাকে না, তিনি যা দেখবেন এবং যা ভাববেন তাই সেখানে লিখে যেতে পারেন।

এই ভঙ্গিটিকে সাহিত্যের আঙ্গিকে পরিণত করে কিছু প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' হিসাবে, কারণ পাঁচটি চরিত্র সেখানে ছিল—ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম এবং ছিলেন সভার অধিপতি ভূতনাথ বাবু, তাঁরা ডায়েরির আকারে নিজেদের কথা লিখবেন, এ রকমই পরিকল্পনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিরও নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'শ্রীবিলাসের ডায়েরি'। বস্তুত এটি শ্রীবিলাসের আত্মকথনেই রচিত, যদিও দিনপঞ্জীর সঠিক আকার একে দেওয়া হয়নি।

ছোটগল্প ও উপন্যাসে এই আকারটি কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং সঙ্কর্ষণ রায় এই ভঙ্গিতে গল্প লিখেছেন। সত্যজিৎ রায় প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে যতো বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন তার প্রত্যেকটির আঙ্গিক একেবারে বিশুদ্ধ দিনপঞ্জীর মতো—প্রত্যেকটি দিনের বিবরণ শুরু করার আগে ওপরে বার ও তারিখ উল্লেখ করেছেন এবং তার পরে দিয়েছেন ঘটনার বিবরণ। অবশ্য আঙ্গিকের অনুকরণই সত্যজিৎ রায় করছেন, প্রকৃত ডায়ারির মতো কাহিনীগুলিকে তিনি অর্ধপথে সমাপ্ত করেন নি, খাপছাড়াও করে দেননি—প্রত্যেকটি গল্পে চূড়ান্ত কৌতূহল বজায় রেখেছেন। ডায়ারির আঙ্গিক সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও যে সার্থক গল্প রচনা করা যায়, প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

● একটি সাহিত্যিক দিনপঞ্জী

অবশ্যই করুণ এবং মর্মস্পর্শী, তা সত্ত্বেও সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ দিনগুলির অনুভূতি নিয়ে যে দিনপঞ্জী 'সন্তোষকুমার ঘোষের ডায়েরি' নামে প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সন্তোষকুমারের মতো উঁচুমানের সাহিত্যিক জীবনে মৃত্যুর অনিবার্য ও দ্রুত পদসঞ্চার অনুভব করেও, ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধির তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও চিঠিতে, ডায়েরিতে তাঁর বিদায়কালীন যে অনুভূতি সাজিয়ে দিয়েছেন তা থেকে মানুষটিকেও যেমন আমরা চিনে নিতে পারি, তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর যে বিশেষ উপলব্ধিতে উপনীত হন সেটাও বুঝতে পারি।

থ্রোট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। কলকাতার চিকিৎসার পালা সেরে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে। বাঁচার তো কোনো প্রশ্ন নেই, মৃত্যুর প্রহর গোনা শুধু। সেই সময়ে যত দিনলিপি ও চিঠি তিনি লিখেছেন, সব প্রকাশিত হত 'দেশ' পত্রিকায়। পরে এই গ্রন্থে তা সংরক্ষিত হয়েছে। হসপিটাল ছিল সমুদ্রের ধারে। সেই অসীম সমুদ্র ও মানুষের সীমিত জীবনের দ্বৈতলীলা শিয়রে অপেক্ষমাণ মৃত্যুর অনিবার্য উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে প্রতিভাত হয়, সেটাই দেখবার।

রচনাকাল খুবই সংক্ষিপ্ত অবশ্য। চুরাশি সালের তিরিশে অক্টোবর আরম্ভ হয়েছে, শেষ হয়েছে এগারো নভেম্বর। এখানে চিঠি এবং দিনলিপি দুটিই আছে বটে, বস্তুত সেই দুটি জিনিসই এক—নিজেকে উন্মোচিত করা, প্রকাশ করা, সময় উপলব্ধি ব্যক্ত করা। নইলে চিঠিতে দরকারি কথা জানাবার তো কিছু ছিল না—তাঁর দরকারটাই তো হারিয়ে গেছে। কতকগুলো শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে অসাধারণ খেলা করেছেন। বলেছেন একদিন প্রচুর কথা বলেছেন তো, তাই আজ মুখে তাঁর আর কোনো কথা নেই—"এতদিন 'বাক্যালংকার' ছিলুম, আজ আমার 'নির্বাচন'।" প্রায় একই কথা 'স্বরলিপি' সম্বন্ধে, বলেছেন—"কণ্ঠস্বর হারিয়েছি। এখন 'স্বর' নেই। শুধু 'লিপি'। স্বরলিপি তো সমাসবদ্ধ হয়ে। তবে তো সঙ্গীত।" সুকুমার সেনকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, নিজের পরিচয়ে লিখেছিলেন 'অধমর্ণ, সন্তোষকুমার ঘোষ।'

সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তোষকুমারকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে অবিরত, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে তার তুলনাও এসে গিয়েছিল অনিবার্য ভাবেই এবং দুয়ে মিলে অপূর্ব এক সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। সমুদ্রও মৌন, তিনিও মৌন, এই কথাটা এসেছে ৪.১১ তারিখের দিনলিপিতে—'অবুঝ সমুদ্রটাকে আছড়াতে দেখছি। হঠাৎ টের পাই, আমাদের স্বভাব এক। ভিতরে কত কথা, তোলপাড়, মুখে শুধু বোকা বোকা দাঁত-কপাটি ফেনা, শব্দ নেই। আমি আর এই ঢেউ, দুই-ই বোবা।'

এই তোলপাড়ের মধ্যে কি মন আছে? সন্তোষকুমারের মনে পড়েছে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত বাক্যটি—'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?' তাই তিনি লিখেছেন সমুদ্র সম্বন্ধে—'বম্বের সাগরকে যদি কুসুম ভাবি, তবে, থৈ থৈ শরীর যে আছে, নিশ্চিত। কিন্তু মন? বোধহয় নেই। থাকলে তার একটু উথলে-ওঠা কি দেখা যেত না?' তিনিও একা, সমুদ্রও একা। তিনিও একাকিত্ব চান না, সমুদ্রও তো চায় না, একথা মনে হবার

পর লিখেছেন—'সমুদ্দুর, টইটম্বুর হয়ে আছে। তবু কি এক ফুসলানিতে অজানা পাড়ে আছড়ে পড়ছে, আঁচড়ে নখে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে বেলাভূমি। টেনে নিচ্ছে নদী-দের বুকের ভিতরে। অতএব একা নয়, তারও সঙ্গী চাই।'

মৃত্যুচিন্তা এই সময়ে আচ্ছন্ন করেছিল সন্তোষকুমারকে—করবেই, জানা কথা, কিন্তু বিপর্যস্ত করেনি, হতাশ্বাস করেনি। তাঁর দিনলিপির প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে এবং পত্রাদিতে তার প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব গুহকে লেখা একটি চিঠিতে—এই গ্রন্থের অংশ পাই, "দুরন্ত বেঁচেছি। আর এখন? 'সবল আলাপ গেলে থেমে/শান্ত বীণায় আসে নেমে/সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে বাজে গভীর স্বনে'।"

আর-একটি জায়গায় লিখেছেন: 'থাকবার মধ্যে খালি আছে নিদ্রা। ... এখনও আসছে। কবে ইস্তফা দেবে, কে জানে! দিন তো বয়ে গেল। ওতো খুচরো নিদ্রা। বড়ো ঘুমটা তো পড়েই আছে। তাকে ঠেকায় কে? সিস্টার বলেছে, ইওর হার্ট-বিট্স্ আর নর্ম্যাল টুডে। নরম্যাল তো নরম্যাল আমার বয়ে গেল। থামলে বাঁচি। সেই প্রবাদপ্রসিদ্ধ ওস্তাদি গানের মতো।'

'জীবনের উপভোগের কোটা শেষ। এবার ভোগের পালা, বা দুঃসহ দুর্ভোগের।' কিম্বা 'বাঁচাটার সঙ্গে ঘর করা বড্ড বেশি আর বাসি হয়ে গেল, পরে দেখাই যাক না বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার ব্যবহার কেমন।' অথবা 'বাঁচা নামে ব্যাপারটাকে এত চুটিয়ে উশুল করেছি যে, এখন কর্জ করা সময়েই টিকে থাকতে হচ্ছে'—এরকম বহু মন্তব্য এই গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নিষ্ঠ ছিলেন, পড়েছেন বিস্তর, ব্যাখ্যাও করেছেন অনেক—তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুষঙ্গ এসে পড়েছে বারবার। মোট কথা সমগ্র গ্রন্থটিই অনুভূতির আন্তরিকতায় ও ভাষাসৈনিকের ঐশ্বর্যে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক প্রসঙ্গে কথা আছে। সেই রকম একটি প্রসঙ্গ দিয়েই গ্রন্থের পরিচয় শেষ করি:

> 'নগ্নতারও একটা তীব্র মৌন আদিম চুম্বন আছে নিশ্চয়। নিষ্প্রভ, নিষ্প্রলেপ, নিরংলকার। তারাও ছড়ানো সর্বত্র—পর্বতের নিবিড় তুষারে, বৈরাগীর উদার প্রান্তরে। শিল্পীর মগ্ন দৃষ্টিতে, সটান তুলিকায়। এবং রসিকজনের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।'

ঘ. পত্র বা লিপিসাহিত্য

পত্র এবং পত্রসাহিত্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পত্র একেবারেই বৈষয়িক এবং প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পত্রের প্রাপকও একজন এবং পাঠকও একজন। বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত করাই বৈষয়িক পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু পত্র যেখানে সাহিত্য হয়ে ওঠে সেখানে প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে যায়—মনের অত্যন্ত কাছাকাছি যে আছে তার কাছে এখানে লেখক তাঁর হৃদয় উন্মোচন করেন। ব্যক্তিগত তা এখনও থাকে, তবে প্রয়োজনভিত্তিক থাকে না—হয় লঘু আলাপচারিতা, অথবা গভীর অনুভূতির প্রকাশে তা সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সেক্ষেত্রে পত্রটি যার কাছে প্রেরিত হয়েছে শুধু তার কাছেই নয়, সাহিত্যমনস্ক অন্য যে কোনো মানুষের কাছেই পত্রটি উপভোগ্য। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভাব নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ভাবহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।'

একজন প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক পত্রের গৌরব আরো বৃদ্ধি করতে চেয়ে বলেছেন— 'Great letter-writers are suppressed novelist, frustrated essayists born before their time.'

এই ধরনের সার্থক পত্রসাহিত্যের আলোচনা করবার আগে এ বিষয়ে আরো দুটি প্রসঙ্গ আমাদের উল্লেখ করতে হবে। প্রথমত, কালের বিচারে যেদিন থেকে লিপির আবির্ভাব সেদিন থেকে পত্রেরও উদ্ভাবন। একদিকে গ্রীকপুরাণে আমরা যেমন পাই পত্রের ব্যবহারের কথা, অন্যদিকে রামায়ণ-মহাভারতেও পত্র রচনার কথা আছে। মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে দময়ন্তী হংসের পায়ে বেঁধে পত্র প্রেরণ করেছিল রাজা নলকে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের গদ্য সাহিত্যের উৎসেও আছে এই পত্র। রাজা ও ভূস্বামীরা যেসব পত্র লিখতেন সেইসব পত্রেই গদ্য প্রথম ব্যবহৃত হয়। গবেষকগণ বিস্তৃত পরীক্ষার পর মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লিখিত পত্রই আমাদের প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা দেয়। পত্রটি সম্ভাষণের পর এইভাবে শুরু হয়েছে—

'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বৰ্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।'

দ্বিতীয়ত, পত্রের আকারটি কাজে লাগিয়ে এই ছকে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে— ইংরেজি সাহিত্যেও হয়েছে, বাংলা সাহিত্যেও হয়েছে। বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসই পত্রের আঙ্গিকে রচিত। এই উপন্যাসের নাম 'পামেলা', লেখক স্যামুয়েল রিচার্ডসন। তাঁর উপন্যাসের এই ভঙ্গি খুব আকস্মিক ভাবেও কল্পিত হয়নি। পাড়ার অশিক্ষিত চাকরাণীর দল তাঁর কাছে আসতো বিভিন্ন রকমের চিঠি লিখিয়ে নিতে। এইসব প্রেমপত্র লিখতে লিখতেই এই আঙ্গিকে একটি উপন্যাস লেখার সাধ তাঁর জাগে।

বাংলা সাহিত্যে এই আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস এমন কি কাব্যও আছে। মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন যা মূলত কয়েকটি কল্পিত পত্রের সমষ্টি। ভারতীয় পুরাণের কিছু নারী তাঁদের প্রেমিকের বা স্বামীর উদ্দেশে কল্পিত পত্ররচনা করছেন, এই ছিল কাব্যের বিষয়বস্তু।

বাংলা উপন্যাসে এই আঙ্গিক প্রথম ব্যবহার করেন সম্ভবত নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্তকুমারের পত্র' উপন্যাসে। কাজী নজরুল ইসলামও এইসময় পত্র-উপন্যাস রচনা করেছেন, নাম 'বাঁধনহারা'। এই ধরনের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', বনফুলের 'কষ্টিপাথর', সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার/ শ্রীচরণেষু মা-কে', অথবা বুদ্ধদেব গুহর 'মহুয়ার চিঠি' প্রভৃতি।

সাহিত্যরচনা নয় বা সাহিত্যরচনার আঙ্গিকমাত্র নয়, বিশুদ্ধ পত্র হিসাবে রচিত—এরকম পত্রও প্রকৃত সাহিত্যিকের হাতে পত্রসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত তা হয়েছে। প্রকৃত সাহিত্যিক বা কবি তাঁর হিসাবের খাতাতেও প্রতিভার কিছু স্পর্শ রেখে যান। সুতরাং চিঠিপত্রে তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতি, রুচিবোধ এবং মানসিকতার কিছু স্পর্শ পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

সেই কারণেই পাশ্চাত্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ওয়ালপোল, লর্ড টেনিসন, কুপার, লুকাস, রবার্ট লিন্ড প্রভৃতি ব্যক্তির পত্র আমাদের কাছে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সাহিত্যিকের পত্রের আস্বাদও ভিন্নতর। যেমন বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এলেন টেরির কাছে যে পত্রগুলি লিখেছেন তা লঘু আলাপের জন্য লেখা বলে তাঁর মনের পরিহাস-তরল মনের পরিচয়ই বহন করে সেগুলি। আবার কবি কীটস তাঁর প্রিয়তমাকে যে পত্রগুলি লেখেন সেখানে তাঁর বিষণ্ণতা এবং মনের গভীর চিন্তাই ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যেও এইরকম বেশ কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাতের পত্র', স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু পত্র উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষদের প্রেমপত্রের সংকলন 'প্রিয়তমাসু'-র উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে।

তবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি। তিনি সারাজীবন বিভিন্ন ব্যাপারে অসংখ্য পত্র রচনা করেছেন। তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যাই অনেক, যথা—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ছিন্নপত্র', 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথে' ও 'পথের প্রান্তে'।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে সব রকম আস্বাদই আমরা পাই, কখনো তা লঘু ভাষায় মনের হালকা চিন্তার প্রকাশ। এর মধ্যে উচ্চস্তরের পরিহাস রসিকতাও আমরা পাই। কখনো কোনো পত্রে তিনি দার্শনিক চিন্তা বা কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর চিঠিপত্রের স্পষ্টই দুটি বিভাগ আছে—এক ধরনের চিঠি তিনি কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, যেমন 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্ন পত্রাবলী'। অন্য ধরনের চিঠি প্রকাশের জন্যই কিছু অনির্দেশ্য পাঠকের জন্য লেখা। এগুলিতে হয়তো প্রকাশের কথা চিন্তা করেই লিখেছেন, যেমন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বা 'জাপান যাত্রী'। তাঁর সব রকমের পত্রেই যথেষ্ট সাহিত্যগুণ দেখা যায়।

● একটি পত্রসাহিত্য: ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। চিঠিগুলি প্রায় সবই লেখা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে, ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে। শুধু এর প্রথম আটখানি চিঠি লেখা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। চিঠিগুলি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী স্বহস্তে নকল করে না দিলে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভভ হত না। সুতরাং বোঝা যায় গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশে চিঠিগুলি লেখা হয় নি। অর্থাৎ এগুলি বিশুদ্ধ পত্র, এবং আমাদের মতে সাহিত্য, তাই এগুলিকে নিঃসংশয়ে বলা চলে পত্রসাহিত্য।

পত্র কেমন করে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় সে বিষয় খুব সাধারণ সিদ্ধান্ত তো নিশ্চয়ই এই যে, লেখকের দক্ষতা এবং অনুভবের গভীরতাই তার প্রধান কারণ, কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'-র একটি চিঠিতেই আরো একটা কারণ পাওয়া যায়। 'গানভঙ্গ' কবিতায় যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'একাকী গায়কের নহে তো গান', এখানেও ইন্দিরাকে বলেছেন—'আমি তো

আরো অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।' অর্থাৎ পত্র যার কাছে লেখা হচ্ছে, তারও একটা ভূমিকা এখানে আছে। এটা সাহিত্য হয়ে উঠেছে, সে স্বীকৃতিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তিনি ইন্দিরা দেবীকে অনুরোধ করেছিলেন চিঠিগুলি একবার দিতে, তিনি টুকে নেবেন, কারণ—'এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত-জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা ভাবে ফিরে পাব—আমার, গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।'

প্রথম জমিদারির দায়িত্ব দিয়ে শিলাইদহে পাঠানো হয় যখন রবীন্দ্রনাথকে, দিনরাতের বেশির ভাগ সময় কেটে যেত বোটে তখনকার অভিজ্ঞতা-প্রকাশক চিঠিগুলির সংকলনই 'ছিন্নপত্র'। ভৃত্যরাজতন্ত্রে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাইরে এলেন এবং মুক্তবিশ্বের স্বাদ পেলেন, এজন্য তো বটেই, জীবনকে প্রথম ভালো ভাবে উপভোগের সুযোগ পেলেন, সেই জন্যও সম্ভবত এই উপলব্ধিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

লেখার ভাষা এবং অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতায় প্রত্যেকটি চিঠিই আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। চিঠিগুলি পড়েই বোঝা যায়, ব্যক্তিগত সূত্র এবং উপলক্ষ হলেও কবির অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বেরিয়ে আসছে এবং ব্যক্তিগত মানুষই যে তা উপভোগ করতে পারবেন এমন নয়, সমস্ত সাহিত্যসাধক মানুষের কাছেই তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। নতুন পরিচয়ের মধ্যে আছে পল্লিপ্রকৃতি, নদী, ঝড়জল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী ও বালুচর, পল্লির সহজ-সরল মানুষ—অনেক কিছু। ৯৮ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছেন, 'পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব এবং আপন মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বাগত সংগীতস্বর।'

নদী সম্বন্ধে মুগ্ধতা কবির অনেক পত্রেই আছে। ১৯-সংখ্যক পত্রে দেখি—'খুব' উঁচু পাড়ে—বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময় এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে সেই সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই।'

নদীর চরের বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র বর্ণনা বেশ কয়েকটি পত্রেই আছে। একটির উল্লেখ করি। ১০-সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়—গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই'—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি।'

নদীর ওপর থাকলে ঝড়জলের অভিজ্ঞতা হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। শিলাইদহে থেকে লেখা ৮৭-সংখ্যক চিঠির ছোট্ট একটি অংশ উদ্ধার করি: 'কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হু-হু করে কেঁদেছিল—আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়েছে।'

প্রকৃতির রূপের যে ছবি ছিন্নপত্রে আছে, পল্লিগ্রামের মানুষের যে নিবিড় পরিচয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন, তাও প্রায় প্রতি পত্রেই ফুটে উঠেছে—উদাহরণ দিয়ে তা শেষ করা যাবে না। কিন্তু এছাড়াও কবির মানসচেতনায় যে ছবি এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তাতে এর সাহিত্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবল ভাবে। শুধু প্রকৃতিকে কবি দেখেন নি, এই প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে বহুযুগের সম্পর্ক আছে, প্রকৃতির সৃজন মুহূর্ত থেকে তিনি যে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন—এ কথা তিনি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় বলেছেন, এখানেও প্রায় সেরকমই আছে। 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে কথা বলেছেন ঠিক সেই কথা পাই ৬৪-সংখ্যক পত্রে—'এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত।'

আসলে পত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। এই সব পত্রে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে কবিতার খসড়া আছে, গল্পের স্কেচ আছে, এমনকী নাটকের পরিকল্পনাও রয়েছে। কাজেই বিস্তৃত আলোচনা না করেও বলা যায়, 'ছিন্নপত্র' পত্র হয়েও অবশ্যই উন্নীত হতে পেরেছে পত্রসাহিত্যে।

ঙ. ভ্রমণ সাহিত্য

অচেনাকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের। নিজে যেটুকু অঞ্চলকে প্রয়োজনের তাগিদে চিনি, তার বাইরে জনপদগুলির চেহারা কেমন, সেখানকার মানুষের জীবন-যাত্রা কীরকম, সেই দেশগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছু আছে কিনা—এসব মানুষ দীর্ঘকাল থেকে জানতে চেয়েছে এবং আজও চায়। এই কারণেই মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েনের মতো পরিব্রাজক পুরাকালে ভ্রমণের নেশায় পৃথিবী-পরিভ্রমণ করেছিলেন, এ যুগের রামনাথ বিশ্বাসের মতো মানুষও বিশ্বপর্যটনে বার হয়েছিলেন। মানুষের মনে এই নেশা আছে বলেই আজো স্বল্প বা দীর্ঘ ছুটিতে মানুষ বেরিয়ে পড়ে অচেনা অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জায়গায় বেড়াবার জন্য। মানুষের মনের এই চিরন্তন পিপাসাই ব্যক্ত হয়েছে কবিগুরুর কণ্ঠে—

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কতনা অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

ভ্রমণের নেশা মানুষের আছে বলেই অজানার সঙ্গে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখবার প্রচেষ্টাও মানুষ অনেক দিন থেকেই করে আসছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রার তথ্যসমৃদ্ধ পরিচিতিই যদি এইসব রচনার একমাত্র উপকরণ হতো তাহলে ভূগোল এবং সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থের মতোই তাদের আকর্ষণ হতো কেবল তথ্যের

কারণেই। কিন্তু এইসব ভ্রমণ-কাহিনী যে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ সেখানে কেবল অজানা তথ্যই নেই, আছে মানুষের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অনুভূতি। সেই কারণেই বস্তুগত বিবরণকে অতিক্রম করে মানুষের অনুভূতির রঞ্জক তাদের বিচিত্রভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্ত কেমন করে সাহিত্য হয়ে ওঠে, শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই যে হয় না, এ বিষয়ে দু-একজন সাহিত্যিকের অভিমত স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ঘটনার নামই অভিজ্ঞতা নয়, ঘটনা হচ্ছে কাঁচা মাল যা থেকে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। এবং সেই সৃষ্টি মনের বিশেষ এক রকম রসায়ন-ক্রিয়া—বিশেষ একটি ক্ষমতাসাপেক্ষ।' অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'বেরোবার আগে আমি বিস্তর পড়াশোনা করি, ফিরে আসার পরেও আরো পড়ি। তারপর লিখতে বসি ভ্রমণকাহিনী।'

অবশ্য এইসঙ্গে যদি ভাষার ঐশ্বর্য যুক্ত হয় তবে ভ্রমণকাহিনী আরো আস্বাদ্য এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। সেইজন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের হাতে ভ্রমণকাহিনী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হয়। যেমন এ কালের বিশিষ্ট ভ্রমণসাহিত্য রচয়িতা যাযাবর যে দুটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলেন—'দৃষ্টিপাত' এবং 'ঝিলম নদীর তীরে', কেবল অনবদ্য ভাষার কারণেই সেগুলি বার বার পড়া যায়। এর একটু উদাহরণ—'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ ; তাতে আছে গতির আবেশ, নেই যতির আয়েস।'

ভ্রমণকাহিনীর সূত্রপাত কবে থেকে, বলা খুবই শক্ত, তবে স্থানের বর্ণনা বা যাত্রাপথের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতমূলক কাব্যে গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় লেখা হয়েছে—

'তারপরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্মবীর॥
পার হৈয়া প্রভু চলে কণ্টক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে॥'

পদাবলীর বিখ্যাত কবি নরহরি চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' ও 'ব্রজ পরিক্রমা'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় অংশের বর্ণনীয় বিষয় ছিল প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য মানসিংহের যশোহর আগমন ও বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করে ভবানন্দসহ দিল্লীযাত্রা। এখানেও ভ্রমণ পথের কিছু বর্ণনা আমরা পাই।

তবে এগুলিকে আমরা ভ্রমণকাহিনীর পূর্বাভাসই বলবো ভ্রমণকাহিনী নয়। কারণ ভৌগোলিক জ্ঞান যে মধ্যযুগীয় কবিদের খুব ভালো ছিল না, থাকাটা প্রত্যাশিত নয়, তার প্রমাণ কবি মুকুন্দর 'গুজরাট নগরপত্তন'। এই গুজরাট নগরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে কেউ যদি ভৌগোলিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন, তিনি যে কিছুটা আশাহত হবেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভ্রমণকাহিনীর সূচনা আমরা ধরতে পারি জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী-পরিক্রমা' গ্রন্থটিকে। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে রচিত। কাশীর মন্দির, তৎকালীন জীবনযাত্রা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়ে জয়নারায়ণ ঘোষাল লক্ষ করেছিলেন এবং গ্রন্থে তার নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এরকম : 'তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের কক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।'

একেবারে প্রথমদিকে রচিত তিনটি ভ্রমণকাহিনীর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। এগুলি হল যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থ-ভ্রমণ', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিক স্পর্শযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ইওরোপ ভ্রমণসংক্রান্ত ডায়েরির অনুবাদ। যদুনাথ সর্বাধিকারীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে, কিন্তু এটি রচিত আরো প্রায় চল্লিশ বছর আগে। মাত্র চল্লিশ টাকা সম্বল করে কীভাবে তিনি তীর্থযাত্রা করেছিলেন চার বছর ধরে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর রোজনামচায়। গ্রন্থটিতে শুধু যে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা আছে তাই নয়, সেখানকার মানুষ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্তিরও পরিচয় আছে। যেমন গয়ার ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'ভিক্ষুক সকলেই। যাহার দশ হাজার টাকার অঙ্গভূষণ আছে, এক কড়া কড়ির জন্য সেও লালায়িত। তাহাদিগকে যদি কেহ ক'হে, তোমরা এমত ভিক্ষা জন্য কি জন্য ক্লেশ কর। তাহারা উত্তর করে যে, আমাদের যাহা ধনসম্পত্তি, এই মত ভিক্ষাভিন্ন অন্য উপায়ে তাহা হয় নাই।'

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যদুনাথ পরিভ্রমণ করেছেন, লিখেছেন আজমীর শরীফ ও খাজাবাবার কথা, হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার কথা, পুরনো দিল্লীর 'ভুলভুলড়ি মসজিদের' কথা। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থটি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলাকাতা থেকে নদীপথে ভ্রমণে বার হলে 'ভ্রমণকারিবন্ধু হইতে প্রাপ্ত' শিরোনামায় এই রচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মূলত পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অধুনা যাকে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলি, সেখানকার বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। গদ্য রচনাতেও ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একটু গদ্যাংশ উদ্ধার করলেই সে কথা বোঝা যাবে—'সে বিষও নাই। সে চক্রও নাই, অথচ ফোঁস-ফোঁসানির ত্রুটি হয় নাই, ইঁহারা অভিমানের অধীন হইয়া অনেক সম্পত্তি ও সুখসৌভাগ্যের হানি করিয়াছেন, অহঙ্কার পরবশ না হইলে এত বিপদ্‌গ্রস্ত কখনই হইতেন না, কেবল অহঙ্কারেই সর্বনাশ করিয়াছেন।'

রমেশচন্দ্র দত্ত জলপথে ইউরোপ গমন করেন এবং তিন বছরেরও বেশি সময় সেখানে অতিবাহিত করেন, সুতরাং তাঁর ভ্রমণকাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডায়ারিতে ইংরেজিতে লিখিত এই ভ্রমণকাহিনী সম্ভবত অন্য কেউ বাংলায় অনুবাদ করেন।

একেবারে প্রথম দিকে রচিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমালয় বর্ণনামূলক গ্রন্থ এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ দর্শন'। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তথ্য আছে, তাঁর বিশিষ্ট অধ্যাত্ম অনুভূতির স্পর্শও আছে, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা আরো প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—'সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।'

একটু ভিন্নভাবে পরিবেশিত সেকালের একটি ভ্রমণকাহিনী দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন।' উদ্দেশ্য ভ্রমণকাহিনী লেখা কিন্তু সেটি লিখবার জন্য তিনি একটি কল্পকাহিনীর উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তীকালে 'পয়সার ডায়েরি' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, লেখক সম্ভবত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সেখানে একটি পয়সা তার আত্মজীবনী রচনা করছে। এই

তুলবার জন্য একটা কাহিনীসূত্র তাতে থাকতেই পারে, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর চরিত্র যেন তাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়েও তাকে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ লেখকের সংযম এবং মাত্রাবোধই ভ্রমণকাহিনীকে সজীব করে রাখতে পারে।

● একটি ভ্রমণকাহিনীর পরিচয়

গল্প-উপন্যাস নয়, একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেই পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন, এমন কয়েকটি গ্রন্থের নাম যদি করতে হয়, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' যে তাদের অন্যতম হবেই, নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই একই কথা বলেছিলেন—'বাঙলা ভাষায়' দেশভ্রমণকে অবলম্বন করে ... অন্যতম রসসৃষ্টি।'

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটি লেখকের কাবুল যাত্রা ও অল্প দিন সেখানে বসবাসেরই স্মৃতি-রোমন্থন। কাবুল তো বিদেশ, সুতরাং গ্রন্থের নাম 'দেশে বিদেশে' কেন, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে লেখকের উত্তর, ''দেশে বিদেশে'' শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ বইয়েতে কিছুটা 'দেশের' বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি, আর বাকিটা 'বিদেশের' অর্থাৎ এ স্থলে কাবুলের।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত, কাজেই পেশওয়ার তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষেরই অন্যতম অঙ্গ ছিল।

মূলত তিনটি পর্যায় আছে এই যাত্রার। সূচনায় দেখি, হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা ও শেষ পর্যন্ত কাবুলে পৌঁছানো; দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখকের কাবুলের প্রবাস-জীবনের বর্ণনা এবং তৃতীয় পর্বে আমীর আমানুল্লার সংস্কার-প্রচেষ্টার হাস্যকর বাড়াবাড়িতে কাবুলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি এবং তারই ফলস্বরূপ লেখকের কাবুল ত্যাগ। কাবুলের রাজনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশদ বর্ণনা বা ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের ইতিহাস বা একটি পুতুল শাসক বসিয়ে রুশ আগ্রাসন ঠেকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার বিবরণ এখানে নেই—রাজনৈতিক অবস্থার কথা যেটুকু এসেছে তা শেষ পর্বে আমানুল্লার সংস্কার-প্রয়াস প্রসঙ্গেই। কিন্তু সম্ভবত সেই জন্যই গ্রন্থটি কাবুলের ক্ষমতা-উত্থানপতনের দলিল না হয়ে একটি অসাধারণ ভ্রমণ-আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

গ্রন্থের আরম্ভটিই অসাধারণ। কাবুল আমাদের অপরিচিত দেশ, সেখানকার রীতিনীতি, আদব-কায়দাও আমরা কিছু জানি না বললেই হয়। অন্য দিকে এর লেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বহুভাষাবিদ্ এক পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিমান। কাজেই একটি গুরুগম্ভীর ভূমিকা দিয়ে গ্রন্থ শুরু হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অথচ শুরুটা হয়েছে এইভাবে: 'চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম।' অতঃপর ট্রেনে সহযাত্রী এক ফিরিঙ্গি তার ফিঁয়াসে-প্রদত্ত নিজহাতে প্রস্তুত ডিনার যখন বার করে তখন দেখা যায় লেখকের জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা ডিনার-প্যাকের সঙ্গে তার এতটুকু তফাত নেই।

এইরকম হালকা চালেই এগিয়েছে ভ্রমণকাহিনী। পেশোয়ার যাওয়ার পথে শিখ এবং পাঠানের বিলক্ষণ আধিক্য দেখে লেখকের মনে বিবিধ চিন্তা জাগে, এগুলিকে আর যাই বলা যাক, গুরুতর গবেষণার বিষয় বলা যাবে না, কারণ এর মধ্যে একটি ছিল 'তুলনামূলক

ভঙ্গিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে আমরা ভারতবর্ষের বাইরের অন্যান্য দেশের বর্ণনাও পাই।

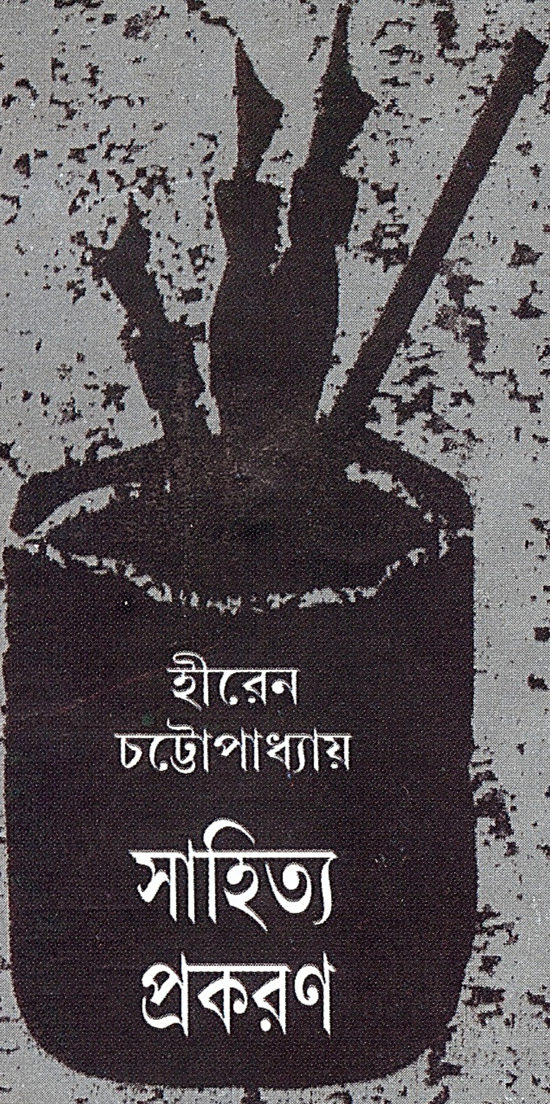
কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের হাতে ভ্রমণকাহিনী একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাঁকে বিভিন্ন কারণে পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর অজানাকে জানার আনন্দ ও বিচিত্র অনুভূতি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি লেখা হয়েছে পত্রের ভঙ্গিতে। তাঁর এইসব ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা গল্পকাহিনী সংযোগ করলে তা আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে বলে আধুনিক কালের ভ্রমণসাহিত্যে এই প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। প্রবোধকুমার সান্যাল দুটি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন—'মহাপ্রস্থানের পথে' এবং 'দেবতাত্মা হিমালয়।' এর মধ্যে প্রথম গ্রন্থটিতে একটি উপভোগ্য কাহিনী আমরা লাভ করি।

এইরকমই একটি অসামান্য ভ্রমণকাহিনী 'দেশে বিদেশে' লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি। গ্রন্থটিতে কাবুল ভ্রমণের যে অন্তরঙ্গ চিত্র আছে তাতে সেখানকার মানুষের একটি প্রাণবন্ত চিত্র আমরা লাভ করি। এখানেও সুন্দর একটি কাহিনী লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। গ্রন্থটির উপভোগ্যতার একটি বড় কারণ লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা। ভ্রমণকাহিনী রচনার সমস্ত প্রথা একেবারে নস্যাৎ করে তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এইভাবে—'চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম।'

ভ্রমণসাহিত্যে বাংলা ভাষা রীতিমত সমৃদ্ধ বলা চলে। কাহিনী প্রায় বর্জন করে রমণীয় ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকে। উল্লেখ করা যায় জলধর সেনের 'হিমালয়', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে', দেবেশ দাসের 'ইয়োরোপা', রামনাথ বিশ্বাসের 'লালচীন', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' প্রভৃতি গ্রন্থের। কেবল দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করেছেন এবং আন্তরিক ভাবে তা একের পর এক গ্রন্থে বর্ণনা করে গিয়েছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে গল্পের ভাগ একটু বেশি যোগ করেছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন শঙ্কু মহারাজের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' গ্রন্থটি পাঠ করে গল্পের স্বাদও কিছু পাওয়া যাবে। অবধূতের লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থে অবশ্য ঘটনার নাটকীয়ত্ব অনেক বেশি। পর্বত-অভিযান নিয়ে যেসব গ্রন্থ বংলায় লেখা হয়েছে, উত্তেজনার খোরাক সেখানেও আমরা অনেক পাই, যথা গৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি' বা বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড'। ভ্রমণকাহিনী ঐতিহাসিক গবেষণার আরক-গ্রন্থ হয়ে রয়েছে, এমন উদাহরণও আছে, যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

বেশ কিছু খণ্ডে রচিত 'রম্যাণি বীক্ষ' গ্রন্থের উল্লেখ না করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হতে পারে না। এই গ্রন্থের লেখক সুবোধ চক্রবর্তী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পর্বে পর্বে পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের মতো এখানে ভ্রমণের সঙ্গেই কিছু কল্পিত কাহিনী এবং সেই কাহিনীর কল্পিত চরিত্রও আছে। এই কারণেই কোনো কোনো সমালোচক তাদের খাঁটি ভ্রমণকাহিনী না বলে ভ্রমন্যাস (ভ্রমণ + উপন্যাস) হিসাবে অভিহিত করতে চান। অবশ্যই এই নামকরণ কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। আমরা মনে করি, ভ্রমণ কাহিনীকে আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য করে



হীরেন
চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ